নাটক সমগ্র ১

নাটক সমগ্র ১

রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত

সপ্তর্ষি প্রকাশন

NATAK SAMAGRA 1
A collection of five adopted drama
by Rudraprasad Sengupta

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০০২

স্বাতী রায়চৌধুরী কর্তৃক সপ্তর্ষি প্রকাশন , ৪৪এ চক্রবর্তী লেন , শ্রীরামপুর হুগলী থেকে
প্রকাশিত এবং কালি প্রেস, ৬৭ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট থেকে মুদ্রিত ।

যে আমাকে থিয়েটারে এনেছিল
সেই অজিতেশকে
যারা আমাকে থিয়েটারে রেখে দিয়েছিলো
সেই রেখা, বরুণ, অসিত এবং আরো অনেককে
যারা আর নান্দীকারে নেই
কেউ কেউ এই পৃথিবীতেই নেই
এবং
পরিমল, সুব্রত, জ্যোতি, দুলাল
বীণা, সোহিনী, গৌতম, দেবশংকর ,
পার্থ প্রতিমকে আর
অন্যান্য ছাত্রছাত্রীকেও- যারা আজ
নান্দীকারের ভালো এবং মন্দের স্থপতি
এবং সর্বোপরি আমার সবচেয়ে মানবিক সহযোগী
স্বাতীলেখাকে

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা
নাট্যকারের সন্ধানে ছ'টি চরিত্র	১১
ফুটবল	৬৩
শেষ সাক্ষাৎকার	১২৫
ফেরিওয়ালার মৃত্যু	১৮৯
গোত্রহীন	২৫৭
সমকালীন দৃষ্টিতে রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তর নাটক লিখছেন: সলিল বন্দ্যোপাধ্যায় কুন্তল মুখোপাধ্যায় দেবাশিস রায় চৌধুরী তীর্থঙ্কর চন্দ	৩১৭-৩৩৮
নাটককার রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত নাট্যকার রুদ্র প্রসাদ লিখছেন: সীমা মুখোপাধ্যায় দেবশঙ্কর হালদার	৩৩৯-৩৪৭
মুখোমুখি : গৌতম হালদার খালেদ চৌধুরী সঞ্চয়ন ঘোষ রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত সুমন মুখোপাধ্যায়	৩৪৯-৩৮১

বিন্যাসকের কথা

একটু দেরী হয়ে গেলেও শেষ পর্যন্ত প্রকাশিত হলো। নাট্যজনেরা আশা করি সেটুকু মেনে নেবেন। অনেক না এর মধ্যে দিয়েও তবু পাঠকদের হাতে তুলে দেওয়া গেলো আমাদের বহু কাঙ্খিত "রুদ্রপ্রসাদ নাটক সমগ্র"-এর প্রথম খণ্ড। প্রত্যাশা রাখি প্রকাশক দ্বিতীয়খণ্ড-ও আমাদের হাতে তুলে দেবেন।

প্রায় বছর খানেক আগে সপ্তর্ষি প্রকাশনের দুই তরুণ-তরুণী সৌরভ ও স্বাতী এই বিন্যাসককে জানিয়েছিলেন তাঁদের ভাবনা, একটি নাটকের বই করতে চান। প্রথমে উড়িয়ে দিয়েছিলাম। প্রকাশনা ওঁদের ব্যবসা। সেইখানে দাঁড়িয়ে এতোটা ঝুঁকি নেবেন সত্যি? অবশ্যই ঝুঁকি, কেননা প্রতিদিন অ্যাকাডেমি বা অন্যান্য মঞ্চগুলির টিকিট বিক্রির অবস্থা দেখলেই বোঝা যায়, পরিচিত কয়েকটি মুখ ছাড়া সাধারণ মানুষ কজন আসেন, মানুষ নির্ভর এই শিল্পটি অনুভব করতে, উপভোগ করতে। আমরা তো ক্রমশ মানুষ বিবর্জিত হয়ে যাচ্ছি, একেকটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো। তবু প্রকাশক নাছোড়বান্দা। ওঁদের প্রস্তাব এমন একটি নাটকের বই, যে নাটকগুলি মঞ্চ আলোড়ন তুললেও গ্রন্থ রূপে প্রায় অপ্রকাশিত।

এখানে কয়েকটি কথা বলা জরুরি বলে মনে হয়। মৌলিক বাংলা নাটকের কয়েকটি ভালো ভালো সংস্করণ প্রকাশিত হলেও রূপান্তরিত বাংলা নাটক সেভাবে সঙ্কলিত হয়নি। অথচ সৃজনের পথে তারও গুরুত্ব কম কিছু নয়। প্রসেনিয়াম বাংলা নাট্যমঞ্চে বহু রূপান্তরিত/অনুদিত নাটক অভিনীত হয়েছে, বাংলা নাটকের ইতিহাসে মৌলিক/অনুদিত/রূপান্তরিত কারোর গুরুত্বই কম নয়। তাই বেছে নেওয়া হলো রূপান্তরিত নাটকের বই প্রকাশের ভাবনাকে। রূপান্তরিত নাটকের ক্ষেত্রে রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। তাঁর সৃজনান্তরিত একাধিক নাটক প্রযোজিত হয়েছে, কিন্তু মুদ্রিত রূপ সেইভাবে কলেজস্ট্রিট পাড়ার চোখে পড়েনি। প্রকাশক বললেন, যতো কঠিন কাজই হোক রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত নাটক সমগ্র প্রকাশ করার গৌরব হাতছাড়া করতে তাঁরা বিন্দুমাত্র রাজি নন। নাটককারের সঙ্গে কথা বলে অনুমতিও আদায় করে ফেললেন। সুতরাং........।

এবার হলো আসল সমস্যা। প্রকাশকদের দাবী, এই অধমকে নিতে হবে বিন্যাস এবং সঙ্কলনের দায়িত্ব। তাঁদের বহু বোঝানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হতে হলো যে এই বিন্যাসক আর কিছু যদিও বা বোঝেন নাটক কিম্বা নাট্য কিছুই বোঝেননা। ভালো লাগে বলে একটু আধটু দেখলেও, বোঝেননা কিছুই। তবু অনুরোধ এবং প্রচণ্ড উপরোধে অবশেষে ঢেঁকি গিললাম। বেশ কয়েকটা শর্ত দিলাম, ওঁরা রাজিও হলেন। বলেছিলাম শুধু দুই মলাটের মধ্যে কয়েকটা নাটক ছেপে দিলেই প্রকাশকের দায়িত্ব শেষ হবে না। একটু অন্যরকম কিছু করতে চাই। তার জন্য প্রকাশনা ব্যয় বেড়ে যাবে, যদিও দাম বাড়ানো যাবে বলে মনে হয়না। বেশি দাম হলে হয়তো বিক্রি কমে যাবে। বয়সে নবীন প্রকাশকদ্বয় এককথায় সায়

দিলেন। কাজ শুরু হলো অনেক আশা এবং ভাবনা নিয়ে। ভাবা গিয়েছিলো প্রতিটি রূপান্তরিত নাটকের মূল নাটক এবং নাট্যকারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া থাকবে। রুদ্রবাবুর রূপান্তরিত নাটকগুলি সম্পর্কে সমকালীন নাট্যজনের ভাবনাচিন্তার প্রকাশও থাকবে আমাদের এই সংকলনে। অনুরোধ করা হলো, অনেকেই রাজি হলেন, প্রচুর ব্যস্ততা থাকলেও বালখিল্য সুলভ এই উদ্যোগে সানন্দে সায় দিলেন, লিখেও দিলেন। কথা দিয়েও কথা রাখতে পারলেন না কেউ কেউ, আবার প্রচুর উপদেশ এবং পরামর্শ দিয়ে বিন্যাসকের এবং হয়তো কিছুটা প্রকাশকের অনভিজ্ঞতাকে শুধরে দিয়েছেন বহু থিয়েটারপ্রেমী। কিন্তু যতটা ভাবা গিয়েছিলো ততোটা পারলাম না। প্রকাশকের কোনো দায় নেই এই না পারাতে, দায়টা বিন্যাসকেরই। ভাবনাকে রূপান্তরিত করবার সবরকম সহায়তাই দিয়েছিলেন তাঁরা, মুদ্রণব্যয় নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথা না ঘামিয়ে।

এবার প্রশ্ন হলো প্রচলিত অন্যান্য সঙ্কলন থেকে এটা আলাদা করতে চাইছিলাম কেন? আমাদের মনে হয়, আলাদা না বলে এই ধরণের সঙ্কলনকেই পূর্ণাঙ্গ সঙ্কলন বলা বাঞ্ছনীয়। কারণ, নাটক সাহিত্য নয়। আলাদা একটি শিল্পমাধ্যম। নাটককার যখন নাটক লেখেন তাঁর মানসপটে অবশ্যই থাকে প্রযোজনার একটি কাঙ্খিত/কল্পিত প্রতিরূপ। মুদ্রিত নাটকে, প্রযোজিত রূপটি দেখা যায়না, তাই নাটককার/নির্দেশকদের প্রযোজনা ভাবনা পাঠকের সামনে থাকলে সুবিধা হয় বলেই মনে হয়েছে। নাট্য তিলোত্তমা শিল্প। একাকী সম্পূর্ণ নয় সে। নির্দেশকের সঙ্গে সহায়তা করে/ উপদেশ দিয়ে/ পরামর্শ দিয়ে প্রযোজনাটি সুসম্পন্ন করেন অনেক নেপথ্য শিল্পী। এই সঙ্কলনে আমরা চেষ্টা করেছি কয়েকজন নেপথ্য শিল্পীর প্রযোজনা সংক্রান্ত ভাবনাটি তুলে ধরতে। সৌভাগ্য, আমরা পেরেছি স্বয়ং খালেদ চৌধুরীর শিল্পসৃজন পথের কণা মাত্র হদিশ দিতে। মনে হয়েছিলো, তরুণতর প্রজন্মের নাট্যজনদের সঙ্গে যদি মুখোমুখি বসানো যায় কিংবদন্তী- সম নাট্য-শিল্প ব্যক্তিদের, তাহলে কেমন হয়। আমাদের প্রস্তাবে সানন্দে রায় দিলেন সুমন এবং সঞ্চয়ন। এঁদের চোখে দেখতে চাইলাম নাটককার নির্দেশক রুদ্রপ্রসাদের মনোভূমি। সঞ্চয়ন কথা বললেন তাঁরই অগ্রজ প্রতিম খালেদ চৌধুরীর সঙ্গে, আর সুমন কথা বললেন রুদ্রবাবুর সাথে।

মনোভূমি কর্ষিত হয়ে ফসল ওঠা, যেন এক যাত্রাপথ, কখন কোন ভাবনা থেকে কেমন ভাবে একটা বীজ জন্ম নেয় সেই প্রক্রিয়াটি থিয়েটার অনুরাগীর কাছে শিক্ষণীয় বিষয়। তাই স্থির হলো তাঁর নাটক থেকে নাট্যের যাত্রাপথের যাঁরা সঙ্গী তাঁদের অভিজ্ঞতা এবং অনুভূতিটিও এই সঙ্কলনের একটি স্তম্ভ হয়ে উঠুক।

এবার বলতে হয় দেরি হওয়ার প্রসঙ্গ। সবাইকে যে কথা দেওয়া হয়েছিলো সেই কথা রাখা হয়নি। প্রায় বছর ঘুরে গেলো, যে ভাবে সঙ্কলনটি বিন্যস্ত করা হবে বলে ভাবা গিয়েছিলো ততোটাও করা হলো না। না এরজন্য প্রকাশকের কার্পণ্য দায়ী নয়। বরং তারা চেয়েছিলেন ভাবনাকেও ছাপিয়ে যাক সঙ্কলন। বিন্যাসকের ভাবনা দুই মলাটবন্দী করার জন্য বিস্তর দৌড়ঝাঁপও করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর হয়ে উঠলোনা। বিন্যাসকের অক্ষমতা ছাড়া একে আর কি-ই বা বলতে পারা যায়?

শুভ্র মজুমদার
সপ্তর্ষির পক্ষে

নাট্যকারের সন্ধানে ছ'টি চরিত্র

মূল নাটক : পিরানদেল্লো

[নাটকটিতে অঙ্ক বা দৃশ্য কিছুই নেই। একবার নাটকের অভিনয় স্থগিত থাকছে যখন ম্যানেজার ও প্রধান চরিত্রগুলি সিনারিও ঠিক করার জন্য বেরিয়ে যাচ্ছে (পর্দা পড়ছে না)। দ্বিতীয়বার স্টেজম্যানের ভুলে পর্দা পড়ে গিয়ে অভিনয় স্থগিত থাকছে। দর্শকরা দেখবেন যে পর্দা ওঠানোই রয়েছে আর মঞ্চের সাধারণ একটি সন্ধ্যায় যে রকম থাকে সেইরকম।
এক কোণে প্রম্পটারের বসার জন্যে একটা টুল। ম্যানেজারের বসার জন্য একটা ছোট টেবিল আর চেয়ার। আরো কয়েকটা চেয়ার আর দুটো টেবিল এধার ওধার ছড়ানো। অভিনেতা-অভিনেত্রীরা এক-এক করে ঢুকলো। প্রম্পটার বই নিয়ে ম্যানেজারের জন্যে প্রতীক্ষমান। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কেউ সিগারেট খেতে লাগলেন। কেউবা নিজের পার্টটা আউড়ে নিলেন। মানেজার ব্যস্তভাবে নিজের চেয়ারে গিয়ে বসে টেবিলের ওপর রাখা চিঠিপত্র দেখতে থাকেন। প্রম্পটার বইটা খুলে নিজের টেবিলে গিয়ে বসেন।]

ম্যানেজার। (একটা খাম টেবিলে ছুঁড়ে) আরে বাপরে, কিছু যে দেখাই যায় না! (স্টেজ-ম্যানেজারকে) ওহে মাখন, একটু আলোর ব্যবস্থা করো তো স্টেজে।

মাখন। আজ্ঞে এই যে।

ম্যানেজার। (হাততালি দিয়ে) আচ্ছা চলে আসুন দিকি। এক্ষুণি ইতালীয়ান নাট্যকার পিরানদেল্লোর "মিক্সিং ইট আপ" অবলম্বনে "আলো আমার আলো" নাটকের সেকেণ্ড এ্যাক্টের রিহার্সাল শুরু হবে।

প্রম্পটার। (বই থেকে পড়ে) 'সুশোভনের ঘর অদ্ভুত ধরনের সাজানো। সাধারণতঃ অবিবাহিত লোকের ঘর যে রকম হয়ে থাকে।'

ম্যানেজার। (স্টেজ-ম্যানেজারকে) পুরোনো লাল সেটটা তৈরী থাকে যেন।

স্টেজ-ম্যানেজার। (নোট বইটা খুলে লিখতে লিখতে) আগের নাটকের লাল সেটটা তো? এক্ষুণি নোট করে নিচ্ছি।

প্রম্পটার। (পড়তে থাকে) 'টেবিলে কিছু খাবার রয়েছে। কোণে একটা ছোট্ট টেবিল। তার ওপর কিছু বই, রাইটিং প্যাড, কালির দোয়াত। পেছন দিক দিয়ে আটাকলে যাওয়ার রাস্তা। বাঁদিকে চালের গুদোম। ডানদিকে বাইরে যাবার রাস্তা।'

ম্যানেজার। (উৎসাহের সঙ্গে) ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন তো? বাইরে যাবার রাস্তা ডানদিকে। ঐ দিকে চালের গোডাউন। (অশোকের ভূমিকায় প্রধান অভিনেতার দিকে তাকিয়ে) আপনি এইদিক দিয়ে ঢুকবেন, ঐদিক দিয়ে বেরোবেন। (স্টেজ-ম্যানেজারকে) ঐদিকে একটা দরজা। একটা চটের পর্দার ব্যবস্থা থাকে যেন!

স্টেজ-ম্যানেজার। (লিখে নিয়ে) ঠিক আছে।

প্রম্পটার। (আগের মতো পড়ে যায়) 'পর্দা উঠলে দেখা যাবে, সুশোভন লুঙ্গি পরে খালি গায়ে একটা কাপে ডিম ভাঙছে, অমল শুয়ে আছে সুশোভনের বিছানায়। ত্রিলোচনবাবু চেয়ারে বসে খবরের কাগজ পড়ছেন।'

প্রধান অভিনেতা। (ম্যানেজারকে) আচ্ছা দেখুন, আমার কি ঐ লুঙ্গি পরে খালি গা হওয়াটা কি খুব এসেনশিআল?

ম্যানেজার। মানে? খালি গা হতে যাবেন কেন?....... ও। স্ক্রিপটাতে যে আবার তাই লেখা আছে।

প্রধান অভিনেতা। কিন্তু হিরোর পক্ষে এরকম ব্যাপারটা কি নিতান্ত ছ্যাবলামি হবে না?

ম্যানেজার। ছ্যাবলামি! মানে ছ্যাবলা? আরে মশাই, এ কি আমার দোষ যে এদেশে ভালো নাটক পাওয়া যাচ্ছে না? একে বিদেশী, তায় ইংল্যাণ্ড না, আমেরিকা না— ইটালী, আর কি খটমট নাম..... পিরানডেল্লো! এঁর নাটকের মাথামুণ্ডু কারুর বোঝবার সাধ্য আছে? মশাই, যতোই অনুসরণ করুন, অবলম্বন করুন, ভবি ভোলবার নয়। উপায় থাকলে কি সাধ করে এ নাটকের ঝামেলা ঘাড়ে নিই! ......আর আপনি কচুবাবু, আপনাকে ঐ লুঙ্গি পরে খালি গায়ে ডিমই ভাঙতে হয়? উপায় নেই মশাই, উপায় নেই।

তরুণ অভিনেতা। তার দরকার নেই। ফার্স্ট সিনেই যে সব উদ্ভট কারবার রয়েছে তাতে অডিএন্স থেকেই অনর্গল ডিমের খোলা ঝাড়তে থাকবে।

অভিনেতা অভিনেত্রীরা হেসে ওঠে

ম্যানেজার। সাইলেন্স! সাইলেন্স। ...... আমি এবার সিচুএশানটা আপনাদের বুঝিয়ে দেব। (দ্বিতীয় প্রধান অভিনেতাকে) 'সচেতন ও সক্রিয় প্রবৃত্তি না থাকলে অন্তঃসারশূন্য যুক্তির কোন ধারই থাকে না। আপনি যুক্তিকে আর আপনার লাভার প্রবৃত্তিকে রূপ দেবেন। সমস্ত পার্ট গুলিয়ে দেওয়াই এই বইয়ের বিষয়বস্তু। যার ফলে আপনি নিজের ভূমিকা অভিনয় করে, নিজেই নিজের ক্রীড়নকে পরিণত হবেন'....বুঝলেন তো ব্যাপারটা?

প্রধান অভিনেতা। কিছুই না।

ম্যানজার। আমিও না। কিন্তু এইটা তো স্টেজ করতে হবে। আপনি যদি খানিকটা চুটিয়ে এ্যা ক্টিং করতে পারেন তাহলে জিনিষটা অন্ততঃ একটা গ্লোরিয়াস ফেলিয়ার, মানে গৌরবময় ব্যর্থতা গোছেরও তো দাঁড়াবে। একটা সুবিধে আছে যে নাটকটার ডায়লগগুলো শুনতে কিন্তু বেড়ে, খালি মানেটাই যা বোঝা যায় না।....যাক্‌গে, গেট রেডি এভরিবডি...।

প্রম্পটার। মিঃ ঘোষ, আমি উইংসে চলে যাই?

ম্যানেজার। না! এই একটু দূরে দাঁড়িয়েই করোনা। আচ্ছা, রেডি এ্যাকসন!

[এই সময় বাইরে একটা হট্টগোল শোনা যায়। শিফটার নেপাল

এসে ম্যানেজারের টেবিলের সামনে দাঁড়ায়। স্টেজের পেছনদিকের উইংস দিয়ে ছ'টি চরিত্র এসে ঢোকে। ওদের ওপর আবছা আলো। বাবার বয়স পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশ। মুখে গোঁফদাড়ি। চোখে চশমা, মাথার চুল অল্প পাকা, কাঁচা কিন্তু বেশী নয়। খুব ধারালো চোখ। কোট প্যান্ট ও চটি পরিহিত। হাতে একটা ছড়ি।

মা'কে দেখে মনে হয় খুব শোকাচ্ছন্ন; একেবারে ভেঙে পড়েছেন। বিধবার নতুন পোষাক পরণে। ঘোমটায় প্রায় সমস্ত মুখ ঢাকা।

সৎমেয়ে বেশ সুন্দরী আর চটুল ভাবাপন্ন; সাধারণ শাড়ী জামা পরণে, খালি পা।

একটি চৌদ্দবছরের ছেলে। উস্কোখুস্কো চেহারা একটি আট বছরের মেয়ে।

একটি ছেলে, বয়েস বাইশ। রুক্ষ চেহারার। লম্বা। ভাবভঙ্গিতে মনে হয় যে ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে স্টেজে আনা হয়েছে।]

নেপাল। বড়বাবু....

ম্যানেজার। (চটে) কি? কি ব্যাপার?

নেপাল। বড়বাবু, এই এঁরা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

ম্যানেজার। (আরো রেগে) রিহার্সাল হচ্ছে দেখতে পাচ্ছ না? রিহার্সালের সময় আমি কি কারো সঙ্গে দেখা করি? ([illegible] বলতে যায়) সাট্ আপ্। (আগন্তুকদের দিকে তা[illegible] [illegible]াপনারা?

বাবা। (একটু এগিয়ে আসেন। তাঁর পেছন পেছন [illegible] [illegible]িয়ে আসে) ব্যাপারটা কি জানেন? আমরা না....আ[illegible] নাট্যকারের খোঁজে বেরিয়েছি।

ম্যানেজার। (চটে আবার অবাক হয়েও) নাট্যকার? কোন নাট্যকার?

বাবা। যে কেউ। যে কোন একজন নাট্যকার।

ম্যানেজার। (আগন্তুকের কথাবার্তার ধরন দেখে সম্ভ্রমের সঙ্গে) কিন্তু এখানে তো কোন নাট্যকার নেই। আমরা এখানে একটা বিদেশী নাটকের রিহার্সাল দিচ্ছি। বুঝেছেন? তা যিনি এটা অ্যাডাপ্ট করে দিয়েছেন, সেই ভদ্রলোকও তো এখানে নেই। মানে ব্যাপার হচ্ছে যদি— আমরা কোন দেশী নাটক স্টেজ করতুম....

মেয়ে। ভালোই তো, আমরাই তো আপনার দেশী-নাটক হতে পারি।

তরুণ অভিনেতা। (অন্য সবাইয়ের থেকে এগিয়ে এসে) কি বলছেরে বাবা!

বাবা। সে ভদ্রলোক না থাকলে তো মুস্কিল হয়ে গেল। (ম্যানেজারকে) আচ্ছা, আপনি তো—

ম্যানেজার। আমি কি? নাট্যকার? একি রসিকতা করতে এসেছেন নাকি?

বাবা। না না বিশ্বাস করুন, সত্যি বলছি, আমরা না একটা নাটক এনেছি।

মেয়ে। আমাদের দৌলতে আপনার ভাগ্য ফিরে যেতে পারে!

ম্যানেজার। খুব ভালো। কিন্তু আপনারা এখন দয়া করে বিদেয় হোন তো! আমাদের রিহার্সাল দিতে দিন।

বাবা। আচ্ছা আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে জীবনে অনেক কিছু ঘটে যা সাধারণভাবে অসম্ভব বলে মনে হয়, কিন্তু সেগুলোও তো সত্যি। তাই যা সত্যি সেগুলোর অসম্ভাব্যতা বিচার নিষ্প্রয়োজন।

ম্যানেজার। আরে আরে, আপনি যে আবার জ্ঞান দিতে আরম্ভ করলেন দেখছি। ভ্যালা পাগলের পাল্লায় পড়া গেল তো।

বাবা। আমি জানি প্রচলিত রীতির বিরোধিতা করাকেই অনেকে পাগলামো মনে করেন—আর ধরুন আপনারা যে নাটক করতে গিয়ে কতকগুলো অলীক চরিত্রকে স্টেজে এনে বাস্তব প্রমাণ করবার চেষ্টা করেন, সেটাও কি পাগলামো নয়?

ম্যানেজার। (চেয়ার থেকে উঠে, বাবার দিকে তাকিয়ে) মানে আমাদের নাটক করা আপনার মতে পাগলামো?

বাবা। বিনা দরকারে, যা সত্যি নয় তাকে সত্যি বলে প্রমাণ করার চেষ্টা, কতকগুলো অবাস্তব, অলীক চরিত্র জীবন্ত করে তোলার চেষ্টা—এই তো আপনাদের কাজ? তাই না?

ম্যানেজার। আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে নাটক করা একটা....যাকে বলে মানে বেশ একটা ভালো ব্যাপার।

বাবা। জানি না। আমি শুধু আপনাকে বোঝাতে চাই যে একটা সত্তার যেমন বিভিন্ন রূপ—ধরুন গাছ, ফুল, পাখি, নদী, প্রজাপতি হয়ে প্রকাশিত হয়, তেমনি একটা নাটকের চরিত্র হিসেবেই তো কেউ কেউ প্রকাশিত হতে পারে।

ম্যানেজার। ও, তার মানে, আপনি আর আপনার অনুচরবৃন্দ নাটকের চরিত্র হিসেবেই ধরাধামে প্রকাশিত হয়েছেন?

বাবা। হ্যাঁ! ঠিক এই কথাটাই তো এতক্ষণ ধরে আপনাকে বলতে চাইছি।

তরুণ অভিনেতা। এতো আগমন নয়, আবির্ভাব!

[ম্যানেজার ও অভিনেতারা সশব্দে হেসে ওঠে]

বাবা। (ক্ষুণ্ন স্বরে) আপনারা হাসছেন। কিন্তু বিশ্বাস করুন আমরা এই ছ'জন পৃথিবীতে এসেছি শুধু একটা নাটকের জন্যেই....শুধুমাত্র একটা নাটকের জন্যেই....বিশ্বাস করুন। (মা'র দিকে তাকিয়ে) আচ্ছা, ওর এই বিধবার বেশ দেখেও কিছু বুঝতে পারছেন না?

ম্যানেজার। (ধৈর্যচ্যুত হয়ে) থামুন মশাই, অনেক হয়েছে, এবার আসুন দিকি। (দারোয়ানের সন্ধানে এদিক ওদিক তাকিয়ে নেপালকে) কী হে, এদের বের করে দিতে পারছো না?

বাবা। আচ্ছা আমার কথাটা একটু—

ম্যানেজার। এখন কথা শোনবার সময় নেই আমার। যান কাটুন।....স্টেডি। সেকেণ্ড অ্যাক্ট!

তরুণ অভিনেতা। হ্যাঁ, ঢের পেঁয়াজি হয়েছে।

বাবা। (আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে এগিয়ে এসে) দেখুন, আপনারা অবিশ্বাস করছেন? ঠাট্টা করছেন? বাধছে না আপনাদের? আপনারাই নাটকে

লেখা চরিত্রগুলোতে অভিনয় করবেন বলে স্টেজে দাঁড়িয়েছেন। আমাদের নিয়ে এ পর্যন্ত কোন নাটক লেখা হয়নি বলেই আপনারা—

মেয়ে। (ম্যানেজারের দিকে চটুল ভঙ্গিতে এগিয়ে গিয়ে) বিলিভ মি, আমরা ছ'জন সত্যিই খুব নাটকীয় চরিত্র, যদিও কিছুটা আপনাদের চেনাজানা বাঁধাধরা রাস্তার বাইরে চলে গেছি।

বাবা। ঠিক তাই। (ম্যানেজারের দিকে) যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছিলেন তিনি আমাদের একটা নাটকে গ্রন্থবদ্ধ করতে চাননি, হয়তো পারেন নি, তবু আমরা রইলাম; কেননা নাটকের চরিত্র হয়ে জন্মাবার সৌভাগ্য যাদের হয়েছে, তারা কি কখনো মরতে পারে? পারে না। এই ধরুন না, চন্দ্রশেখর, প্রতাপ কিংবা শ্রীকান্ত অথবা ইন্দ্রনাথ— সাহিত্যে স্থান পেয়েছেন বলেই না আজও এঁরা অমর।

ম্যানেজার। না, এটা বোধহয় আপনি ঠিকই বলেছেন। কিন্তু আপনারা এক্স্যাক্টলি কি চান বলুন তো?

বাবা। আমরা বাঁচতে চাই।

ম্যানেজার। তা বাঁচুন না,—আটকাচ্ছে কে?....ও, মানে বাঁচতে চান, বাঁচতে চান....ঐ....চিরকালের জন্যে—

বাবা। না, একটি মুহূর্তের জন্যে....আপনার মধ্যে আমরা বাঁচতে চাই।

তরুণ অভিনেতা। (আর একজন অভিনেতাকে) বলে কি কচুদা।

প্রধানা অভিনেত্রী। বলছে, ওরা মিঃ ঘোষের মধ্যে বাঁচতে চায়।

তরুণ অভিনেতা। (মেয়েকে দেখিয়ে) আহা, ঐ মেয়েটা আমার মধ্যে বাঁচতে চায় না রে।

বাবা। শুনুন, শুনুন, নাটকটা যদি করতেই হয় তাহলে আমাদের সবার মধ্যে...যাকে বলে একটা ঐকতান দরকার।

তরুণ অভিনেতা। মেরেসে। আমাদের এখানে খুচরো বাজনা-টাজনার ব্যবস্থা নেই মশাই। আমরা নাটক করি।

বাবা। সেইজন্যেই তো আমরা এসেছি।

প্রম্পটার। কিন্তু আপনাদের বই কোথায়?

বাবা। বই? বইতো আমাদের মধ্যেই। (সবাই হেসে ওঠে) আমাদের মধ্যেই নাটক আছে, আমরাই নাটক। আর সেই নাটকটা আমাদের অভিনয় করতে দিন। বিশ্বাস করুন, এই আমার একমাত্র কামনা।

মেয়ে। (বিদ্রুপ আর ন্যাকামি মেশানো ভঙ্গিতে) একমাত্র কামনা! ইস্, আপনারা যদি জানতেন....আমার জন্য ওর কামনা....

বাবার দিকে দেখায় তারপর এগিয়ে জড়িয়ে ধরার ভঙ্গি করে, আর ফেটে পড়ে হিস্টিরিক হাসিতে।

বাবা। আঃ, কি হচ্ছে! ও রকম করে হাসছো কেন?

মেয়ে। আপনারা যদি পারমিশান দেন তাহলে বলি—যদিও মোটে সাতদিন হোলো আমার বাবা মারা গেছেন—তা-ও আমি আপনাদের একটা

আধুনিক গান গেয়ে শোনাতে পারি—

অভিনেতা-অভিনেত্রীরা সমস্বরে বাহবা বাহবা, কেয়াবাৎ বহুৎ আচ্ছা, হোক হোক, বেড়ে ইত্যাদি ধ্বনি করতে থাকেন।

ম্যানেজার। সাইলেন্স, কি হচ্ছে সব! এ কি আপনাদের ইয়ের বাড়ী পেয়েছেন নাকি? (বাবার দিকে) এ মেয়েটা পাগল নাকি মশাই?

বাবা। পাগল? শুধু পাগল?

মেয়ে। শুধু পাগল? পাগলের চেয়েও খারাপ, না? আপনারা আমাদের নাটকটা করতে দিন। তারপর দেখবেন, একটা জায়গায়...আমার এই সবচেয়ে ছোট্ট বোনটা (মেয়েটাকে খুব কাছে টেনে নিয়ে ম্যানেজারের দিকে এগিয়ে) দেখুন, দেখুন, একে দেখতে বেশ না? জানেন, আমার এই ছোট্ট বোনটা...মরে যাবে....আর এই ছোট্ট ভাইটা....আমাদের দু'বোনের এই একটা ভাই; এ-ও কেমন করে বুঝতে পারবে ওর বেঁচে থাকার কোন মানে নেই। তারপর একদিন ওদের বাড়ির বাগানে....ঐ লোকটার (বাবাকে দেখিয়ে) বন্দুকটা লুকিয়ে এনে দেখুন, দেখুন এই এতটুকু ছেলে ....গুলিটা লেগেছিলো ঠিক এখানটায় (গলায় হাত দিয়ে দেখায়) ....যখন মা ওর মরা শরীরটার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে অজ্ঞান হয়ে যাবে .... তখন .... আমি দারুণ লজ্জায় ঘেন্নায়—ওদের (বাবাকে দেখায়) বাড়ি ছেড়ে চলে গেছি অনেক দূরে—থাকগে। এখনো নাটকের সে জায়গাটা আসেনি। আমি শেষ অবধি মরবো না। কিন্তু মা আর ঐ লোকটা আর ওর ছেলেটার সংসারে আমি বাঁচবোই বা কি করে বলুন? ওই লোকটা যে এই সেদিন আমার সঙ্গে নোংরামি করেছে—আমার মা যে তা জানে। মার মুখের দিকে তাকিয়ে আমার যে বুক ফেটে যায় .... আর হয়তো তবু আমার ভাইটা, আমার বোনটা বাঁচতেও পারতো, যা যা হয়েছে সব কিছু ভুলে গিয়ে আমরা আবার একসঙ্গে থাকতে পারতাম .... কিন্তু তাও হোলনা—হতে দিলোনা—ঐ বিশ্রী নোংরা জানোয়ারটা—ঐ ছেলেটা দেখুন, দেখুন ওর দিকে তাকিয়ে দেখুন—আমাদের কোন কথা যেন ওর গায়েই লাগছে না—যেন এসব কথাতে ওর কিছুই আসে যায়না .... কেন জানেন? কেননা ওর বাবা ওর মাকে মন্ত্র পড়ে বিয়ে করেছিলো। ও তাদের বৈধ-সন্তান। আর আমাদের তিন ভাই-বোনকে ও ঘেন্না করে, কেননা আমার বাবা আমার মাকে অগ্নিসাক্ষী রেখে বিয়ে করেনি। আমাদের ভাই-বোনকে ও বলে বাস্টার্ড, বলে জারজ, অবৈধ—আমার মাকে বলে ....! মন্ত্র, অগ্নিসাক্ষী .... থুঃ!!

[এই সমস্ত কথা মেয়েটি খুব তাড়াতাড়ি বলে যায়।]

মা। (ম্যানেজারকে) বাচ্চা ক'টার মুখ চেয়ে—(প্রায় মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েন) আপনি—

বাবা। (মাকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এসে) কি, কি হলো? কাইগুলি

একটা চেয়ার, তাড়াতাড়ি একটা চেয়ার ....

অভিনেতারা। সত্যিই কি অজ্ঞান হয়ে গেলেন নাকি?

ম্যানেজার। এই মাখন, বদ্যিনাথ .... তাড়াতাড়ি একটা চেয়ার নিয়ে আয় না!

[**মাখন তাড়াতাড়ি চেয়ার এগিয়ে দেয়।**]

মাখন। (নেপালকে) কী করিস সব!

বাবা। (মায়ের ঘোমটাটা তোলার চেষ্টা করে) দেখুন, এর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখুন!

মা। না, না, আমাকে ছেড়ে দাও, তোমার পায়ে পড়ি ....

বাবা। (ঘোমটাটা তুলে) না, এরা সবাই তোমাকে দেখুন ....

মা। (উঠে দাঁড়িয়ে দু'হাতে মুখ ঢেকে) আপনারা দয়া করুন, দোহাই আপনাদের এ যা করতে চায়, আপনারা তা হতে দেবেন না—

ম্যানেজার। (হতবাক হয়ে) আমি ছাই মাথামুণ্ডু কিচ্ছু বুঝতে পারছি না; কেস্‌টা কি? আচ্ছা এই ভদ্রমহিলা আপনার স্ত্রী?

বাবা। হ্যাঁ, এই ভদ্রমহিলা আমার স্ত্রী।

ম্যানেজার। তা আপনি বেঁচে আছেন, অথচ ইনি বিধবা হয়ে গেলেন কি করে?

[**অভিনেতারা হেসে ওঠে।**]

বাবা। আপনারা হাসছেন কেন? প্লীজ হাসবেন না। ওর চরিত্রের আসল নাটকীয়তাই তো এখানে। —আমাকে বিয়ে করার পরেও এক ভদ্রলোককে ও ভালোবেসেছিলো, তিনিও যদি এখন আমাদের সঙ্গে এখানে আসতে পারতেন —

মেয়ে। মোট কথা, আমাদের বাবা আজ সাতদিন হোলো মারা গেছেন। একটু আগেই তো আপনাদের বললাম। এই দেখুন না, অশৌচ চলছে বলে আমাদের কারো পায়ে জুতো নেই ....

বাবা। সেই ভদ্রলোক এখানে নেই দেখতেই পাচ্ছেন। তার কারণ এই নয় যে তিনি মারা গেছেন। তার কারণ, তাঁর এখানে আসার দরকার নেই। কেন নেই এই মহিলার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখুন .... (মাকে দেখিয়ে) .... তা'হলেই সব বুঝতে পারবেন আপনারা। ভালো করে তাকান — যে সংঘাতকে কেন্দ্র করে এই মহিলার জীবন-নাট্য গড়ে উঠেছে সেটা প্রেম নয়। বাৎসল্য। প্রিয়া নয়, জননী — যেমন মহাভারতের কুন্তী — দু'জন মানুষের প্রেমের দ্বন্দ্ব ওর জীবনে নেই বলেই আমরা দু'জন একসঙ্গে আসিনি। যাদের কেন্দ্র করে ওর জীবনের নাটকীয়তা তা' হোলো এই চারটি ছেলেমেয়ে। ওরা এসেছে —

মা। কে চেয়েছিলো এদের? আমি তো চাইনি। আমাদের প্রথম ছেলেকে কোলে পেয়েই আমার কোল ভরেছিলো। আমি তো আর কাউকেই চাইনি। তুমিই আর একজনের জীবনের সঙ্গে আমার জীবনকে জোর করে বেঁধে দিলে।

মেয়ে। মিথ্যে কথা।

মা। (চমকে উঠে) মিথ্যে? এ কথার সত্যি-মিথ্যে তুই কতটুকু জানিস্?

মেয়ে। জানি। মিথ্যে, মিথ্যে। কেউ তোমাকে জোর করে আমার বাবার জীবনের সঙ্গে বেঁধে দেয়নি। (ম্যানেজারকে) এ কথা বিশ্বাস করবেন না আপনি। মা মিথ্যে কথা বলছে। কেন বলছে তাও আমি জানি। (বড় ছেলেকে দেখিয়ে) ঐ ছেলেটার জন্যে। ঐ মার জীবনের প্রথম ছেলে। ওকে দু'বছর বয়সে ফেলে রেখে মা আমার বাবার ঘর করতে গিয়েছিল। আজ বাইশ বছর পরে আবার ওদের মা-ছেলের দেখা হয়েছে। ওই যে আছে না? .... 'বিধির প্রথম দান এ বিশ্ব সংসারে মাতৃস্নেহ, কেন সেই দেবতার ধন আপন সন্তান হতে করিলে হরণ?'.... না কি যেন — মা সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত শুরু করেছে। তাই মা ঐ ইডিঅটটাকে মিথ্যে কথা বলে বোঝাতে চায়,'বাবা আমি নিজে তোকে ছেড়ে যেতে চাইনি। তোর বাবাই জোর করে আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে আর "একজনের" জীবনের সঙ্গে বেঁধে দিয়েছিলো আমাকে।' .... সেই 'একজন' মানে আমার বাবা।

মা। (দৃঢ়স্বরে) ভগবান সাক্ষী। ওর বাবাই জোর করে আর একজনের জীবনের সঙ্গে আমার জীবনকে বেঁধে দিয়েছিলো! (ম্যানেজারকে) ওঁকে জিজ্ঞেস করে, দেখুন, একথা, সত্যি কিনা? উনিই বলুন। (মেয়েকে) তোর তো এসব জানার কথা নয়! কি করেই বা জানবি বল?

মেয়ে। ছোটবেলা থেকে আজ পর্যন্ত কোনদিন তো দেখিনি আমাদের বাড়িতে তোমার সুখ ছিলোনা, শান্তি ছিলোনা? বলো, সত্যি কথা বলো? আমাদের বাবা তোমাকে খুব ভালবাসতেন কিনা বলো?

মা। আমি তো না বলিনি।

মেয়ে। চিরকাল! আমার বাবা তোমাকে চিরকাল ভালোবেসেছে। যতো দিন বেঁচে ছিলো ততদিন। .... সব্বাই জানে। এরাও জানে। (ছোট ভাইকে ধরে) কথা বলছিস না কেন বোকা কোথাকার? বলনা, আমাদের বাবা কীরকম ভালো ছিলো, বলনা সব্বাইকে!...

মা। ওকে ছেড়ে দে। শোন, তুই বিশ্বাস কর আমাকে। আমি মিথ্যে বলিনি। ওঁর মতো ভালোমানুষ হয় না। এত উদার, এত শান্ত, এত ভালোমানুষ—আমি দেখিনি!

বাবা। এ কথা সত্যি। যা কিছু ঘটেছে তার জন্যে দায়ী একমাত্র আমিই। শুধু আমিই। আর কেউ না। ....

প্রধান অভিনেতা। (সহকর্মীদের দিকে তাকিয়ে) ভো ভো, কি অপূর্ব দৃশ্য!

প্রধানা অভিনেত্রী। আমরাই তাহলে অডিএন্সের দলে?

বদ্যিনাথ। অহো একেবারের জন্য অন্তত ।

ম্যানেজার। (সত্যি সত্যিই উৎসাহের সঙ্গে) আঃ চুপ করো না! হচ্ছে কি? ওদের কথাটা পুরো শুনতে দাও।

ছেলে। হ্যাঁ! মন্দ লাগবে না আপনাদের। আমার বাবা তো নোংরা কাজে

সিদ্ধহস্ত। আবার শোনার ব্যাপারেও দেখছি আপনাদের উৎসাহের কমতি নেই। ...

বাবা। ইউ সাট আপ। নিজের বাবা সম্পর্কে একথা বলতে তোমার লজ্জা করে না? .... (ম্যানেজারকে) আমার বিবেক-দংশনের যে তীব্র জ্বালা .... যে নিদারুণ আত্মগ্লানি ...., তাই নিয়ে ও বিদ্রুপ করে আমাকে ....

ছেলে। (বিরক্ত হয়ে) আঃ! 'তীব্র জ্বালা। নিদারুণ আত্মগ্লানি।' শুধু কথা আর কথা। কতকগুলো ভালো ভালো বাংলা শব্দ।

বাবা। দুঃখ বেদনার মধ্যে শাদামাটা ক'টা কথাতেও কি মানুষ সান্ত্বনা খুঁজে পায় না? 'কথা' মানে হয়তো কিছু নয়, কিন্তু কথার কি কোন মানে নেই।

মেয়ে। আছে বৈকি। ঐ 'বিবেক-দংশনের তীব্র জ্বালা, নিদারুণ আত্মগ্লানি'র ব্যাপারে কথার মানে আছে বৈকি। বদমাইশি করে ঐসব ভালো ভালো কথাই তো চালাতে হয়, কথাও চালাতে হয় .... টাকাও। .. হু ...টাকাও। প্রথম দিন রাত্রিবেলা ঠিক সাড়ে আটটায় আমাকে একশোটা টাকা দিয়েছিলো কে বলোতো?

ছেলে। (চীৎকার করে ওঠে) স্টপ্ ইউ বাস্টার্ড।

মেয়ে। (হাসে) কেন নিজের বাবাকে ভদ্দর-লোক সাজিয়ে রাখার ইচ্ছে?

ছেলে। (আগের কথার রেশ টেনে) সোআইন।

মেয়ে। (ছেলের কথায় ভ্রুক্ষেপ না করে) বনোয়ারী লালের দোকানে সেই চকচকে পালিশ করা কাঠের কাউন্টারের ওপর একটা ফিকে নীল রংয়ের খামে একশোটা টাকা ছিলো না? বনোয়ারীলালকে নিশ্চয়ই আপনারা সবাই চেনেন। হয়তো ওকে কিংবা ওরই মতো আর একজনকে নিশ্চয়ই চেনেন? .... ওরা বাইরে একটা ভদ্রগোছের দোকান সাজিয়ে রাখে আর ভেতরে ভেতরে গরীব মেয়েদের দিয়ে ব্যবসা চালায়। ....

মা। আঃ। কি করছিস্? এসব নোংরা কথা সবাইকে বলতে তোর বাধছে না?

মেয়ে। বাধবে কেন? একটু বাধছে না। এটাই যে আমার প্রতিশোধ। ... ঐ সিনটাতে অভিনয় করার জন্যে আমি মরে যাচ্ছি .... সেই ঘর .... চোখের সামনে ভাসছে .... এই দিকে জানালা ... কোণে একটা ভালো চেয়ার ... তার পাশেই হ্যাঙারে ক'টা জামাকাপড় ঝুলছে .... লাল রংয়ের পর্দা .... আর পর্দার ওপারে ফিকে অন্ধকার জানালাটার পাশে .... সেই চকচকে পালিশ করা সেই কাউন্টারের ওপর .... একশোটা টাকা আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আবার .... আপনারা সংকোচে ঘেন্নায় আমার দিকে তাকাতে পারছেন না, না। আমি জানি এগুলো ভালো কথা নয় .... সবার কাছে চেঁচিয়ে বলার মতো নয় ....তবু আমার সংকোচ নেই, লজ্জা নেই .... কেন

থাকবে বলুন? 'সংকোচ' 'লজ্জা' এসব তো (বাবাকে দেখায়) ওর থাকা উচিত।

ম্যানেজার। আমিতো ছাই কিছুই বুঝতে পারছি না ....

বাবা। সত্যি বোঝা মুস্কিল। .... আপনি যদি একটু সবাইকে জোর করে চুপ করিয়ে আমাকে বলতে দেন। .... বিশ্বাস করুন ও শুধু শুধু আমাকে দোষ দিচ্ছে .... আমারও তো কিছু বলার থাকতে পারে?

মেয়ে। থাকতে পারে বৈকি। নিজের সাফাই গেয়ে অনেক কিছুই বলার থাকতে পারে।

বাবা। কিন্তু আপনারা কি বুঝতে পারছেন না, সব গণ্ডগোলের মূলকথা এখানেই—এই বলাতেই। আমাদের প্রত্যেকেরই একটা নিজস্ব জগৎ আছে .... আমি যা বুঝি ... তা যখন নিজের মতো করে বলি, তখন অন্য কেউ তা মানতে চায় না .... আমি যা বলি তা অমনি আপনারা নিজেদের চিন্তায় ছাঁচে ঢালাই করে নেন। .... আমরা সবাই ভাবি, প্রত্যেকেই প্রত্যেককে বুঝি ... কিন্তু তা মোটেই সত্যি নয়। .... এই দেখুন না (মাকে দেখিয়ে) এই মহিলাটি .... আমার সদিচ্ছাকে নিষ্ঠুরতা বলে মনে করেন ....

মা। তুমি আমাকে জোর করে তোমার বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দাওনি?

বাবা। শুনছেন আপনারা? আমি নাকি জোর করে ওকে আমার বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি। .... ও ভাবে ওকে আমি তাড়িয়ে দিয়েছি।

মা। আমি ওর মত গুছিয়ে কথা বলতে পারিনে। কিন্তু আপনারা ওর কথা বিশ্বাস করবেন না। .... (ম্যানেজারকে) আমাকে যখন ও ভালোবেসে বিয়ে করলো .... কে জানে। .... আমার মধ্যে ভালবাসার মতো অসাধারণ কি ও দেখেছিলো জানিনা ....

বাবা। অসাধারণ কিছু দেখিনি বলেই তো তোমাকে ভালোবেসেছি ....বিয়ে করেছি ....। —তোমার সারল্য আমাকে মুগ্ধ করেছিলো — (কথা বলতে বলতে থেমে যায়। মা'র দিকে এগিয়ে যায়। নিজের বোঝাতে না পারার ভঙ্গি করে) — দেখছেন ও অস্বীকার করছে। ওঃ! মন বলে কি কিছুই নেই, ... কিন্তু মন? তুমি কি কিচ্ছু বোঝোনা?

প্রধানা অভিনেত্রী। (প্রধান অভিনেতাকে মেয়ের সঙ্গে মশগুল দেখে এগিয়ে এসে ম্যানেজারকে বলে) এক্সকিউজ মী, মিঃ ঘোষ — আজ কি রিহার্সাল হবেনা?

ম্যানেজার। ডেফিনেট্‌লি হবে। — কিন্তু এঁরা কি বলছেন একটু শুনে নিই না।

প্রধান অভিনেতা। ব্যাপারটা কিন্তু বেড়ে।

প্রধানা অভিনেত্রী। (প্রধান অভিনেতার দিকে রাগতভাবে তাকিয়ে) হ্যাঁ, নোংরামি যারা পছন্দ করে তাদের কাছে বেড়ে তো হবেই।

ম্যানেজার। (বাবাকে) আপনি আর একটু পরিস্কার করে আমাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলুন তো।

বাবা। বলছি। .... আমার ফার্মে একজন ক্লার্ক ছিলো। সে আমার সেক্রেটারীর কাজও করতো। .... বেশ শিক্ষিত, বিনয়ী ভদ্রলোক। .... ওর সঙ্গে (মাকে দেখিয়ে) এর আলাপ হোলো একদিন। তারপর আস্তে আস্তে ওদের দু'জনের ঘনিষ্ঠতা হোলো .... আর শেষের দিকে এমন অবস্থা দাঁড়ালো, যাকে ভালো বাংলায় বলে, "দু'টি অভিন্ন হৃদয় আত্মা" — কিন্তু এই ঘনিষ্ঠতা যে ওদের সম্পর্ককে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তা বোধহয় ওরা কল্পনাও করতে পারেনি ....

মেয়ে। (ম্যানেজারকে) শুনছেন, এমন ভাবে বলছে যেন ও নিজেও কল্পনা করতে পারেনি —

বাবা। আমি পেরেছিলাম, কিন্তু আমি বাধা দিইনি। (ম্যানেজারকে) — ভাবলে খুব অবাক লাগে, না? — প্রথমটায় আমি ভাবতুম আমারই স্ত্রী যদি আমাকে ভালো না বেসে আর কাউকে ভালোবাসে — তাহলে — শুধুমাত্র স্বামীত্বের গৌরব নিয়ে তার ভালোবাসা দাবী করবো, এ'তো নিছক কাপুরুষতা ....

ম্যানেজার। তা মশাই আপনি কেন ঐ ভদ্রলোককে — মানে আপনার ঐ সেক্রেটারীকে তাড়িয়ে দিলেন না ?

বাবা। জানতুম এ-ও অন্যায় — তবু আমি মানুষ তো? একদিন তাই-ই করলাম। —- কিন্তু ফলটা কি হোলো জানেন? এই মহিলাটি (মাকে দেখায়) দিনরাত বাড়ির এককোণ থেকে আর এককোণে মুখ শুক্‌নো করে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন .... যেন বনের পাখীকে জোর করে এনে খাঁচায় পুরে রেখেছি আমি ....

মা। হ্যাঁ।

বাবা। (হঠাৎ মায়ের দিকে ঘুরে) তুমি আমাদের সংসার ভেঙে আর একজনের সঙ্গে আবার সংসার গড়েছিলে, বাধ্য হয়েই, এ আমি জানি; আমি বাধ্য করেছি তোমাকে। এ দোষ তো আমি কোনদিনই অস্বীকার করিনে। .... কিন্তু আমাদের ছেলের ব্যাপারে তুমি আমাকে অন্যায়ভাবে দায়ী করো। ....

মা। যখন আমি তোমার সংসার ছেড়ে যাই, তখন ওর বয়স তিন বছর। অথচ শেষের পুরো একটা বছর আমি ওকে চোখের দেখাও দেখিনি .... তুমিই বলো .... ওকে তুমি দু'বছর বয়সেই আমার কাছ থেকে জোর করে নিয়ে গেছ কিনা। ....

বাবা। হ্যাঁ, গেছি বৈকি। কিন্তু সে তো তোমার ওপর অত্যাচার করবার জন্যে নয়। .... ও আমাদের একমাত্র ছেলে বলে তোমার যেমন একথা মনে হওয়া স্বাভাবিক, তেমনি আমারও কি মনে হওয়া স্বাভাবিক ছিল না, যে ছেলেটা পাহাড়ী জায়গায় খোলা হাওয়া-বাতাসে সত্যিকারের মানুষ হয়ে উঠুক ....

মেয়ে। (ছেলের দিকে আঙুল দেখিয়ে) আহা!! 'মানুষ হয়ে উঠুক। মহামানব!! .... ঐ যে মানুষই হয়েছেন একখানা ....

বাবা। ও যে ঠিকমতো মানুষ হতে পারলো না, তা-ও কি আমার দোষ? আমি কি ইচ্ছে করে ওকে ওরকম অমানুষ করে তুলেছি? ভাবুন তো তখন ওর মা'র স্বাস্থ্য দিন দিন খারাপই হয়ে যাচ্ছে .... ওরও কষ্ট হতো, ওর মা'রও। .... ঝি চাকরদের মধ্যে ছেলেপুলে মানুষ হোক এ আমি নীতিগতভাবে কোনদিনই চাইনি .... সুবিধে হবে ভেবে ছেলেটাকে ওর পিসির কাছে মানুষ হবার জন্যে পাঠিয়ে দিলাম। .... আজ ভাবলে দুঃখ হয়, সেদিন কি ভুলই করেছি। কিন্তু আমার দোষটা কোথায়? আমি হয়তো .... হয়তো কেন .... নিশ্চয়ই ভুল করেছি .... কিন্তু ভাবুন, আমি সমাজনীতির দিক দিয়ে কোন অন্যায় করেছি কি? আমি সারাজীবন চেয়েছি যাতে আর কিছু না হোক অন্ততঃপক্ষে যেন কোন নীতিভ্রষ্ট হতে না হয় আমাকে ....

[মেয়ে সজোরে হেসে ওঠে]

.... আঃ। ইট্স্ ইন্টলারেব্ল! ইন্টলারেব্ল!!

ম্যানেজার। হ্যাঁ, আপনি দয়া করে চুপ করুন দিকি।

মেয়ে। (হাসতে হাসতে) চুপ করা মুস্কিল কিনা। .... বনোয়ারীলালের বাঁধা খদ্দেরের মুখে নৈতিকতার পরম বাণী!!

বাবা। ইডিঅট। সেইটেই তো সব চেয়ে বড় প্রমাণ যে আমি মানুষ। আমার চরিত্রে এই পারস্পরিক বিরোধিতা এইটেই তো চরিত্রকে নাটকীয় করে তুলেছে — এই চরিত্র -বৈষম্যই তো আজ আমাকে নিয়ে এসেছে এখানে .... স্টেজে .... নাট্যকারের সন্ধানে .... (মা'কে) আর কেউ না জানুক, তুমি তো জানো, তুমি যখন আবার নতুন করে সংসার পাতলে হাজারীবাগে — তখন কি আমি শুধুমাত্র মানবিক নীতির কথা ভেবেই — তোমার সংসারের খোঁজ নিতাম না? কেন? — একদিন তুমি আমারই স্ত্রী ছিলে একথা ভেবেই তো? ....

মেয়ে। বটেই তো। তখন আমার বয়েসই বা কতো? নেহাৎই ছোট্ট মেয়ে ছিলুম, শাড়ী ধরবারই বয়েস হয়নি তখন .... এই ভদ্রলোক রোজ ছুটির পর আমাদের ইস্কুলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতেন আর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতেন আমাকে, কবে আমি সত্যিকারের বড়ো মেয়ে হবো।

বাবা। ননসেন্স। দিস ইজ এ লাই! এ পজিটিভ্ লাই!!

মেয়ে। মিথ্যে?

বাবা। জঘন্য নির্লজ্জ মিথ্যে!! (উত্তেজিতভাবে ম্যানেজারকে বোঝাবার চেষ্টা করে) আমার স্ত্রী আমার কাছে থেকে চলে যাবার পর থেকেই হঠাৎ আমার কাছে সমস্ত জীবনটা আশ্চর্য রকম ফাঁকা হয়ে গেল। .... আমি হয়তো শেষের দিকে ওকে আর ভালোই বাসতাম না, ... শুধু তাই কেন? সত্যিকথা বলবো, আমি সহ্যই করতে পারতাম না ওকে .... কিন্তু ও যে একান্ত নিঃশব্দে আমার সমস্ত জীবনটাকে পাকে পাকে জড়িয়েছিলো — একথা ও চলে যাবার আগে

কোনদিনই বুঝতে পারিনি। .... বছর দেড়েক কেটেছে নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণায় ... কি যে ভুল করেছি বুঝতে পেরেই সমস্ত মন নিজেকে যেন ছিঁড়েখুঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে ... ভাবলাম না থাক .... যা হয়েছে হয়েছে .... কাজের মধ্যে নিজেকে সমস্তক্ষণ ডুবিয়ে ফেলে সব ভুলে যেতে হবে আমাকে। — তাই করলাম। .... নিজের কাজকর্ম নিয়ে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ালাম .... অনেক দিন .... অনেক বছর .... তবু ভোলা কি যায়! দিনরাত শুধু আশ্চর্য অতীতের দিনগুলো যন্ত্রণা দিতে লাগলো আমাকে। ভাবলাম ছেলেটাকে ফিরিয়ে আনবো .... দুজনে থাকবো একসঙ্গে .... আবার সব ঠিক হয়ে যাবে (ছেলেকে দেখিয়ে) ওকে আর নিজের ছেলে বলে চিনতেই পারলাম না। ও অদ্ভুত বদলে গেছে। ওর জীবন সম্বন্ধে আমি কি আশ্চর্য কল্পনাই না করেছিলাম — আর ও কি হয়েছে ভেবে দারুণ হতাশায় মন ভরে গেল। হয়তো তাই .... নিজের ছেলের ওপর বাপের যে স্বাভাবিক মমতাটুকু থাকে সেটুকু নিজের অজান্তেই আমি কেমন করে হারিয়ে ফেললাম ... তখন আমার জীবনের কথা একবার ভাবুন ... যেদিকে তাকাই শুধু শূন্যতা হতাশা বেদনা — তখন মানসিক হাহাকার আমাকে টানলো ওর সংসারের দিকে — হাজারীবাগে। তখন ঐ মেয়েটির বয়স বছর দশেক। — আমি যেখানে গিয়ে উঠেছিলাম তার খুব কাছেই ওদের স্কুল। তাই ছুটির পর আমি 'কয়েকদিন' ওকে যেতে আসতে দেখেছি —

মেয়ে। 'কয়েকদিন' না — প্রায় রোজ-রোজই। আমি স্কুল থেকে বেরোনোর পর ও আমার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসতো আর এইরকম করে হাত নাড়তো — আমার খুব মজা লাগতো ভাবতে লোকটা কে — আমি মাকে বললুম ও কিরকম-কিরকম দেখতে .... মা ঠিক আন্দাজ করলে — বেশ কয়েকদিন তো ভয়ে ভয়ে মা আমাকে স্কুলেই যেতে দিলেন না — অনেকদিন পরে আবার যেদিন স্কুলে গেলাম দেখি আমার লোকটা দাঁড়িয়ে আছে — হাতে একটা কাগজের প্যাকেট — আমাকে দেখেই এগিয়ে এসে আমার গালটা টিপে আদর করলো — তারপর সেই কাগজের প্যাকেট খুলে আমার জন্যে বের করলো ... একগোছা ফুল আর একটা ভ্যানিটি ব্যাগ ....

ম্যানেজার। কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে — আমরা মূল নাটকটা থেকে অনেকটা সরে যাচ্ছি না?

ছেলে। (ঘৃণার সঙ্গে) আঃ! শুধু নাটক আর নাটক — সাহিত্য!!

বাবা। সাহিত্যই তো। নিশ্চয়ই সাহিত্য। এটাই তো জীবন, এই তো জীবনের আবেগ।

ম্যানেজার। হ্যাঁ। বড়ো ভালো বলেছেন কথাটা — 'জীবনের বেগ' .... কিন্তু .... নাট্য-সাহিত্যের তো আবার কতকগুলো ইয়ে আছে — নাটকে

এ জায়গাটা জমবে না মনে হয় —

বাবা। ঠিকই বলেছেন আপনি। নাটকে এ জায়গাটা জমবে না। — এ ঘটনা ঘটেছে অনেক বছর আগে। আসল নাটকটার সাথে এ ঘটনার সম্পর্ক নেই বললেও চলে। (মেয়েকে দেখিয়ে) দেখুন না, ওকে দেখে কি মনে হয় — ও-ই বছর দশেক আগে একটা বেণী দোলানো ফ্রকপরা ফুটফুটে মেয়ে ছিলো?

মেয়ে। বাঃ। তাই আবার হয় নাকি? 'বেণী দোলানো ফ্রকপরা রোগা ফুটফুটে মেয়ে'কে নায়িকা করে যে-সব ভোঁতা ভোঁতা নিরিমিষ নাটক তৈরী হয় — আমাদের জীবনের নাটক কি তেমনি ভাল গোছের, ভদ্র একটা কিছু? .... হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে খেটে আমার বাবা পঙ্গু হয়ে বিছানা নিয়েছিলো পুরো দু'বছর।... বাবাকে সারিয়ে তুলবো বলে নিয়ে এলাম এখানে। .... চিকিৎসা করতে গিয়ে সবদিক দিয়ে নিঃশেষ হয়ে গেলাম আমরা .... তবুও তাকে বাঁচাতে পারলাম না ....

বাবা। আর তারই অলক্ষ্যে আমাদের ছ'জনের জীবন-নাটক গড়ে উঠেছিলো — কী নিষ্ঠুর, কী ক্রুর, কী বীভৎস নাটক! .... বুদ্ধিগত ভাবে কোনদিন দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিইনি,.... অথচ বিচারবুদ্ধির অগোচরে আমি কি না করেছি! ... আমার দিকে তাকান, ... এতো বয়েস হয়নি যে জীবন থেকে মেয়েদের প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে .... আবার এতো কম বয়সও নয় যে নির্লজ্জভাবে কোন মেয়েকে আপন করে চাইবো .... তাছাড়া তখন আমার যা মনের অবস্থা তাতে কোন মেয়েই আমাকে ভালবাসতে পারেনি — পারতোও না — আপনারা বলবেন, 'তবু আপনি যা করেছেন, তা অন্যায়, অনুচিত। — আপনাকে সহানুভূতি দেখানোর প্রশ্নই আসে না।' আমি জানি। — আর সবার মতো ফাঁকা ভালোমানুষির খোলস পরে আমি আপনাদের সামনে হাজির হইনি। — সব মানুষই অন্যায় করে কিন্তু স্বীকার করার সাহস তো সবার নেই ....

মেয়ে। স্বীকার করার সাহস নাই বা থাকলো, অন্যায় করার সাহসের তো কমতি নেই—

বাবা। তা নেই। কিন্তু সে অন্যায়ও করে লুকিয়ে চুরিয়ে। সেই জন্যেই তো লুকানো অন্যায় স্বীকার করতে বেশী সাহস লাগে। অন্য সবাই যখন নিজের ভেতরের জন্তুটাকে দেখে চোখ বন্ধ করে তখন এরাই জন্তুটার মুখোশ ছিঁড়ে ফেলে তার স্বরূপ দেখিয়ে দেয় আর পাঁচজনকে। — (ম্যানেজারকে) আপনি বলবেন 'এতো সিনিসিজম্।' — কিন্তু সত্যিই কি তাই? যে অন্যায় করে অন্যায় স্বীকার করে, সে কি সমাজের আর পাঁচটা মানুষের চেয়ে ভালো নয়?

মেয়ে। ভালো খারাপের কথাই নয়। যদি কেউ বোঝে, আর তো লজ্জা

লুকিয়ে রাখতে পারা যাচ্ছে না — তখন খুব কাচুমাচু হয়ে ভদ্রলোকের ভান করে বলে, 'আমি অবশ্যি স্বীকার করছি এ আমারই অন্যায়। এ জন্যে আমাকে ক্ষমা করা চলে না' — কিন্তু বলেই তার অন্যায়ের জন্যে সে নিজে বিশেষ দায়ী নয়, আর কেউ কিম্বা অন্য কোন ঘটনা দায়ী, একথা বলেই আবার ভালোমানুষ সাজতে চায় — এই করেই, ছোট্ট অন্যায় স্বীকার ক'রে বড়ো অন্যায় চাল দেবার ন্যাকামিটা ইদানীং খুব চালু হয়েছে বটে। — প্রেম নেই, ভালোবাসা নেই — শুধু চরিত্রহীন কামনার আগুনে যার সারা গা ঝল্‌সে গেছে তার কাছ থেকে এ ধরনের যুক্তির মার-প্যাঁচ শুনলে আমার অসহ্য মনে হয়, গা ঘিন্ ঘিন্ করে আমার — যে লোকের মধ্যে মনুষ্যত্বের ছিঁটেফোঁটাও নেই — আদর্শ, ভদ্রতা, বিনয়ের মুখোশ ছিঁড়েখুঁড়ে হুংকার দিচ্ছে, তখনও সে চেষ্টা করছে জন্তুটার নিন্দে করে নিজের সাফাই গাইবার —

ম্যানেজার। আহা। আসল গল্পের খেইটা হারিয়ে ফেলছি না? এ তো শুধু আলোচনা হচ্ছে। — যাকে বলে ধান ভানতে শিবের গীত ....

বাবা। কিন্তু সত্য হচ্ছে একটা বেলুনের মতো। হাওয়া না পুরলে তার পুরো চেহারাটা বোঝা যায়না। সত্যকে দেখতে হলে তার সমস্ত যুক্তি অনুভূতিগুলিকে তো বোঝা দরকার — এই দেখুন না, আমি তো সবে সেই রাত্রিতে বনোয়ারীলালের দোকানেই প্রথম জানতে পারলুম যে এই মেয়েটির বাবা পঙ্গু হয়ে বিছানা নিয়েছে, ওকে সারিয়ে তুলবে বলে এরা ওকে নিয়ে এসেছে এখানে। আর প্রচণ্ড অভাবের তাড়নায় ওর মা বাধ্য হয়েই বনোয়ারীলালের শাল রিপেআরিং-এর দোকানে কাজ নিয়েছে —

মেয়ে। হ্যাঁ, বনোয়ারীলালের শাল রিপেআরিং-এর দোকানে জামা কাপড় সেলাই করা, রিপু-করার কাজ। — আমিই তো প্রায়ই দোকানে গিয়ে অর্ডারগুলো নিয়ে আসতুম। মা বাড়িতে বসে কাজ করতো, আবার আমিই পরের দিন ওগুলো ফেরত দিয়ে পয়সা নিতুম — নতুন অর্ডার নিয়ে বাড়ি চলে আসতুম —

মা। আপনারা বিশ্বাস করুন — আমি জানতুম না — সত্যিই আমি জানতুম না — আমি স্বপ্নেও ভাবিনি যে ঐ বুড়ো আমাকে কাজ দিয়েছে ঠিকই — কিন্তু ওর আসল নজর আমার মেয়ের ওপর —

মেয়ে। মা গো মা!! — আচ্ছা বলুন তো আপনারা, আমি যখন মায়ের হাতের কাজগুলো বনোয়ারীলালের কাছে দিয়ে আসতাম, বুড়ো আমাকে প্রায়ই কি বলতো? — ওঃ হো, আপনারা তো আবার ভেতরের ব্যাপারটাই জানেন না। তখন আমাকেই তো বুড়ো ওর আসল ব্যবসায় খাটাচ্ছে কিছুদিন ধরে? তার জন্যে আমারই রোজগার থেকে কয়েকটা শাড়ী-জামা কিনে রেখে দিতে হয়েছে

দোকানের এককোণে। সেগুলো প্রায়ই ছিঁড়তো আর বুড়ো আমারই হাত দিয়ে সেগুলো সেলাই করার জন্যে, রিপু করার জন্যে পাঠাতো মা'র কাছে। আর আমারই রোজগার থেকে মেরামতি খরচ কেটে নিয়ে দিতো মার হাতে। আর মা বেচারা রোজ মাঝরাতে হ্যারিকেনের আলো জ্বেলে মেঝেয় বসতো বাবার বিছানার পাশে পা ছড়িয়ে আর সেলাই করতো — আর বাবাকে বলতো, "তবু তো ভগবান দয়া করেছেন বলে মেয়েটাকে আর বাচ্চা দু'টোকে নিয়ে জলে ভাসিনি। —

ম্যানেজার। আর ঐ দোকানেই আপনি একদিন রাত্রিবেলা সাড়ে আটটার সময় দেখলেন—

মেয়ে। (বাবাকে দেখিয়ে) ঐ ওকে — বনোয়ারীলালের এক পুরোনো খদ্দের — বুঝতে পারছেন এইটেই আপনার নাটকের ক্লাইম্যাক্স সিন ....

বাবা। ঠিক সেদিনই — তখুনি — ওর মা — কয়েকটা টাকা ধার করার জন্যে দোকানে এসে হাজির হয়েছিল ....

মেয়ে। (ব্যঙ্গের সুরে) ঠিক তখুনি উনি মজা লুটতে গিয়েছিলেন, হায় হায়।

বাবা। (চিৎকার) না, আমার জীবনের সবচেয়ে বড়ো ভুলের মুহূর্ত। ভাগ্যি ভালো আমি ওকে চিনতে পেরেছিলুম .... আমার জীবনের সত্যিই সবচেয়ে বেদনার মুহূর্তে .... তার কয়েকদিন পরেই ওদের বাবা মারা গেলেন — আমি ওদের সঙ্গে করে আমার বাড়িতে নিয়ে এলাম .... তারপর থেকে আমার আর আমার স্ত্রীর সম্পর্কটা ভেবে দেখুন। .... ওর অবস্থা তো দেখছেনই — উনিও আর ওর দিকে চোখ তুলে তাকাতেই পারেন না .... সে ক্ষমতা হারিয়েছি .... সেই .... ওখানেই ....

মেয়ে। তাহলেই, বলুনতো মশাই, কি করে এর পরেও ওই ভদ্রলোক আশা করেন যে একটা স্বাভাবিক সাধারণ মেয়ের মতো আমি ওর মুখ থেকে সুনীতির কচ্‌কচি শুনবো?

বাবা। তবু শুনবে। শুনতে হবে তোমাকে। আমার বিবেকদংশনের যে তীব্র জ্বালা যে নিদারুণ আত্মগ্লানি, তার মধ্যেই রয়েছে আমার পরিপূর্ণ সত্তা।

মেয়ে। আবার বিবেক? —

বাবা। হ্যাঁ তাই। বিবেক তো আর একটা অখণ্ড কিছু নয়? এর বিভিন্ন দিক আছে। .... এক একজন মানুষের মধ্যে দিয়ে তার এক এক রকম প্রকাশ। একটা ঘটনার ভিত্তিতেই যদি কোন মানুষকে বিচার করা হয়, তাহলে তারচেয়ে বড়ো অবিচার আর কিছুই হতে পারে না। আমাদের সমস্ত অস্তিত্ব তো ঐ একটা মাত্র ঘটনার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় .... (ম্যানেজারকে) .... শুনুন আপনি, এই যে এই মেয়েটি .... ওর সঙ্গে আমার এমন এক জায়গায় দেখা হয়েছিলো যেখানে

আমি তাকে চিনতুম না, সত্যিই চিনতুম না। বিশ্বাস করুন .... ও-ও আমাকে চিনতো না, ... কিন্তু আমার জীবনের ঐ চরমতম মুহূর্তটিকে ও আমার চরিত্রের একমাত্র সত্য বলে মনে করে নিয়েছে। .... তারপর দেখুন, (ছেলেকে দেখিয়ে) আমার ছেলে —

ছেলে। আঃ, প্লীজ লীভ্ এ্যালোন — আমাকে এসব ব্যাপারে জড়িয়ো না .... আমি এসব নোংরামির মধ্যে নেই ....

বাবা। কি আশ্চর্য। তুমি এখান থেকে চলে যেতে চাও নাকি?

ছেলে। হ্যাঁ চাই! এ ব্যাপারে আমার কিছু করারও নেই, আমি কিছু করতে চাইও না...

মেয়ে। আমরা সবাই নোংরা আর তুমি একা ভদ্দরলোক, না? (ম্যানেজারকে) শুনুন, আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে আমি যখনি ওর দিকে তাকাই, ও তখনই চোখ নামিয়ে নেয়। মনে মনে ও কি প্রচণ্ড দুর্বল — ও জানে আমার ওপর কি অন্যায় ও করেছে —

ছেলে। (মেয়েটির দিকে না তাকিয়েই) আমি আবার কি অন্যায় করেছি?

মেয়ে। হ্যাঁ তুমি! তুমি!! — শুধু তোমার জন্যেই আমাকে তোমাদের বাড়ি ছাড়তে হলো। শুধু তোমার জন্যেই আজ আমি একটা রাস্তার মেয়ে — একটা বেশ্যা। রক্তের সম্পর্কের কথা বাদই দিলুম — প্রথমদিন থেকেই তুমি আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করোনি যেন আমি একটা রাস্তার কুকুর? .... তুমি সবসময় এমন ভাব দেখাও যেন মন্ত্র পড়ে, অগ্নিসাক্ষী না রেখে যে বিয়ের ছেলেমেয়ে — তারা বেশ্যার ছেলেমেয়ে ছাড়া আর কিছুই নয়। (ম্যানেজারকে) শুধু ওর আর আমার দু'একটা সিন্ দেখবেন আপনি? দেখবেন?

ছেলে। ওরা সবাই বলে শেষের দিকে যা কিছু ঘটেছে তার জন্যে দায়ী আমি। দায়ী আমি মোটেই নই। আমি কিছু জানি না। জানতামও না। .... দিন পনেরো কুড়ি আগে একদিন বাড়িতে বসে আছি, দারোয়ান এসে বললে, কে একজন বাবার খোঁজ করছে। বলছে খুব জরুরী দরকার। .... বেরিয়ে এসে দেখি এই ন্যাকা এ্যাবনরম্যাল মেয়েটা। বললুম, 'বাবা নেই। পরে আসবেন।' কিছুতেই শোনে না। — বাবাকে ওঁর চেম্বারে ব্যাপারটা জানিয়ে ফোন করতেই দেখি উনি হন্তদন্ত হয়ে বাড়ি ফিরে এলেন। আর তারপরেই মেয়েটাকে সোজা নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন। .... দরজা খোলাই ছিলো। দূর থেকে আমি সব কথাবার্তা শুনতে পাইনি। কিন্তু দেখতে পেলাম বাবা ওর হাতে অনেকগুলো টাকা দিলেন। মেয়েটা চলে গেল — আর তারপর দিন সাতেক ধরে রোজই মেয়েটা আসে। আর বাবা যেন ওরই জন্যে বাইরে যাওয়া বন্ধ করে নিজের ঘরে অপেক্ষা করেন। .... রোজই মেয়েটা আসে, কি সব কথাবার্তা বলে বাবার সঙ্গে আর রোজই অনেকগুলো টাকা নিয়ে যায়। ....

বাবা। আমারই ভরসায় ওরা তখন ওর বাবাকে হস্‌পিটালে ভর্তি করেছিলো। ওদের সংসারের কথা ভেবে, আমার সেদিনের জঘন্য অন্যায়ের কথা ভেবে, অন্ততঃ পক্ষে শুধুমাত্র মানবিকতার কথা ভেবেও কি ওদের টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করা উচিত ছিলো না আমার?

ছেলে। কিন্তু আমি এতো সব কথা জানবো কি করে বলুন? আমাকে কোন কথা বলেছিলে? তারপর এই দিন চারেক আগে (বাবাকে) এদের সবাইকে নিয়ে এলে আমাদের বাড়িতে। বললে, 'এদের বাবা পরশুদিন সকালে হাসপাতালে মারা গেছে— আর এঁকে প্রণাম করো। —এই তোমার মা।' ....বলুন আপনারা কেউ যদি এই অবস্থায় পড়তেন, কি করতেন? .... আপনাদের নাটকের ভাষায় যাকে বলে, আমার চরিত্রটা দানাই বাঁধেনি। আমি স্টেজে আসতে চাইনি। নাট্যকারের খোঁজে আমার কোন দরকার নেই। এদের সঙ্গে থাকতে আমার খুব খারাপ লাগে। আমাকে ছেড়ে দিন। আমি চলে যাচ্ছি।....

বাবা। তুমি এখানে এসে সত্যিসত্যিই এরকম ব্যবহার করবে জানলে—

ছেলে। আমি কি রকম ব্যবহার করবো, সে তো তোমাদের একশোবার বলেছি। তবু তোমরা আমাকে জোর করে এখানে এনেছো। আমার কথা কোনদিন তুমি বুঝতে চাওনি— বুঝতে চাওনা। দু'বছর বয়সে আমার মা'র কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে গেছো — কেননা 'নীতিগতভাবে' তুমি বিশ্বাস করো এতে ছেলেমেয়েদের ভালো হয়। আমার দিকটা ভেবেছ সেদিন? দশ বছর ধরে শুধু মাঝে মাঝে চিঠিপত্র লিখে আর টাকা পাঠিয়েই, তুমি মনে করেছো ছেলের ওপর বাবার দায়িত্ব পালনে তোমার কোন ত্রুটি নেই। হয়তো এ ব্যাপারেও তোমার কোন একটা 'নীতি' আছে। মা'র কথা কোনদিন বলেছো আমাকে? আমি কি তোমাকে হাজার দিন জিজ্ঞেস করিনি—

বাবা। আঃ চুপ করো, তোমার মা কাঁদছেন—

মেয়ে। কি সবসময় বোকার মতো ছিঁচকাঁদুনি কাঁদো মা—চুপ করো না।

বাবা। (একটু হেসে ম্যানেজারকে) ছেলের ব্যাপারে যে ওর মা কাঁদে সেটুকুও মেয়েটি সহ্য করতে পারে না। (ছেলেকে দেখিয়ে) ও বলছে এ ব্যাপারে ওর কিছুই করার নেই—

ছেলে। না, নেই—

বাবা। কিন্তু আসলে ও-ই হচ্ছে নাটকটার পরিণতির জন্যে দায়ী। তার মানে নাটকটার ভিত্তিই হলো ও। ...... ওই বাচ্চা ছেলেটার দিকে তাকান, ও সব সময় কেমন একটা অদ্ভুত ভাব করে এদিকে তাকায়। একটাও কথা বলে না। কেন জানেন? শুধু (ছেলেকে দেখায়) ওর জন্যে। ওর ভয়ে। ওর ব্যবহারে, যতো বাচ্চাই হোক, কিছু

কিছু ব্যাপার তো ও বোঝে। বোঝে ওকে কেউ ভালবাসে না। না মা, দিদি, না আমরা কেউ। এই তো ওর বয়েস। মৃত্যুর তীব্র করুণ রহস্য ওর মনকে নিষ্ঠুর আঘাত করবেই তো। ওর বাবার মৃত্যু, তারপর আমাদের ব্যবহার ওকে একেবারে অন্য মানুষ করে দিয়েছে। ও বুঝে নিয়েছে, ও বাঁচুক তা বোধহয় আমরা কেউ চাই না..... অথচ সারা পৃথিবীতে ওকে সবচেয়ে ভালবাসতো যে মানুষটি ..... সে আর কোনদিন ফিরবে না .... ওর বাবা..... হয় তো জীবনের পরপারে—

ম্যানেজার। ঠিক আছে। ওকে নাটকটা থেকে বাদ দিয়ে দেব। এ বয়েসি লেণ্ডিগেণ্ডি নাটকে বড়ো ঝামেলা বাধায়। এ্যাও করতে বললে অও করে দেয়—

বাবা। হ্যাঁ, ও খুব তাড়াতাড়ি চলে যাবে। বড্ডো বেশী তাড়াতাড়ি। নাটকে মানুষ যেমন আচম্‌কা চলে যায়, তেমনি। আর এই ছোট্ট মেয়েটাও। .... এই মেয়েটাই মারা যাবে সবার আগে। ...... তাহলে নাটকটা দাঁড়ালো, ... বুঝতে পারছেন তো? ওদের বাবা মারা যাবার পর আমার বাড়িতে ফিরিয়ে আনলাম ওদের। .... তারপর আমি আর আমার স্ত্রী সেই ঘটনার পর থেকে আর কোনদিনই সহজ হতে পারলাম না। ..... আমার ছেলে ঐ মেয়েটিকে কিছুতেই সহ্য করতে পারে না, কিছুতেই ভালবাসতে পারে না ওর মাকে ..... ওর সমস্ত মাতৃত্ব দিয়ে এখন ভালবাসে ওর মাতৃস্নেহ-বঞ্চিত প্রথম ছেলেকে — আর...... সবদিক থেকে অনাদৃত ঐ বাচ্চাদুটো...... প্রথমে ওই ছোট্ট মেয়েটা মারা যাবে আমার বাড়ির বাগানে, বাড়ির ভাঙা কার্ণিশ থেকে পড়ে, আর সেইদিনই প্রায় তক্ষুণি ঐ ছেলেটা আমার বন্দুকটা লুকিয়ে এনে আত্মহত্যা করবে বাগানে ..... ঐ মেয়েটি আমার বাড়ির অসহ্য পরিবেশ থেকে পালিয়ে যাবে অনেক দুরে — বেছে নেবে পতিতাবৃত্তি — বাকী থাকবো আমরা তিনজন — আমি, আমার স্ত্রী, আমার ছেলে — তারপর জীবন বৃত্তে আমাদের পরিক্রমা চলবে অনন্তকাল ধরে — পরস্পরের কাছ থেকে আরো দূরে সরে যাবো আমরা নিপীড়িত মানবসত্তা — এই আমাদের নাটক —

ম্যানেজার। হ্যাঁ, মশাই, আপনার কথা শুনে ভারী আনন্দ হলো — সত্যি দারুণ একটা নাটকীয়তা আছে আপনাদের গল্পে — বোধহয় বেশ একটা জমাট নাটক হয় আপনাদের নিয়ে —

মেয়ে। (এগিয়ে এসে) হ্যাঁ! বিশেষ করে আমার মতো চরিত্র যখন রয়েছে, তখন দেখুন না একবার চেষ্টা করে —

বাবা। থামো, ওঁকে ভাবতে দাও।

[উত্তেজিত হয়ে ম্যানেজারের দিকে এগিয়ে এসে ম্যানেজারের সিদ্ধান্তের জন্যে অপেক্ষা করতে থাকেন।]

ম্যানেজার। (আপন মনে) হুম্‌ ..... ব্যাপারটা ফাঁদতে পারলে ভালোই দাঁড়াবে

মনে হচ্ছে .....

বাবা। অন্ততঃ একেবারে নতুন জিনিস তো বটেই .....

ম্যানেজার। নতুন? কি বললেন নতুন? নতুন মানে আশ্চর্য! যাই বলুন মশাই, আপনাদের বাহাদুরী আছে, এরকম জোর করে এখানে ঢুকে পড়ে গোড়াটাই বড্ড ঘেবড়ে দিয়েছিলেন......

বাবা। আমরা জানতুম, আমরা যে নাটকের জন্যেই এখানে এসেছি — একথা বললেই আপনি বুঝতে পারবেন।

ম্যানেজার। আপনারা এ্যামেচার আর্টিস্ট-ফার্টিস্ট নন তো মশাই?

বাবা। না, নাটকের জন্যে এখানে এসেছি। মানে ....

ম্যানেজার। এই তো আবার গুলিয়ে দিলেন। মানে আপনারা কি এ লাইনে পুরোনো? না কী? ব্যাপারটা.....

বাবা। আপনি কি এখনও বুঝতে পারছেন না যে আমাদের ভূমিকাই আমাদের অস্তিত্ব?

ম্যানেজার। (কিছু না বুঝে) এটা আর বুঝতে পারবো না? খুব বুঝেছি — আপনাদের অস্তিত্বই আপনাদের ভূমিকা—

বাবা। ঠিক তাই। এই যে আমি ....আমার জীবনের উত্তেজনার মুহূর্তগুলোতে আমি একটা আশ্চর্য নাটকীয় আবেশ অনুভব করি নিজের মধ্যে—

ম্যানেজার। সেটা ম্যানেজ করে নেবো। .... কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে বিসমিল্লায় গলদ—নাট্যকার তো নেই .... দাঁড়ান, আমি একজনকে রিং করে দেখি—

বাবা। না, আর কেউ না। আমরা চাই আপনিই আমাদের নাট্যকার হোন।

ম্যানেজার। আমি নাট্যকার হবো? কি যে বলেন আপনি! আমার চোদ্দপুরুষে কেউ ওসব চাষবাস করেনি—

বাবা। আপনিই না হয় শুরু করলেন। ক্যারেকটাররাই তো রয়েছে আপনার সামনে। ঘটনা রয়েছে..... আমরাই বলবো আমাদের কথা। আপনি শুধু লিখবেন।

ম্যানেজার। তা হয়! ...ধ্যুৎ! হয়, না হয় না। আমার বড্ড বানান ভুল হয়।....

বাবা। আপনি শুধু নাটকের কাঠামোটা তৈরী করে নিন....

ম্যানেজার। আর তারপর ডায়ালগ্ পাবো কোথায়?

বাবা। আমরাই 'সিনের পর সিন অভিনয় করে যাবো। .....তখন কেউ একজন আমাদের ডায়ালগ্গুলো লিখে নেবেন। তারপর আপনি বসবেন সব কাগজ নিয়ে। নাটকটাকে সাজিয়ে ফেলবেন।

ম্যানেজার। (খুব খুশী হয়ে) ধ্যুৎ, যা থাকে বরাতে। ভীষণ লোভ লেগে যাচ্ছে মাইরি।

বাবা। তাহলে লিখুন।

ম্যানেজার। হ্যাঁ লিখব..... আপনি একজন ভদ্রলোক রিকোএস্ট করছেন আর আমি এটুকু পারবোনা? ঠিক আছে। ..... ছ ফর্মার নাটক করবো,

জব্বর ছাপাই-বাঁধাই। মূল্য তিন টাকা ....না পৌনে তিন টাকা.... আপনারা আমার অফিসে আসুন.... (অভিনেতাদের) আপনাদের দশ মিনিটের রিসেস্ দিলুম, তার বেশী দেরী না হয় যেন। .....(বাবাকে) কি জানি কি হবে, কি রকম লাগছে যেন— মনে তো হয় ভালো জিনিসই দাঁড় করিয়ে দেব....

বাবা। ওরা পাঁচজনওতো আমাদের সঙ্গে আপনার অফিসে আসবে?

ম্যানেজার। আসবেন বই কি? নিশ্চয়ই! নিশ্চয়ই! আসুন, আপনারা আসুন। (অভিনেতাদের) আপনারা সব দশ মিনিটের মধ্যেই ফিরে আসবেন কিন্তু। আসুন।

[ম্যানেজার আর ছটি চরিত্র উইংসের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে যায়।]

প্রধান অভিনেতা। কি ব্যাপার, কিছুতেই বুঝতে পারছি না।

তরুণ অভিনেতা। এতো একেবারে ডাহা পাগলামো। ওঁর কি ধারণা যে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই একটা নাটক তৈরী হয়ে যাবে?

প্রধানা অভিনেত্রী। মিঃ ঘোষ যদি মনে করেন যে এরকম ভাঁড়ামিতে আমি পার্ট করবো, তাহলে খুব ভুল করেছেন—

তরুণ অভিনেতা। আমিও বাবা এর ভেতরে নেই—

প্রধান অভিনেতা। আমার জানতে ইচ্ছে করে এরা কারা।—

প্রধানা অভিনেত্রী। আপনাদের কি মনে হয়?

তরুণ অভিনেতা। সব রাঁচীর গরম-গরম আমদানী।

প্রধান অভিনেতা। কি জানি বাপু, খুব খাতির করে তো আবার অফিসে নিয়ে গেল।

তরুণ অভিনেতা। মজা মন্দ নয়। লম্বুদার লাট্যকার হওয়ার শখ হয়েছে।

স্টেজ ম্যানেজার। এরকম কথাতো বাপের জন্মে শুনিনি—

বদ্যিনাথ। রসিকতা করতাসে বোধায় মাইরি।

প্রধান অভিনেতা। দেখা যাক্ শেষ অব্দি কি হয়।

তরুণ অভিনেতা। এই বদ্যিনাথ, আমরা চা খেয়েই ফিরছি.....

[এই রকম কথাবার্তা বলতে বলতে অভিনেতা-অভিনেত্রীর মঞ্চ থেকে চলে যায়। পর্দা ওঠানোই থাকে। দশ মিনিটের জন্যে নাটকের অভিনয় বন্ধ থাকে।]

[ঘন্টা বেজে ওঠে অভিনেতাদের সতর্ক করে দেওয়ার জন্য। অভিনয় এক্ষুণি শুরু হবে।]

মেয়ে। (সঙ্গে ছোট মেয়েটি ও ছোট ছেলেটিকে নিয়ে ম্যানেজারের অফিস বেরিয়ে আসে। স্টেজে ঢুকতে ঢুকতে চিৎকার করে ওঠে) না— না— না— চোখের সামনে আমার নিজের ভাই বোন মরে যাবে এ আমি কিছুতেই সইতে পারব না। না.... (বাচ্চা মেয়েটির দিকে ঘুরে, তাকে নিয়ে এগিয়ে আসে) চলে আয়রে— চল, আমার সঙ্গে পালিয়ে যাবি....

[বাবা ম্যানেজারের অফিস থেকে স্টেজে ঢোকেন। উত্তেজিত ভাব। ম্যানেজার তার পেছনে ঢোকেন।]

বাবা। আর একবার অফিসে এসো তো এক মিনিট। আমরা মোটামুটি ব্যবস্থা সেরে ফেলেছি।

ম্যানেজার। (উত্তেজিত কণ্ঠে) .... আপনি একটু এদিকে আসবেন? নাটকটার দু-একটা জিনিস ঠিক করে নিতুম তাহলে।

মেয়ে। উঃ ভগবান। নাটকটার সব ব্যবস্থাই হয়ে গেল। ....নাটকটা তাহলে হবেই। তবে আর শুধু শুধু......

[বাবা, ম্যানেজার আর মেয়ে অফিসের দিকে চলে যান। সঙ্গে সঙ্গে বড় ছেলে আর মা অফিস থেকে বেরিয়ে আসেন।]

ছেলে। (পেছন ফিরে অফিসের দিকে তাকায়) ওআণ্ডারফুল! ওরা সবাই ভাবছে আমার যেন হাত পা বাঁধা..... আমি যেন এখান থেকে চলে যেতে পারবো না।....

[মা বড় ছেলের চোখের দিকে তাকাতেই দৃষ্টি নামিয়ে নেয়। বড় ছেলে একটু দূরে সরে যায়। মা আস্তে আস্তে একটা চেয়ারে গিয়ে বসে পড়েন। ছোট ছেলেটি ও ছোট মেয়েটি মা'র কাছে সরে আসে। মা বড় ছেলের দিকে তাকান ও কথা বলার চেষ্টা করেন।]

মা। মাগো, এ নাটক যে আমার পক্ষে কত বড় শাস্তি। (বড়ো ছেলেকে তাঁর কথায় ভ্রুক্ষেপ করতে না দেখে) ভগবান !...... পৃথিবীতে কেউ বোঝে না, ছেলেই যদি মার দুঃখু না বোঝে তাহলে আর কাকেই বা বলি? .....হ্যাঁরে, আমাকে এত কাঁদিয়েও তোর শান্তি নেই, একবারও আমার দিকে ফিরে চাইবি না? এত নিষ্ঠুর তুই? আমি না তোর মা।

ছেলে। (অনেকটা নিজের মনেই অথচ মা বুঝতে পারে এমন ভাবে) নাটক! রিআলিজম্। নোংরামিকেই জাহির করাই যেন যত রিআলিজম্ .....বাবা এমন একটা অন্যায় করেছেন— যার সীমা নেই, তাই তিনি নাটকটা করার ব্যাপারে সবাইকে ইন্‌সিস্ট করেছেন। এ নাটকটা না হলে তিনি নিজেকেই নিজে ক্ষমা করতে পারছেন না। তিনিও যে সবার মতন ভাল-মন্দে মেশানো একজন সাধারণ মানুষ— তিনি যে ভয়ঙ্কর অন্যায় করছেন সেটা নেহাৎই এক্সিডেন্ট; যে কোন মানুষই তাঁর অবস্থায় পড়লে এরকমই করতো— এটা প্রমাণ করার জন্যেই তিনি নাটকটা করার ব্যাপারে এত উৎসাহী। তার মানে, এ নাটকটা যাতে পুরোপুরি তাঁর আত্মশুদ্ধির দলিল হয়ে ওঠে, সে জন্যে তাঁর চেষ্টার কসুর নেই।.....অথচ বাবা বুঝতেই পারছে না, তাঁর সমস্ত ইনটেলেক্‌চুয়াল লজিকটা গিয়ে দাঁড়াচ্ছে একটা জায়গায় —তিনি যা করেছেন সেটা ততটা অন্যায় হয়নি, —যতটা অন্যায় হয়েছে তাঁর ধরা পড়ে যাওয়াটা! চিরকাল ধরে তার নীতিবোধের কোন হেরফের হয়নি— একথা বলে তিনি এখনো ভালোমানুষ সাজতে চান।..... আর ছেলে হয়ে আমাকে আমার নিজের বাবার চরিত্র স্খলনের সাফাই গাইতে হবে। আমারই মা

যে বাবার সংসার ছেড়ে আর একজনের সঙ্গে ঘর করছে— এই লজ্জা, এই ঘেন্না, এই নোংরামি মেনে নিয়েও, বাবার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে আমাকে নাট্যকার খুঁজে বেড়াতে হবে, যাতে তিনি দয়া করে আমাদের জীবন নিয়ে একটা নাটক লেখেন। আশ্চর্য।

[মা দুহাতে মুখ ঢাকেন। ড্রেসিংরুম, উইংস দিয়ে অভিনেতারা, স্টেজম্যানেজার ও প্রম্পটার ফিরে আসে। সঙ্গে সঙ্গে ম্যানেজার, বাবা এবং মেয়েও অফিস থেকে বেরিয়ে আসেন।]

ম্যানেজার। আচ্ছা...... গেট রেডি এভ্‌রিবডি। .... আর ওহে মাখন।

মাখন। আজ্ঞে।

ম্যানেজার। এক্ষুণি স্টেজে একটা দোকানের সেট লাগাও। ঘরের দুপাশে দুটো দরজা। এক্টরস্ রাইট-এ যে দরজাটা থাকবে, তার গায়ে ভেতরে নামবার একটা সিঁড়ি.......

[স্টেজ-ম্যানেজার সেট-এর ব্যবস্থা করতে দৌড়ে যায়। জিনিসপত্র নিয়ে আসতে থাকে। ম্যানেজার, স্টেজ-ম্যানেজার, বৈদ্যনাথ আর প্রম্পটারের সঙ্গে কথা বলতে থাকেন।]

ম্যানেজার। ......ভালো কথা, বৈদ্যনাথ, আমাদের স্টকে কোন সোফা বা ডিভান আছে?

বদ্যিনাথ। আইজ্ঞা, আসে একখান্। হবুজ.......

মেয়ে। না না, সবুজ হলে চলবে না। ওটা ছিল হলদে ফুলের নক্সা কাটা। বেশ বড় সোফা।

বদ্যিনাথ। আমাগো তো ঠিক ঐরকম কিসু নাই।

ম্যানেজার। তাতে কিছু ক্ষতি হবে না। আমাদের যেটা আছে ওটাতেই কাজ চলবে।

মেয়ে। ক্ষতি হবে না? ওটাই তো হচ্ছে সবচেয়ে দরকারী।

ম্যানেজার। আঃ, আচ্ছা জ্বালাতন তো, বিরক্ত করছেন কেন! ....দেখছেন তো আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। (স্টেজ-ম্যানেজারকে) আচ্ছা, মাখন, ব্যাক-গ্রাউণ্ডে একটা জানালা লাগাবে........

মেয়ে। আর কাঠের কাউন্টার। চকচকে পালিশকরা কাঠের কাউন্টার। তার ওপরেই তো থাকবে ফিকে নীল রঙের খামে একশোটা টাকা।

বদ্যিনাথ। (ম্যানেজারকে) আমাগো তো হেই চকচইক্যা টেবুলখান আসে—

ম্যানেজার। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওটাতেই চলে যাবে।

মেয়ে। কিন্তু কাউন্টার—

ম্যানেজার। আঃ, থামুন দিকি আপনি। কাজের সময় ডিস্টার্ব করছেন কেন?

বাবা। একটা আয়নাও দরকার।

মেয়ে। আর লালরংয়ের পর্দা, সেটা না হলে চলবে কি করে?

স্টেজ-ম্যানেজার। (মেয়েকে) ....আচ্ছা আমাদের কাপড়-চোপড় ঝোলাবার জন্যে কয়েকটা হ্যাঙার লাগবে না?

মেয়ে। হ্যাঁ, অনেকগুলো, তা প্রায়—

ম্যানেজার। (বদ্যিনাথকে) —যাও আমাদের স্টকে যে কটা হ্যাঙার আছে, সবগুলোই নিয়ে এসো।

বদ্যিনাথ। সবগুলোই তো, আইচ্ছা।

[তাড়াতাড়ি আদেশ পালন করতে চলে যায়। ফিরে এসে জিনিসপত্র ঠিক করে রাখতে থাকে।]

ম্যানেজার। (প্রম্পটারকে) —তুমি একটু দূরে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসো। আর শোনো, এই কাগজগুলোতে কি রকমভাবে সিনগুলো এ্যারেঞ্জও হবে সব নোট করা আছে, ধরো (কাগজগুলো দেন) ......আচ্ছা একটা কাজ করতে পারবে?

প্রম্পটার। ডায়লগগুলো টপ্‌টপ্ লিখে নিতে বলছেন তো?

ম্যানেজার। (আনন্দ ও বিস্ময়ে) ঠিক ধরেছো! কি করে বুঝলে?

প্রম্পটার। বুঝেছি........ আচ্ছা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লিখে নেবো।

ম্যানেজার। বাদসাদ যেন না যায়।

প্রম্পটার। যাবারই কথা। তবে যাতে না যায় চেষ্টা করবো। স্পীডে লেখার সুনাম আছে আমার।

ম্যানেজার। ঠিক আছে। বহুৎ আচ্ছা। যাও তো অফিস থেকে কয়েকটা ফুলস্কেপ কাগজ নিয়ে এসো তো। কুইক্।

[প্রম্পটার তাড়াতাড়ি অফিস থেকে কয়েকটা কাগজ নিয়ে আসে।]

ম্যানেজার। (প্রম্পটারকে) .... তুমি সমস্ত সিনগুলোকে মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করবে, আর আসল জায়গাগুলো নোট করবে। (অভিনেতাদের) .... আপনারা সবাই ওই দিকটায় গিয়ে বসুন, আর যা যা হচ্ছে সব মাইনিউটলি মার্ক করুন।

প্রধান অভিনেতা। কিন্তু আমরা...........

ম্যানেজার। (বক্তব্য আঁচ করে) —ব্যস্ত হবেন না, আপনাদের কিছু করতে হবে না।

প্রধান অভিনেতা। তার মানে?

ম্যানেজার। মানে কিছু করতে হবে না। এখন আপনারা শুধু সমস্ত ব্যাপারটা ভাল করে মার্ক করুন। এর পরে আপনাদের প্রত্যেকের নিজের নিজের পার্ট লিখে দেওয়া হবে। এখন প্লে-টা করছেন ওঁরা।

বাবা। (একেবারে হতভম্ব হয়ে) ....তাহলে কি ....তাহলে কি এটা আমাদের রিহার্সাল হবে?

ম্যানেজার। মানে ওঁদের জন্য রিহার্সাল।

বাবা। কিন্তু আমরাই যখন ক্যারেকটার্স—

ম্যানেজার। হ্যাঁ, ক্যারেকটার্স—। আপনারা যখন বলছেন ক্যারেকটার্স, নিশ্চয়ই ক্যারেকটার্স। কিন্তু মশাই, আমাদের এখানে ক্যারেকটার্সরা তো প্লে করেন না........ প্লে করেন আর্টিস্টরা। ক্যারেকটার্সরা থাকেন বইয়ে। স্টেজে আসতে হয় তো আর্টিস্টদের।

বাবা। তা ঠিক। ....কিন্তু এটাও তো ঠিক যে আর্টিস্টরা ক্যারেকটার

নন। ওঁরা যতই ক্যারেকটার হোন না কেন, আই মিন হবার চেষ্টা করুন না কেন, আর্টিস্টরা তো কখনই ক্যারেকটার নন। ধরুন অডিএন্স যদি ক্যারেকটারদেরই স্টেজ-এ দেখতে পান—

ম্যানেজার। সেও একটা খাসা স্টান্ট হয়।

বাবা। শুধু স্টান্ট হয়? আর কিছু নয়? কি বলছেন আপনি?

ম্যানেজার। না-না, বলছি সেটাও বেড়ে হয়—

প্রধান অভিনেতা। তাহলে ওঁরাই এ্যাক্টিং করুন। আমরা কি এখানে দাঁড়িয়ে ভ্যারেণ্ডা ভাজবো?

ম্যানেজার। আরে দূর মশাই—দাঁড়ান না (বাবার দিকে ফিরে) তা মশাই মানলুম। আপনারা ক্যারেকটার, কিন্তু ক্যারেকটার হলেই যে ভাল আর্টিস্ট হবে তার তো কোন মানে নেই— ধরুন শাজাহান কি অহীনবাবুর মত এ্যাকটিং করতে পারতেন?

[অভিনেতারা হেসে ওঠে।]

ঐ দেখুন আপনার কথা শুনে ওঁরা হাসছেন। ....যাক্‌গে এখন আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে রোলগুলো সিলেক্ট করে ফেলা। (দ্বিতীয় প্রধানা অভিনেত্রীকে) আপনি মা'র রোলটা করবেন বুঝলেন। (বাবাকে মা'র দিকে দেখিয়ে) ওঁরতো একটা নাম দরকার।

বাবা। ওঁর নিজের নাম যা, নাটকে সেই নামই থাক না।

ম্যানেজার। আহা ওটাতো গেল ওঁর আসল নাম, গল্পে তো লোকে সাধারণতঃ আসল নামটা চেপে যায়—

বাবা। না-না, এটাই যখন ওর আসল নাম তখন ....তবে যদি (দ্বিতীয় প্রধানা অভিনেত্রীকে দেখিয়ে) অন্য কিছু নাম ভাল লাগে তবে তাই দিন— আমি তো আমার স্ত্রীর ঐ একটা নামই জানি (ক্রমেই হতভম্ব হয়ে যেতে থাকেন) ....আমি যে কি বলবো— কিছুই বুঝতে পারছি না। এর মধ্যেই আমি যেন কেমন ফিল করছি যে —আমার ক্যারেকটারটা কেমন যেন মিথ্যে হয়ে যাচ্ছে।

ম্যানেজার। সেজন্য আপনি কিস্যু ঘাবড়াবেন না। মিথ্যেকে সত্যি করার দায়িত্ব আর্টিস্টদের....... আচ্ছা আগে ওঁর নামের ব্যাপারটা— ওটা আশালতা থাক। ......আপনি যদি চান তো আরও অনেক ভাল ভাল নাম সাজেস্ট করতে পারি আমি....... আচ্ছা এখন বাকী পার্টগুলো সিলেক্ট করতে হবে...... (প্রধান অভিনেতাকে) আপনি ছেলের পার্টটা করবেন। (প্রধানা অভিনেত্রীকে) তুমি করবে মেয়ের পার্টটা।

মেয়ে। কি আমি ঐ মেয়েটা? (হাসিতে ফেটে পড়ে)

ম্যানেজার। (রেগে) এতে খিক্‌খিক্‌য়ের কি হলো?

প্রধানা অভিনেত্রী। আমাকে ঠাট্টা করার স্পর্দ্ধা আজ পর্যন্ত কারোর হয়নি। আমার সঙ্গে এরকম অভদ্র ব্যবহার করলে আমি এখান থেকে চলে যাব।

মেয়ে। না-না আপনি কিছু মনে করবেন না। বিশ্বাস করুন, আমি আপনাকে

ঠাট্টা করছি না।

ম্যানেজার। (মেয়েকে)—জানেন, উনি হচ্ছেন এখন বাংলা দেশের উঠতি হিরোইন। বছর দুয়েক বাদে একটু শাঁসে-জলে পড়লে ওঁর রেটটা কতো হবে আন্দাজ করতে পারেন? উনি যে গোড়াতেই আপনার রোলটা করতে আপত্তি করে বসেননি এজন্যে আপনার কৃতার্থ হয়ে যাওয়া উচিত।

মেয়ে। (প্রধানা অভিনেত্রীকে) .....আবার বলছি, বিশ্বাস করুন আপনাকে ঠাট্টা করার জন্য হাসিনি। আমার মজা লাগছে এই ভেবে যে আপনি কি করে 'আমি' হয়ে যাবেন? আপনার সঙ্গে আমার কোন মিল নেই।

বাবা। ঠিক তাই। এইটেই তো আসল কথা। আমাদের আত্মিক বৈশিষ্ট্য, আমাদের সত্তা—

ম্যানেজার। আপনি কি মনে করেছেন যে আপনাদের আত্মিক বৈশিষ্ট্য, সত্তা— ঐ সবগুলোর ঠিকাদারী নিয়েছেন শুধু আপনারাই?

বাবা। আমাদের সত্তা কি কেবল আমাদের নয়? আমাদের আত্মিক বৈশিষ্ট্য কি আমরা ছাড়া আর কারোও থাকতে পারে?

আলবৎ পারে। পারে না? ......ঐ সত্তা, আত্মিক বৈশিষ্ট্য, সবই তো এই স্টেজ-এ পোর্ট্রেড হয়, সেগুলো করে কারা— আর্টিস্ট-এরাই তো। আর আমার এই আর্টিস্ট-এরা আপনাদের ক্যারেকটার-এর থেকে অনেক কড়া কড়া ক্যারেকটার তুড়ি মেরে পার করে দিয়েছেন। আপনাদের এই নাটক যদি ওৎরায়, তাহলে এঁদের জন্যই ওৎরাবে জানবেন।

বাবা। তা বুঝতে পারছি। কিন্তু একটা কথা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না, যে আমাদের চোখের সামনে আমাদের চেহারা আমাদের মুভমেন্ট আর কেউ—

ম্যানেজার। (কথায় অধৈর্য হয়ে বাধা দিয়ে) কি বিপদ— মেকআপ-ম্যানকে কি জামাই করবো বলে পুযে রেখেছি? মেকআপ নিলে সব ঠিক হয়ে যাবে মশাই— মেকআপে সব......

বাবা। কিন্তু আমাদের গলার স্বর। আর—

ম্যানেজার। দেখুন, আপনারা ঠিক ঠিক যে রকমটি চান সে রকমটি তো কস্মিনকালেও হয় না— হতে পারে না—হবে না। এ ব্যাপারেও আর্টিস্টদের ওপর ডিপেণ্ড করতেই হয়। যত ফালতু তক্ক—

বাবা। বুঝেছি, আপনার আর্টিস্টেরা খুব বড় দরেরই আর্টিস্ট হয়ত..... কিন্তু যখনই মনে হচ্ছে যে আমার ক্যারেকটারটা পেন্ট করবেন—

ম্যানেজার। (প্রধান অভিনেতাকে দেখিয়ে) —উনি। দেখবেন ফাটিয়ে দেবেন আপনার রোল।

বাবা। তবু আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না— ওঁর ক্যারেকটার তো ওঁর নিজের...... আর আমার ক্যারেকটার আমার নিজের। ওঁর যতই

ট্যালেন্ট থাক্ — উনি কি করে আমার ক্যারেকটারে ট্রান্সফর্মড্ হবেন?

প্রধান অভিনেতা। ঐ ট্যালেন্ট-ফ্যালেন্ট কি যে বলেন।

[লজ্জিত হন।]

বাবা। উনি যতই মেকআপ নিন, ওঁকে কি কখনও আমার মত দেখাবে?

তরুণ অভিনেতা। (ঠাট্টা করে) ঐ সামনের টাকটা একটু ধ্যাড়াবে বটে।

[অভিনেতারা সবাই হেসে ওঠেন]

বাবা। হাসছেন কেন? এই কথাটাই তো এতক্ষণ আমি বলতে চাইছি। উনি আমাকে যা মনে করেছেন আমাকে যে রকম বুঝতে চাইছেন— ওঁর সেই বোঝা, সেই মনে করা কি আমার বোঝা, আমার মনে করার সঙ্গে মিলতে পারে? এটা কি খুব এ্যাবসার্ড না? আমাদের এই নাটকের ক্রিটিসিজম্ করবেন যাঁরা— তাঁদেরকেও কি আপনারা তাহলে এই মূল অসুবিধেটার মধ্যে ফেলে—

ম্যানেজার। খেয়েছে। আপনি এর মধ্যেই আবার ক্রিটিকদের কথাও ভাবতে আরম্ভ করে দিয়েছেন? মরুকগে যা খুশি ভাবতে থাকুন— আমরা আর সময় নষ্ট করতে পারবো না। নাও হে কাজ শেষ কর। (চারিদিকে দেখে) ......গেট রেডি ফ্রেণ্ডস্, গেট রেডি। (মেয়েকে) আচ্ছা একবার দেখে নিন; সেটটা ঠিক হয়েছে তো? এই সেটে চলে যাবে কি বলেন?

মেয়ে। সেটটা তো একেবারেই হয়নি।

ম্যানেজার। একেবারে হবে কি? মানে আপনাদের সেই বনোয়ারীলালের দোকানটা কেটে এনে হুবহু স্টেজে বসিয়ে দেওয়া হবে? (বাবাকে) আপনিই তো অফিসে বসে বললেন, এই রকম দেওয়াল— মাঝে মাঝে এই রকম নক্সা কাটা—

বাবা। হ্যাঁ—

ম্যানেজার। তাই তো হয়েছে। —আর ফার্ণিচার-টার্ণিচারগুলোতে মোটামুটি আপনাদের কথামতোই ব্যবস্থা করা হয়েছে— আচ্ছা ঐ ছোট টেবিলটা একটু সামনে এগিয়ে দাওতো— বদ্যিনাথ, দেখোতো, একটা খাম পাও কিনা— সম্ভব হলে ফিকে নীল রংয়ের— পেলে নিয়ে এসে (বাবাকে দেখিয়ে) এই ভদ্দরলোকের হাতে দাও—

বদ্যিনাথ। (পেছনের জানলা থেকে) সাধারণ সাইজের খাম হলেই চলবে তো।

ম্যানেজার। ওরে বাবা, এ যে শালা ভেতরের লোকের জেরায় পড়লুম। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সাধারণ সাইজের হলেই চলবে।

বদ্যিনাথ। অখনই আনতাছি। **[জানলা থেকে সরে যায়]**

ম্যানেজার। গেট রেডি এভরিবডি। ফার্স্ট সিন শুরু হচ্ছে। ফার্স্ট সিনে থাকবেন তরুণী ভদ্রমহিলা আর (প্রধানা অভিনেত্রী এগিয়ে আসে) না-না আপনি না, আপনি এখন ওয়েট করুন। (মেয়েকে) আপনি আসুন। (প্রধানা অভিনেত্রীকে).....আপনি একে খুব ভাল করে ফলো করুন।

মেয়ে। ভাল করে দেখুন আমি কেমন করে অ্যাক্টিং করি।

প্রধানা অভিনেত্রী। আমি কি আপনার চেয়ে খারাপ অ্যাক্টিং করবো নাকি?

ম্যানেজার। ধ্যাৎ, কচুপোড়া —কি হচ্ছে এসব। এ ......ঐ ধরনের ফালতু আলোচনা করে কিছু লাভ আছে? (প্রম্পটারকে) .....নোট করো —'প্রথম দৃশ্য বনোয়ারীলালের দোকান, তরুণী মহিলা ও বনোয়ারীলাল।' (হঠাৎ খেয়াল হতে) ......ওরে গুঁতো! আপনাদের বনোয়ারীলালকে কোথায় পাওয়া যাবে?

বাবা। সে তো আমাদের সঙ্গেই নেই।

ম্যানেজার। তাহলে এখন উপায়টা কি হবে?

বাবা। কিন্তু সেও তো আমাদের নাটকের একটা ক্যারেকটার।

ম্যানেজার। তাতো বটেই, কিন্তু তিনি কোথায়?

বাবা। এক মিনিট! (অভিনেত্রীদের দিকে তাকিয়ে) দয়া করে আপনার ভ্যানিটি ব্যাগটা একটু দেবেন?

তরুণ অভিনেতা। (বিস্মিত ও কৌতুকান্বিত হয়ে) ভ্যানিটি ব্যাগ! মেয়েদের ভ্যানিটি ব্যাগ নিয়ে আপনি কি করবেন?

ম্যানেজার। হ্যাঁ, মশাই মেয়েদের ভ্যানিটি ব্যাগ লাগবে কোন কম্মে?

বাবা। কিছু না। আমি শুধু কিছুক্ষণের জন্যে এটাকে সেট-এ রাখবো। তাই ছিল কিনা। (প্রধানা অভিনেত্রীকে) আর আপনি যদি কাইগুলি ক্লোকটা খুলে দেন—

তরুণ অভিনেতা। ক্লোক নিয়ে আপনি করবেন কি?

বাবা। কিছুক্ষণের জন্যে এটাকেও পাশে ঝুলিয়ে রাখতে হবে, না হলে চলবে না বিশ্বাস করুন!

[অভিনেত্রীরা ভ্যানিটি-ব্যাগগুলো আর ক্লোকটি খুলে ঝুলিয়ে দেয়]

তরুণ অভিনেতা। আচ্ছা দেখা যাক্ শেষ অব্দি।

বাবা। তবু তো একেবারেই শাল-রিপেআরিং-এর দোকানের মতো দেখাচ্ছে না। তাছাড়া ঘরে ছিল সবুজ রংয়ের আলো।

ম্যানেজার। এখনকার মতো ফোকাসেই চালাতে হবে। লাইট ......তাছাড়া রিহার্সালে সেটটা হুবহু হবার দরকার কি?

বাবা। আমি আপনাকে বুঝিয়ে বলছি। এরকম তো হতে পারে যে বনোয়ারীলালের দোকানের ভেতরের ঘরটার মতো করে যদি সেট্টা সাজিয়ে ফেলি, তাহলে হয়তো সে নিজেই এখুনি চলে আসবে—

[সবাই সেটের পর্দাওয়ালা দরজাটার দিকে দেখে।]

দেখুন, দেখুন, তার আগেই ও এসে গেছে—

[বনোয়ারীলাল ধীরে ধীরে ঢোকে। একটু বয়স্ক চেহারা, মধ্যে একটা হাস্যকর আড়ম্বর— হাতে একটা গজকাঠি।]

মেয়ে। (ওর দিকে দৌড়ে গিয়ে) বনোয়ারীভাইয়া ..... এই তো, এইতো তুমি।

বাবা। ওই দেখুন বনোয়ারীলাল— আমি বলিনি আপনাদের— ও চলে

আসতে পারে।

ম্যানেজার। (বিস্ময় দমন করে —ক্রুদ্ধ হয়ে) ..... এটা কি ধরণের চালাকি।

প্রধান অভিনেতা। (সঙ্গে সঙ্গে) ....এর পরে আরো কি দেখতে হবে আমাদের?

তরুণ অভিনেতা। এ লোকটা কোত্থেকে এলো মাইরি? উইংস-এর পাশে চুপিচুপি দাঁড় করিয়ে রেখেছিল না কি?

বাবা। এক্সকিউজ মী— সিচুএশন তৈরী হলেই তো ক্যারেকটার আসে। এই যে সেট, জিনিসপত্র, আমরা ক্যারেকটারস্ আর সবুজ আলো, স্টেজের এই জাদুর টানে বনোয়ারীলাল কি সত্যি সত্যিই এখানে হাজির হতে পারে না? এটা নিশ্চয়ই মানবেন যে, এই নাটকে বনোয়ারীলালের থাকার অধিকার আপনাদের প্রত্যেকের চেয়ে বেশী। —তার মতো নাটকীয় চরিত্রের উপস্থিতিকে তাহলে আপনারা ......শুধু শুধু একটা চালাকি বলে উড়িয়ে দিতে চাইছেন কেন? ......আপনাদের মধ্যে কে বনোয়ারীলাল জানিনা, যিনিই হোন না কেন তিনি নিশ্চয়ই এই বনোয়ারীলালের চেয়ে বেশী জীবন্ত নন— দেখলেন না— মেয়েটি ওকে দেখেই সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারলো। —আচ্ছা আমরা তাহলে ফার্স্ট সিনটা শুরু করতে পারি। ......ঐ দেখুন আরম্ভ হয়ে গেছে ফার্স্ট সিন—।

[বাবার কথা এবং অভিনেতাদের বাধা সত্ত্বেও তরুণী ভদ্রমহিলা ও বনোয়ারীলালের দৃশ্যটির অভিনয় শুরু হয়ে গেছে। খুব ধীরে ও স্বাভাবিক ভাবে তাদের অভিনয় হচ্ছে। ঐ অভিনয় মঞ্চের পক্ষে স্বাভাবিক নয়— কাজেই যখন বাবার কথামতো অভিনেতারা ওদের দিকে দৃষ্টি দেয় বনোয়ারীলাল তখন মেয়েটির চিবুক ধরে মাথাটিকে তুলে ধরেছে আর ফিস্ ফিস্ করে কি যেন বলছে। প্রথমে অভিনেতারা আগ্রহ করে কিন্তু কথাবার্তা না শুনতে পেয়ে বিরক্ত হয়ে ওঠে।]

ম্যানেজার। ও কি? ওকি হচ্ছে? ওরা কি বলাবলি করছে নিজেদের মধ্যে?

প্রধান অভিনেতা। কথা তো শোনা যাচ্ছে না।

তরুণ অভিনেতা। লাউডার প্লিজ।

মেয়ে। (চটুল ভঙ্গিতে এগিয়ে এসে) .....লাউডার? কি বলছেন আপনারা? আমাদের কথাবার্তা কি গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে বলবার মতো .....হয়তো জিজ্ঞেস করবেন তাহলে (বাবাকে দেখিয়ে) —ওঁর সঙ্গে কেন চিৎকার করে কথাবার্তা বলেছি। সেটা বলেছি ওঁকে অপমান করার জন্যে— ওঁকে লজ্জা দেবার জন্যে— প্রতিশোধ নেবার জন্যে..... কিন্তু বনোয়ারীভাইয়ার বেলায় তো চিৎকার করলে চলবে না।

ম্যানেজার। বুঝলুম। কিন্তু পাবলিক শুনতে পায় এরকম জোরে তো হবে? আমরা স্টেজের ওপর দাঁড়িয়ে আপনাদের কথা শুনতে পাচ্ছিনা.... ভাবেন তো এরকম ফিস্‌ফিস্ করে কথা বললে— পাবলিকের হাতে পড়ে অডিটোরিআমের চেয়ারগুলোর কি হাল হবে। .....থাকগে আপনি ভেবে নিন্ যে এখানে আছেন আপনারা দুজনেই, নিয়ে

জোরে কথা বলুন।

[মেয়ে চটুল অঙ্গভঙ্গি দিয়ে অসম্মতি জ্ঞাপন করে]

না মানে কি?

মেয়ে। (রহস্যময় ভঙ্গিতে বনোয়ারীলালকে দেখিয়ে) .....বনোয়ারীভাইয়া যদি জোরে কথা বলে তাহলে ঐ সিঁড়ির পাশে চুপ করে একজন আমার জন্য দাঁড়িয়ে আছেন; উনি শুনতে পেয়ে যাবেন যে।

ম্যানেজার। সে কি। আবার কোন নব-অবতারের আবির্ভাব হবে?

বাবা। না— আর নতুন কেউ না। আমিই সিঁড়ির পাশে চুপ করে ওয়েট করবো। ও আমার কথা বলছে। বনোয়ারীলাল জানে আমি ওখানটায় আছি..... আমি ওখানে চলে যাই?

ম্যানেজার। বাবাকে থামিয়ে .....স্টেজে ওরকম সামনে দিয়ে ঢোকা যায় মশাই। উইংস দিয়ে.... উইংস দিয়ে ঢুকুন। ওদিক দিয়ে ঘুরে।

মেয়ে। (বাধা দিয়ে).....না না, এখুনি এখুনি এই মুহূর্তে —দেরী হয়ে গেলে নাটকীয়তা নষ্ট হয়ে যাবে না?

ম্যানেজার। (চেঁচিয়ে) ..... এ মেয়েছেলেকে নিয়ে তো মহাবিপদ হোল। আপনার আর বনোয়ারীভাইয়ার সিনটা আগে হয়ে যাক— তবে তো—।

মেয়ে। ওতো প্রায় শেষ হয়ে এলো। এইতো বনোয়ারীভাইয়া আমাকে যা যা বলছে তা তো আপনারা আন্দাজ করতেই পারেন। ভাইয়া বলছে যে, আজকাল মা আর আগের মত কাজ ভালো করতে পারছে না। এতে ওর খদ্দের বিগড়ে যাচ্ছে— তাই ওর ইচ্ছে থাকলেও ও তাকে পয়সা দিতে পারবে না। তবে আমি যদি কিছু করি, তাহলে ওর কমিশনটা কেটে নিয়ে সবটাই আমাকে দিয়ে দেবে....

বনোয়ারীলাল। (খুব গম্ভীর চালে) —হ্যাঁ মোসাইরা, বলি কি খোঁকী— ইয়াতে তুর ভালো হবে— তুই মা ভাই বহিন ভুখা মরবে না। তুর বাবার বুখারে দাবাই মিলবে— ভগমান্ তুকে পুণ্য দিবে....

ম্যানেজার। একি! ও এরকম করে কথা বলছে কেন

মেয়ে। (হেসে) হ্যাঁ, ও ওইরকম করেই কথা বলে।

তরুণ অভিনেতা। এতো বাবা ডাহা ধীরাজ ভট্চায্যির টুকলি।

[সবাই হেসে ওঠে।]

বনোয়ারীলাল। মোসাইরা— হামি এতো বরষ বাংলা মুলুকে আসি—বাংলা হামি জানে।.....

ম্যানেজার। বাঃ বাঃ, ঠিক আছে, ওহে বনোয়ারীলাল, তুমি ঐ রকম করেই কথা বলে যাও তো, ঐ রকম করেই বলো— বিউটিফুল হবে। (প্রম্পটারকে) ......দেখো বানান ভুল না হয়। এইরকম একটা ট্র্যাজিক নাটকে বনোয়ারীলালই হবে কমিক রিলিফ।

মেয়ে। সত্যি কি মজার মজার কথা বলে ও— দেখবেন লোকে একেবারে হেসে গড়িয়ে যাবে, যখন ও ঐরকম অদ্ভুত করে বলবে —'এ বহিন। একজন ভদ্দর আদমি তুমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। তুমাদের

সংসারের দুখের কথা শুনে বাবু কাঁদে--’

বনোয়ারীলাল। খুব বুঢ়া না বহিন। তুর পসন্দ লাগতে পারে। বাবু তোমাকে রাজরাণী করে রাখবে।....

মা। (কেউ তাঁকে এতক্ষণ লক্ষ্য করছিলো না, হঠাৎ দাঁড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে) বুড়ো হতভাগা..... মর্, মর্ তুই—

মেয়ে। মা, মা— মাগো, চুপ করো। শান্ত হয়ে বোসো। ঐ রকম কোরোনা মাগো।

বাবা। হ্যাঁ, হ্যাঁ শান্ত হও—শান্ত হয়ে বোসো। উত্তেজিত হয়োনা— বোসো—

মা। না গো, —আমি সইতে পারছিনা; ঐ হতভাগা বুড়োটাকে আমার চোখের সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও এখুনি— নইলে আমি ওকে —

মেয়ে। (ম্যানেজারকে) —মা এখানে থাকলে এ নাটক আর একটুও এগোবে না—

বাবা। (ম্যানেজারকে) —বনোয়ারীলাল আর ওদের মা দুজনে কিছুতেই একসঙ্গে থাকতে পারবে না, এই জন্যেই এতক্ষণ নিশ্চয়ই বুঝেছেন, —এই জন্যেই বনোয়ারীলাল আর ওদের মা একসঙ্গে আমাদের সাথে আসেনি। ওরা দুজন যদি একসঙ্গে থাকত, তাহলে এ নাটকটা এক ইঞ্চিও এগোতো না....

ম্যানেজার। কোনো ক্ষতি নেই— মোটামুটি একটা খসড়া করে এগুতে পারলেই হয়ে যাবে— (প্রম্পটারকে) —আসল কথাগুলো বাদ না যায়— এই সিনটা শেষ করে ফেলা যাক্।

মেয়ে। (বনোয়ারীলারের দিকে এগিয়ে)— এসো—এসোনা ভাইয়া—

বনোয়ারীলাল। না—না খোঁকী, তুমার মা এখানে থাকলে হামি তুমার সঙ্গে কিছু কোথা বলতে পারবো না।

মেয়ে। আচ্ছা জ্বালাতন তো—অন্ততপক্ষে সেই ভদ্রলোককে এখানে নিয়ে এসো—শুনছো না, এ সিনটা আমাদের.... এখুনি এটা শেষ করে ফেলতে হবে। —কি আসবে না?

বনোয়ারীলাল। না—না—

মেয়ে। আচ্ছা —তাহলে সরে যাও তুমি। দোকানে গিয়ে বসো।

বনোয়ারীলাল। হাঁ-হাঁ— আমি দুকানে যাই। হামার কাম বাকি আসে..... আঁঃ? ......খিড়কির দরজা খুলা রইল, হামি পোরে বন্দো কোরে দিব। এ খোঁকী, হামার কমিশন দিতে ভুলো না আঁ? থার্টি পার্সেন্ট। [বেরিয়ে যায়।]

মেয়ে। (বাবাকে)— আপনি এবার আসুন। না-না ওদিক দিয়ে নয়— সোজা চলে আসুন। আচ্ছা। ....ধরে নেওয়া গেল— আপনি যেন ঘরের মধ্যেই দাঁড়িয়ে আছেন এখন। বলুন, এবার বলুন...... সেরকম সুন্দর করে বলুন তো। ......কোটের কলার দুটো তুলে দেওয়া,

কপালে অল্প অল্প ঘাম, মুখে কেমন একটু নার্ভাস হাসি— পাদুটো একটু একটু টলছে —চোখে কেমন ঘোলাটে দৃষ্টি —তেমনি সুন্দর করে বলুনতো, 'দেখে মনে হচ্ছে ভদ্রবাড়ির মেয়ে'—

ম্যানেজার। ব্যাপারটা কি? এখানে ডাইরেক্টারটা কে —আমি না আপনি? (বাবার দিকে তাকিয়ে) —আপনি নার্ভাস হবেন না— যান যান— কুইক কুইক। দেখবেন আমাদের স্টীয়ারকেসটা আবার একটু নড়বড়ে আছে। ঢুকে সোজা চলে আসুন মিডস্টেজ-এ—

[বাবা নির্দেশমতো কাজ করেন। প্রথমে একটা ইতস্তত ভাব, কিন্তু আস্তে আস্তে স্বাভাবিক ভাব ফিরে আসে— মুখে একটা হাসি ফুটে ওঠে— অভিনেতারা মন দিয়ে লক্ষ্য করতে থাকে।]

ম্যানেজার। (প্রম্পটারকে) —স্টেডি। নাও ঢোকো—ঢুকে যাও।

বাবা। (এগিয়ে এসে মিষ্টি গলায়) —দেখে মনে হচ্ছে ভদ্রবাড়ির মেয়ে—

মেয়ে। (মাথাটা একদিকে ঝুঁকিয়ে বিতৃষ্ণা চেপে) —ভদ্রবাড়ির মেয়ে....

বাবা। (একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। ওর সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়ে কাছে এগিয়ে যায়) —বাঃ, বেশ দেখতে তো,— এই লাইনে নতুন বুঝি?

মেয়ে। না পুরোনোই।

বাবা। পুরোনো? (সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়া দেখে) যাঃ দেখে টেখে তো তা মনে হচ্ছে না। (উত্তরের জন্য অপেক্ষা করে —প্রগলভ হাসি হেসে) পুরোনো? তাহলে এরকম কনে বৌয়ের মতো দাঁড়িয়ে আছ কেন, এতে লজ্জা কিসের? শাড়ীটা গলায় জড়িয়ে আছ কেন, গরম লাগছে না? —ঈশ এতো ভীষণ ঘেমে গেছো —দাও আঁচলটা সরিয়ে দিই—

মেয়ে। (প্রচ্ছন্ন বিরক্তির সঙ্গে —তাড়াতাড়ি জড়ানো আঁচলটা সরিয়ে দেয়) না না, আমিই সরিয়ে দিচ্ছি।

মা। (দৃশ্যের অগ্রগতি লক্ষ্য করতে থাকেন। তাঁর পাশে রয়েছে ছোট ছেলে ও মেয়ে। মার মুখে হতাশা, বিষাদ, নানাভাবে ফুটে উঠতে থাকে। মাঝে মাঝে দুহাতে মুখ ঢাকেন) ....উঃ মাগো।—

বাবা। (নাটকীয় ভঙ্গিতে) .....দাঁড়াও মুখটা মুছিয়ে দিই তোমার —বড্ড ঘেমে গেছো। .....এতো সুন্দর দেখতে তোমাকে, আর কি বিচ্ছিরি একটা ব্লাউজ পরেছো, এটা কি তোমার রঙে মানায়?...... এরকম একটা ক্লোক নেবে তুমি? দেখোনা পরে কেমন দেখায়—

দ্বিতীয় প্রধানা অভিনেত্রী। ওটা আমার ক্লোক মনে থাকে যেন।

ম্যানেজার। (ক্ষেপে গিয়ে) .....বাপের সঙ্গে রসিকতা করগে যা শালা। ......(সামলে) বুঝছ না, এ সিনটা আমাদের এখুনি শেষ করতে হবে তো? ডোন্ট মাইণ্ড —এ্যা। ....(মেয়েকে) .....আপনি চালিয়ে যান তো..... বেশ হচ্ছে।

মেয়ে। (চালিয়ে যেতে থাকে) ....না থাক। ক্লোক আমি কখনো পরিনি।

বাবা। তাতে কি হয়েছে, না হয় এটা দিয়েই শুরু করলে।.... এরকম ডজনখানেক আমি কিনে দেবো তোমাকে —নাও না নাও। .....আমি —সাধ করে দিচ্ছি আর তুমি নেবে না? কি নেবে না? দেখিতো কেমন না নাও— আমি পরিয়ে দিচ্ছি তোমায়—

মেয়ে। না, থাক—

বাবা। বুঝতে পেরেছি, তুমি ভয় পাচ্ছে বাড়ির কথা ভেবে, ভাবছ..... একটা ক্লোক পরে গেলে বাড়ির সবাই কি ভাববে না? ....দুর বোকা —এসব ব্যাপারে একটু চালাকি করতে হয়, তাও জান না.....? নাঃ, তুমি দেখছি নিতান্তই নোভিশ।....আচ্ছা কি বলতে হবে আমি শিখিয়ে দেব তোমাকে, কেমন রাজী?

মেয়ে। (ঘৃণা দমন করে) না-না তা নয়, এসব কথা বলে কি লাভ? এতে তো আমার আপনার দুজনেরই সময় নষ্ট হচ্ছে —আপনার যা খুশি করুন, শুধু তাড়াতাড়ি করুন .....আমায় টাকাটা দিয়ে ছেড়ে দিন।

বাবা। আরে বাপরে আশ্চর্য নির্লজ্জ মেয়ে তো তুমি।

মেয়ে। আমি কিন্তু একটা পয়সাও কম নেব না। আমার টাকার খুব দরকার।

বাবা। তাই নাকি, তবে যে বনোয়ারীলাল বললো যে তুমি নিজে দেখে আমাকে পছন্দ করেছো—

মেয়ে। হ্যাঁ তাই, ...আমার খুব পছন্দ হয়েছে আপনাকে ....আপনাকে আমি এদিক দিয়ে যেতে আসতে অনেকবার দেখেছি। আমি আপনাকে ভালোবাসি। আপনি আমাকে দয়া করুন। আমাকে যা খুশি করুন, কিন্তু দাঁড়ান, আমি আগে টাকাটা গুণে নিই....

ম্যানেজার। (বাধা দিয়ে, প্রম্পটারের দিকে) দাঁড়াও একমিনিট। এই মহিলার এই লাষ্ট ডায়লগটা লিখতে হবে না.... ওটা বাদ দিয়ে দাও — (বাবা ও মেয়েকে) বিউটিফুল হচ্ছে — রিয়েলি সুপার্ব (অভিনেতাদের) এ সিনটা বেশ জমবে না? বিশেষ করে এই ক্লোক দিতে যাবার জায়গাটা থেকে—

মেয়ে। এখনো তো এ সিনের ক্লাইম্যাক্সটাই বাকি।

ম্যানেজার। এক মিনিট —কাইগুলি একটু ওয়েট করুন। (প্রম্পটারকে) এ সিনের কথাবার্তাগুলো আর একটু ভদ্র করে আনতে হবে....

প্রবীণ অভিনেতা। এমনিতে কিন্তু সিনটার মধ্যে স্পীড আছে।

প্রধানা অভিনেত্রী। নিশ্চয়ই —এই সিনটা তো মোটামুটি সহজ বলেই মনে হচ্ছে। (প্রবীণ অভিনেতাকে) আপনি আর আমি এক রাউণ্ড ট্রাই করে দেখবো নাকি?

প্রবীণ অভিনেতা। উইথ প্লেজার। (ম্যানেজারকে) আচ্ছা, আমি ওদিক দিয়ে এন্ট্রেন্স নিচ্ছি (প্রধান অভিনেতাকে) একটু মুড ক্রিএটেড হওয়া দরকার।

ম্যানেজার। (প্রধান অভিনেতাকে) কি ব্যাপার, আপনারা এখুনি একবার ক্যারেকটারদের সামনে সিনটা করে নিতে চান? তা বেশ তো,

ওঁরা দেখুন .....আচ্ছা আপনার আর বনোয়ারীলালের পোরশানটুকু এখন থাক, ও যায়গাটায় আমি আরো কতকগুলো কমিক ডায়লগ ঢুকিয়ে নেব। তার পরের সিনটুকু করুন তো? একি আপনি আবার যাচ্ছেন কোথায়?

প্রধানা অভিনেত্রী। এক মিনিট। আমার ভ্যানিটি ব্যাগটা একটু ....

[সেট থেকে ব্যাগটা নিয়ে দোলাতে দোলাতে এগিয়ে আসে। সেটা খুলে দুটো লবঙ্গ মুখে দেয়। ব্যাগ বন্ধ করে।]

ম্যানেজার। বেশ। আপনি ওখানটায় দাঁড়ান —মাথাটা একটু নিচের দিকে ঝুঁকিয়ে দিন ....হ্যাঁ।

প্রধানা অভিনেত্রী। দেখুন। এবার আমি আপনার চেয়ে এ জায়গাটায় ভাল অভিনয় করি কিনা।

মেয়ে। আমার চেয়ে?

ম্যানেজার। (মেয়েকে) একটু চুপ করুন দিকি। দেখুন একে ভালো করে ফলো করুন। এর কাছ থেকে আপনিও অনেক কিছু শিখতে পারবেন। (হাততালি দিয়ে প্রবীণ অভিনেতাকে) আপনি ওদিকে যান — ওদিকে রেডি থাকুন, নিন —এবারে এন্ট্রেন্স নিন্ —ইয়েস —

[প্রবীণ অভিনেতা সপ্রতিভ ভাব-ভঙ্গি করে ঢোকেন —প্রথম থেকেই দেখা যায় যে অভিনেতাদের বাচনভঙ্গি চরিত্রগুলো থেকে আলাদা, যদিও এর মধ্যে প্যারডির কোন ভাব নেই। নিজেদের থেকে অন্যরকম মনে হচ্ছে দেখে বাবা ও মেয়ে কখনো হেসে কখনো অন্যরকম মুখভঙ্গি করে তাঁদের অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে থাকেন।]

প্রবীণ অভিনেতা। দেখে মনে হচ্ছে ভদ্রবাড়ির মেয়ে।

বাবা। (নিজেকে আর সামলাতে না পেরে) না না, এরকম মোটেই না।

[প্রধান অভিনেতার ঢোকা দেখে মেয়ে সশব্দে হেসে ওঠে]

ম্যানেজার। আরে চুপ করুন তো। আপনার হাসিটা থামান। এরকম করে বার বার কথা বললে আর খিক্ খিক্ করতে থাকলে তো আমরা সারা জন্মে নাটকটা শেষ করতে পারবো না।

মেয়ে। না, না আপনি কিছু মনে করবেন না। কিন্তু হাসি পাচ্ছে কেন সেটা তো বুঝতেই পারছেন । এই ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়ে আছেন, যেন সত্যি-সত্যিই ফুলশয্যার রাতের কনে বউ। একটা লোক আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই একশো টাকার বদলে ওঁর শরীরটা নিয়ে যা খুশী তাই করবে জেনেও কি কোন মেয়ে ওরকম করে দাঁড়িয়ে থাকে? সত্যি কোন ধারণা নেই আপনাদের।

বাবা। যেন সমাজটায় কোন নোংরামি নেই —ইতরতা নেই —সব অমনি সরল সুন্দর —থিয়েটার থিয়েটার খেলা —

ম্যানেজার। রাবিশ যত সব। সরুন তো —আমাকে দেখতে দিন ব্যাপারটা।

প্রবীণ অভিনেতা। (বাবাকে) আপনি ব্যাপারটা বুঝুন। প্রায় ফরটি ফিফটি এজ-এর কোন লোক যদি ঐ বয়সী একটা ভদ্রমেয়েকে এমন একটা জায়গায় দেখে, যেখানে প্রকাশ্য দিবালোকে —বুঝেছেন তো ক্যারেকটার-

টা?

ম্যানেজার। আহা চুপ করুন আপনি। আপনি আবার গেলেন ওঁকে জ্ঞান দিতে। ওঁদের কথায় কান দেবার দরকার কি? এই জায়গাটা আর একবার করুন। বেশ হচ্ছিল।

[অভিনেতাদের আরম্ভের অপেক্ষায় চুপ করে থাকেন।]

কি হলো?

প্রবীণ অভিনেতা। দেখে মনে হচ্ছে ভদ্রবাড়ির মেয়ে।

প্রধানা অভিনেত্রী। হ্যাঁ ভদ্রবাড়ির মেয়ে।

প্রবীণ অভিনেতা। (বাবার অঙ্গভঙ্গি নকল করে; প্রথমে মিষ্টি করে হাসেন পরে ভীতির ভাব দেখান) বাঃ বেশ দেখতে তো— এই লাইনে বুঝি নতুন?

ম্যানেজার। হ্যাঁ মোটামুটি হচ্ছে। তবে অ্যাকশনটা আরও বাড়াতে হবে। আর একটু ইমোশান....আমাকে ফলো করুন। এই রকম হবে —বাঃ বেশ দেখতে তো, এ লাইনে নতুন বুঝি? (প্রধানা অভিনেত্রীকে) তুমি বলো —না পুরোনোই—

প্রবীণ অভিনেতা। বাঃ বেশ দেখতে তো —এই লাইনে নতুন বুঝি?

প্রধানা অভিনেত্রী। না—

প্রবীণ অভিনেতা। পুরোনো। যাঃ দেখে তা—

ম্যানেজার। আরে দুর। আগে ওর কথাটা শেষ করতে দিন মশাই। ও বলবে, 'না পুরোনোই' .....তখন আপনি বলবেন 'পুরোনো? ও যেইনা বলেছে 'না—' অমনি আপনি বলতে লেগে গেছেন 'পুরোনো' .....যাঃ কি যে করেন—

[প্রধানা অভিনেত্রী বিতৃষ্ণায় নিজের চোখ বন্ধ করে। তারপর ঘাড় নাড়ে। মেয়ে হাসি চাপার ব্যর্থ চেষ্টা করে।]

ম্যানেজার। (মেয়ের দিকে ঘুরে) কি হচ্ছে কি —আপনি ওরকম করছেন কেন?

মেয়ে। কই আমি তো কিছু করিনি।

ম্যানেজার। (প্রবীণ অভিনেতাকে) আপনারা চালিয়ে যান তো—

প্রবীণ অভিনেতা। পুরোনো? যাঃ —দেখে তো মনে হচ্ছে না। সত্যি পুরোনো? তাহলে এরকম করে কনেবউ-এর মত দাঁড়িয়ে আছ কেন? এত লজ্জা কিসের? শাড়িটা গলায় জড়িয়ে আছ কেন? গরম লাগছে না? ইস্—অ্যাতো ভীষণ ঘেমে গেছো। দাও আঁচলটা সরিয়ে দিই — বাপরে—

[প্রবীণ অভিনেতা 'বাপরে' রেশটুকু এমন সুরে আর ভঙ্গিতে বলেন যে মেয়ে দুহাত দিয়ে মুখ চেপে রেখেও হাসি চাপতে পারে না।]

প্রধানা অভিনেত্রী। আমি চলে যাচ্ছি। এসব আজে বাজে লোকের ঠাট্টা নেকামি সয়ে রিহার্সাল দিতে হবে এমন দাসখৎ লিখে দিইনি।

প্রবীণ অভিনেতা। আমিও চলে যাচ্ছি। কি বলেন মশাই —সহ্যের একটা সীমা আছে তো?

ম্যানেজার। (মেয়ের দিকে চেঁচিয়ে) হাত জোড় করে বলছি —আপনি চুপ

করুন। বুঝলেন, হাসিটা থামান।

মেয়ে। সত্যি আমার অন্যায় হয়ে গেছে। আপনারা কিছু মনে করবেন না —দেখবেন আর এ রকম হবে না।

ম্যানেজার। সত্যি আপনি অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করছেন, সব জিনিসের একটা সীমা আছে, মাত্রা আছে —

বাবা। (মধ্যস্থতা করার চেষ্টা করেন) তা আছে কিন্তু ওর অবস্থাটা একবার বুঝে দেখুন—

ম্যানেজার। বুঝে দেখবো। কি বুঝবো আবার —আমার মেজাজ ক্রমেই চড়ে যাচ্ছে —এমনিতে ব্লাডপ্রেসার-এর পেশেন্ট আমি—

বাবা। কিন্তু বিশ্বাস করুন ওঁরা যখন এরকম অদ্ভুত সব পোজ করেন— না, আমি বলছি আপনার আর্টিস্টরা সত্যিই ট্যালেন্টেড। এই ভদ্রলোক, এই মহিলার, অ্যাক্টিং-এর মধ্যে সত্যই আছে ওরিজিনালিটি .....কিন্তু এঁরা আর আমরা কি এক? আপনিই বলুন?

ম্যানেজার। না তা হবে কেন? আপনারা আর এঁরা এক হবেন কি করে? হওয়া উচিতও নয়। আপনারা হলেন ক্যারেকটার্স আর এরা হলেন আর্টিস্ট—

বাবা। হ্যাঁ তাই তো বলছি আমি। এঁরা আর্টিস্ট, এঁরা নিজেদের মতো করে আমাদের রোল পোর্ট্রে করছেন। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমাদের উপর, মানে ক্যারেকটারদের উপর কিন্তু অ্যাক্টিং-এর একেবারে অন্য রকম রিঅ্যাকশান আছে। এঁরা যতই আমাদের মতো হতে চেষ্টা করুন না কেন, এঁরা কখনও আমরা হতে পারেন না।

ম্যানেজার। তাহলে এটা কি হচ্ছে?

বাবা। বললুমই তো যা হচ্ছে ....সেটা ওঁদের নিজেদের সৃষ্টি। এই সৃষ্টি থেকে ওরিজিনাল ক্যারেকটরস্ চেনাবার কোন উপায় নেই।

ম্যানেজার। ওব্‌ভিয়াস্। এটাই যে ওব্‌ভিয়াস্ সে কথা তো এর আগে আপনাকে বহুবারই বললুম।

বাবা। হ্যাঁ আমি বুঝতে পারছি ....বুঝতে পারছি....

ম্যানেজার। বুঝতে পারছেন ব্যস, তবে আর কথা বাড়াবেন না। (অভিনেতাদের দিকে ফিরে) এখন তা হলে থাক। বুঝলেন আমরা পরে নিজেদের মত কম্পোজিশান করে নিয়ে রিহার্সাল দেবো। (বাবাকে) নিন —আপনারাই আসুন। আবার শুরু করা যাক। আর —(মেয়েকে) আপনার ঐ হাসি-টাসিগুলো একটু সামলে।

মেয়ে। না না আর হাসবো না। এবার আমার যা একটা অপূর্ব জায়গা আছে না, দেখুন, কি সুন্দর।

ম্যানেজার। বেশ তো। কিন্তু তার আগে একটা জিনিস ঠিক করে নিতে হবে —তাহলে এই মহিলা যখন বলবেন —হ্যাঁ তাই তাই, আমার খুব পছন্দ হয়েছে আপনাকে আপনাকে আমি এদিক দিয়ে যেতে আসতে অনেকবার দেখেছি —আপনি আমাকে দয়া করুন, যা খুশি করুন

কিন্তু দাঁড়ান আমি আগে টাকাটা গুণে নিই —বলবেন তো? এখানে এই মহিলাকে শুধু এইটুকু বলতে হবে — আপনাকে আমি যেতে আসতে অনেকবার দেখেছি, আপনি আমাকে দয়া করুন। —ব্যস। বাকি ডায়লগগুলো বাদ দিয়ে দিন। দিয়ে —(বাবাকে) আপনি বলুন দয়া? কেন দয়া কেন? কি হয়েছে তোমার, — বলেই এগিয়ে আসুন। —আচ্ছা বলুন তো একবার।

মেয়ে। (বাধা দিয়ে) কি বলবেন?

ম্যানেজার। বলবেন —তোমাকে যেন আমার খুব চেনা চেনা ঠেকছে, কোথায় তোমাকে দেখেছি মনে হচ্ছে খুব যেন একটা চেনা মুখের প্রতিবিম্ব' —

মেয়ে। কি সব আজে বাজে বকছেন আপনি —আসলে কি হবে জানেন? যেই আমি বলবো, —হ্যাঁ, তাই তাই, আমার খুব পছন্দ হয়েছে আপনাকে। আপনাকে আমি এদিক দিয়ে যেতে আসতে অনেকবার দেখেছি —আপনি আমাকে দয়া করুন, আমাকে যা খুশি করুন, কিন্তু —দাঁড়ান, আমি আগে টাকাটা গুণে নিই। —তখন উনি কি করবেন জানেন? আমার হাতটা ধরে আচমকা টান মেরে বলবেন —থাক —থাক ও টাকা। আমি তোমাকে আরও অনেক টাকা দেবো। কিন্তু এ জামাটা সত্যিই তোমাকে একদম মানায় না। এটা খুলে ফ্যালো। খোলো—

ম্যানেজার। ও-বাবা, তাহলে তো অডিটোরিআম-এ একেবারে হট্টগোল আরম্ভ হয়ে যাবে।

মেয়ে। কিন্তু এইটেই যে সত্যি, এই তো হয়েছিল।

ম্যানেজার। হয়েছিল তো হয়েছিল — তাতে কি হয়েছে? আমাদের কাজ তো রিআলিটি নিয়ে নয়, আর্ট নিয়ে। রিআলিটিকে আমরা স্বীকার করতে চেষ্টা করতে করি, কিন্তু সব সময়েই যে রিআলিটি বজায় রাখতেই হবে তার কোনো মানে নেই।

মেয়ে। তা হলে এ জায়গাটা কি করতে চান আপনি?

ম্যানেজার। সে সব আপনি কিছু ভাববেন না। এ জায়গাটায় সব অদ্ভুত ভাল ভাল সংলাপ লিখে দেব আমি।

মেয়ে। না না, তা হবে না। এ আমি কিছুতেই মানবো না। আমি যা আমি তাই। আমার কোন আশা' নেই, মায়া মমতা নেই। ভদ্রতা শ্লীলতা নেই, চরিত্র নেই — আমার জীবনের এই যে ঘটনাটুকু — আমার বিতৃষ্ণা, আমার রাগ, আমার ক্ষোভ, আমার জ্বালা-যন্ত্রণা, বেদনা আর নিষ্ঠুর নগ্ন-সত্যের সঙ্গে আপনি আপনার মনগড়া যত ভাল ভাল কথা জুড়ে নিয়ে একটা খুব জমাটি গোছের রোম্যান্টিক সিন্ খাড়া করবেন ভেবেছেন? আর আমি তা মেনে নেবো? আপনার কথামতো উনি আমাকে বলবেন তোমাকে যেন আমার খুব চেনা চেনা ঠেকছে। কোথায় তোমাকে দেখেছি বলতো — আর অমনি

আমি চোখের জলে গলে গিয়ে বলবো, — এখান থেকে আধ মাইল দূরে একটা বস্তিতে আমার বাবা মারা যাচ্ছেন। ওঁকে এখুনি অক্সিজেন দিতে হবে — না না না — তা কিছুতেই হবে না। উনি যেমন করে আমাকে বলেছিলেন, ঠিক সেইরকম করেই ওঁকে বলতে হবে। থাক, থাক ও টাকা। আমি তোমাকে আরও অনেক টাকা দেবো। কিন্তু এ জামাটা তোমাকে মানায় না। এটা খুলে ফ্যালো — 'আর আমি ডান হাতের মুঠোয় একশোটা টাকা নিয়ে, বাঁ হাত দিয়ে আমার নিজের জামা—

ম্যানেজার। (মাথার চুলে আঙ্গুল চালাতে চালাতে) একি বলছেন আপনি?

মেয়ে। (উত্তেজিতভাবে চিৎকার করে) সত্যি, যা সত্যি তাই।

ম্যানেজার। বুঝলুম সত্যি, আপনাদের মনের অবস্থাটাও বুঝতে পারছি কিন্তু দেখুন, স্টেজের ওপর তো আর ওসব জিনিস দেখানো যাবে না, একেবারে কেচ্ছা হয়ে যাবে তাহলে—

মেয়ে। দেখানো যায় না? যা সত্যি তা দেখানো যায় না, না? বুঝেছি, যেমন আপনারা, তেমনি আপনাদের স্টেজ। আচ্ছা নমস্কার — আমি চললুম।

ম্যানেজার। আহা! ব্যাপারটা ঠাণ্ডা মাথায় একটু বুঝতে চেষ্টা করুন। হঠাৎ এতটা চটে উঠছেন কেন?

মেয়ে। আমি আর এক সেকেণ্ডও এখানে দাঁড়িয়ে থাকবো না। সব বুঝতে পেরেছি আমি .....আপনি আপনার অফিসে বসে কথা বলবার সময় ওঁকে বুঝিয়েছেন স্টেজে এতটা সম্ভব নয়। বুঝতে পেরেছি আমি ......আর উনিও তাতে হুবহু সায় দিয়ে গেছেন, কেননা উনি তো শুধু চান এ নাটকে আর কিছু দেখাবার দরকার নেই, শুধু ওঁর বিবেক-দংশন, আত্মগ্লানি, এইসব দেখিয়ে ওঁর চরিত্রের সাফাই গেয়ে ওঁকে নির্দোষ প্রমাণ করলেই হলো। কিন্তু আমি তো চাই আমার চরিত্রের যা সত্যি দেখানো হোক এ নাটকে।

ম্যানেজার। (মাথা নেড়ে বিপর্যস্ত হয়ে) আহা বুঝলুম আপনার কথা। আপনার চরিত্রের রিআলিটি-র ব্যাপারটাও বুঝলুম। কিন্তু ওঁদের তিনজনের, এই ভদ্রলোকের, আপনার মা'র রোলগুলোর কথা ভাবুন একবার। এটা তো আপনি নিশ্চয় মানবেন যে নাটকে একটা মাত্র ক্যারেকটার-এর বেশী স্কোপ থাকলে অন্য ক্যারেকটারের মোদ্দা জায়গাগুলোকে মিলিয়ে মিলিয়ে একটা নিট জিনিস খাড়া করা যায়। উঁ— ? ....এটাও আমি অ্যাডমিট করছি যে প্রত্যেক ক্যারেকটারেরই নিজের কিছু গোপন কথা আছে। সেগুলো প্রকাশ করতে দিলে ভালই হয়। ধরুন, যদি এরকম একটা ব্যবস্থা থাকতো যে প্রত্যেকটি ক্যারেকটার রিয়েলিটি দিয়েই কিম্বা ধরুন অডিএন্স-এর সামনে একঘন্টা লেকচার দিয়ে নিজের যা কিছু বলবার আছে, সব বলতে পারবে, তাহলে তো সবচেয়ে ভাল হতো। (ঠাট্টার সুরে)

কিন্তু ন্যাচারালিস্ট নাটকে তো চলে না। নাটক — নাটক। এ্যাঁ? আপনাকে আর একটু পেসেন্ট হতে হবে। .....বুঝেছেন তো, যদি শুধুমাত্র আপনার ক্যারেকটার-এর বিতৃষ্ণা, রাগ, ক্ষোভ, জ্বালা, যন্ত্রণা দেখাতে থাকি তাহলে অডিএন্স তো স্রেফ বোর ফিল করবে। তাই না? আর দেখুন, চটবেন না, আপনি নিজেই তো বললেন, আপনিও এমন কিছু গঙ্গা জলে ধোয়া তুলসীপাতা নন। ......ঐ বনোয়ারীলালের দোকানে এই ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হবার আগেই — আপনি তো ওই লাইনে নেমেছিলেন।

মেয়ে। (সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে) তা ঠিক। কিন্তু মনে রাখবেন, আমার জীবনের প্রথম থেকেই যা-কিছু ঘটেছে তার জন্য দায়ী উনিই—

ম্যানেজার। (বুঝতে না পেরে) তার মানে? প্রথম থেকেই যা কিছু ঘটেছে, তার জন্যে উনি দায়ী হলেন কি করে?—

মেয়ে। হ্যাঁ, উনি-ই। প্রথমে যে খারাপ রাস্তায় নামায়, বাকি জীবনের সমস্ত নোংরামির সমস্ত দায়িত্ব তো তারই। আমার জন্মের আগে থেকেই উনি আমার জন্যে এই নোংরা রাস্তা খুলে রেখেছিলেন — ওঁর দিকে তাকান, ওঁর বিচার করুন আপনারা—

ম্যানেজার। ও এই কথা বলছেন? কিন্তু তবু ভাবুন, সব ব্যাপারের সব দায় ঐ একজনের ঘাড়ে চালিয়ে দিলে সে বেচারাই বা করেন কি? ওঁকে অন্তত ওঁর কথাগুলো বলতে দিন। ওঁকে অ্যাকটিং করার চান্স দিন একবার।

মেয়ে। চান্স! কেন? যাতে উনি শুধু ওঁর বিবেকদংশন, আত্মগ্লানি, এইসব ফলাও করে দেখিয়ে শান্তি পান? ওঁর একশো বদমায়েশির একটাও লোকে জানবে না, আর ওঁর সমস্ত দোষের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যাবে? ওর বিবেক শুদ্ধ হয়ে গিয়ে উনি আবার ঝকঝকে ভাল মানুষ সেজে যাবেন? ....অন্তত একটা টুকরো ঘটনা আপনারা দেখান, যেখানে একটা বেশ্যা মেয়ের বুকের ওপর ....যে বেনী দোলানো ফ্রকপরা ফুটফুটে মেয়েকে দশ বছর আগে উনি রোজ ইস্কুল থেকে আসতে যেতে দেখেছেন—

[মা অত্যন্ত অভিভূত হয়ে বীভৎস চিৎকার করে ওঠেন। সবাই অভিভূত হয়ে যায়। দীর্ঘ বিরতি।]

(মা একটু শান্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে মেয়ে গম্ভীর আর দৃঢ়ভাবে বলতে থাকে) আজ পৃথিবীতে আমরা অজানা — কাল আপনারা আমাদের জীবন নিয়ে যা খুশী তাই নাটক করে সুনাম করবেন, টাকা পয়সা করবেন ....কিন্তু আজ তো আপনারা সত্যিকারের নাটক চান? সেই নাটকই চান তো যা সত্যি সত্যি হয়েছে?

ম্যানেজার। নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই চাই। অন্ততঃ আমি তো বাপু চাই-ই। মডার্ন লাইফের ওপরেই তো একটা স্টোরি আমি চাইছিলুম। ভালোই

হলো। দেখবেন, সমস্ত জিনিসটা তো চোখের সামনে রইল? এর পর ঢেলে ফেলে নিয়ে একখানা এ-গ্রেড নাটক খাড়া করে নেবো।

মা। (তীব্র চিৎকার করে) না, না না —আপনারা এ নাটক করবেন না। কোন দিন করবেন না, পায়ে পড়ি আপনাদের—

ম্যানেজার। না না না — আপনাদের নিয়ে যে নাটকটা ফাইন্যালি খাড়া করব সেটাতে এসব কেচ্ছাকাণ্ডের পুরো পোরসান্ বাদ দিয়ে দেবো।

মা। তবু না, এখন আর নয়, আমাদের ছেড়ে দিন। আমি আর কিছুতেই চোখের সামনে এই সব সহ্য করতে পারছি না — কিছুতেই পারছি না।

ম্যানেজার। বাঃ এইটেই তো রিআলিটি — মানে সত্যিই ঘটে গেছে — তাই-তো বললেন আপনারা — তাহলে — কি জানি বাপু, আমি কিস্যু বুঝতে পারছি না।

মা। আপনাদের কাছে সবটাই নাটক। কিন্তু আমি যে এ-নিয়ে প্রতিমুহূর্তের জ্বালায় জ্বলে পুড়ে মরছি, সব সময় আমি এসব দেখি ভাবি আর — ভাবি আমি পাগল হয়ে যাবো। এই বাচ্চা দুটোর দিকে তাকিয়ে দেখুন —এরাও তো সব দেখছে। এগুলো কি এদের দেখা ভালো? — অথচ এরা কেউ কিচ্ছু বুঝবে না —(মেয়েকে দেখিয়ে) ওই আমার শত্রু — পেটে ধরেছিলাম ওকে, খাইয়ে পরিয়ে এত বড়টা করে তুললাম হতভাগীকে — আর ও আমাকেই সহ্য করতে না পেরে চলে গেল বাড়ী ছেড়ে। আজ ও কি করে পেট চালায় আমি জেনেছি — ওকে আমি যে কেন আঁতুড় ঘরে নুন খাইয়ে মেরে ফেলিনি! হতভাগী! মরুক, মরুক — ও মরে যাক। আমার হাড় জুড়োক। — দোহাই আপনাদের, আপনাদের পায়ে পড়ি, এ নাটকটা করবেন না, তাহলে যতবার এগুলো আমি দেখবো ততবারই তো আমার বুকের আগুন হু-হু করে উঠবে। আপনাদেরও তো ছেলে মেয়ে আছে, মা হয়ে আমি আমার নিজের ছেলেমেয়েদের এই জ্বালা সইব কেমন করে বলুন?

বাবা। তবু এ নাটক হোক। আমি চাই এ নাটক হোক। এই কথাই মেনে নিন আপনারা — আমাকে অন্তত লজ্জা পেতে দিন। নিজেকে ধিক্কারে জর্জরিত হতে দিন একবার — কালের অনন্ত সমুদ্রের মাঝখানে একটি মুহূর্তের যে ভুল, তাই যদি আমার চরিত্রের একমাত্র সত্য হয়, তবে তাই হোক।

ম্যানেজার। হোক — তাহলে সিন্‌টা শেষ করে ফেলুন। ......আপনার আর ঐ মহিলার সিকোএন্সটা জমে উঠেছে এমন সময় ওর মা বকছেন, বনোয়ারীলালের কাছে ক'টা টাকা ধার করবার জন্য — হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন আপনাদের — এই তো? এইখানে ফার্স্ট সিন-এর কার্টেন। এ্যাঁ?

বাবা। তাই হোক। আমার শাস্তির শুরু হোক। আমাদের প্রত্যেকের

নাটকীয়তার পরিণতি ঘটুক ওর ওই আর্ত চিৎকারে।

মেয়ে। উঃ —এখনো কানে বাজছে মা'র সেই পাগল করা চিৎকার — কি ভয়ঙ্কর কি করুণ কি তীব্র আর্তি। .....তা হলে শুরু করি। আমি ছিলুম ঠিক এই রকম করে (বাবার কাছে গিয়ে তার বুকে মাথা রাখে) — ওঁকে ঠিক এইরকম করে ধরে — ঠিক এমনি — উনি আমাকে ভেতরের ঘরে টেনে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন হঠাৎ আমার বাঁ হাতের একটা নীল শিরা যেন খুব জোরে দপ্ দপ্ করে উঠল, অমার কেমন যেন ভীষণ ভয় করতে লাগল, আমার চোখ বুঁজে এলো — আমার মাথাটা ওঁর গায়ের উপর ঝুঁকে পড়ল — (মায়ের দিকে তাকিয়ে) চিৎকার করো মা, চিৎকার করো।

[মা ভয়ঙ্কর জোরে বীভৎস চিৎকার করে দু'জনকে আলাদা করে দেন। মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে লুটিয়ে পড়েন মাটিতে।]

ম্যানেজার। (ফুটলাইটের দিকে পিছু হাঁটে) আঃ —বিউটিফুল, বিউটিফুল (প্রম্পটারকে) কার্টেন — নোট করে হে ফার্স্ট সিনের কার্টেন — রিয়েলি সুপার্ব —বিউটিফুল —সত্যি খুব জমবে খু-উ-ব জমবে। এই খানটাতেই ফার্স্ট সিন-এর কার্টেন —

[ম্যানেজারের মুখে দু-তিনবার কার্টেন শুনে বদ্যিনাথ পর্দা টেনে দেয়।]

আরে কে রে, কে এ, মাইরী একেবারে পাঁঠার সন্তান —শালা বললাম, এইখানে ফার্স্ট সিনের কার্টেন পড়বে —শুনেই শুয়োরের বাচ্চা ঘড়্ ঘড়্ করে কার্টেন টেনে দিল। ধ্যুৎ—

[পরদা ফাঁক করে স্টেজ-এর ভেতরে ঢুকে যান। তখন তাঁর চেঁচানি শোনা যায়।]

কী মাইরি তোমাদের—

। দশ মিনিটের বিরতি।

[যখন পর্দা পুরো উঠে যায় তখন দেখা যাবে যে স্টেজের আসবাবপত্রের কিছু কিছু পরিবর্তন হয়েছে এবং চলেছে। স্টেজ-এর পেছনে কয়েকটা গাছ। দুপাশে দুটো উইংস, একটা কার্ণিশের কিয়দংশ দেখা যাচ্ছে। বড় ছেলে বসে আছে মার কাছ থেকে দূরে। তার মুখে রাগ, ক্লান্তি এবং লজ্জার চিহ্ন। অন্যান্য সবাইকে মঞ্চের বিভিন্ন অংশে দেখা যাচ্ছে।]

ম্যানেজার। (খানিকক্ষণ চিন্তার পরে) হুঁ। আচ্ছা। এবার সেকেণ্ড সিন। আমি বলছি খুব মন দিয়ে শুনুন। দেখবেন কি দাঁড় করাই।

মেয়ে। আমাদের বাবা হাসপাতালে মারা গেলেন — তার ঠিক একদিন পরে আমাদের তিন ভাই-বোন আর মা'কে (বাবাকে দেখিয়ে) উনি ওঁর বাড়িতে নিয়ে গেলেন।

ম্যানেজার। (অধৈর্য হয়ে) আপনি কাইগুলি মাথাটা একটু কম ঘামাবেন? — চা খাচ্ছেন, চা খান। ওহে বদ্যিনাথ, ওঁকে আর এক ভাঁড় চা দাও।

—বলছি তো, আমি যাচ্ছি। —আমার উপর সবটা ছেড়ে দিন — দিয়ে দেখুন—

মেয়ে। কিন্তু একথা যেন সবাই বুঝতে পারে যে অন্তত আমি ওঁর বাড়িতে আসতে চাইনি—

ম্যানেজার। (অধৈর্য হয়ে) আমি বুঝেছি রে বাপু, সব বুঝেছি। আমার সবকথা খেয়াল আছে, একথা ভুলে যাচ্ছেন কেন?

মা। (অনুনয়ের সুরে) দোহাই আপনার —একথাটা যেন স্পষ্ট বোঝা যায়, আমি সব সময় মনপ্রাণ দিয়ে চেয়েছি।

মেয়ে। (উদ্ধতভাবে বাধা দিয়ে) যাতে ওই ইডিঅটটার সঙ্গে ভাইবোনের সম্পর্ক পাতিয়ে আমরা ঐ বাড়িতেই টিকে থাকতে পারি। কী লাভ হলো? —এতেও কি ওরা বাঁচলো? আমি থাকতে পারলাম ওদের বাড়ীতে? এতেও কি তুমি ওর ভক্তি-ভালবাসা ফিরে পেলে?

ম্যানেজার। আমি শুধু একটা কথাই জানতে চাই —নতুন সিনটা আমরা করবো, না করবো না?

বাবা। হ্যাঁ শুরু করুন। —এই স্টেজে দাঁড়িয়ে প্রতি মুহূর্তে আমাদের মিথ্যে করে দেওয়ার শেষ অধ্যায়টা শুরু করতে চানতো? —আমরা ছ'জন যতো রিআল—

ম্যানেজার। আমরা ততো আর্টিফিসিআল —এই বলছেন তো?

বাবা। (রহস্যময় হাসি হেসে) বলছি, আপনাদের কাছে যেটা আর্ট আমাদের কাছে সেটাই রিআলিটি —

ম্যানেজার। তা হবে কেন? যা রিআলিটি তা সবায়ের কাছেই রিআলিটি। আপনাদের কাছেও যা আমাদের কাছেও তা। কিন্তু সেই রিআলিটিকে নিয়েই যখন আমাদের আর্টের কারবার করতে হয় —

বাবা। (ম্যানেজারের চেয়ারের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে) এক্সকিউস্ মি, আপনি ঠিক বলছেন না। ......আচ্ছা বলুন তো —আপনি কে?

ম্যানেজার। (হতভম্ব হয়ে) আমি কে? কেন? আমি —আমি ....আমি ...,আমার বাবার ছেলে......

বাবা। কিন্তু আমি যদি বলি তা সত্যি নয়। যদি বলি আপনি মোটেই আপনি নন। আপনি হলেন — আমি, আমার বাবার ছেলে—

ম্যানেজার। তাহলে আপনার মাথার ইস্ক্রুপ ঢিলে হয়ে গেছে—

[অভিনেতারা হেসে উঠে।]

বাবা। ঠিকই, হাসছেন আপনারা —এতে আমার কথাই প্রমাণ হয়। (ম্যানেজারকে) তাহলে আপনি যখন বলেন উনিই (প্রবীণ অভিনেতাকে দেখিয়ে) আমি, মানে আমার বাবার ছেলে —তখন আমি আপনাকে কি বলবো?

[অভিনেতারা হেসে উঠে।]

ম্যানেজার। (অপ্রতিভ হয়ে) কী গেরো। এসব কথা তো আগেই একবার হয়ে গেছে। —আপনি আবার রামসে শুরু করতে চান নাকি?

বাবা। তা কেন? আমি বলছি যে স্টেজের ওপর আপনাদের এই যে থিয়েট্রিক্যাল আর্ট না কী যেন —এটাকে কখনই রিআলিটি বলে প্রমাণ করতে চেষ্টা করবেন না। যদি করেন তাহলে বাধ্য হয়ে আমাকে আবার প্রশ্ন করতে হবে —আপনি কে?

ম্যানেজার। বোঝো ঠ্যালা আপনি মশাই কোথাকার কে এক ক্যারেক্টার ঢুকলেন আমারই থিয়েটারে। আগেকার রিহার্সালটার বারোটা বাজিয়ে দিলেন। বলেন, আপনারা নাকি নিজেরাই একটা নাটক এনেছেন। কিছুটা হলো কি হলো না —কনস্ট্যান্টলি কী সব কপ্‌চানি করে যাচ্ছেন .....আবার এখন আমাকেই হুকুম করে বলে বসেছেন, বলুন তো আপনি ....যদি বলি আমার বাবাই আপনার বাবা ......যতসব অফেনসিভ কথাবার্তা।

বাবা। আই বেগ টু ডিফার, স্যার। আমি একটা ক্যারেক্টার ......আর তাই, আপনাকে প্রশ্ন করতে পারি, দিস ইজ কোয়াইট এ পারটিনান্ট কেশ্চেন .....আমি বলেছি যাকে আপনারা আর্ট বলেন, তা রিআলিটি নয় ......কেননা কাল আপনি যা ছিলেন ....এক ঘন্টা পরে আপনি তা থাকবেন না ......এই মুহূর্তে স্টেজ-এ আপনারা যেটাকে সত্যি বলছেন, আর পনের মিনিট পর সেটাই হয়ে যাবে মিথ্যে........

ম্যানেজার। (ঠাট্টা করে) হরিবোল। তাহলে আপনার কথা হচ্ছে আপনাদের এই নাটকটাই হলো নির্ভেজাল রিআলিটি —

বাবা। (খুব গম্ভীরভাবে) আনডাউটেড্‌লি।

ম্যানেজার। আনডাউটেড্‌লি? বেশ। এই ভেবে যে বললেন আনডাউটেড্‌লি —তা বেশ ভালো করে ভেবে চিন্তে বলছেন তো?

বাবা। নিশ্চয়ই।

ম্যানেজার। আপনারা ছ'জন তাহলে আমাদের চেয়েও জ্যান্ত —মানে — আমাদের চেয়ে রিআল —এইতো?

বাবা। নিশ্চয়ই। কেননা আপনাদের রিআলিটি প্রত্যেক মুহূর্তে মিথ্যে হয়ে যায়, প্রতি মুহূর্তে আপনারা বদলান—

ম্যানেজার। তাহলে বলি মশাই। ঠিক ঐ একই কারণে —আপনাদের রিআলিটিও তো প্রত্যেক মুহূর্তে মিথ্যে হয়ে যায়। —প্রতি মুহূর্তে আপনারাও বদলান।

[অভিনেতারা হেসে ওঠে।]

বাবা। (চিৎকার করেন) না! না না। আপনারা কি কখনও বুঝবেন না যে, আমাদের ছকের রিআলিটি কখনও মিথ্যে হবে না —বিশ্বাস করুন আমাদের নাটক ঠিক যে রকম ভাবে তৈরি হয়েছে —তার বাইরে একপা নড়বার অধিকারই নেই আমাদের —আমরা কখনও বদলাব না —আপনারা সবাই আপনাদের রাগ ভালবাসা স্নেহ প্রেম মায়া মমতা —সব বিচিত্র অনুভূতির রঙে প্রতিমুহূর্তে রঙ বদলান, পারিপার্শ্বিকতা আপনাদের জোর করে পাল্টে দেবে —কখনো

কখনো নিজেদের বুদ্ধি দিয়ে আপনারা বোঝেন যে পুরো সমাজটাই পাল্টেযাওয়া উচিত, কিন্তু আমাদের কথা ভাবুন একবার, আমাদের এক্‌জিস্‌টেন্সটাই কী ভয়ঙ্কর নিদারুণ কী দুঃসহ......

প্রধান অভিনেতা। মিঃ ঘোষ, আমাকে একবার ডেন্টিস্ট-এর কাছে যেতে আপনি তো কালকেই বলেছিলেন আমাকে, পৌনে ন'টার সময় ছেড়ে দেবেন একবার?

ম্যানেজার। হ্যাঁ, এই দিচ্ছি, দিচ্ছি। মশাই, ঐ সব ভালো ভালো কথা এখন শিকেয় তুলে রাখুন, আমার আর্টিস্ট সব অধৈর্য হয়ে উঠছে। আপনি ঐ সব দার্শনিক বুলি আওড়াতে থাকলে তো আসল নাটকটাই লাটে উঠে যাবে।

বাবা। যাঁরা নিজেদের উপলব্ধির কথা খুলে বলেন না, তাঁদের কাছে আমার একার কথা তো নীরস দার্শনিক বুলি বলেই মনে হবে। এ-ও জানি, অনেকে মনে করেন, মনের বেদনা যন্ত্রণাকে লুকিয়ে রাখাই মানবিক। ....কিন্তু রিআলিটি কী প্রমাণ করে। মানুষ যখন দুঃখের আগুনে জ্বলে তখনই সে কথা বলে —মানুষ জানতে চায়। কেন দুঃখ? কিসের যন্ত্রণা? একথা কারো কাছে নীরস দার্শনিক বুলি বলে মনে হলে আমার কিছু করার নেই। নিজের সুখের কারণগুলো তো কখনই মানুষ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানতে চায় না, বলে না, ভাবে সুখে তার জন্মগত অধিকার। ......কিন্তু দুঃখ? পশুরা দুঃখ পায়; তারা কথা বলতে পারে না। তারা যন্ত্রণা সহ্য করে; কারণ তারা খোঁজে না। —কিন্তু মানুষ কি কখনো পশুর মতো চুপ করে থাকতে পারে? সে কি তার অতলান্ত মনকে তোলপাড় করে বেদনার কারণ খুঁজে ফিরবেনা? মানুষ কি কথা না বলে —কারণ না খুঁজে —শুধু 'মানবিক' থাকতে পারে?

ম্যানেজার। এ কী মশাই? আপনি যে শঙ্করাচার্যকেও হার মানাবেন দেখছি।

বাবা। আমার সমস্ত মন ....যে রক্তাক্ত বিবেকের নিদারুণ দংশন ....আমাকে যে পাগল করে দিতে চায়।

ম্যানেজার। তার আগে যে আমরা পাগল হয়ে যাবো। আমি তো বাপের জন্মে শুনিনি যে, কোন নাটকের কোন ক্যারেক্টার তার রোলের বাইরে এই রকম বড় বড় লেকচার ঝাড়ে —এতো ভ্যালা বিপদ হলো।

বাবা। আমরা যে চিনতে চাই নিজেদের। আমরা বাঁচতে চাই। আমরা সার্থক হতে চাই।

ম্যানেজার। (বাবাকে) ধ্যুর মশাই, যাই বলুন, কিছু মনে করবেন না —আপনি সময় সময় মাত্রা ছাড়িয়ে যান।

বাবা। আমি? কখন? কোথায়?

ম্যানেজার। কখন আবার। সব সময়ে। সারাক্ষণ ধরে —আর এই যে আপনার জোর করে বিশ্বাস করানোর চেষ্টা যে আপনারা ক্যারেক্টার — এটা ধামা চাপা দিন তো। সব সময় খালি তক্ক করছেন আর বড়

বড় বুলি ঝাড়ছেন। এই চললেই হয়েছে আর কি। আগের সিনে ঐ মহিলা খিঁক খিঁক করে হাসছেন তো হেসেই যাচ্ছেন —আবার এখন আপনি লেকচার মেরেই যাচ্ছেন।......এ রকম চললেই তো হয়েছে আর কি! নাটক হবে, না কাঁচকলা হবে। নাটক মানে অ্যাকশান —বুঝলেন —অ্যাকশান।

মেয়ে। আমার মনে হয় 'অ্যাকশান' বলতে আপনি যা বোঝাচ্ছেন সেটা এবার আপনি পাবেন। আমরা ওর বাড়িতে যাওয়ার পর একদিন আমার ওই ছোট ভাইটা ওঁর বন্দুক চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে যাবে। তারপর আবার একদিন ও সত্যি-সত্যিই চুরি করে আনবে বন্দুকটা—

ম্যানেজার। ও ব্যাপারটা মনে আছে আমার।—আচ্ছা আপনার ঐ বাচ্ছা বোনটি —ওর দু'একটা অ্যাকশান ঢোকান যায় না?

মেয়ে। হ্যাঁ। বাগানে অফুরন্ত রোদ —ও খেলা করবে। ওকে আমি দেখবো আর ভাববো —আবার ওর বয়সে ফিরে যেতে পারি না আমি? জীবনের এই ক'টা বছর মুছে ফেলে দিয়ে আবার গোড়া থেকে শুরু করে যায় না জীবনটাকে? তখন হঠাৎ মনে পড়বে (বাবাকে দেখিয়ে) ওঁর বাড়ীতে আসার আগের দিনগুলো —মা বাবার পায়ের কাছে মেঝেয় পড়ে ঘুমোচ্ছে —আর একপাশে আমরা তিন ভাইবোন —তখন বোনটি আমার এই নোংরা শরীরটাকে ওর নরম দুটো হাত দিয়ে জড়িয়ে আশ্চর্য শান্তিতে ঘুমোবে। আবার হঠাৎ-ই মনে পড়ে যাবে, হাজারীবাগে আমাদের সেই ছোট্ট সুন্দর বাড়িটা —বাড়িটার সামনে একটা ছোট্ট ফুলের বাগান —বাবার খুব শখ ছিল কিনা? —আমি যখুনি ইস্কুল থেকে ফিরতুম —দেখতুম বাবা বাগানে কাজ করছেন —'ওই দ্যাখো দিদি' —আর ও ছুটে আমার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে হৈ-হৈ করে উঠতো—

ম্যানেজার। ভেরি গুড। তাহলে পুরো সীনটাই হবে বাগানের ব্যাক-গ্রাউণ্ডে। আর বাকী সিকোএন্সগুলো ঘটবে বাগানের ডিফারেণ্ট পার্টে। ....ওহে মাখন, পেছনে বাগান আর ঐ পাশে কার্ণিশ, যেমন স্কেচ দিয়েছি তোমায়, এ্যাঁ? (পিছন দিকে তাকিয়ে) ও তুমি শেষ করে এনেছো প্রায় —ভেরী গুড। —ও কে স্টেডি। আচ্ছা (মেয়েকে) আচ্ছা, আপনার ঐ ভাইটি তাহলে ঐ বাগানেই থাকছে কেমন? আপনার ঐ ছোট বোনটির আপনার কোলে হৈ হৈ করে ওঠাটা স্টেজে দেখানো একটু মুস্কিল। —বুঝছেন তো, তখন তো আপনি স্কুলে পড়তেন —আপনার বাবা বেঁচে ছিলেন —আর,যেটা আমরা এখন দেখাচ্ছি সেটা তো নেহাৎই রিসেন্ট ঘটনা। এ্যাঁ? তাতে ইউনিটি অব টাইমটা ব্রেক করে যায়। (ছোট ছেলেটির মুখে আর্তভাব লক্ষ্য করে) বাঃ, এর সিনটা খুব জমবে। (ছোট ছেলেটির হাত ধরে একটা গাছের পেছনে নিয়ে যান) আচ্ছা তুমি

এখানটায় লুকিয়ে পড়তো। হ্যাঁ ঠিক এই রকম —আচ্ছা মুখটা একটু বাড়িয়ে একটু উকি মেরে এমন ভাব করো যেন কাউকে তুমি খুঁজছো। (পিছিয়ে এসে দৃশ্যটি দেখে) বিউটিফুল, বিউটিফুল হচ্ছে। (মেয়েকে) আচ্ছা এখানে যদি এরকম করা যায়, আপনার ঐ ছোট বোনটি পেছন দিক দিয়ে গিয়ে টপ করে ওর চোখ টিপে ধরবে —আর ও প্রথমটায় খুব ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যাবে —তারপরেই 'কেরে? এই ছেড়ে দে বলছি......'

মেয়ে। না —তা হবে না। ......এটা তো আমাদের হাজারীবাগের বাড়ির বাগান নয় —এটা ওঁর এখানকার বাড়ির বাগান। বোনটি কিছুই করতে পারবে না —ভাইও একটি কথাও বলবে না (বড়োছেলেকে দেখিয়ে) ও যতক্ষণ এখানে আছে, ততক্ষণ এদের দিয়ে আপনি একটাও কথা বলাতে পারবেন না —একটাও ভালো এ্যাকশান করাতে পারবেন না। ......ওকে তাড়িয়ে দিন, তারপর দেখুন, ওরা কেমন সহজ স্বাভাবিক হয়ে ওঠে—

ছেলে। (আনন্দে লাফিয়ে উঠে) খুব ভালো। আমি ত চলে যেতেই চাই। ....আমি চলে যাচ্ছি —(চলে যেতে থাকে)

ম্যানেজার। (ছেলেকে থামিয়ে) আরে, না না, আপনি কোথায় যাচ্ছেন? দাঁড়ান। দাঁড়ান দাঁড়ান।

[মা, ছেলে চলে যাচ্ছে ভেবে সন্ত্রস্তভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ান। এখানে দাঁড়িয়েই থেকেই তাকে বাধা দেবার ভঙ্গি করেন।]

মেয়ে। (ধীরে ব্যঙ্গের সুরে) ওকে কষ্ট করে আটকাতে হবে না। আপনি যা করছিলেন করুন না, ও এখান থেকে কিছুতেই যেতে পারবে না —

বাবা। তুমি এখান থেকে চলে গেলে চলবে কী করে? তোমার মা'র ক্যারেকটারই যে তাহলে মিথ্যে হয়ে যাবে—

ছেলে। (হঠাৎ দৃঢ়ভাবে গম্ভীর হয়ে) কে সত্যি, কে মিথ্যে তা প্রমাণ করার দায়িত্ব আমার নয়। আমি আগাগোড়া বলে আসছি আমি প্লে করবো না .....(আরো দৃঢ়তার সঙ্গে) আমি করবো না।

মেয়ে। (ম্যানেজারের কাছে গিয়ে) আপনি কিছু ব্যস্ত হবেন না। দেখবেন? ....আচ্ছা বেশ, তুমি চলে যেতে চাও তো? যাও —যদি পারো, চলে যাও। (ছেলেটি তার দিকে অবজ্ঞা ও ঘৃণার সঙ্গে তাকায় —মেয়েটি উপহাসের স্বরে বলে চলে) দেখছেন, ও এখানে থেকে চলে যেতে পারবেন না। ওর ক্ষমতা নেই। ওকে এখানে থাকতে হবেই। ও শিকলে বাঁধা। ওরা দু'জন মরে যাবার আগে আমি ওদের বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার আগে —ও কিছুতেই এখান থেকে নড়তে পারবে না। (মা'র দিকে তাকিয়ে) এসো মা, এদিকে এসো ....(আবার ম্যানেজারের দিকে তাকিয়ে) ঐ বড়ো ছেলেকে বুকে করে আগলে নিয়ে বেড়ানোর জন্যে মা যে কী ব্যাকুল, তার কতটুকুই

বা আপনারা বুঝতে পারছেন বলুন? ....ঐ দেখুন, আপনার নাটকের নতুন সীনটা শুরু হয়ে গেছে।

[সত্যিই মা ছেলের দিকে এগিয়ে যায়। মেয়ের কথা শেষ হওয়া মাত্র মা দু'হাত তুলে সম্মতি জানান।]

ছেলে। (হঠাৎ) না না। চলে যাবার ক্ষমতা আমার নেই, নেই। ....কিন্তু আমি প্লে করবো না, কিছুতেই করবো না।

বাবা। (উত্তেজিতভাবে ম্যানেজারকে) আপনি ওকে জোর করুন।

ছেলে। জোর করে আমাকে দিয়ে কেউ কোনদিন কিছু করাতে পারেনি, পারবেও না।

মেয়ে। একটু দাঁড়ান, এক মিনিট। ......তার আগে যে বোনটিকে ভাঙা কার্ণিশের আলশের ওপর খেলা করতে হবে। (দৌড়ে মেয়েটির কাছে যায়। তাকে আদর করে বলে) বোনটি, বোনটি, সোনা! তুই খুব ভয় পেয়েছিস না? ভাবছিস এ কোথায় এলাম? (ছোট মেয়েটির একটি প্রশ্নের জবাব দেবার ভান করে) এর নাম থিয়েটার। এখানে লোকেরা থিয়েটার করে বুঝলি। এখানে সবাই নিজেরা যা নয়, তাই দেখাতে চায়। আমরা এক্ষুণি একটা থিয়েটার করবো রে। এখানেই। তাতে তুইও আছিস। (ওকে তুলে বুকে জড়িয়ে বলতে থাকে) বোনটি, বোনটি সোনারে, তুই কী সর্বনাশা নাটকেই না অভিনয় করবি রে। তোকে যে ওরা কী ভয়ঙ্কর রোল-এর জন্যে বেছেছে তা যদি জানতিস। ......ঐখানটায় ....ঠিক ঐখানটায় একটা বাগান থাকবে .... আর ঐখানটায় ....একটা ভাঙা কার্ণিশ। কোন জায়গায়? ঠিক ঐখানটায়। .... না না, এখানে কিছুই সত্যি নয়, এখানে সবই শুধু মিথ্যে, সবই অভিনয়, এখানে সবই খেলা। ....কিন্তু খেলা যদি সত্যিই খেলা হতো সত্যিই তোর জন্যে একটা কার্ণিশওলা বাড়ির খেলনা থাকতো ....আর এমন একটা বাগান থাকতো, ...যেখানে তুই সারাদিন সোনালী রোদের মাঝখানে আপনমনে শুধু ....শুধু খেলা করতে পারতিস। ....তুই যখন পার্ট করতিস তখন সবাই ভাবতো, বাঃ বাঃ, বাচ্চা মেয়েটা বেশ সুন্দর পার্ট করছে তো। ....কিন্তু ....তুই নিজে যে সত্যি খেলার পুতুল নোস বোনটি, তুই যে রক্তমাংসে গড়া একটা বাচ্চা মেয়ে। একটা সত্যিকারের ভাঙা কার্ণিশ থেকে মাটিতে পড়লে ....(বাচ্চা মেয়েটাকে) তোর মা-ও তোকে ভালোবাসে না — নারে? মা ভালোবাসে এর বাইশ বছর পরে ফিরে পাওয়া বড় ছেলেটাকে। ....কিন্তু আমিও হয়তো তোকে বাঁচাতে পারতাম বোনটি ......ভাইকেও। (ছোট ছেলেটার একটা হাত ধরে কাছে টেনে আনে) বোকা কোথাকার? হদ্দ বোকা তুই। ওই লোকটার শোবার ঘর থেকে সাহস করে বন্দুকটা চুরি করতে পারলি, আর একটু সাহস করে লোকটাকে আর ছেলেটাকে গুলি করে মারতে পারলিনে?

ছোট ছেলেটা মুখ ফ্যাকাশে করে দিদির মুখের দিকে তাকায়। কিন্তু কোনো উত্তর দেয় না।

বোকা। (ছেলেটার গালে একটা চড় মারে) আত্মহত্যা করে কেউ? (বোনটির হাত ধরে, গম্ভীরস্বরে) আমি ওকে নিয়ে যাচ্ছি কেমন?

[ছোট মেয়েটিকে কার্ণিশের কাছে নিয়ে যায়।]

ম্যানেজার। বাঃ, বিউটিফুল, এই তো ডাবল অ্যাকশান হবে।

ছেলে। ডাবল অ্যাকশান মানে? ওর যা হয় হোক কিন্তু আমার কোনো রোল নেই (মা'কে দেখিয়ে) ওই ওই বিধবা মহিলাকেই জিজ্ঞেস করে দেখুন, আমি আজ পর্যন্ত ওর সঙ্গে একটাও কথা বলেছি কি না।

মা। হ্যাঁ। ওর জন্মের পর থেকে আজ পর্যন্ত আমার সাথে একটাও কথা বলেনি — (জোরে কেঁদে ওঠেন) আপনি শুধু ওকে একবার বলুন ....ও আমার সাথে কথা বলুক — আমার মনের সব কথা আমি ওকে খুলে বলতে চাই — বলুন — দোহাই আপনার ....(ম্যানেজারের পায়ে পড়ে কাঁদতে থাকেন)

বাবা। (ছেলের দিকে ক্রুদ্ধভাবে এগিয়ে) ইডিঅট। তোমার মা'র দিকে তাকাও। — বলো, কথা বলো।

ছেলে। (দৃঢ়ভাবে) আমি কথা বলবো না। আমি ওর সাথে কথা বলবো না।

[চারপাশে বিশৃঙ্খলা। মা ভীতভাবে উঠে এসে ওদের ছাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেন।]

বাবা। (ছেলের দুই কাঁধ ধরে ঝাঁকানি দিয়ে) তোমাকে বলতেই হবে। দেখতে পাচ্ছোনা, তোমার মা তোমার সাথে কথা বলতে চায় বলে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কাঁদছে। তুমি না তার ছেলে।

ছেলে। (বাবার বাহু ধরে) আমি বলেছি, আমি কথা বলবো না; আমি বলবো না।

মা। (অনুনয়ের স্বরে) ওগো ওগো, তোমরা এরকম কোরোনা, এরকম কোরোনা।

বাবা। (ছেলেকে ধরে রেখেই) বলো, কথা বলো।

ছেলে। (রেগে চিৎকার করে উঠে) কী হচ্ছে এসব পাগলামি। তোমার কী কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই — সবার সামনে নিজেদের ঘরের কেচ্ছা নিয়ে ঘাঁটাঘাটি করছো —? যা জেনেছি, জেনেছি ....আরো খারাপ কিছু যাতে জানতে না হয় সেই জন্যেই আমি ওদের কারো সঙ্গেই কথা বলতে চাই না, (মুখে চোখে ভয়ের ভাব ফুটে ওঠে। সে ইতস্ততঃ করতে থাকে) আমি বাগানে ....

ম্যানেজার। (আগ্রহের সঙ্গে এগিয়ে আসেন) হ্যাঁ বাগানে —

ছেলে। বাগানের মাঝখানে দাঁড়িয়েছিলুম —

ম্যানেজার। বলুন, বাগানের মাঝখানে দাঁড়িয়েছিলেন। তার পর?

ছেলে। (আর্ত চিৎকার করে) কেন, কেন, কেন? কেন আপনি জোর

করে জানতে চান?

ম্যানেজার। (ছেলেটির চোখের দৃষ্টি লক্ষ্য করে, সন্দিগ্ধভাবে) ঐ বাচ্চা মেয়েটি— ?

ছেলে। ঐ আলশেতে খেলতে খেলতে ভাঙা কার্ণিশ থেকে কেমন যেন —

বাবা। (কোমলসুরে, মাকে দেখিয়ে) তখন ওর মা ওর সঙ্গেই কথা বলবার জন্যে বাগানে এসে দাঁড়িয়েছে ওর পাশে —

ম্যানেজার। (উদ্বিগ্নভাবে ছেলেকে) তারপর, তারপর আপনি —

ছেলে। আমি দৌড়ে ওর কাছে গেলাম। ওকে তুলতে যাবো ....হঠাৎ এমন একটা জিনিস দেখলাম যে তাতে আমার বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল। ....ঐ, ঐ ওখানে ....ঐ ছোট ছেলেটা ওর বোনের হাত থেকে গড়িয়ে পড়া রবারের বলটাকে একটা লাথি মারলো — দেখি ও তাকিয়ে আছে ওর বোনের রক্তাক্ত মাংস-পিণ্ডটার দিকে — মনে হচ্ছে — ও পাগল হয়ে গেছে —

একটা বন্দুকের গুলির শব্দ — যেখানে ছোট ছেলেটি লুকিয়ে ছিলো, সেখান থেকে আসে।

মা। (একটা আর্তচিৎকার করে শব্দ লক্ষ্য করে ছুটে যান) আমার ছেলে। আমার ছেলে। (চার পাশে হৈ-চৈ-এর মাঝখানে মা'র গলা ছাপিয়ে ওঠে) ওকে বাঁচাও। ওকে বাঁচাও। ওকে বাঁচাও।।

ম্যানেজার। (দু'পাশের অভিনেতাদের দু'হাত দিয়ে সরিয়ে দিতে থাকেন। দু'জন অভিনেতা ছোট ছেলেটিকে বয়ে নিতে চলে যান) কী কী ব্যাপার। আওয়াজটা কিসের হোলো? —

মাখন। এখানে একটা বন্দুক। এখানে একটা বন্দুক পড়ে আছে।

ম্যানেজার। সে কী। বাচ্চা ছেলেটার লেগেছে নাকি?

প্রবীণ অভিনেতা। ছেলেটা মরে গেছে।

প্রধান অভিনেতা। না না, মরেনি — মরেনি — ও প্লে করছে।

প্রম্পটার। ইট'স্ নট রিয়েল।

বাবা। (প্রচণ্ড চিৎকার করে) ওঃ এক্সকিউস মি। দিস্ ইজ ফ্যাক্ট। দিস্ ইজ রিয়েল।

ম্যানেজার। ফ্যাক্ট। রিয়েল। একি থিয়েটার না ম্যাজিক? পাক্কা দু-ঘণ্টা নষ্ট। পাক্কা দু-ঘণ্টা।

পর্দা

ফুটবল

মূল নাটক : পিটার টার্সন

অতীতে

মঞ্চ পরিকল্পনা	॥	কুমার রায় ও রবি চট্টোপাধ্যায়
আলোক পরিকল্পনা	॥	কণিষ্ক সেন
রূপসজ্জা	॥	শক্তি সেন
নৃত্য পরিকল্পনা	॥	অসিত চট্টোপাধ্যায়
শব্দ গ্রহন	॥	হিমাদ্রি ভট্টাচার্য
শব্দ প্রয়োগ	॥	হিমাংশু পাল
পোষাক	॥	কেয়া চক্রবর্তী
মূকাভিনয় শিক্ষণ	॥	নিরঞ্জন গোস্বামী
গানের কথা	॥	গৌতম চৌধুরী সুতপা সেনগুপ্ত
প্রযোজনা সহযোগী	॥	পরিমল মুখোপাধ্যায় নিরঞ্জন পাল
নির্দেশনা সহযোগী	॥	কেয়া চক্রবর্তী ও অচিন্ত্য দত্ত
রূপান্তর-আবহ-নির্দেশনা	॥	রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত
১ম অভিনয়	॥	১০ই মার্চ, ১৯৭৭
১০০তম অভিনয়	॥	১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৮
২০০তম অভিনয়	॥	২০ শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮১
৩০০তম অভিনয়	॥	৫ই মে, ১৯৮৩

বর্তমানে

মঞ্চ	॥	সঞ্চয়ন ঘোষ
আবহ	॥	স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত
পোশাক	॥	সোহিনী সেনগুপ্ত হালদার
শব্দ প্রক্ষেপণ	॥	হিমাংশু পাল
আলো	॥	বাদল দাস
মঞ্চাধ্যক্ষ	॥	দেবশঙ্কর হালদার
অভিনয়	॥	২০০০

প্রথম অঙ্ক

দৃশ্যঃ ১

[খেলার মাঠ]

[তৃতীয় বেলের পরে আবহতে রেডিও সিগন্যাল। তারপর ঘোষণা:]

আকাশবাণী কোলকাতা, কোলকাতা ক-এর বিশেষ অধিবেশন শুরু হল। অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে ৪৪৭.৮মিটারে অর্থাৎ ৫৮০ কিলো হার্ডজে। এখন যুবভারতীতে অনুষ্ঠিত ইস্টবেঙ্গল বনাম মহামেডান স্পোর্টিং দলের প্রদর্শনী খেলার ধারাবিবরণী রিলে করে শোনানো হচ্ছে। ধারাবিবরণী দিচ্ছেন পল্লব বসুমল্লিক, প্রদীপ ব্যানার্জি, জয়ন্ত চক্রবর্তী। এখন আপনাদের নিয়ে যাচ্ছি যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে।

[খেলার মাঠের প্রচণ্ড কোলাহল। পর্দা খুলে যায়। এক এক করে দর্শক ফেন্স টপকে সামনে চলে আসে। এধার ওধার তাকায়। ডাকতে আরম্ভ করে।]

ক্রাউড ১। কালিদা।

ক্রাউড ২। কালিদা

ক্রাউড ৩। কালিদা (সুরে)

ক্রাউড। কালিদা কালিদা ও কালিদা।
কালিদা কালিদা ও কালিদা।
কালিদা কালিদা ও কালিদা।
কালিদা কালিদা ও কালিদা।

[কালিদা লাফিয়ে ওদের সামনে আসে। সকলে হৈ হৈ করে ওঠে। কালিদা ওদের শান্ত করে।]

ব্যোমকালি। আমার নাম কালি, লোকে বলে ব্যোমকালি। এইসব দেখছেন ফুটবল পাগলার দল, সব আমার সার্গিদ। আমি ওদের গুরু। কিরে ভোম মেরে আছিস কেন? ধর্। আপনারা শুনুন কেমন করে ওরা নিজেদের টিমকে জেতায়। লড়ে যাও, লড়ে যাও ভায়েরা।

ক্রাউড। (গান) ইস্টবেঙ্গলের গ্যালারি পরে
কত তরুণ কিশোর গদীয়ান।
গাহো সবে মুক্ত স্বরে।
কত বাইচুং তুষারের ঘামের দাগে
ইডেনের মাঠ হলো স্বর্ণপ্রভা,

গাহো সবে মুক্ত স্বরে।
ইস্টবেঙ্গলের গ্যালারি পরে,
সস্তা সবুজ এই গ্যালারি পরে
কত তরুণ কিশোর গদীয়ান
গাহো সবে মুক্ত স্বরে।

ব্যোমকালি। চুপ রে চুপ। আমি এদের গুরু। এদের সব্বার—ঐ যে চুল উস্কো খুস্কো সারা গায়ে ঘাম,চোখগুলো উত্তেজনায় চক্‌চক্ করছে হাজারো নওজোয়ান ওদের সব্বার। আমায় ওরা কাঁধে তুলে নেয়, নাচে তারপর; আমিই শুরু করি ঃ এ—এ—এ—

ক্রাউড। ব্যোমকালি ব্যোমকালি ব্যোমকালি ব্যোমকালি
ব্যোমকালি ব্যোমকালি ব্যোমকালি ব্যোমকালি
ব্যোম ব্যোম ব্যোম, কালি কালি কালি
ব্যোম ব্যোম ব্যোম, কালি কালি কালি
ব্যোম ব্যোম ব্যোম, কালি কালি কালি
ব্যোম ব্যোম ব্যোম, কালি কালি কালি
ব্যোমকালি ব্যোমকালি ব্যোমকালি
ব্যোমকালি ব্যোমকালি ব্যোমকালি
—এ—এ—এ—

ব্যোমকালি। মাঠে যখন আমাদের টিম নামে, প্লেয়াররা সবাই একবার এদিকে তাকিয়ে নেয়। ওরা জানে আমি এখানে আছি আর আছে হাজার নওজোয়ান। অপনেন্ট টিম আমাদের ভয় করে। প্রথমেই ওদের গোলকি'কে আওয়াজ।

[সিটি এবং অন্যান্য আওয়াজ করে ক্রাউড।]

ওদের কোনও প্লেয়ার একটু বেগোড়বাঁই করলেই আমরা স্ট্যান্ড স্টিল। শিকারের গন্ধ পাওয়া নেকড়ের মতন।

ক্রাউড। (সুরে) হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ
বের করে দাও, বের করে দাও, বের করে দাও,
বের করে দাও, বের করে দাও, বের করে দাও,
বের করে দাও, বের করে দাও, বের করে দাও,
বের করে দাও, বের করে দাও, বের করে দাও,
বের করে দাও।

ব্যোমকালি। লাইন্‌স্‌ম্যান আমাদের গোল অফসাইড করে দিলে তারও জান কয়লা। **[ক্রাউড চিৎকার করে।]**

ক্রাউড ১। আবে এ শালা লাইন্‌স্‌ম্যান, শালা ঘুষ খেয়েছিস নাকি বে।

[ক্রাউড চিৎকার করে ওঠে।]

ক্রাউড ২। আবে শালা বউ আজ রাতে বিধবা হবে।

[ক্রাউড চিৎকার করে ওঠে।]

ক্রাউড ৩। আবে এই লাইন্‌স্‌ম্যান পালটাও।

ক্রাউড। (সুরে) লাইন্‌স্‌ম্যান পালটাও, লাইন্‌স্‌ম্যান পালটাও, লাইন্‌স্‌ম্যান পালটাও, লাইন্‌স্‌ম্যান পালটাও, লাইন্‌স্‌ম্যান পালটাও, লাইন্‌স্‌ম্যান পালটাও, লাইন্‌স্‌ম্যান পালটাও।

ব্যোমকালি। আমাদের টিম হারতে থাকলে ভোলাবাবার চরণে বডি থ্রো—

ক্রাউড ১। পার করেগা পার করেগা ভোলেবাবা পার করেগা।

ক্রাউড। (সুরে) পার করেগা পার করেগা ভোলেবাবা পার করেগা, পার করেগা পার করেগা ভোলেবাবা পার করেগা, পার করেগা পার করেগা ভোলেবাবা পার করেগা, পার করেগা পার করেগা ভোলেবাবা পার করেগা।

ব্যোমকালি। রেফারিকে পটানোর চেষ্টা করি দরকার পড়লে—

[ক্রাউড চিৎকার করে ওঠে—]

ক্রাউড ১। আবে এই রেফারি তুই শালা ক' বাপের ব্যাটা বে?

[ক্রাউড চিৎকার করে ওঠে—]

ক্রাউড ২। আবে শালা রেফারি, চোখে কি গুঁজেছিস বে?

[ক্রাউড চিৎকার করে ওঠে—]

ক্রাউড ৩। আবে শালা কর্নার হয়েছে বে, কর্নার।

ক্রাউড। (সুরে) কর্নার— কর্নার— কর্নার— কর্নার— কর্নার—কর্নার— কর্নার—কর্নার—কর্নার—কর্নার—কর্নার—

ব্যোমকালি। আর ভাল্ কথায় কাজ না হলে রেফারির বাপের শ্রাদ্ধ।

ক্রাউড। (সুরে) বাবা কে তোর বাবা কে তোর
বাবা কে তোর রেফারি
বাপ নেই ঘরে বাপ নেই ঘরে
বেজন্মা তুই রেফারি
বেজন্মা তুই বেজন্মা তুই বেজন্মা তুই রেফারি
বেজন্মা তুই বেজন্মা তুই বেজন্মা তুই রেফারি।।

ব্যোমকালি। এমনিভাবে আমরা জেতাই আমাদের টিমকে।

[খেলা শেষ হবার বাঁশী।]

খেলা শেষ, আমরা জিতেছি, আমরা জিতিয়েছি আমাদের টিমকে। পৃথিবীতে আমাদের চেয়ে সুখী কে? এবার যাব টেন্টে। চা ওমলেট প্যাঁদাবো, রাজার বাচ্চা প্লেয়ারদের গ্যাস দেব—তারপর রাস্তায়— অপনেন্ট টিমের সাপোর্টাররা উল্টো পাল্টা বাতেলা করলেই পড়বে ঝাড়।

[ক্রাউড সমর্থন করে।]

ওই আসছে আমার এক চামচা। আমার নিজেরও বহুৎ সাপোর্টার আছে। ওই হরি তাদেরই একজন। কি রে হরি!

হরি। কেয়া বাত কালিদা?

ব্যোমকালি। হ্যাঁরে তুই আমার সাপোর্টার তো?

হরি। জরুর কালিদা। নিশ্চয়ই।

ব্যোমকালি। রিভাল্ভোর একটা অটো নিবি? চল্লিশ টাকা লাগবে।
হরি। আমি স্টুডেন্ট কালিদা, চল্লিশ টাকা কোথায় পাব?
ব্যোমকালি। কেন, খবরের কাগজ বেচে কিছু হচ্ছে না?
হরি। সে আর, ক'পয়সা? চলি কালিদা।
ব্যোমকালি। আয়। সামনের শনিবার মহামেডানের সঙ্গে দেখা হবে।
হরি। হ্যাঁ—হ্যাঁ—
কোরাস। (সুরে) হেই হেই হেই হেই হেই হেই
সব খেলার সেরা বাঙালির তুমি ফুটবল
সব দলের সেরা আমাদের আমাদের
আমাদের—ইস্টবেঙ্গল।
সব খেলার সেরা বাঙালির তুমি ফুটবল।
[দ্বিতীয় পর্দা পড়ে যায়।]

দৃশ্য ঃ ২

[হরির পরিচিতি]

ব্যোমকালি। বৃহত্তর কলকাতায় কিশোর তরুণদের সংখ্যা কম করে আঠারো থেকে বিশ লাখ, এদের একটা বিরাট অংশ যারা বাস করে কলোনিতে বস্তিতে গলিতে, যাদের জীবনের কোনও লক্ষ্য নেই, ফুটবলকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে আছে—মানে নিজেদের বেঁচে থাকাকে অর্থপূর্ণ করে রেখেছে। এই বিরাট সংখ্যার কিশোর তরুণদের একজন প্রতিনিধি হরি পুরকায়স্থ। হরি পুরকায়স্থর জীবন বৃত্তান্ত খুবই সহজ সরল—খুবই সাদামাটা।

হেডমাস্টার। আমি হেডমাস্টার। হরি পুরকায়স্থ আমার স্কুলে পড়ে। আর পাঁচজন সাধারণ ছাত্রের মতই হরি—মাথায় গোবর পোরা। ও ক্লাস সিক্সে যা জানত এখনও তার চেয়ে বিশেষ অগ্রসর হয়নি। ও! ছোকরা বড্ড পেনসিলের ডগা চোযে। Mother Complex এর Case। মনে হয় আবাল্য মাতৃস্নেহবঞ্চিত।

ক্লাস টিচার। আমি হরিদের ক্লাস টিচার। হরি—হরি যখন ক্লাস নাইনে পড়ত তখন ভগ্নাংশটা ভালই পারত, দশমিকটা কিছুতেই পারত না, এখন দশমিকটা পারে, ভগ্নাংশটা ভুলে গেছে। মানে একসঙ্গে একটার বেশি জিনিস মাথায় রাখতে পারে না—Case of one track mind.

স্পোর্টস টিচার। কেমন চলছে দাদা?
ক্লাস টিচার। এই চলে যাচ্ছে আর কি।
স্পোর্টস টিচার। হ্যাঁ, আমাদের মত লোকের চলে গেলেই হল। আমি হচ্ছি স্কুলের ফিজিক্যাল মাস্টার। হ্যাঁ, কি কথা হচ্ছিল?—হ্যাঁ, হরির কথা....। হরি...হরি খুব সিগারেট খায়—এক্কেবারে দম নেই। আর আমার

ডেফিনিট বিশ্বাস ওর আরও সব বদ দোষ আছে—মানে সব যা-তা দোষ— এক্কেবারে সংযম নেই...এন.সি.সি. প্যারেডের সময় ঘুমায় ছোকরা।

সংবাদপত্র বিক্রেতা। হ্যাঁঃ, যত্তো সব বাজে কথা! ঐ মাস্টার ফাস্টার ফালতু। ওদের কথা শুনবেন না। দিনরাত বকর-বকর, জ্ঞান আর খালি টিউশনি বাগানোর ধান্ধা। হরি—হরি বেশ ভালো ছেলে। ও আমার হয়ে কাজ করে। মানে, আমি হচ্ছি বুঝলেন কিনা, পাতিরামের—পাতিরাম—ঐ যে খবরের কাগজের এজেন্ট, সেই পাতিরামের সাব এজেন্ট গোছের। একটা টেম্পো ভ্যান আছে আমার, সেই ভ্যানে করে ভোরবেলায় সব কাগজ—আনন্দবাজার, টেলিগ্রাফ, প্রতিদিন, স্টেটসম্যান, বর্তমান, গণশক্তি, বসুমতী, দেশ, সানন্দা, সুখী-গৃহকোণ এইসব নিয়ে আসি—তারপর সব হকাররা আমার কাছ থেকে নিয়ে সেগুলো গোটা অঞ্চল জুড়ে বিক্রি করে। হরিও আমার একজন হকার—আমার বাড়ির কাছেই কলোনিতে থাকে। বেশ ভাল রোজগার করে ছোকরা। মানে ৭০০-৮০০ টাকা কামায়। খাটতেও হয় খুব। ধরুন ভোর ৫ টায় ওঠে, তারপর কাগজ নিয়ে পাঁচ-সাত মাইল ঘোরে, ইস্কুলে গিয়ে ঘুমটা পুষিয়ে নেয়। ভালো ছেলে, বেশ ভালো ছেলে হরি।

[হরি ঢোকে]

এই যে হরি!

হরি। বলুন ফণী দা।

সংবাদপত্র বিক্রেতা। একটা উপকার করে দেবে?

হরি। বলুন।

সংবাদপত্র বিক্রেতা। কাজটা—ইয়ে একটু ঝামেলার।

হরি। বলুন না আপনি।

সংবাদপত্র বিক্রেতা। তোমার ঝোলায় জায়গা আছে?

হরি। হ্যাঁ হ্যাঁ। কি ব্যাপার?

সংবাদপত্র বিক্রেতা। এই প্যাকেটটা—ন'পাড়ার মোড়ের নতুন হলদে বাড়িটা আছে না—সেই বাড়ির বুড়োকর্তাকে দিয়ে দিও। স্টেটসম্যান নেয় তো ওরা।

হরি। হ্যাঁ।

সংবাদপত্র বিক্রেতা। তার মধ্যে লুকিয়ে দিয়ে দিও। আর ইয়ে—তুমি প্যাকেটটা খুলো না, মানে খারাপ বই, ঐ রসের বই—হেঁ হেঁ—ঠিক আছে তাহলে?

হরি। ঠিক আছে।

সংবাদপত্র বিক্রেতা। কাল দেখা হবে।

হরি। হ্যাঁ। শুয়োরের বাচ্চা!

সংবাদপত্র বিক্রেতা। হরি!

হরি। আপনি কি বলছেন?

সংবাদপত্র বিক্রেতা। তুমি কিছু বললে?

হরি। নাঃ। শুয়োরের বাচ্চা। [**হরির প্রস্থান।**]

সংবাদপত্র বিক্রেতা। হরির একটা ভালো—মাসি আছে—চুম্বকের মতো—না তাকিয়ে পারা যায় না—বেশ খেলোয়াড় টাইপ—যে কোনও লোকের টক্কর নিতে পারে। লড়াক্কু আছে।

দৃশ্য ঃ ৩

[**হরির বাড়ি।**]

মাসি। (গান) আগে যদি জানতাম আমি
যাইবারে ফালাইয়া
দুই চরণ বাইন্ধা রাখতাম
মাথার কেশ দিয়া—

[**হরির প্রবেশ।**]

কিরে খেলা দেখে এলি? মুখখানা একেবারে শুকিয়ে গেছে। যা, হাতমুখ ধুয়ে আয়। পায়েস করেছি তোর জন্য।

হরি। এক্ষুণি বেরোব। খেতে ইচ্ছে করছে না আমার।

মাসি। কি ব্যাপার, তোদের দল হেরেছে বুঝি আজ?

হরি। এঁঃ। অত সস্তা নয়। এক গোলে জিতেছি।

মাসি। কে গোল করল, বাইচুং?

হরি। বাইচুং চলে গেছে।

মাসি। চলে গেছে, কোথায়?

হরি। লন্ডনে।

মাসি। আহারে অমন সুন্দর দেখতে—লন্ডনে চলে গেল?

হরি। সুন্দর দেখতে—মানে?

মাসি। তোর কাছে একটা ছবি দেখেছিলাম। সুন্দর দেখতে—বেশ পুরুষ মানুষের মতো। আচ্ছা তোর সঙ্গে আলাপ নেই ওদের?

হরি। কাদের?

মাসি। ঐ যারা ফুটবল খেলে।

হরি। ওরা সব রাজার বাচ্চা, মুর্গি খায়, রোজ এরোপ্লেনে করে বম্বে দিল্লি যায়, চাকরির জায়গায় সই করে এলেই চলে, হেভি র‍্যালা—ওরা আমাদের পাত্তা দেবে কেন?

মাসি। ও হরি, যাবার আগে রেশনকার্ডটা জমা দিয়ে যাস—কেরোসিন ফুরিয়েছে।

হরি। আমি পারব না—দেরি হয়ে যাবে।

মাসি। আচ্ছা তোদের আক্কেল কি বলতো? আমি একা মেয়েলোক—হাট-বাজার-দোকানপাট সব তো আমি করছি। দুধ আমি আনব—রেশন আমি তুলব—কেরোসিন আমি আনব। বড় হচ্ছিস, ঘর-সংসারের

কাজ যদি একটু না দেখিস, একা হাতে আমি তো আর পারি না বাবা।

হরি। আচ্ছা আচ্ছা হয়েছে, কাল সকালে যাবখন। দাও পায়েস দাও।

মাসি। আনি, হ্যাঁরে মেয়েরা খেলা দেখতে যায় না?

হরি। অনেক মেয়ে যায়। আমাদের সঙ্গেই তো কত মেয়ে যায়!

মাসি। আমাকে একদিন নিয়ে যাবি মাঠে?

হরি। তোমরা কি দিন দিন মাথা খারাপ হচ্ছে মাসি?

মাসি। ঠিক আছে আমি একা যাব। সামনের শনিবারেই যাব। বাইচুং খেলবে সেদিন?

হরি। বললুম না দল ছেড়ে চলে গেছে।

মাসি। আচ্ছা তুই ফুটবল খেলতে পারিস না? তাহলে বেশ হত; তোর ল্যাজে ল্যাজে মাঠে যেতাম...বম্বে দিল্লী যেতাম... বাইচুং টাইচুংদের সঙ্গে আলাপ হত!

হরি। আমি খেলতে পারি না, খেলা দেখি।

দৃশ্য ঃ ৪

[হরির ক্লাশ]

[ক্লাশ শুরুর ঘণ্টা বাজে। ছাত্রেরা হৈ হৈ করতে করতে ক্লাশে প্রবেশ করে। শিক্ষক প্রবেশ করলে সবাই উঠে দাঁড়ায়।]

শিক্ষক। বসো। আমি খেলতে পারি না, খেলা দেখি। এটা কি ধরণের মনোভাব আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না। তোমাদের অধিকাংশের এই এক এ্যাটিটুড। শুধু দেখব, কিছু করবনা! ছাদে বসে চাঁদ দেখব, বারান্দায় বসে ট্রাম-বাস দেখব, রকে বসে—রকে বসে...

[একজন ছাত্র হাত তুলল।]

কি ব্যাপার?

ছাত্র। একটু জল খেতে যাব স্যার?

শিক্ষক। যাও। আমি...আমি...এই পরে যাবে বোসো। সত্যি আমি কিছুতেই ভেবে পাই না, গ্যালারিতে বসে বসে খেলা দেখে আর হ্যা হ্যা করে কি আনন্দ পাও।

হরি। বুঝবেন না। আপনি বুড়ো হয়ে গেছেন।

শিক্ষক। কে? কে? কে বললে? তুমি...হরি...কি বললে? কি বললে?

হরি। আপনি বুড়ো হয়ে গেছেন।

শিক্ষক। কে? কে? কে? বললে? তুমি...হরি...কি বললে? কি বললে?

হরি। আপনি বুড়ো হয়ে গেছেন

শিক্ষক। স্যার বলো হরি!

হরি। সার।

শিক্ষক। হুঁঃ। ভালো কথা, হরির লেখাটাই গোড়াতে পড়া যাক। হরিকে

বলেছিলাম, ওর প্রিয় বিষয় নিয়ে একটা রচনা লিখতে। স্বভাবতই হরির প্রিয় বিষয় ফুটবল—দর্শকের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লেখা। তাহলে শোনা যাক ফুটবলের মহাকাব্য! পড়ো, পড়ো হরি।

হরি। [পড়ে] ইস্টবেঙ্গল কি এবার মনোবল হারিয়ে ফেলেছে? সাপোর্ট যদি জোরদার হয়, তাহলে কি মনোবল ফিরে আসবে? সে বিষয়ে সাপোর্টাররা কেউ পিছপাও নয়। তারা প্রাণপণে ইস্টবেঙ্গলকে সাপোর্ট করে যাবে। আমার মনে হয় ইস্টবেঙ্গল আবার চ্যাম্পিয়ন হবে।

১ জন ছাত্র। সব দলের সেরা আমাদের

শিক্ষক। কে?

অন্যছাত্র। আমাদের

শিক্ষক কে? কে?

ঐ দু'জন ছাত্র। আমাদের ইস্টবেঙ্গল।

শিক্ষক। আস্তে, আস্তে, আস্তে—

ছাত্রদল। সব দলের সেরা আমাদের,
আমাদের, আমাদের ইস্টবেঙ্গল।
সব খেলার সেরা বাঙালির
তুমি ফুটবল।।

শিক্ষক। পরিবেশ, বাড়ির পরিবেশ, বুঝলেন। আমি একা কি করতে পারি? আমার তো হাত-পা বাঁধা। বেত লাগানো বন্ধ! যদিও বা মারি, গার্জেনরা ছুটে আসে: 'কেন বেত মারলেন?' হোম-টাস্ক দিয়ে কোনও লাভ নেই, কেউ করবেনা। শুনছি শিক্ষাব্যবস্থার আমূল সংস্কার হবে; সে যদ্দিনে হবে তদ্দিনে আমার সৎকার কম্‌প্লিট্ হবে। আসলে বাড়ির পরিবেশ, বুঝলেন! এই হরির কেসটাই ধরুন না! মাসির কাছে মানুষ, মাসি রোজ নতুন নতুন লোক জোটায়। অভাবে শুরু করেছিল, এখন স্বভাবে এসে দাঁড়িয়েছে। Veritable Sex Maniac। হরিকে কাটিয়ে দেওয়ার জন্য টাকা দেয় ওকে, গাদা গাদা টাকা। ছোঁড়ার মাথার ওপর কোনও গার্জেন নেই। ওর বাবা — বাবা সেই Party-র আকচা-আকচিতে খুন হয়ে গেল—তারপর থেকেই...

একজন ছাত্র। বাবা কে তোর, বাবা কে তোর,
বাবা কে তোর রেফারি—

ছাত্রদল। বাপ নেই ঘরে, বাপ নেই ঘরে,
বেজন্মা তুই রেফারি,
বেজন্মা তুই, বেজন্মা তুই, বেজন্মা তুই রেফারি,
বেজন্মা তুই, বেজন্মা তুই, বেজন্মা তুই রেফারি।।
বেজন্মা তুই, বেজন্মা তুই, বেজন্মা তুই রেফারি।।

দৃশ্য ঃ ৫

[হরির বাড়ি]

হরি। মাসি, মাসি, খেতে দাও মাসি—

মাসি। কি হ'ল তোদের খেলার?

হরি। জিতেছি আমরা। খেতে দাও।

মাসি। কে গোল দিল?—বাইচুং?

হরি। সেদিন বললাম তো বাইচুং লন্ডনে চলে গেছে। খেতে দাও।

মাসি। খাবার তো এখনও কিছু করিনি রে?

হরি। বাঃ

মাসি। মুড়ি আছে, খানিকটা মেখে দেবো?

হরি। মুড়ি?

মাসি কিম্বা বাইরে থেকে খেয়ে আয় না, টাকা দিচ্ছি তোকে। খেলা দেখে এলি, এতটা ধকল, যা বাইরে থেকে ভাল-মন্দ কিছু খেয়ে আয়।

হরি। কে এসেছে আজ বাড়িতে?

মাসি। কেউ না, কেউ না..........না ইয়ে হ্যাঁ, তোর অরুণ মামা, অরুণ মামাকে মনে নেই তোর?

[অরুণ মামার প্রবেশ।]

হরি। অরুণ মামা! কই না, তো!

মাসি। সেকি রে অরুণ মামাকে মনে পড়ছে না?

হরি। নাঃ।

মাসি। তা অবশ্য মনে না থাকতেই পারে। অরুণদা শেষ যেবার এসেছিল তখন তুই এতটুকু। তাই না অরুণদা?

অরুণ। হ্যাঁ, তখন ও এই এতটুকু।

মাসি। তোর অরুণ মামা ব্যবসার কাজে বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়ায় তো।—ইয়ের ব্যবসা.......সে জন্য আর আসতে পারেনা, তোকে ছোটবেলায় খুব ভালবাসত। এসেই তো তোর খোঁজ করছিল, তা তুমি ওকে কিছু কিনে দেবে বলছিলে না? তা ওর হাতে টাকাটা দিয়ে দাও না, ও নিজেই কিনে নেবে।

অরুণ। হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই, এই যে কৃষ্ণ।

হরি। আমার নাম হরি।

অরুণ। অ্যাঁ, হ্যাঁ, ঐ একই হোল, যে হরি সেই তো কৃষ্ণ। নাও।

মাসি। নে না, নে। মামা হয় তোর, বোকা ছেলে, নে।—কাল তো ইস্কুল নেই তোর? নাইট শোয়ে সিনেমা দেখবি নাকি, দেরি হলে তোর দিদির ওখানেই থেকে যাস। অত রাতে আর হেঁটে হেঁটে বাড়ি ফেরার দরকার নেই। ওখানেই থাকিস্। তাহলে তোর খাটটায় অরুণদাকে বিছানা করে দেব, ও আজ রাতে থাকবে তো। অরুণদা তোকে খুব ভালবাসত, আগে প্রায়ই আসত আমাদের বাসায়। তোর

বাবা নেই তাই.....

[নেপথ্যে—এ 'বাবা কে তোর' গানটি]

দৃশ্য ঃ ৬

[বিনয় এবং অণিমার বাড়ি]

ব্যোমকালি। আমাদের হরির এক দিদি আছে—অণিমা, বেশ ভালো মেয়েছে—বেশ ভালো ভদ্রমহিলা, বেশ ঝকঝকে, ওদের বাড়িটাও খুব ঝকঝকে, অনেকটা ভিমের বিজ্ঞাপনের মতো, টুয়েন্টি-ফোর আওয়ার ঝকঝক জ্যোতি ছাড়ছে। বাড়িতে ফ্যান, ফোন, ফ্রিজ, রেডিও, এমনকি টেলিভিশন ওয়াশিং মেশিন ইনস্টলমেন্ট কেনা একটা টেলিভিশনও আছে। আর অনেক ফুল—সব প্লাস্টিকের, কিন্তু দেখে বোঝা যায় না। অণিমার স্বামী বিনয়—সেও অনেকটা বিজ্ঞাপনের মতো—দাঁত কোলগেট, মুখ বোরোলিন, চুল ব্রিলক্রিম, পোশাকপত্তর সিয়ারামস। আর হেভী কাজের লোক, সেই একটা ক্লাশ আছে না—ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে শুয়োরের মতো দৌড়চ্ছে—দরদর করে ঘাম, পাঁই পাঁই করে ছুটছে। কি করে এক খাবলা সুখ ম্যানেজ করা যায়—আর খুব বাতেলা— always জ্ঞানমার্গের চর্চা—sociologically speaking —খুব Boring Father Type...........আমি এক সময়ে লেখাপড়া শিখেছিলুম, ইউনিভার্সিটির খাতায় নামও লিখিয়েছিলুম—আর তখন তো আজকালকার মতো টুকে পাশের রেওয়াজ ছিল না—এসব ছোকরাদের সঙ্গে মিশি বটে......মাঝে মাঝে পুরোনো খানদানি হ্যাবিট স্লিপ করে বেরিয়ে আসে। যাকগে, ও সব আমার Personal কেচ্ছা...অণিমার কথা হচ্ছিল...অণিমা খুব ভালো মহিলা, লেখাপড়ায় বেশ ভালো ছিল, দেখতেও ভালো ছিল, তার অনেক স্বপ্ন ছিল—এখনও আছে বোধহয়। অল্প বয়সে অণিমা একবার T.V-র দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রেমে পড়েছিল।

[অণিমার প্রবেশ।]

অণিমা। Hello প্রিয় FM Channel.

একটা সমস্যায় পড়েছি—আমার স্বামীকে নিয়ে। যখন আমার প্রেমে পড়েছিল তখন রোজ সকালে একটা টু-সিটার গাড়ি হাঁকিয়ে কলেজের সামনে এসে দাঁড়াত, তারপর ক্লাশ কেটে ওর গাড়িতে করে শহর ছাড়িয়ে অনেক দূরে চলে যেতাম আমরা—আজ ভিক্টোরিয়া, কাল গান্ধীঘাট, কোনওদিন ডায়মণ্ড হারবার, প্রচণ্ড জোরে গাড়ি চালাত, চুলগুলো হাওয়ায় উড়ত ওর, আর গলা ছেড়ে আবৃত্তি করত : পথ' বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি......

—এত ভাল লাগত, ঠিক সিনেমার মতো লাগত। বিয়ের পর সব

বন্ধ। এখন গাড়ি চালানো ছেড়ে গাড়ি সারানো ধরেছে, একটা মোটর গ্যারেজ বানিয়েছে, শুধু কাজ আর কাজ। সবসময় এমন কি খুব, খুব রোমান্টিক মুহূর্তেও ওর কান খাড়া টেলিফোনের দিকে, কার গাড়ি খারাপ হ'ল—ব্যাস্ দৌড় দেবে সঙ্গে সঙ্গে। একেবারে বদলে গেছে জানেন। এমনকি সেই গান ও আর গায় না.......কখ্খনো না.......অথচ ঐ গানটার জন্যই ওর প্রেমে পড়েছিলাম। জানেন, আপনি যখন গান শোনান এত ভালো লাগে মনে হয় আপনার প্রেমে পড়ে গেছি।

[অণিমা রেডিও খোলে।]

রেডিও। অনুরোধ করেছেন তালতলার প্রভা দাস ও নিভা দাস, বাঁশদ্রোণীর সবিতা, অনিতা ও মমতা ভৌমিক , এস. এন. ব্যানার্জী রোডের কৃষ্ণা পাল এবং দমদম মল রোডের অণিমা দত্ত।.....

[দেবদুলালের কণ্ঠস্বর।]

পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি,
আমরা দু'জনা চল্‌তি হাওয়ার পন্থী।
রঙিন নিমেষ ধূলার দুলাল
পরাণে ছড়ায় আবীর গুলাল
ওড়না ওড়ায় বর্ষার মেঘে
দিগঙ্গনার নৃত্য
হঠাৎ-আলোর ঝল্‌কানি লেগে
ঝল্‌মল্ করে চিত্ত।...

[বিনয়ের প্রবেশ।]

বিনয়। ইশবগুলের ভূষিটা ভেজানো হয়েছে?

অণিমা। হ্যাঁ, এত দেরি হল যে আজ?

বিনয়। দুটো গাড়ি আজ সকালে ডেলিভারি দেওয়ার কথা ছিল, সারাদিন ফোন করে জ্বালিয়েছে।

অণিমা। মিস্ত্রিগুলো কি করছিল?

বিনয়। ঐ তো মুশকিল—যেটি নিজে না দেখব সেইটি গেল।

অণিমা। কাল সকালে দিলে চলত না?

বিনয়। না না, কথা দিয়ে কথা না রাখা খুব অন্যায়, immoral।

অণিমা। হ্যাঁগো চলো না, কোথাও বেরোই।

বিনয়। কি, রাত দশটায় আবার বাইরে? নাঃ, TV নিয়ে একটু বসব, ছবিটা গোলমাল করছে।

অণিমা। দোকানে দিলে হ'তো না?

বিনয়। না, না পয়সা কি খোলমকুচি? সাত হাত মাটি খুঁড়ে দেখতো—তাছাড়া জানো না, আরাম হারাম হ্যায়!

অণিমা। কতদিন বেরোইনি কোথাও!

বিনয়। আশ্চর্য! কিছুদিন আগে তুমিই বলতে এ্যাতো লোক ভালো লাগে

না। বেশ হত যদি শুধু দুজনের একটা সংসার হ'তো।

অণিমা। বাঃ, আমি আবার কবে ওকথা বললাম?

বিনয়। মুখে বলোনি কিন্তু মনে মনে তো তাই ইচ্ছে ছিল তোমার। তোমার কথা ভেবেই বাড়ি থেকে আলাদা হলুম, বন্ধুবান্ধবদের আড্ডা ছেড়ে দিলুম, এমনকি গাড়িটাও বেচে দিলুম...আর তুমিই....

অণিমা। বারে, তোমার সঙ্গে থাকতে আমার খারাপ লাগে নাকি? তবুও মাঝেমধ্যে সিনেমা যেতে ইচ্ছে করে না? বেড়াতে যেতে ইচ্ছে করে না? কতদিন বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজনদের দেখিনি..... হরিটাও আজকাল আর আসে না.....

বিনয়। হ্যাঁ, তোমার মাসিকেও অনেকদিন দেখনি।

অণিমা। হঠাৎ মাসির কথা তুলছ কেন?

বিনয়। নাঃ, মাসির কথা তুলতে হয় না। উনি তো ভেসেই আছেন।

অণিমা। তোমার কথার মানেটা ঠিক বুঝলাম না।

বিনয়। ঠিক আছে আর মানে বুঝে কাজ নেই।

[হরির প্রবেশ।]

বিনয়। আরে হরিবাবু যে, কি সৌভাগ্য আমাদের। এসো, এসো, বসো। এত রাতে কোত্থেকে?

হরি। এই ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম।

বিনয়। এত রাতে ঘুরে বেড়াচ্ছিলে কি হে? প্রায় দশটা বাজে!

অণিমা। কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলি তুই?

হরি। নাইট শোয়ে সিনেমা দেখব ভেবেছিলাম—মৃণালিনীতে....ভাল লাগল না। চা খেলুম, আড্ডা মারলুম....একা একা হাঁটলুম..... তোদের এখানে চলে এলুম!

অণিমা। তারপর বাড়ি ফিরলি না কেন? না, তুই এখানে এসেছিস, আমাদের খুব ভালো লাগছে কিন্তু তোর না পরীক্ষা সামনে?

হরি। বাড়িতে—বাড়িতে—

অণিমা। হ্যাঁ, বাড়িতে—কি?

হরি। বাড়িতে কে.....অরুণমামা এসেছে....তাই মাসি.....

অণিমা। অরুণমামা!

হরি। হ্যাঁ, তুই চিনিস দিদি? খুব রোগা, চোখে চশমা, খুব পান খায়....

অণিমা। পান খায়?

বিনয়। তারপর হরি, তুমি রাতে থাকছ তো! যাও, আগে হাতমুখ ধুয়ে এসো। তারপর খেতে খেতে আমি তোমার কাছ থেকে ডায়মণ্ড সিস্টেমটা বুঝে নেব। তারপর, যদি আমাকে বোঝাতে পারো, তোমাকে আমি ফুটবলের ওপর একটা দারুণ বই দেব!

হরি। কি—কি বই?

বিনয়। সে দারুণ বই—আগে হাত-মুখ ধুয়ে এসো, যাও।

[হরির প্রস্থান।]

অণিমা। তুমি না থাকলে হরির....হরির সর্বনাশ হয়ে যেত...

বিনয়। আসলে কি জানো, ওদের সমস্যাগুলো বোঝা দরকার। সেইটা বুঝলেই আর কোনও প্রবলেম থাকে না। Generation gap.....ওদের সঙ্গে ওদের ভাষায় কথা বলতে হবে। আচ্ছা অণিমা, হরির জন্মসময়টা একবার দিও তো। ওর হরোস্কোপটা একবার দেখা দরকার। আমার মনে হয় একটা গোমেদ ধারণ করলে.....

[হরির প্রবেশ]

এসো হরি, তারপর—TV-তে শুনলাম তোমাদের গোলটা নাকি অফসাইড বলে সন্দেহ করছে অনেকে?

দৃশ্য ঃ ৭

[হরির স্কুল]

হেডমাস্টার। হরি পুরকায়স্থর স্কুলের শিক্ষা শেষ ১৮ বছর বয়সে। আর পাঁচটা সাধারণ ছাত্রর মতোই হরি। ব্যবহার: সাধারণ। যোগ্যতা: সাধারণ। বিদ্যা: সাধারণ। চরিত্র: .....সাধারণ। মানে হরি.... হরিই: অমল—

[অমল ও পরে সমবেত ছাত্ররা।]

হে বিশ্বপিতা,
আজ বিদ্যালয় পরিত্যাগের প্রাক্কালে,
তুমি আমাদের পথ দেখাও
কেননা সামনে আমাদের সুদীর্ঘ যাত্রা।
সেই পথ কন্টকাকীর্ণ,
সেই পথ সমাচ্ছন্ন,
সেই পথ দুস্তর, দুরূহ কাণ্ডারীহীন।
তুমি আমাদের আলো দাও।

একজন ছাত্র। তুমি আমাদের পেনাল্টি দাও।

অমল ও ছাত্ররা। তুমি আমাদের শক্তি দাও।

দু'জন ছাত্র। তুমি আমাদের গোল দাও।

অমল ও এক ছাত্র। আমাদের কন্টকাকীর্ণ পথ তুমি সুগম কর।

সমবেত ছাত্র। আমাদের লিগ বিজয়ের পথ সুগম কর।

অমল। হে মহাত্রাতা,

সমবেত ছাত্র। হে বাইচুং

অমল। হে পালকপিতা,

সমবেত। হে তুষার,

হেডমাস্টার। সমাজের আর সব জায়গার মতো এখানেও মুষ্টিমেয় দুর্জনের দাপটে সংখ্যাগরিষ্ঠের সব শুভ প্রচেষ্টা ব্যর্থ। সর্বত্র এক চেহারা— স্কুলে-কলেজে, ট্রামে-বাসে, অফিসে-কলে-কারখানায়, রাজনীতিতে— সর্বত্র। এরা সব ভারী বীর। দলের মধ্যে থাকলে সবাই এক-একজন

রাণাপ্রতাপ— শেরশাহ্‌.....একা—প্রত্যেকে এক একটি নপুংসক, এক একটি ক্লীব, শিখণ্ডী, এরা ভাবে জগৎটাই একটা ফুটবল মাঠ!

[হরি অমলকে ধাক্কা মারে।]

অমল। আঃ, কি হচ্ছে কি হরি!

হেডমাস্টার। হরি, এদিকে এসো। বেতটা আনো অমল।

[হরিকে বেত মারেন।]

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, এখনও অনেকে আছে যারা গোটা পৃথিবীটাকে ফুটবল মাঠ মনে করে না, যারা জীবনকে জীবনের মর্যাদা দিতে জানে, দিতে চায়।—অমল শুরু করো।

অমল। হও ধরমেতে ধীর, হও করমেতে বীর, হও উন্নত শির, নাহি ভয়।

সমবেত ছাত্র। হও ধরমেতে ধীর, হও ফুটবলে বীর, হও উন্নত শির, নাহি ভয়।

অমল। ভুলি ভেদাভেদ জ্ঞান, হও সবে আগুয়ান,
সাথে আছে ভগবান, হবে জয়।

সমবেত ছাত্র। ভুলি ভেদাভেদ জ্ঞান, হও সবে আগুয়ান,
ঝাড় খাবে মহমেডান, হবে জয়।

হেডমাস্টার। (চেঁচিয়ে) Silence ! তোমরা আজ স্কুল থেকে বিদায় নিচ্ছ। আমি আগামী পরীক্ষায় এবং জীবনের সব পরীক্ষায় সর্বান্তকরণে তোমাদের সাফল্য কামনা করি। [ক্লাস পুরো ভাঙেনি।] হরি!

হরি। কি বলছেন?

হেডমাস্টার। স্যার—

হরি। কি বলছেন, বলুন।

হেডমাস্টার। স্যার বল্‌। [হরি চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে।]
হরি তুই এরকম হয়ে গেলি কেন? এইতো সেদিন তোর মাসির হাত ধরে এলি, ফুটফুটে ছেলে....তারপর দিন দিন কেমন বদলে গেলি, সিগারেট খেতে শিখলি, টুকতে শিখলি, লোককে অসম্মান করতে শিখলি.... কেন, কেন এমন হলি তোরা? হরি....

হরি। আর কিছু বলবেন আমাকে?

হেডমাস্টার। নাঃ। যা—বাইরে বিরাট পৃথিবী, দেখবি পৃথিবীটা খেলার মাঠ নয়। ভিড়ের মধ্যে মাথা গুঁজে জীবনটা কাটবে না, একা হতেই হবে, তখন...দরকার হলে আসিস আমার কাছে।

হরি। মরে গেলেও আর আপনার কাছে কোনওদিন আসব না। এই শালার খোঁয়াড়ে—

হেডমাস্টার। হরি—

[হরি অন্যান্য ছাত্রদের ইঙ্গিত করে, সকলে হেডমাস্টারকে প্রহার করতে থাকে।]

হরি। এ......এ, ব্যোমকালি, ব্যোমকালি, ব্যোমকালি, ব্যোমকালি, ব্যোমকালি, ব্যোমকালি, ব্যোমকালি, ব্যোমকালি, ব্যোম, ব্যোম, ব্যোম, কালি, কালি, কালি, ব্যোম, ব্যোম, ব্যোম, কালি, কালি, কালি, ব্যোমকালি, ব্যোমকালি, ব্যোমকালি, ব্যোমকালি,

ব্যোমকালি, এ.......এ।

হেডমাস্টার। Wested ! অর্থহীন। পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষাখাতে বার্ষিক বরাদ্দ ৩৯০০ কোটি টাকা!—অর্থহীন। পশ্চিমবাংলায় ৫৩ হাজার স্কুল, ৭শো ২৭টা প্রাইমারি স্কুল, ৬ হাজার ৩শো ৬০ সেকেণ্ডারি স্কুল—২৪৩৭ হায়ার সেকেণ্ডারি দুশো সাতাত্তরটা কলেজ....সাতটা ইউনিভার্সিটি—অর্থহীন।Thirty years of my life wested—জীবনের ত্রিশটা বছর বৃথা গেল—বৃথা।

ছাত্রদল। (গান) মানবো না এ বন্ধনে না
মানবো না এ শৃঙ্খলে
ছাত্র-জনতার স্বাধীনতা অধিকার
খর্ব করে যারা ঘৃণ্য কৌশলে।
মানবো না এ বন্ধনে না
মানবো না এ শৃঙ্খলে।

[ছাত্ররা বেরিয়ে যায়।]

অমল। স্যার, স্যার, চলুন—

[অমল ও অন্য একজন ছাত্রের কাঁধে হাত রেখে হেডমাস্টার বেরিয়ে যান।]

দৃশ্য ঃ ৮

[খেলার মাঠ]

ক্রাউড। (গান) মানবো না এ বন্ধনে না মানবো না শৃঙ্খলে
মানবো না এ বন্ধনে না মানবো না এ শৃঙ্খলে
ইস্টবেঙ্গলকে সাপোর্টের অধিকার খর্ব করে যারা ঘৃণ্য কৌশলে
মানবো না বন্ধনে, মানবো না এ শৃঙ্খলে।

[ফ্রেন্সের সামনে দিয়ে পুলিশের প্রবেশ। জনতা প্রথমে কলার খোসা, তারপর যথাক্রমে চটিজুতো, বোমার আকারে কাগজের বল, শেষে হরি পুলিশের গায়ে বোতল ছোঁড়ে। পুলিশ বোতল হাতে জনতার দিকে ঘুরে দাঁড়ায়।]

ক্রাউড। (গান) বেশ করেছে
বোতল ছুঁড়েছে, ছুঁড়বেই তো
আহা, ভুঁড়ির নীচে কি
খুব লেগেছে, লাগবেই তো।
লা ল্ ল্ লা লা লা.......
আহ, বেশ করেছে
ল্যাঙ্ মেরেছে, মারবেই তো
আহা ভুঁড়ির তলায়
চোট লেগেছে, লাগবেই তো.....
বেশ করেছে, ল্যাঙ্ মেরেছে
মারবেই তো।

বেশ করেছে, বোতল ছুঁড়ছে
ছুঁড়বেই তো।।

[পুলিশ হরিকে ধরে ফেন্সের সামনে নিয়ে আসে।]

হরি। বিশ্বাস করুন, আমি কিচ্ছু জানি না.....

পুলিশ। গায়ে বোতল ছোঁড়বা, আবার ইছা-মাছের মতো চিড়িং বিড়িং করবা—বসো, ঘুইরা বসো, তোমার খেলা দেখন্ বন্ধ।

হরি। খেলার শেষ পর্যন্ত?

পুলিশ। হ, শেষ পর্যন্ত।

হরি। খেলার শেষে আমায় ছেড়ে দেবেন?

পুলিশ। হারামি! **[জনতা চিৎকার করে।]**

হরি। এ্যাঁ!

পুলিশ। ওগো রাইটব্যাকটা, হুদাহুদি তুষারেরে ট্যাপ করল! না—

হরি। ফাউল দিল না?

পুলিশ। না, খেলার শেষে তোমারে ছেড়ে দেব না, থানায় লয়ে যাব।

হরি। আমার নামে কেস লিখবেন?

[ফাউল কিকের বাঁশি।]

পুলিশ। আহাঃ কিলিয়ার করে দিল, কিলিয়ার করে দিল—কর্ণার, কর্ণার.....জ্যাকসন কিক করবে মনে হয়, হ হ জ্যাকসন তো।

হরি। আচ্ছা আমাকে কি মারবেন আপনারা?

পুলিশ। মারবেন আপনারা? মারব না, নিশ্চয়ই মারব। তোমরা গায়ে বোতল ছুঁড়বা, আর তোমাদের থানায় নিয়া গিয়া কি লস্যি খাওয়ানো হবে।—ঘুইরা বসো, ঘুইরা বসো—

[কর্ণারের বাঁশি]

হরি। খুব জোরে জোরে মারবেন?

পুলিশ। ওহ্, পারলে না....কিলিয়ার করে দিলে.... পেনাল্টি, পেনাল্টি..

হরি। আচ্ছা,...এই যে শুনছেন....শুনুন না ...শুনেছি মারবার সময় ফেটেটেটে গেলে কোর্টে পুলিশকে খুব বকে?

পুলিশ। হ বকে, সে সব পুরানো জমানার কথা। আজকাল সব নতুন নতুন কায়দা বেরোইছে। ছোটো ছোটো রবারের লাঠি দিয়া মারে। পায়ের তলায়, গাঁটে, কোমরে, আঙুলের মাথায়, ঘাড়ে....ফাটবো, ছিঁড়বো না—ব্যথা থাকব ছয়মাস।

হরি। ছ'মাস?

পুলিশ। কারো, কারো এক-দেড় বছরও থাকে, [পেনাল্টির বাঁশি] খোঁড়ায়-খোঁড়ায় চলে, আঙুল নাড়তে পারে না...হাঁটতে গেলেই... গো...ল—

[জনতা উল্লাসে ফেটে পড়ে। পুলিশ হরিকে জড়িয়ে ধরে পাগলের মতো চুমো খায়। জনতার মধ্যে একজন ছুটে এসে পুলিশকে চুমো খায়।]

পুলিশ। একি, তুমি কাঁদছো নাকি?

হরি। না, না তো....

পুলিশ। এই যে তোমার চোখে জল!

হরি। জোরে হাওয়া দিলে আমার চোখে জল এসে যায়।

[ব্যোমকালি ক্লাব কর্মকর্তাকে নিয়ে ঢোকে।]

ক্লাব কর্মকর্তা। প্রত্যেকদিন, প্রত্যেকদিন তোমরা একটা না একটা ঝামেলা বাধাবে। একদিন একটু শান্ত হয়ে খেলা দেখতে পারো না।—কি হয়েছে কনস্টেবল?

পুলিশ। গোল হয়েছে, গোল।

ক্লাব কর্মকর্তা। না, না, এখানে কি হয়েছে?

পুলিশ। এখানে?...কিছু না তো।....ও বোতল ছুঁড়েছে—

ক্লাব কর্মকর্তা। বোতল! এদের নিয়ে আর পারা যাচ্ছে না।... লেগেছে খুব?

পুলিশ। না লাগেনি। পাছার ওপর পড়েছিল তো...

ক্লাব কর্মকর্তা। কি অন্যায় বলতো! এদের জন্য ক্লাবের বদনাম। এদিকে কাগজে তো প্রত্যেকদিন আমাদের সাপোর্টারদের নিয়ে ছিছিক্কার। ছিঃ। এই ছোকরা কার্ড দেখি—

পুলিশ। কার্ড দাও, কার্ড দাও—

[হরি ইতস্তত করে।]

ব্যোমকালি। কার্ডটা দে না, তখন থেকে কার্ড চাইছে আর ন্যাকার মতো বসে আছিস।

ক্লাব কর্মকর্তা। হুঁ! কালি এ তোমার পাড়ার ছেলে তো?

ব্যোমকালি। হ্যাঁ, ভোলাদা—

ক্লাব কর্মকর্তা। একমাস আমি কার্ড রেখে দিচ্ছি, কোনও খেলা দেখতে আসতে পারবে না। আর ওর গার্জেনকে বলবে ছেলেকে সামলাতে, what is this? Disgrace to our Club। কন্‌স্টেবল্ ওঁকে ছেড়ে দিন।

পুলিশ। কিন্তু স্যার, ডিউটি অফিসার.....

[ব্যোমকালি পুলিশের বাঁহাতে আড়ালে দশ টাকার নোট গুঁজে দেয়।]

ক্লাব কর্মকর্তা। ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমি ডিউটি অফিসারকে বলে দেব।

পুলিশ। ভোলাবাবু বললেন তাই, নইলে.....যাও।

ক্লাব কর্মকর্তা। কালি, একে এক্ষুনি মাঠ থেকে বার করে দাও।

ব্যোমকালি। আচ্ছা ভোলাদা।

[হরি ও ব্যোমকালির প্রস্থান। পুলিশ ও ক্লাব কর্মকর্তা নমস্কার বিনিময় করে। ক্লাব কর্মকর্তার প্রস্থানের সময় জনতার মধ্যে একজন চিৎকার করে ডাকে—]

১ম ক্রাউড। ভোলাদা—

[ভোলাদার হাত নেড়ে প্রস্থান]

ক্রাউড। (১)। (গান) তা বলে কি প্রেম দেবে না।
যদি মারে বোতলখানা
খুশির ঝোঁকে!

সকলে। তা বলে কি প্রেম দেবে না
যদি মারে বোতলখানা
খুশির ঝোঁকে!

ক্রাউড (১)। বোতল ছোঁড়ার কেউ
না থাকলে ভাই
পুলিশকে কি পুঁছতো লোকে?
তা বলে কি প্রেম দেবে না
যদি মারে বোতলখানা
খুশির ঝোঁকে!

[গানের মধ্যে পুলিশ রাগতভাবে চলে যায়। পর্দা পড়ে]

দৃশ্য ঃ ৯

[পথ]

কালি। কিরে, ভয় পেয়ে গেছিলি?

হরি। হ্যাঁ, একটু-একটু। হাতে খুব জোর ঝেড়েছে তো রুল দিয়ে।

কালি। কই দেখি।

হরি। (যন্ত্রণায় চিৎকার করে ওঠে) ওরে বাবা!

কালি। আমি ভাঙছি না, ভেঙেছে কি না দেখছি। বাড়ি গিয়ে নুন পুঁটলির সেঁক দিয়ে দিস, ঠিক হয়ে যাবে।

হরি। আচ্ছা কালিদা, কার্ডটা যে নিয়ে নিলে?

কালি। কার্ডটা না? ঠিক আছে, কাল সন্ধ্যেবেলায় টেন্টে গিয়ে ম্যানেজ করে নিয়ে আসব। ওঃ হরি, চল্লিশ টাকা দিস আমায়। খরচা হয়েছে তোর জন্য।

হরি। এই যে। (কালি টাকাটা নেয়) আচ্ছা কালিদা আমি যাচ্ছি, আমার একটু তাড়া আছে।

কালি। আয়। বাড়ি গিয়ে নুন পুঁটলির সেঁক দিতে ভুলিস না কিন্তু।

হরি। আচ্ছা। (বেরিয়ে যায়)

বুড়ো। কালিদা, আমায় কুড়ি টাকা ধার দেবে?

কালি। ঘাপটি আছিস তো! বেশ তাল বুঝে চাইলি মাইরি টাকাটা!

বুড়ো। না'গো এমনিই চাইতাম।

কালি। আগের বারের টাকাটা এখনও শোধ দিসনি।

বুড়ো। দিয়ে দোব। একসঙ্গে দিয়ে দোব। মা টাকা দিয়েছিল সর্ষের তেল কিনতে। মাঠে খরচ করে ফেলেছি। না নিয়ে গেলে কেলো হয়ে যাবে মাইরি।

কালি। বেশ দিলি মাইরি। সেন্টিমেন্টাল, শরৎচন্দ্র টাইপ। যাঃ শালা।

দৃশ্যঃ ১০

[হরির বাড়ি]

মাসি। (মাসি হরির হাতে সেঁক দেয়) হাতটাতো ভালই ফুলেছে। পুলিশের সঙ্গে কেউ ঝঞ্ঝাট করে?

হরি। উঃ, লাগছে তো।

মাসি। স্থির হয়ে বোস তো!

বিনয়। তাহলে? ঘন্টা খানেক তো হল...অনেক আলোচনাও হল, কিন্তু আলো তো কিছুই বেরোল না!

অণিমা! সত্যি...আমি অবাক হয়ে গেছি হরি...তুই....তুই একটা পুলিশের গায়ে বোতল ছুঁড়ে মারলি...

মাসি। আর তার জন্য একটু তাপ-অনুতাপ নেই। আশ্চর্য! এমনটা হলি কি করে, হরি?

অণিমা। আমি সত্যি বুঝতে পারছি না... তুই কেন এমন করলি!

মাসি। ঠিক আছে হরি, তুই আমায় বল। আমি তো কোনওদিন তোকে কিছু বলিনি...তুই আমায় বলতো, কেন বোতলটা ছুঁড়লি? কেন?

অণিমা। ঠিক আছে, তুই আমাদের বলবি না তো....এরপরে দেখিস, পাগলাগারদের ডাক্তারকে বলতে হবে...ইলেকট্রিক শক দিয়ে বলাবে—

হরি। কেন, ইলেকট্রিক শক দিয়ে বলাবে কেন? আমি কি পাগল?

অণিমা। তোর তো এটা বিকার—কোনও সুস্থ মানুষ এমন করে? তোর তো হ্যাবিট হয়ে যাবে—তখন? এইতো সেদিন কাগজে পড়ছিলাম এসব কেসে পুলিশ পাগলাগারদে দিয়ে দেয়। সেখানে ইলেকট্রিক শক দিয়ে সারায় এসব কেস—

মাসি। এ্যাঁ শক দেবে? হরি তুই—

হরি। চুপ করতো মাসি। কেন? কত লোকই তো বোতল ছোঁড়ে—গাদা গাদা লোক ছোঁড়ে, তারা কি সবাই পাগল?

অণিমা। বাজে বকিস না—

বিনয়। আঃ অণিমা! কি সব আবোল তাবোল বকছো? ছেলেটাকে nervous করে দিচ্ছ—হরি তুমি

মাসি। হ্যাঁ, শুধু শুধু ওকে কেন ভয় দেখাচ্ছিস অণু? ছেলে বয়সে সবাই ওরকম করে। বোতলটা ছুঁড়লি কেন?

অণিমা। কেন আবার! কোনও শাসন নেই—আর বাড়িতে যা পরিবেশ!

মাসি। পরিবেশ মানে! কি বাজে কথা বলছিস অণু। বাড়িতে ও কিনা পায়—জামা কাপড়, জুতো, পয়সা-কড়ি—যখন যা দরকার তাই পায়—আর আমি কি করব! আমি তো সবসময় ও যা চাইছে তাই দিচ্ছি—

অণিমা। হ্যাঁ দিচ্ছ—যাতে বাড়ি থেকে দূরে থাকে সেই জন্য—সেই জন্য দাও!

মাসি। অণু দ্যাখ! বাজে কথা বলিস নি। তোদের কিভাবে মানুষ করতে

হয়েছে তা আমিই জানি। বাপ-মা ছিল না তোদের। তাও কোনওদিন স্নেহ ভালবাসার অভাব দেখেছিস?

অণিমা। তা কেন? বরং ভালোবাসাবাসি একটু বেশিই দেখেছি!

মাসি। মুখ সামলে কথা বলবি অণু!

হরি। আঃ চুপ করবে তোমরা! আমার ব্যাপার আমাকে ভাবতে দাও!

মাসি। হ্যাঁ, তোমার ব্যাপার তুমিতো ভাববেই। আজ হাত ভেঙেছ, কাল পা ভাঙবে। তারপর বাড়িতে মাসি আছে সেবা করবে—যা খুশি কর, আমি আর এর মধ্যে নেই। এই শেষ বার বলে দিলাম।

[মাসির প্রস্থান]

বিনয়। ঠিক আছে হরি, তোমার যদি বলতে অসুবিধে থাকে—

হরি। না বিনয়দা, আমি....আমি বলছি, আমার কি রকম মনে হল—স্কুল শেষ হয়ে গেছে তো...আর স্কুলে যেতে হবে না, পরীক্ষা দিতে হবে না, কারো বকুনি খেতে হবে না, তাই—

বিনয়। হুঁ! হরি! একটা কথা বলি। আমার চেনা একটা Firm আছে। বললে হয়ে যাবে—দশ বারো হাজার খাইয়ে দিলেই—ওখানে একটা apprentice ship-এ ঢুকে যাও!

অণিমা। হ্যাঁ, তাই কর হরি!

হরি। আমার এ্যাপ্রেন্টিসসিপ ভাল্‌লাগে না, আমি, আমি অন্য কাজ করব।

বিনয়। কোথায় পাবে কাজ?

হরি। আমাদের লোকাল এম. এল. এ. আছেন, আমায় খুব ভালবাসেন। বলেছেন করে দেবেন।

বিনয়। হরি, তোমার বয়স অল্প—এখনই future build করার time। এই সুবর্ণ সুযোগ ছেড়ো না।

হরি। না, বিনয়দা।

বিনয়। আমি বলছি তোমাকে—

হরি। ও আমার ভালো লাগে না।

দৃশ্য ঃ ১১

আমি কেবলই স্বপন করেছি বপন বাতাসে
আমি কেবলই স্বপন করেছি বপন বাতাসে

[টাইপরাইটারের আওয়াজ ঃ বাঁদিক দিয়ে ইতিমধ্যে স্টেনোগ্রাফার ঢোকে]

(২য় পর্দা অংশত খুলে যায়)

স্টেনো। Good morning, Sir.

ভদ্রলোক। Thank you. একটা ডিক্টেশন নিন তো। As the entire State of West Bengal is in the grip of depression, our workers shall have to accept staff rationalisation and off for volientary retirement

scheme we hope our workers will do the needfull. That's all Mrs. Ghosh, এটা আপনি এক্ষুণি টাইপে দিয়ে দিন। যাতে কালকেই ফ্যাক্টরিতে ওয়ার্কারদের মধ্যে Distribute হতে পারে। You may go now.....কি ব্যাপার?

স্টেনো। স্যার, আজকে কিন্তু আমাকে তিনটের মধ্যে—

ভদ্রলোক। তিনটের মধ্যে—কেন?

স্টেনো। আমার ছেলের স্কুলের অ্যানুয়াল ফেট আছে। ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল তো—গার্জেনরা এসব function attend না করলে...

ভদ্রলোক। স্বাধীনতার পর ৫৩ বছর পার হয়ে গেল, এখনও ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল—যাবেন।

স্টেনো। Thank you Sir.

ভদ্রলোক। Next?

[হরির প্রবেশ]

ভদ্রলোক। কি ব্যাপার? Young man. ওরকম করে কুঁজো হয়ে আছো কেন? সোজা হয়ে দাঁড়াও। হুঁ! কি চাই?

হরি। চাকরি।

ভদ্রলোক। ব্যস? চাকরি? একটা বেয়ারার পোস্টের জন্য আজকাল application কত পড়ে জানো? কম করে এক লাখ!

হরি। এক লাখ?

ভদ্রলোক। এক লাখ—তার মধ্যে সব গাদাগাদা গ্র্যাজুয়েট।

হরি। এক লাখ! তাহলে আমি যাই?

ভদ্রলোক। আরে দাঁড়াও, দাঁড়াও, কোত্থেকে আসছো, কে পাঠিয়েছে— কিছুই তো শুনলাম না, এলে আর চলে গেলে!

হরি। ওঃ এই যে, আপনাকে একটা চিঠি দিয়েছেন। গোপালবাবু MLA.

ভদ্রলোক। কই দেখি? হুঁ.....বোসো। কে হন তোমার?

হরি। কেউ না....মানে খুব ভালবাসেন আমাকে।

ভদ্রলোক। হুঁ। আগে কোনও কাজ করেছো?

হরি। হ্যাঁ, এখনো করি। সকালে খবরের কাগজ বিক্রি করি। ৭০০-৮০০ টাকা হয়।

ভদ্রলোক। হুঁ। লেখাপড়া কদ্দুর?

হরি। স্কুল ফাইনাল পাশ।

ভদ্রলোক। good...good...Apprentice Ship হলে ভাল হয়, না?

হরি। Apprentice !

ভদ্রলোক। ৫০ টাকার মতো হাত খরচা পাবে মাসে। ৫ বছর ট্রেনিং।

হরি। মাসে ৫০ টাকা?

ভদ্রলোক। চাকরিতে Starting ভালই পাবে। দাঁড়াও, বড় সাহেবকে একটু বলে নিচ্ছি, তারপরে—

হরি। ইয়ে শুনুন—

ভদ্রলোক। কি ব্যাপার?

হরি। না, মানে Apprentice-এর কাজে বড্ড সময় যায়—ছ'মাসে যা শেখা যায় পাঁচ বছরে তাই শেখাবে। আর বড্ড কড়াক্কড়ি—আমার এক্ষুণি একটা চাকরি হলেই ভাল হয়। কম মাইনে হলেও—

ভদ্রলোক। তুমি—Apprenticeship চাও না? Funny! আশ্চর্য! টাইপ জানো?

হরি। না।

ভদ্রলোক। শর্টহ্যাণ্ড?

হরি। না।

ভদ্রলোক। একাউন্টেন্সি?

হরি। না।

ভদ্রলোক। ডাটা প্রোসেসিং?

হরি। না।

ভদ্রলোক। ইংরিজি?

হরি। না?

ভদ্রলোক। DTP?

হরি। না।

ভদ্রলোক। বাংলা?

হরি। না।

ভদ্রলোক। এ্যাঁ?

হরি। হ্যাঁ—মানে বাংলা জানি।

ভদ্রলোক। তুমি তো...তুমি কিছুই জানো না হে—তোমাকে নিয়ে তো—(চিঠিটি পড়তে থাকেন আবার)

হরি। আমি Life saving society-র certificate পেয়েছিলাম। কেউ জলে ডুবলে —

ভদ্রলোক। তাহলে তো সন্ধেবেলায় লেকের পাড়ে বসে থাকার কাজ দিতে হয়—কখন কোন ব্যর্থ প্রেমিক জলে ঝাঁপ দেবে—আমার এখানে, অফিসে, কারখানায় কোথাও তো তোমার কাজ নেই দেখছি—ঠিক আছে, তুমি এক কাজ করো। নিউ ইণ্ডিয়া কেমিক্যালে একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি—ওরা লোক খুঁজছিল—সেলস্‌ম্যান—প্রথম তিনমাস মাসে ১০০০ টাকা করে দেবে প্লাস T.A. প্লাস, একশো টাকার বিজনেসে পাঁচ টাকা কমিশন। তা' দেড় দু'হাজার মতো হবে মাসে। আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি।

[হরি চিঠি নিয়ে চলে গিয়ে আবার ফিরে এসে ভদ্রলোককে নমস্কারের ভঙ্গি করে]

ভদ্রলোক। অ্যাঁ—কি?

হরি। নমস্কার।

ভদ্রলোক। ও হ্যাঁ, নমস্কার, নমস্কার।

দৃশ্য ঃ ১২

[ওষুধের দোকান]

[মঞ্চের ডানদিক দিয়ে চারজন সাইনবোর্ড নিয়ে ঢোকে। চারটি ওষুধের দোকানের সাইনবোর্ড। হরি এদের কাছে ওষুধ বিক্রি করছে। এর সঙ্গে বাজনা চলে। বাজনা থামলে ওরা চারজন মঞ্চের ডানদিক দিয়ে চলে যায়। বাঁ দিক দিয়ে ব্যোমকালি ঢোকে]

কালি। কিরে হরি কেমন রোজগার হল এ সপ্তাহে?

হরি। ভালোই হয়েছে।

কালি। সাব্বাস বেটা। এবার একশ টাকা পকেটে রেখে বাকিটা ফেলে দে মাসির হাতে— তারপর চল—মহামেডানের সঙ্গে খেলা আজ।

(গান) গোল দেবে গোল দেবে ফটাফট।

দৃশ্য ঃ ১৩

[হরির বাড়ি]

হরি। মাসি, আমি এসে গেছি। (খাটে একটা খাম ছুঁড়ে ফেলে) খামে টাকা রইল, এ মাসের সংসার খরচা। আমি একশ টাকা রাখলাম। আর মাসি, আমার ব্যাগি প্যান্ট আর টাইট গেঞ্জিটা বের করে দাও না।

[মাসি এবং বরুণমামা ঢোকে]

মাসি। হরি, এই দ্যাখ কে এসেছে—তোর ইয়ে বরুণমামা, বরুণমামাকে মনে পড়ছে তোর?

বরুণ। বাড়ির কর্তা?

মাসি। হ্যাঁ, বাড়ির ছোট কর্তা, হরি—ওতো—ও একটা চাকরি পেয়েছে।

বরুণ। বাঃ! খুব ভালো, ফিগারটাও বেশ ভাল হয়েছে, কাঁধটায় একটু Stoop আছে, হয়ে যাবে, হয়ে যাবে।

মাসি। হ্যাঁ, ওর খেলাধুলোয় খুব উৎসাহ।—ইস্টবেঙ্গলের সাপোর্টার। তোর বরুণমামা একবার লাইটওয়েট চাম্পিয়ন হয়েছিল—ঐ যে সেই লোহা তোলায়। খুব গায়ে জোর। তোর বরুণমামাকে মনে পড়ছে তো?

হরি। ওকে বার করে দাও—

বরুণ। এ্যাঁ।

মাসি। ও কিরে হরি, মামা হয় তোর...ওরকম করে বলতে আছে? কদ্দিন পরে এল এ বাড়িতে...দু' একদিন থাকতে রাজী হয়েছে, আর তুই—

হরি। তুমি ওকে বের করে দেবে মাসি?

বরুণ। এ্যায়, এ্যায়!

মাসি। হরি, ছিঃ! কি বলছিস্ তুই!

হরি। মাসি, এবাড়ি এখন আমার। আমি খাটব সংসারের জন্য, আমিই টাকা আনব, ঐ খামে হাজার টাকা আছে।

বরুণ। হ্যাঃ, হাজার টাকা! এই যে!

[মানিব্যাগ ছুঁড়ে ফেলে খামের পাশে]

হরি। তোমার ঐ হারামের টাকা নিয়ে বেরিয়ে যাও এখুনি!

বরুণ। অ্যায়, অ্যায়!

মাসি। হরি। বরুণমামাকে খেপাস না। খুব রগচটা লোক। গায়ে জোর—ফট করে কি—বরুণদা, তুমি আবার চটে যেওনা কিন্তু।

হরি। বেরোও এখান থেকে শুয়োরের বাচ্চা! নইলে—তোমাকে—

[হরিকে প্রচণ্ড জোরে মারে বরুণ]

মাসি!

হরি। মাসি একটা অপরিচিত লোক তোমার সামনে আমাকে মারলো—তুমি...তুমি চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখলে? তুমি দেখলে...

মাসি। তুমি ওকে মারলে কেন? হরি, বাপ আমার—খুব লেগেছে? রাগ করিস নি—থাক আমার কাছে হরি, হরিরে রাগ করিস নি।

হরি। ঠিক আছে...আমি আবার আসব...এবার আমি তৈরি হয়ে আসব...তারপর এই নরক—এই নরক একেবারে সাফ করে ফেলব—আমি আবার আসব...মাসি এবার কিন্তু আমি লড়ব...আমি ছাড়ব না...আমি ছাড়ব না...আমি ছাড়ব না!

[নেপথ্যে ঊর্ধ্বগগনে বাজে মাদল-এর সুর বাজতে থাকে]

দৃশ্য ঃ ১৪

[আর্মি রিক্রুটিং সেন্টারের সামনে]

হরি। পুলিশের চাকরি নেব আমি, পুলিশের সার্জেন্ট। নাঃ আর্মিতে বেশি র‍্যালা। তিনমাস ট্রেনিঙের পর ফিগারটা সলিড হবে, তারপর আজ লাডাক, কাল লঙপু, পরশু কার্গিল.....ঢ্যা ঢ্যা ঢ্যা ঢ্যা কাগজে বেরোবে একক প্রচেষ্টায় ১৪ জন মারাত্মক অস্ত্রধারী আতঙ্কবাদীর মোকাবিলা...বীরচক্র...নাঃ মহাবীর চক্র...বছরে একবার ফিরব, কাঁধে হ্যাভারস্যাক...দু'হাতে দুটো ইয়াব্বড় সুটকেশ — ক্যামেরা, Walkman, স্ট্রেচলনের বেলবট্স দামী সিগারেট...চ্যাপ্টা মদের বোতল...গোঁফে আঙুল দিয়ে ঢুকব পাড়ায়...শালা টপ র‍্যালা। তারপর, ঐ মামা শুয়োরের বাচ্চাগুলোকে ঢি-ই-ক...ঢি-ই-ক...ঐ ওয়েট লিফটিং মামার পিছনে শালার ওয়েট লিফটিং রড ভরে দেব...হ্যাঁঃ অনেক হয়েছে—শক্ত না হলে চলবে না...সব শালা শক্তের ভক্ত, নরমের যম।

দৃশ্য ঃ ১৫

[রিক্রুটিং অফিসারের ঘর]

হরি। আমি আর্মিতে জয়েন করতে চাই।

রিঃ অ। কেনো তুমি আর্মিতে জয়েন করতে চাও?

হরি। আমার ইচ্ছে... দেশের জন্য লড়ব।

রিঃ অ। Republic day-তে হর সাল ছাদের উপর তিরঙ্গা লাগাও?

হরি। হ্যাঁ।

রিঃ অ। আচ্ছা, তো তুমি কোন ডিপার্টে যেতে চাও?

হরি। আর্মিতে।

রিঃ অ। এ থোড়ি কোই গার্লস গাইডের অফিস আছে, This is army recruting Centre... লেকেন আর্মি তো কোই ছোটি-মোটি অফিস নহি—আর্মি বহোৎ বড়ি চিজ—তার কোতো শাখা-প্রশাখা, কোতো পত্র পুষ্প—সারা দেশকে ছায়া দিচ্ছে নিরপত্তা দিচ্ছে আর্মি...তো তুমি কোন ডিপার্টে জোয়েন কোরবে ওহি বাতাও?

হরি। আমি...আমি লড়াইয়ের কাজ করব।

রিঃ অ। লড়াই-হ্যাঁ...কিসিকা মোকাব্‌লা কর রহে লো এ্যায়সে খাড়া হো যাও—ঠিক হি হ্যায়...লেকিন...কোই কাম শিখ লো বাবা... E.M.E. মেডিকেল কোর...এডুকেশন কোর...সাপ্লাই...সিগনাল... এঞ্জিনিয়ারিং এসব ডিপার্টে যাবে তো কাম শিখতে পারবে, আখিরে ফয়দা হোবে।

হরি এসব তো বাইরেও শেখা যায়...আমি ফাইট করতে চাই—

রিঃ অ। হাঁ, লেকিন ফাইট যোখোন খত্‌ম হোয়ে যাবে তোখোন—

হরি। ফাইট যখন খতম হয়ে যাবে তখন হয় আমিও খতম হয়ে যাব নয়তো মহাবীরচক্র পেয়ে একটা কিছু হয়ে যাব।

রিঃ অ। শোলে, শোলে, দেখেছো? হরি। বহোত ছোকরা সানিমা দেখে আর্মিতে আসে, ভাবে কি ওতোহি সহোজ। হীরো ধর্মিন্দার এ্যাকেলা হাজার দুশমনের টক্কর লিয়ে লিলো—বস্‌অ সরকার মে এতো এতো টাকা আওর হিরোইন হেমামালিনী ওভি গলেমে লাগিয়ে লিলো— এতো সহোজ না বাবা।

হরি। তাহলে আমার হবে না?

রিঃ অ। হোবে নাতো বোলিনি। কিতনা তক পড়ে হো?

হরি। স্কুল ফাইনাল পার্শ।

রিঃ অ। তবতো অফ্‌সর হোতে পারবে না...এন.সি.সি. সার্টিফিকেট আছে।

হরি। এন.সি.সি....না।

রিঃ অ। কেনো? এন. সি. সি. কম্পালসারি ছিলো না?

হরি। ছিলো... মানে ড্রেস জমা দিইনি তাই—

রিঃ অ। এ্যায় বহোৎ খারাব বাৎ হ্যায় ইয়ে সব। ফালতু, ঠিক হ্যায় জি মেডিকাল করলো। ডক্টর... [বেরিয়ে যায়]

[মেডিক্যাল অফিসারের প্রবেশ]

এম.ও। হাইট?

হরি। পাঁচ ফুট ছ'ইঞ্চি।

এম.ও। ওয়েট?

হরি। ৫২ কেজি।

এম.ও। চেস্ট? নর্মাল?

হরি। ৩২।

এম.ও। একসপ্যান্ডেড? [হরি চুপ করে থাকে]

এম.ও। ফোলানো?

হরি। ৩৪।

এম.ও। এদিকে এসো। কাশো। জোরে আরও জোরে। ঘোরো। পড়ো ওপরেরটা— [হরির ডান চোখ চেপে ধরে]

হরি। M.

এম.ও। তারপরেরটা.......

হরি। AK

এম. ও। তারপরেরটা........

হরি। LZY

এম. ও। তারপরেরটা........

হরি। RNC

এম. ও। আবার পড়ো—ওপরেরটা......... [হরির বাঁ চোখ চেপে ধরে]

হরি। M

এম. ও। তারপরেরটা........

হরি। A.K

এম. ও। তারপরেরটা........

হরি। LZY

এম. ও। তারপরেরটা........

হরি। MNC না না G.

এম. ও। হুঁ.......শুনতে পাচ্ছ?

হরি। হ্যাঁ।

এম.ও। শুনতে পাচ্ছ? [নিচু গলায়]

হরি। হ্যাঁ।

এম.ও। শুনতে পাচ্ছ? [নিচু গলায়]

হরি। হ্যাঁ।

এম.ও। (ফিসফিস করে) শুনতে পাচ্ছ?

হরি। (ফিসফিস করে) হরি পুরকায়স্থ।

এম.ও। মাথা থেকে পা, গোলমাল গোলমাল—চুলে খুস্কি, পিজিয়ন চেস্ট,

পেট মোটা, ফ্ল্যাট-ফুট, কানে খাটো—চোখে মাটো, চলবে না, চলবে না, চলবে না, চলবে না। বাড়ি যাও।

দৃশ্য ১৬

[রাস্তা]

ব্যোমকালি। কিরে হরি নিল না তোকে?

হরি। নাঃ।

ব্যোমকালি। হাউড্রোসিল? অর্শ? পেচ্ছাপের দোষ?

হরি। জানি না কালিদা।

ব্যোমকালি। যাগ্‌গে যাক্ ভালোই হয়েছে। ও মিলিটারি যা করে মঙ্গলের জন্য। বাঙালির ছেলে........লড়াই-টড়াই আমাদের জন্য নয়... পেলে টেঁশে যেতি।

হরি। আর্টিলারি, ইন্‌ফ্যান্ট্রি না হোক, আমাকে সাপ্লাইতে পর্যন্ত নিলে না।

ব্যোমকালি। আর্মি ব্যাপারটা কি রকম জানিস, হরি......অনেকটা বিয়ের মতো। বাইরে থেকে দ্যাখ সুখের সাগরে ভাসছে—স্বামী বৌয়ের দিকে তাকাচ্ছে.... যেন মাধুরী দীক্ষিত,বৌ তাকাচ্ছে স্বামীর দিকে.....অমিতাভ বচ্চন.......একটু চোরাগোপ্তা মেরে দ্যাখ—ঘোমটা ঢাকতে পেছন খালি।

হরি। আমাকে নিল না! কত ছেলে এখন কার্গিলে লাডাকে বরফের ওপর চামড়ার জার্কিন পরে হাতে স্টেন নিয়ে—

ব্যোমকালি। হ্যাঁ, রাখতো! সবাইকে কত কার্গিল—লাডাক পাঠাচ্ছে....সব ফোর্ট উইলিয়মের মাঠে নয়তো ব্যারাকপুরে। ঘাস-বিচালি ঘাস-বিচালি!

হরি। কি যে করব এখন? কাগজ বেচার কাজটা আগেই ছেড়ে দিলুম। সেলসের কাজটাও আসছে মাসে চলে যাবে—ম্যানেজার হারামি নোটিশ দিয়েছে—বলেছে বিজনেস ডবল না করতে পারলে....কি করব কালিদা?

কালি। মুর্গির কলজে তোদের—এখনি তো ককর কোঁ-ককর কোঁ। যেই ছুরির ছোট্ট একটা পোঁচ পড়ল, ব্যাস্—ফুট্। কেন? যখন চাকরি করতিস না, খেতে পেতিস না? কোন কাজটা আটকে ছিল? যা'হোক কিছু জুটে যাবে একটা। আর শনিবারের বিকেলগুলো কেউ কাড়তে পারবে তোর কাছ থেকে? হাজার হাজার লোক, সবুজ মাঠ, যাদের ফুটবল আছে তাদের কি চাইরে হরি?

হরি। তুমি—তুমি ঠিক বলছ কালিদা?

কালি। নিশ্চয়ই ঠিক বলছি, হাজারবার ঠিক বলছি।

হরি। আর তাছাড়া জানো, মিলিটারিতে যাওয়ার ইচ্ছে আসলে আমারও ছিল না। বার খেয়ে হঠাৎ চলে গিয়েছিলুম। বন্ধুবান্ধব, খেলার মাঠ, এই কলকাতা ছেড়ে বছরের পর বছর বাইরে—ওরে বাবা...ও

সোলজারের চাকরি পেলেও আমি ঠিক ছেড়ে দিতুম।

কালি। সোলজারের চাকরিতে আসলে কার সুবিধে জানিস? শুধু সোলজারের বৌদের—বর টেঁশে গেলেই সরকার থেকে দোকান বানিয়ে দেবে। দেখিসনি মেট্রোর উল্টোদিকে—আলোরাণী দাস।

হরি। মিলিটারির চাকরি জাহান্নামে যাক, বেঁচে থাকুক আমাদের ইস্টবেঙ্গল।

[বিনয়ের প্রবেশ]

বিনয়। এখন কি করবে তুমি, হরি?

হরি। সে আমি যাহোক জুটিয়ে নেব।

বিনয়। মিলিটারি ডিসিপ্লিনে তোমার ভালোই হত, হরি। ভবিষ্যতে অনেক উঁচুতে ওঠার সম্ভাবনা থাকত।

ব্যোমকালি। হ্যাঁ খুব উঁচুতে—ভগবানের কাছেও চলে যাওয়া যেত।

বিনয়। হরি, উদ্দেশ্যহীনভাবে আর ঘুরে বেড়িও না, আমার কথা শোন হরি, তুমি ভুল করছ। একটা কাজ শেখো—যে কোনও একটা হাতের কাজ। দেখবে, কখনও বেকার থাকতে হবে না—আত্মবিশ্বাসের অভাব হবে না কোনওদিন, হরি.... God helps those who help themselves একটা Apprenticeship-এ ঢুকে যাও....আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি....আর রাত্তিরে তার সঙ্গে কোনও কম্পিউটার কোর্সে ভর্তি হয়ে যাও....প্রথম কয়েকটা বছরই যা কষ্ট, তারপর সহজ সরল রাস্তা....হরি স্রোতে ভেসে বেড়িও না।

ব্যোমকালি। হরি, স্রোতে ভেসে যাওয়ার মতো আনন্দ আর কিসে আছে? পাঁচ বছর ধরে দিনে কারখানা রাতে কলেজ—জন্তুর জীবন—ফোরম্যানকে তেল দাও.....সুপারভাইজারদের খিদমদ্গারি করো, বন্ধু নেই একটাও, প্রত্যেকে প্রত্যেকের কম্পিটিটর....তারপর যখন প্রতিষ্ঠা হবে তখন বছরের পর বছর ভোরে পাইখানায় বসে চমকে চমকে উঠবি এই বুঝি কলের ভোঁ পড়ল....আর কাজের শেষে বাড়ি ফেরার পথে আবার চমকে চমকে উঠবি বাচ্চার ফুড নয়ত বৌয়ের ভেতরের জামা নিয়ে যেতে ভুল হল। বুড়ো বয়সে পেনশন নিয়ে আন্দোলন!

বিনয়। হরি, আমার কথা শোন, যে কোন একটা কাজ শেখো.....দেখবে কখনো নিজেকে ফালতু বলে মনে হবে না। যে কোন একটা কাজ শেখো!

ব্যোমকালি। কাজ শিখলেই সেই কাজ তোকে বেঁধে ফেলবে হরি। নিরাপত্তার কথা ভেবে কি হবে? ওটা একটা অভ্যেস। পুরনো চটির মতো, মাটির ভাঁড়ে খুচরো পয়সা জমানোর মতো, পুরানো দাদ চুলকানির মতো.....কিছুতেই মুক্তি নেই, হরি...মরণকাল পর্যন্ত দাসত্ব! [প্রস্থান]

বিনয়। হরি, নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি আমি, সারা জীবন নাইলনের

গেঞ্জি, স্ট্রেচলনের বেলবটস্ আর শনিবারের বিকেলে খেলার মাঠ নিয়ে চলবে না, হরি কারো চলে না.....তোমার বয়স কম....দেখতে ভালো, বুদ্ধি আছে তোমার....জীবন খুব মূল্যবান হরি, তাকে নষ্ট করো না...কাজ করো হরি, কাজ শেখো....

হরি। নাঃ! কি হবে কাজ শিখে বিনয়দা? আপনার মতো জীবন আমার চাই না—শুধু গ্যারেজ, বাড়ি, দিদি আর সাঁইবাবা—এই তো আপনার জীবন!

বিনয়। হরি! হরি....আমি তোমার বন্ধু হতে চেয়েছিলাম!

হরি। আমার বন্ধু চাই না—বিনয়দা, বন্ধু চাই না নিরাপত্তা চাই না, প্রতিষ্ঠা চাই না, আমি শুধু বাঁচতে চাই। ঐ চাপা চার দেওয়ালের মধ্যে জীবন কাটিয়ে আপনি ভুলে গেছেন, আকাশটা কত বড়.....মাঠগুলো কত সবুজ...ফিরে যান আপনি আপনার ঘরে—ঐ ট্রানজিস্টার, টেলিভিশন আর সাঁইবাবার কাছে—যেখানে ধাক্কাধাক্কি নেই, গালাগালি ঝগড়া নেই, ভালোবাসাও নেই.....শুধু শ্মশানের শান্তি....আমার চাই না ও জীবন বিনয়দা....আপনার জন্য থাকুক বাড়ি....আমার চাই বিরাট—বিরাট খোলা ময়দান!

দৃশ্য ঃ ১৭

[খেলার মাঠ]

সোম থেকে শুক্র, দমচাপা প্রতীক্ষা
তারপর শনি নয়ত রবিবারের বিকেল—
সকালে চায়ের দোকানে গুঞ্জন
অফিসের ক্যান্টিনে, কলেজের কমনরুমে অতৃপ্ত উত্তেজনা
সূর্য পশ্চিমে একটু ঢলে পড়লেই, শুরু।
ট্রামের ফুটবোর্ডে, বাসের মাডগার্ডে, বাম্পারে, ছাদে
ট্রেনের কামরায় কামরায়
মানুষ মানুষ কত মানুষ।
টালা থেকে টালিগঞ্জ বেলঘরিয়া থেকে বাঁশদ্রোণী
মানুষের ছোট ছোট ক্ষীণ স্রোত
চলছে যুবভারতীর দিকে—
ময়দানের কাছে এসে যেন এক মহানদী
জনসমুদ্রে লেগেছে জোয়ার—ঢেউ শুধু ঢেউ—
গেটের সামনে আঁকাবাঁকা আগুয়ান অজগর।
তারপর, মরে যাই মরে যাই স্বর্গের নন্দনকানন!
গ্যালারিতে পঞ্চাশ-ষাট-সত্তর হাজার অমৃতস্য পুত্রাঃ—
মাঝখানে স্বর্গীয় সবুজ
মাঝে মাঝে ঝলসে ওঠা চকখড়ির দাগ।

হেলিকপ্টাব থেকে রোমান এ্যারিনার মতোই সজীব সুন্দর।
চা গরম, চপ-চা-গরম, চাই পান
সব ছাপিয়ে গুর্খা রাইফেলসের ব্যাগ পাইপের গান—
হঠাৎ যাট হাজার বিশ্ব-বিস্মৃত অর্জুনের একজোড়া চোখ
টেন্টের দিকে।
না, টেন্টের সামনের ছোট গেটের ওপর—
ঐ ঐ ঐ আসছে
বাইশজন রাজপুত্তুর
বাইশজন গ্ল্যাডিয়েটর
ফ্ল্যাশ বাল্ব জ্বলছে শয়ে শয়ে হাজার হাজার—
মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় শেষ—
টস করা শেষ—
এবার কিক অফের হুইস্‌ল্‌।
এবার, এবার, এবার—
এ......এ.......এ......

ক্রাউড। ব্যোমকালি ব্যোমকালি
ব্যোমকালি ব্যোমকালি
ব্যোমকালি ব্যোমকালি
ব্যোমকালি ব্যোমকালি
ব্যোম ব্যোম ব্যোম কালি কালি কালি
ব্যোম ব্যোম ব্যোম কালি কালি কালি
ব্যোম ব্যোম ব্যোম কালি কালি কালি
ব্যোম ব্যোম ব্যোম কালি কালি কালি
ব্যোমকালি ব্যোমকালি
ব্যোমকালি ব্যোমকালি
ব্যোমকালি ব্যোমকালি
এ ঃ.......এঃ.......এঃ........

দৃশ্য ঃ ১৮

[রাস্তা। সাপোর্টারদের নাচ ও গান]

ক্রাউড। (গান) গোল দেবে গোল, ফটাফট ফট
গোল দেবে গোল, ফটাফট ফট
বিজন আর বাইচুং দেবে ঝটাঝট
টালিগঞ্জ, মহমেডান, হেরে সব ছারখার
লাল আর হলদের আজ জয়জয়কার
ফুটে যা, ফুটে যা, ফুটে যা —য়া-য়া।
চল ফিরে চল, লিগ নিয়ে চল লিগ নিয়ে চল

চল ফিরে চল, লিগ নিয়ে চল
চল জিতে চল, শিল্ড নিয়ে চল্।
চল জিতে চল, শিল্ড নিয়ে চল্।
সকলের সেরা দল ইস্টবেঙ্গল
গোল দেবে গোল, ফটাফট ফট
গোল দেবে গোল, ফটাফট ফট্।

দৃশ্য ঃ ১৯

[বিনয়ের বাড়ি]

বিনয়। হরি পাগল হয়ে গেছে, অণিমা....আমি কি বলব....হরি নির্ঘাৎ পাগল হয়ে গেছে......ও একটা গুণ্ডা হয়ে গেছে!

অণিমা। কি বলছ তুমি? ঐটুকু ছেলে হরি—

বিনয়। ঠিকই বলছি তো[illegible] [illegible]পারটা দুঃখের কিন্তু নিজেদের চোখ ঠেরে তো লাভ নেই। চা-ওলা বাদাম-ওলার পয়সা কেড়ে নেওয়া...বাসে ট্রামে হুজজুতি...লোকের পেছনে পটকা ছোঁড়া, বোতল মারা....পাকা গুণ্ডা হয়ে গেছে!

অণিমা। কিন্তু কেন এমন হল?

বিনয়। সেইটেই তো কথা—কেন? কোনও একটা উদ্দেশ্য থাকবে তো! কোনও দলকে ভালবাসলেই গুণ্ডামি করতে হবে! কোনও বড় খেলা হলেই তুলকালাম কাণ্ড....উল্টোদলের সাপোর্টারের ধারে কাছে পেলেই হল....হরি...ঐ ব্যোমকালি আর তার দলবল.... যেন ক্ষ্যাপা কুকুরের মতো হয়ে যায়!

দৃশ্য ঃ ২০

[রাস্তা]

[বাঁ দিক দিয়ে বিরোধী সাপোর্টারদের প্রবেশ]

বিরোধী দল। (গান) খয়েরি গোলাপি জিতবে আজ
খয়েরি গোলাপি জিতবে আজ
লাল-হলুদ তোর খেলে নেই কাজ
লাল-হলুদ তোর খেলে নেই কাজ
মানে মানে তোরা কেটে পড় এইবেলা।

ব্যোমকালির দল। (গান) বুক্নি বেশি বাড়াস না,
খেলার মাঠে দাঁড়াস না,
মেরে হাড়্ডি গুঁড়োব, যা পালা।

[জহর অন্য দলের সামনে এগিয়ে যায়, অন্য দলের একজন ছুরি হাতে নেয়, ব্যোমকালি ঝাঁপিয়ে পড়ে গোঁসাইকে টেনে আনে।]

ব্যোমকালি। জ-হ্-র

[ব্যোমকালি ছুরি বার করে হাতে নেয়। পরে হরিকে দেয়। হরির হাতে ছুরি খোলা শুরু হয়—]

ব্যোমকালি। আবে, পুলিশ—

[পুলিশের প্রবেশে সকলে পালায়]

পুলিশ। ছুরি লইয়া মারামারি কর, সুমুদ্দির পো—

[পুলিশ অনুসরণ করে]

বিনয়। ভাবতো ২০০১ সাল, সুসভ্য কোলকাতা শহরের এই অবস্থা। এতো যুদ্ধের সময় জাফনা, কার্গিল, কাবুলেরও খারাপ। ভাবত কয়েকটা স্কাউন্ড্রেল মজা মারবে আর ভুগতে হবে সাধারণ পাবলিককে। হরি.... ব্যোমকালি আর তার দলবল এসব করে বেড়াচ্ছে! এরা তো Criminal, এরা তো প্রত্যেকে একটা Potential murderer.

অণিমা। তুমি একটু বাড়িয়ে বলছ না?

বিনয়। আদৌ না, কিছু মনে কোর না, তোমার মাসি হরির পরকালটা একেবারে ঝরঝরে করে দিয়েছে—ওর যত বয়স বাড়ছে, তত ওঁর—ইয়েও বাড়ছে।

অণিমা। তুমি তো সব জেনেশুনেই আমাকে বিয়ে করেছিলে.....আর কতদিন বলেছি মাসির সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখার দরকার নেই...তুমিই তো জোর করে বারবার......

বিনয়। আহা, সে কথা হচ্ছে না অণিমা, হরির মত ছেলেরা....বয়স্কদের সম্পর্কে কোনও Respect নেই! বয়স্কদের সম্মান করতে ভুলে গেছে! আর বয়স্কদেরই বা কি চেহারা দেখছে এরা....বয়স্করাই যদি সব নীতি বিসর্জন দিয়ে বেলেল্লাপনা করে ঘুরে বেড়ায়... তবে সম্মানটা পাবে কোত্থেকে,.....এ হবেই...হতেই হবে, ঢিলটি মারলে পাটকেলটি খেতেই হবে।

দৃশ্য ঃ ২১

[বাস স্টপ ঃ চারজন অপেক্ষারত বাসযাত্রী, এদের মধ্যে একজন, অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ সৈনিক]

১ম যাত্রী। Excuse me, ন' নম্বর যেতে দেখলেন নাকি এর মধ্যে?

২য় যাত্রী। আরে দূর মশাই, আধঘণ্টা ধরে দাঁড়িয়ে আছি—কোনও নম্বরেরই পাত্তা নেই—তো ন' নম্বর।

১ম যাত্রী। Really, এদেশে বাস করাই এক ঝকমারি। লন্ডনে—

বৃদ্ধ সৈনিক। এ্যাঁ!

১ম যাত্রী। বুঝলেন লন্ডনে, Any place you want to go to, minute-এ minute-এ বাস, Tube train and what not, আর আমাদের দেশে.....

[ব্যোমকালির দলের প্রবেশ]

সোমনাথ। ইয়া—হু—উ—উ.....

সৌমিত্র। (গান) রুখ যা, রুখ যা ও জানেওয়ালে রুখ যা—
ম্যায় তো রহী তেরে মন্‌জিল কা।

ব্যোমকালি। কিবে—হারামি—রাস্তায় রোমান্টিক।

সৌমিত্র। পাইপ—(প্রথম যাত্রীর মুখ থেকে পাইপ কেড়ে নেয়)

১ম যাত্রী। what!

সৌমিত্র। ভেরি কড়া—(পাইপ ফেরৎ দেয়)

জহর। গুরু এল নাইন এলে উঠে পড়ব হ্যাঁ....

ব্যোমকালি। সব L বাস সল্টলেক নয়ত কুচবিহার পাঠিয়ে দিয়েছে।

বৃদ্ধ সৈনিক। এই যে লাইনে দাঁড়াও না খোকারা—

হরি। খোকারা?—

সৌমিত্র। লাইনে?—

জহর। লাইনে যাও ভাই, লাইনে যাও, লাইনে যাও—

সোমনাথ। লাইনে যাও ভাই, লাইনে যাও, লাইনে যাও, লাইনে যাও—
[বৃদ্ধ সৈনিকের গায়ে হেলান দেয়]

ব্যোমকালি। (গান, বৃদ্ধ সৈনিককে—)
কেটে পড়ো, ভেগে পড়ো ভামরা—

ব্যোমকালির দল। (গান) কেটে পড়ো, ভেগে পড়ো ভামরা
খসে পড়ো যত বুড়ো দামড়া
না হলে ছাড়িয়ে নেব চামড়া
এইবার এসে গেছি আমরা

[কালির দল গান গাইতে গাইতে মঞ্চের বাঁদিকে চলে যায়]

বৃদ্ধ সৈনিক। এই ছোকরাদের মতো বয়সে আমি আর্মিতে ছিলুম। আমি দেশের সেবা করেছি, একটা ফুটবল টিমের সেবা করিনি।

২য় যাত্রী। এদের জন্যেই আমরা প্রাণ তুচ্ছ করে দেশকে স্বাধীন করেছিলাম; ভাবতে পারেন!

৩য় যাত্রী। স্বাধীনতা পাওয়াই আমাদের কাল হয়েছে মশাই; বৃটিশরা ছিল বেশ ছিল। থাকত সেই আগের দিনের লালমুখো সার্জেন্টগুলো—এইসব ছোকরার পেছন দিয়ে ফুটবল বের করে ছেড়ে দিত।

২য় যাত্রী। হিটলারের মতো লোক দরকার মশাই! ডিকটেটর দরকার! ডিকটেটর! নইলে এই সমস্ত বদ ছেলেপুলেদের সায়েস্তা করা যাবে না।

বৃদ্ধ সৈনিক। এদের মতো বয়সে আমি আফগানিস্তান, বসনিয়া, ঢাকায় লড়েছি। আর এরা যুবভারতীতে লড়ছে। ছি—ছি ছি—ছি।

কালির দল। এইবার এসে গেছি আমরা
এইবার এসে গেছি আমরা
আঁহু আঁহু

সোমনাথ। এ সোঁড়িয়া—

কালি। এ কুঁড়িয়ে

বৃদ্ধ সৈনিক। আপনারা, আপনারা কি মশাই? এইসব ছোকরাদের বেলেল্লাপনা সহ্য করছেন?

সোমনাথ। গুরু, শুড্ডাগুলো তখন থেকে বড় কিচির মিচির করছে, দেব নাকি একটু কেলিয়ে?

বৃদ্ধ সৈনিক। আমি ইয়াইয়া খানের সঙ্গে লড়েছি, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে লড়েছি.....আজ এই বুড়ো বয়সে কটা ফচকে ফুটবল সাপোর্টার...

[কালি বৃদ্ধের চারপাশে ঘুরে ঘুরে বিরক্ত করে। বৃদ্ধ ভয় পায়, কালি গান ধরে, পরে কোরাস যোগ দেয়।]

কালি ও কোরাস। আহা মরি, সেপাই বুড়ো এবার খেপেছে
কবে ঘি খেয়েছি ঢেকুর আজ উঠছে।
ওসব গল্প কদ্দিন আর চালিয়ে যাবেন দাদু,
তিনকাল গে এককাল ঠেকে আছ চাঁদু।
কটা দিন আর কাটিয়ে দাও না উকুন বেছে বেছে—
আহা মরি, সেপাই বুড়ো এবার খেপেছে!

[কালির দল উদ্দাম নাচতে থাকে। এই সময় দু'জন পুলিশ ঢুকে হরি এবং কালির কলার ধরে]

জহর। আবে মামু এয়েচে।

[কালি এবং হরি ছাড়া সকলে পালায়]

কালি। কে বে?

১ম পুলিশ। রাস্তায় নাচনের জায়গা?

কালি। রাস্তায় একটু নাচলেও আপনারা—

[কালি এবং হরিকে পুলিশ ধরে নিয়ে চলে যায়]

বৃদ্ধ সৈনিক। হাকিম যা বিচার করবে তা তো জানি। মাথা চুলকোবে আর ভালো থাকতে উপদেশ দেবে। ছ'পৃষ্ঠার রায়েতে সব বড় বড় কথা লিখবে। আধুনিক জীবনযাত্রার সব জটিল সমস্যা,....যুগ-যন্ত্রণা, যুগ-শক্তির অবক্ষয়—আরও সব গুষ্টির পিণ্ডি। আরে মশাই, পড়ত এরা সব সাহেব ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে—পেচ্ছাপ করে ফেলত!

দৃশ্য ঃ ২২

[বিচারালয়]

ম্যাজিস্ট্রেট। বাস স্টপে কি করছিলে?

কালি। গান গাইছিলাম।

ম্যাজিস্ট্রেট। আমি তোমাদের সঙ্গে হাকিম হিসেবে নয়, একজন ভদ্রলোক হিসেবে কথা বলছি।...... খেলা—খেলা ব্যাপারটা কি? একটা সম্মিলিত সমবেত উদ্যোগের ফল। তাই নয় কি? মাঠে শুধু তোমার টিমের

এগারোটি প্লেয়ার থাকলেই তো খেলা হয় না। মাঠ চাই, মালি চাই, রেফারি চাই, লাইন্সম্যান চাই, টিকিট বিক্রি করার লোক চাই, ফটোগ্রাফার চাই, প্রেস রিপোর্টার চাই, দর্শক চাই, একটা বিরোধী দল চাই, যাদের সঙ্গে তোমার টিম খেলবে। অর্থাৎ বহু লোকের, যাদের অনেকে খেলতে জানে না, খেলতে চায়ও না, এইরকম সব বহু লোকের সম্মিলিত আয়োজনে একটা খেলা হয়। সেক্ষেত্রে সবাইকে নিজের নিজের কাজ করতে হবে এবং অন্যের কাজ যাতে পণ্ড না হয় দেখতে হবে......ধরো মাঠে পুলিশের কাজ হচ্ছে শান্তি রক্ষা করা.......ফেন্সের পাশে দাঁড়িয়ে আছে যাতে সাপোর্টাররা মাঠে না ঢুকে পড়ে........তা সে যদি হঠাৎ নিজের দায়িত্ব ভুলে যায়...... লেফট আউট অথবা রাইট আউট তার সামনে দিয়ে বল নিয়ে দৌড়চ্ছে.......পুলিশ তার মাথায় মারলে বেটনের বাড়ি.......ঘটনাটা ভাবতো........... ফটোগ্রাফার গোল পোস্টের পেছনে বসে আছে ছবি তুলবে বলে.........তা নয় হঠাৎ গোলকিপারের পা টেনে ধরল.........কিম্বা ধরো পেনাল্টি কিক হবে......... রেফারি নিজেই দুম করে কিক করে দিল—

৪র্থ বাস যাত্রী। একটা বড় ভাল কথা বলেছেন, এই সব কথাবার্তা.........

ম্যাজিস্ট্রেট। এটা হাসির কথা নয়। হ্যাঁ, তার মানে প্রত্যেককে নিজের জায়গায় সঠিক থাকতে হবে—Each in his own post—পণ্ডিত নেহেরু বলেছিলেন। তেমনি জীবনটাকেও যদি আমরা ফুটবল খেলা হিসেবে দেখি সেখানেও ঐ একই নীতি অনুয়ায়ী চলতে হবে। তোমাদের উত্তেজনার স্থান মাঠের ভেতরে, বাসস্টপে নয়......সেখানে উত্তেজিত হলে অন্যের ক্ষতি.........বুঝছ তো আমার কথা? (কালি ও হরি মাথা নাড়ে, Good..... Good......Very Good. পনের দিনের বিনাশ্রমে কারাদণ্ড। তারপর ছাড়া পেলে তিনমাস প্রতিদিন বিকেলে Local থানায় হাজিরা দিতে হবে।

ম্যাজিস্ট্রেট। একদিন ছিল আমাদেরও ছেলেবেলা,
দুচোখে স্বপ্ন ছিল দিগন্তগামী,
মাঠের সবুজে ছিল সংযত খেলা—
ওদের বুঝি না, সত্যি বুঝি না আমি।
আমাদের ছিল আকাশের সূর্য তারা,
ওদের আকাশে ফুটবল কম দামী
গড়িয়ে চলেছে হিংস্র ঠিকানা হারা—
ওদের বুঝি না, সত্যি বুঝি না আমি।
ওরা কি যা চায়, পায় না সহজতর,
তবে কেন রাগ কেন এত গুণ্ডামি
আধুনিকতা কি এরকম হজবর—
ওদের বুঝি না, সত্যি বুঝি না আমি।

দৃশ্য ঃ ২৩

ব্যোমকালি। আমাদের হরির জীবনের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল ফুটবল—বলা ভালো ইস্টবেঙ্গল। জজসাহেবের হুকুম তিনমাস রোজ বিকেলে লোকাল থানায় হাজিরা দিতে হবে। কাজেই যুবভারতী থেকে হরি নির্বাসিত। প্রকৃতির নিয়ম শূন্যস্থান পূর্ণ করে দেওয়া। হরির জীবনের ফাঁককে ভর্তি করল একটি মেয়ে, হরি প্রেমে পড়ল।

কি করে প্রেমে পড়ল? যেমন করে সবাই পড়ে। প্রথমে দর্শন, সঙ্গে সঙ্গে দু'জনের যে কোনও একজনের বা দু'জনের মাথায় গুনগুনিয়ে উঠল 'মন বলে চিনি চিনি'।—কিম্বা 'কহোনা প্যার হ্যায়'। তারপর সুযোগ করে সিনেমা—সিনেমায় গিয়ে রোমান্টিক দৃশ্যে হাতের ওপর হাত ফেলে দেওয়া, নয়তো কমিক দৃশ্যে একটু বেশি হেসে শরীরটা বাঁকিয়ে গায়ের ওপর ঢলে পড়া। তারপর সুযোগ বুঝে বাক্য-বিনিময়—দূতের মাধ্যমে, নয়ত face to face, তারপর সুযোগ করে রেস্টুরেন্টে, পর্দা ঢেকে পাশাপাশি বসে বকবক বকবক, মাঝে মধ্যে দীর্ঘশ্বাস.........তারপর চকাম করে চুমু.........আর detail-এ কাজ নেই, ব্যাপারটা তো সকলেরই মোটামুটি জানা। সহজ কথাটা সহজ করেই বলি। হরি প্রেমে পড়ল। সীতা নামে একটি মেয়ে, বছর ২৩ বয়স। একদিন বাসস্টপে দাঁড়িয়েছিল। এমন সময় অকুস্থলে আগমন শ্রীমান হরি পুরকায়স্থর। বাকিটা আপনারা দেখুন পাদপ্রদীপের আলোয়।

[সেন্টার স্টেজে বৃত্তাকার রঙিন আলোতে বাসস্টপে অপেক্ষামানা একটি মেয়ে। হরি তার সামনে দিয়ে হেঁটে গেল। হঠাৎ একটি মেয়ে রয়েছে খেয়াল হওয়াতে ফিরে তাকাল, তারপর মেয়েটির সামনে দিয়ে পেছন দিয়ে হাঁটা শুরু করল। মেয়েটি প্রথমে সচেষ্টায় উদাসীন, পরে বিরক্ত, তারপর কৌতূহলী, তারপর গর্বিত, তারপর খুশি, তারপরে উৎসাহী। ইতিমধ্যে হরি বৃত্তাকারে দ্রুত মেয়েটির চারপাশে ঘুরতে শুরু করেছে। সঙ্গে বাজনা। বৃত্ত ক্রমেই ছোট হচ্ছে। মেয়েটির হাত দু'ধারে ছড়ানো—ব্যালেরিনার মতো। হঠাৎ বাজনা থামে, সাধারণ আলো এসে পড়ে। হরি মেয়েটির হাত ধরে হাঁটতে শুরু করে যেন কতদিনের চেনা।]

হরি। কি রোজ রোজ রিহার্সাল করতে যাও ভাল লাগে না। তোমায় রিহার্সালে পৌঁছে দিয়ে আসি তো......তারপর ফেরার পথে একা একা...কি রকম একটা........একটা..........ভীষণ রাগ ধরে যার মাঝে মাঝে।

সীতা। রাগ.........কার ওপর?—আমার ওপর?

হরি। নাঃ তোমার ওপর না.........তুমি তো একটা কাজে যাও, তোমার ওপর.....মানে একা একা ফিরি তো.....তখন সে নানান কথা মাথার মধ্যে...মানে.......দূরে সে তোমায় বোঝাতে পারব না

সীতা। বুঝেছি গো বুঝেছি! ঠিক আছে, আজ রির্হাসালে যাব না!

হরি। যাবে না? টপ সীতা......তুমি মাইরি চাম্পি,........এই, একটা জায়গায় যাবে?

সীতা। কোথায়?

হরি। আমার দোস্তরা সব আসবে ওখানে—

সীতা। আরে কোথায় বলবে তো!

হরি। বরানগরে..........ইস্টবেঙ্গল টিমকে রিসেপশন দিচ্ছে........কতদিন ওদের দেখিনি—প্রায় আড়াই মাস হয়ে গেল। যাবে?

সীতা। চলো।

হরি। এ্যা, এ্যা।

[হরি সীতার সামনে হাঁটুগেড়ে বসে সীতার হাত ধরে মাথায় ঠেকায়]

হরি। সবে শুনা হো, এ সীতা মাইয়া তুহর চরণ ধরিব........

[হরি ও সীতার প্রস্থান]

দৃশ্য ঃ ২৪

[সংবর্ধনা সভা ঃ কিছু সমর্থক ছেলে মেয়ে]

সমর্থক দল (গান)

১ম সমর্থক। না ভাসায়ো রাধা অঙ্গে,

অন্য সমর্থক। বেশ জমিয়ে ধর—

১ম সমর্থক। (উৎসাহে) না ভাসায়ো রাধা অঙ্গ,

সকল সমর্থক। আ-হা-হা,

১ম সমর্থক। না নিয়ো গো ঘাটে,

সকল সমর্থক। ও-হো—হো,

১ম সমর্থক। মরিলে পুঁতিয়া রেখো

সকল সমর্থক। কোথায়?

ব্যোমকালি। ইস্টবেঙ্গলের মাঠে—

[সকলে 'গুরু', 'ব্যোমকালি' ইত্যাদি সম্বোধনে উল্লাস করে উঠে।]

সকল সমর্থক। ইস্টবেঙ্গল আমি ভালোবাসি,
টালিগঞ্জ ভালো মহামেডান ভালো
তবু ইস্টবেঙ্গল ভালোবাসি।
পিয়ারলেস ভালো, মোহনবাগান ভালো
তবু ইস্টবেঙ্গল ভালোবাসি।
ইস্টবেঙ্গল, ইস্টবেঙ্গল, ইস্টবেঙ্গল, ইস্টবেঙ্গল,
হরিবল, হরিবল, হরিবল, হরিবল......

১ম সমর্থক। অঞ্জন—

[অঞ্জনকে ফুলের তোড়া হাতে দেখা যায়]

সকল সমর্থক। অঞ্জন, অঞ্জন,

অঞ্জন, অঞ্জন, অঞ্জন,
অঞ্জন, অঞ্জন, অঞ্জন,
অঞ্জন, অঞ্জন, অঞ্জন...........

সীতা। অঞ্জন কে?

হরি। কি বলছ? শুনতে পাচ্ছি না!

সীতা। অঞ্জন কে?

হরি। আমি শুনতে পাচ্ছি না!

সীতা। অঞ্জন কে?

হরি। আমি শুনতে পচ্ছি না!

[অঞ্জন ফুলের তোড়া ছুঁড়ে দেয়]

সকল সমর্থক। (গান) অঞ্জন সরকার সেরা লিংকম্যান,
যখন তখন গোলে সুযোগ করে দেন,
আই আই অঞ্জন, অঞ্জন,
আই আই আই।
অঞ্জন সরকার সবার সেরা
যদিও বা থাকে ছ'জনে ঘেরা
ওরই ফাঁকে ঠিকঠাক থুরু দিয়ে দেন।
থুরু নিয়ে জামসেদ গোল ক'রে দেন।
আই আই অঞ্জন, অঞ্জন, আই, আই, আই।

[সকলে নাচতে নাচতে চলে যায়]

দৃশ্য ঃ ২৫

[পার্ক]

সীতা। দারুণ! দারুণ না!

হরি। কি?

সীতা। ঐ যে ব্যাপারটা.........নাচ, গান হৈ হৈ...........

হরি। তোমার ভালো লেগেছে?

সীতা। দারুণ...........

হরি। তোমার থিয়েটারের থেকেও?

সীতা। দুর। থিয়েটারের তো রিহার্সাল, নিয়ম, ডিসিপ্লিন। আর ওদের কি রকম.........কি রকম যেন ভেসে যাচ্ছে হাওয়ায়—দারুণ এক্সাইটিং।

হরি। মাঠে গেলে না তোমার ফ্যান্টাস্টিক লাগবে! তুমি যাবে? আমার সঙ্গে খেলা দেখতে?

সীতা। যাব।

হরি। সীতা তোমাকে একটা জিনিস দেব আমি। নেবে?

সীতা। কি জিনিষ?

হরি। একটা লাল আর হলদে—ইস্টবেঙ্গলের কালার—লাল হলদে

ম্যাক্‌সি। তোমায় দারুণ দেখাবে আর......আর মাঠে না হৈ চৈ পড়ে যাবে।

সীতা। না, সে বাড়িতে বড্ড ঝামেলা হবে।

হরি। বাড়িতে যা হোক একটা তাপ্পি দিয়ে দিও। তুমি নিলে না আমার খুব......ভাল লাগবে.......আমার বন্ধুরা flat হয়ে যাবে।

সীতা। ঠিক আছে, নেব।

হরি। আমাদের একটা বিরাট দল আছে, অনেক মেয়েও আছে—সব ইস্টবেঙ্গলের সাপোর্টার। সব সময় আমরা টিমকে সাপোর্ট করেছি। বছরের পর বছর.......জিতলেও, হারলেও....... যেখানে খেলা হয়েছে দল বেঁধে গেছি— বম্বে, দিল্লি, কটক, কানপুর—সব জায়গায়.....সে যে কি গ্রেট মজা তুমি ভাবতেই পারবে না।

সীতা। আমিও এখন থেকে যাব তোমাদের সঙ্গে।

হরি। গুলু, গুলু, গুলু! সীতা, সীতা তুমি আমায় ছেড়ে যাবে না তো? কি.....চুপ করে রইল যে? বলো?

সীতা। বারে, কি বলব?

হরি। ঐ যে জিজ্ঞেস করলাম!

সীতা। এসব কি বলা যায় নাকি? যদি কোনওদিন অন্য কাউকে ভাল লাগে?—যদি কোনওদিন তোমাকে ভাল না লাগে?—কথা দিয়ে কথা না রাখলে পাপ হবে না?

হরি। সীতা, তুমি কাটিয়ে দিচ্ছ মাইরি—এ খেলায়—আমাদের খেলায় ভালোবাসার ভাগাভাগি চলে না.........যাকে ভালোবাসবে শুধু তাকেই ভালোবাসতে হবে........আমি চাই যে আমাকে ভালোবাসবে সে আমাদের টিমকেও ভালোবাসবে—এই শনিবার—তার পরের শনিবার—তারপরের শনিবার—চিরকাল.......এক সিজন টিম খারাপ খেলল অমনি বেটার টিমকে সাপোর্ট করা—সেসব চলবে না.....বিশ্বস্ততাই আসল, বুঝলে, মানে সীতার মতো একনিষ্ঠ। সীতা তুমি আমায় ভালোবাসো?

সীতা। আমি ঠিক জানি না।

হরি। কিন্তু তুমি আমাদের টিমকে ভালোবাসো তো?

সীতা। হ্যাঁ......কিন্তু আমি তো কোনওদিন খেলা দেখিনি।

হরি। আমি নিয়ে যাব তোমায়—সামনের শনিবারে! দেখবে লাল হলদে জার্সি পরে ১১টা বাঘের বাচ্চা.......অঞ্জনকেও দেখবে।

সীতা। অঞ্জন!

হরি। তুমি সাপোর্টারদের ইনস্পিরেশন হবে—আমাদের টিমের ইনস্পিরেশন!.... তোমায় আমি সব খেলায় নিয়ে যাব। বাইরের খেলাতেও......

সীতা। বাইরে?—কিন্তু বাড়িতে তো—

হরি। ধ্যুৎ! বাড়িতে বলবে থিয়েটার করতে যাচ্ছ, ব্যাস্! সব জায়গায়

নিয়ে যাব—জামসেদপুরে কিনান স্টেডিয়াম, কটকে বারাবাটি, বম্বেতে কুপারেজ, দিল্লিতে আম্বেদকর স্টেডিয়াম,—আমি তোমাকে গোটা দুনিয়া দেখাব, সীতা!

সীতা। দারুণ! দারুণ হবে না?

হরি। সালগাঁওকর, কোচি FC, JCT, চার্চিল ব্রাদার্স, ডেম্পো দেখবে..... দেখবে বাঘ-সিংহর লড়াই, বাইরের মাঠে পাঞ্জাবি, মাদ্রাজি, হিন্দুস্থানী, গুজরাটি, মারাঠি—সব নানান লোকের ভিড়......তার মাঝখানে আমরা কয়েকজন। প্লেয়াররা মাঠে নামলে আমরা ফ্ল্যাগ নাড়বো.......ওরা আমাদের দিকে তাকাবে...... তোমার দিকে তাকাবে.......জানবে আমরা আছি, ওদের জন্যে, শুধু ওদের জন্যে—

সীতা। আমি যাব, আমি যাব, আমি যাব।

দৃশ্য ২৬

পার্ক

[ব্যোমকালির সফরের গান]

ব্যোমকালি যায়রে যায়রে..........
একদিন কলকাতার মাঠে খেলা দেখে বেরিয়েছি। আমি, জহর, সম্রাট, হরি আমার গার্লফ্রেণ্ড কাঞ্চন! কিঁউ ভাই! গ্লার্লফ্রেণ্ড! আর ফুটবল মাঠের হিরোইন সীতা দ্য গ্রেট। তো বাসস্টপের কাছে এসেছি—ঐ বাইপাস কানেক্টরের মুখটায়—ঐ যে MOD DHABA আছে না। সেইখানে এক মিস্টার ঘ্যাম ঐ যে সেলফোন স্যান্ট্রোওলা—সঙ্গে বৌ। বহুত ভাও নিয়ে বসেছিল—আমাদের দেখেই খি খি করে হাসতে শুরু করে দিল।

MAN ওঃ হো—Give me a break.

WOMAN Kit Kat চাহিয়ে?

MAN COKE লাও।

[কফিওয়ালার প্রবেশ]

কফিওয়ালা। কফি, কফি কফি কফি নেসকফি।

ব্যোমকালি। শালা, ভাঁড়ের চা ছেড়ে কফি আর কোক বেচছো? [চড় মারে]

কফিওয়ালা। বাঃ দাদা, এখনও বউনি হল না—কফি, কফি, কফি, কফি......

ব্যোমকালি। এত হাসি কিসের? দাদা দিদির?

MAN খেলনা কুঁদনা খতম? কৌনসা গেইম আছে? Which is your game?

ব্যোমকালি। Poor man's game Football.

জহর। ঘুষখোরদের ডাণ্ডাগুলি—বড়লোকের নাতিদের খেলা ক্রিকেট নয়।

সম্রাট। আজ পয়সাওয়ালা লালুভুলুদের পেন্টুল খুলে নেওয়া হয়েছে।

MAN আপ মুঝে কুছ কহ রহে হ্যঁায়। এ্যায়সা মত বোলিয়ে। ভারি পড়

যায়েগা।

WOMAN গালি দিবেন না। ভাই,

MAN No wrong moves please !

ব্যোমকালি। Hey. রাইট, রঙ। অন্যায় তো অনেক আছে—জীবনের বিকেলে ছাপোষা মানুষদের PF/PPF-এর সুদ কেটে নেওয়া। কলকারখানা বন্ধ করে সেই জমিতে হাইরাইজ বানানো, বুড়ো মানুষদের হঠাৎ PVRS দিয়ে দেওয়া ট্যাক্সো বসিয়ে সাধারণ মানুষের রক্ত চুষে নেওয়া এসবই তো অন্যায় মানছেন আপনারা?

WOMAN কে খুন চুসছে ভাই—

হরি। আপনারা চুসছেন ভাই—

সম্রাট। সব রক্ত চেটে মেরে দিলেন ভাই—

জহর। ভাই— ই...

WOMAN হায় রাম।

MAN Shut up! এসব বাত বোলবেন না। খেটে খাই হামরা, মেহনত করে পয়সা কামাতে হয়।

সম্রাট। বেবিফুড চুষে, ক্লাসে গাড্ডু মেরে বড় হয়েছেন, গাড়ি হাঁকাচ্ছেন, বাড়ি প্যাঁদাচ্ছেন—আবার পিৎজা মারছেন।

জহর। ভেবেছিলেন কানে সেলফোন সাঁটিয়ে, Chief minister হবেন?

হরি। খেটে খাই? খেটে খেলে অত গাড়ি, বাড়ি, নক্সা হয়? হারামের টাকা ছাড়া এত র‍্যালা হয় না।

WOMAN হায় রাম। বাঁচাও!

MAN Hey। হামাদের দিমাগ আছে ভাই। অক্‌ল হ্যয় অক্‌ল। You got that—অক্‌ল কে দুশমনো। ইসলিয়ে হামলোগ পিৎজা খাতে হ্যায় অওর তুম সালে নৌকর আমাদের Santro সাফা করো।

হরি। কি বললেন? চাকর আমরা, এই শালা তোকে সাফ করব আজ। শালা হারামখোর।

WOMAN Hey Ram, বাঁচাও, চলো জি—ইহাঁসে...

MAN Don't you interfare, look she is my bloody wife. Hey! হামসে মাফি মাঙ্গনা পড়েগা।

ব্যোমকালি। মাফি! কি জন্যে! Wife-কেই ঘরে বন্ধ রেখে অফিসের Anti Chember-এ যখন সেক্রেটারির সঙ্গে শোও তখন ভগবানের কাছে মাপ চেয়ে নাও? হারামি। (চড় মারে)

যুবক। অনেকক্ষণ ধরে দেখছি আপনাদের। এবার যান তো।

হরি। কেন বে? একি তোর কেনা জায়গা?

যুবক। না কেনা নয়, তবে ইচ্ছে করলেই কিনতে পারি। তোমাকে কিনতে পারি তোমার বাপদাদাকে কিনতে পারি, তোমার মা-বোনকে কিনতে পারি। ফোটো এখান থেকে ...

হরি। কি আমার মা তুললে তুমি! কালিদা, ঝাড়োতো শালাকে।

যুবক। সিপাইজি। একটু এদিকে আসুন তো।

সিপাই। কি হয়েছে কিরে বাবা?

যুবক। দেখুন তো, এই দু'জন তখন থেকে এদের Taunt করছে, Tease করছে। Marxism-এর ওপর Lecture দিচ্ছে।

সিপাই। কি হয়েছে? কি করেছে এরা?

যুবক। ভারত সবার দেশ। এমন কোনো নিয়ম আছে যে এখানে বড়লোক থাকতে পারবে না?

MAN O God! This is absurd!

যুবক। তখন থেকে এরা বড়লোক মানে চোর খুনি হারামখোর এইসব বলে যাচ্ছে।

সিপাই। এই যে মশায়। খেলা শেষ, বাড়ি যান। ছোটোলোক বড়লোক ওসব গান্ধীর স্ট্যাচুর নিচে গিয়ে বলবেন।

হরি। আপনি পুলিশ হয়ে বড়লোকদের Support করছেন। হাজারটা ধান্দা ফেঁদে বসে আছে। কালো টাকা জমাচ্ছে, বিদেশে টাকা পাঠাচ্ছে, বোনাস চাইলেই লক আউট লে অফ— গোটা দেশকে চুষে খাচ্ছে শালা।

ব্যোমকালি। তোর মা তুলেছে সেটা বল।

হরি। আমার মা তুলেছে। কি অন্যায় বলুন আপনি।

যুবক। Ok, I am sorry– এদের ব্যবহার যদি দেখতেন। তোমরা— দাদারা বয়সী লোক—সঙ্গে স্ত্রী রয়েছেন—মাফ চাইবে তো?

সিপাই। ঠিক আছে ঠিক আছে, ঝামেলা বাড়াবেন না। দিনভর ঘুরে বেড়াচ্ছি, একপয়সা আমদানি নেই যান তো—

ব্যোমকালি। যাব কি করে?

সিপাই। যাব কি করে মানে?

ব্যোমকালি। গায়ে খুব জোর। Health food খায় তো।

হরি। আমরা পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে দেখা করব।

সিপাই। আমার ডাণ্ডার সঙ্গে দেখা করবে তুমি। চলো ফোটো—

যুবক। Thank you so much. আপনি ঠিক সময়ে এসে পড়েছেন— না হলে........

সিপাই। না না, এতো আমার কর্তব্য। তাছাড়া আজকালকার ছেলেছোকরারা সব—পানপরাগ নাকি?

MAN হাঁ হাঁ ! থোড়াসা চলেগা?

সিপাই। দিন

দৃশ্য ঃ ২৭

পথ

সীতা। বাব্বা! খুব জোর একটা লেকচার দিচ্ছিলে তুমি।

হরি। মা তুলে কিসব বলল না......মেজাজটা খারাপ হয়ে গেল। সত্যি কথা বলতে কি বড়লোকদের ওপর আমার রাগ-টাগ বিশেষ নেই। রোজগার করছে—তা আমার বাপের কি? কিন্তু মা তুলে কি সব বলল না?

সীতা। আসলে তোমার মা নিয়ে কিছু বলেনি, সাধারণভাবে বলেছে......সকলের মা সম্পর্কে বলেছে।

হরি। আমি আমার মা-র কথা ভাবছিলাম।

সীতা। ও, মা'কে খুব ভালোবাস? বুড়ো খোকা!

হরি। মা'কে....মা নেই।

সীতা। নেই মানে?

হরি। নেই মানে নেই। মরে গেছে.....আমার ছ'মাস বয়সে....মাসির কাছেই মানুষ আমরা।

সীতা। মাসিকে ভালোবাস খুব?

হরি। হ্যাঁ বাসি......এই শোনো, আমাদের বাড়ি যাবে? মাসির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব?

সীতা। না বাবা, না।

হরি। কেন, চলো না....মাসি হয়ত একদিন তোমারও মাসি হবে।

সীতা। যাঃ, সে কি বলা যায় না কি?

হরি। প্রেম ঠাণ্ডা হয়ে গেল?

সীতা। না, তা নয়। তবে তুমি সবেতেই এত তাড়াহুড়ো করো না! কি বা বয়স আমাদের!

হরি। ঠিক আছে, এমনিই চলো আমাদের বাড়ি।

সীতা। আজ না, আজ না, রাগ করো না, লক্ষ্মীটি। আর একদিন যাব, কেমন?

হরি। বেশ আগের থেকে একটা দিন ঠিক করে......মাসিকে বলে রাখব।

সীতা। তোমার বাবা......কি করেন?

হরি। বাবা নেই.....আমার ছ'মাস বয়সে—

সীতা। আজ যাই, কেমন?

হরি। চলো, কাল দেখা হচ্ছে তাহলে আঠারো নম্বর গেটে।

[নেপথ্যে '—বাবা কে তোর' গানটি বাজে]

দৃশ্য ঃ ২৮

[পর্দা খুললে দেখা যায় মাসি গান গাইছে—ফণী মাসির চুল আঁচড়াচ্ছে]

মাসি। (গান) আগে যদি জানতাম আমি
যাইবারে ফালাইয়া
দুই চরণ বাইন্ধ্যা রাখতাম
মাথার কেশ দিয়ারে বন্ধু.....

[ফণী মাসির মাথার একটি পাকা চুল তোলে]

মাসি। খুব পেকেছে?

ফণী। নাঃ, কই আর! [পাকা চুলটি পকেটে রাখে]

[হরি অন্যমনস্কভাবে মঞ্চে প্রবেশ করে]

মাসি। কে এসেছে দ্যাখ হরি। তোর ফণীমামা।

হরি। ফ—ণী—মা—মা!

ফণী। কি গো হরি?

হরি। এ ফণীমামা না মাসি, এ হারামি মামা। এ শুয়োরের বাচ্চা কলকাতা শহরে যত অশ্লীল ম্যাগাজিন বেরোয় সব বিক্রি করে খায়। সব ন্যাংটো মেয়েছেলের ছবি বেচে খায়। এ ফণীর বাচ্চা—

ফণী। হরি, কি হচ্ছে ভাই? আমি তো দেশ, সানন্দা, সুখী গৃহকোণ বেচি..... ভেবে দেখ, আমার জন্যই তুমি মাস গেলে ৭-৮০০ টাকা রোজগার কর।

হরি। তোমার ঐ টাকা আমি চাই না শুয়োরের বাচ্চা। ঐ টাকা তুমি তোমার মা'কে দাও—তারপর, তার সঙ্গে শোও গিয়ে **(ফণীর কলার চেপে ধরে)** বেরও...... বেরও..... বেরও.....

ফণী। আঃ কি হচ্ছে হরি....ছাড়ো....ছাড়ো। বসো, বসো, এত উত্তেজিত হচ্ছো কেন? যাই তাহলে? আসি। হাঃ.........হাঃ......হাঃ.....

[ফণী হাসতে হাসতে বেরিয়ে যায়]

মাসি। এ বাড়িতে কোনও লোক এলে সবসময় তুই—

হরি। মাসি তোমাকে লোকে—বেশ্যা বলে।

মাসি। কি বললি তুই?

হরি। তোমাকে সবাই বেশ্যা বলে।

[মাসি সশব্দে হরির গালে চড় মারে। হরি কাঁদতে থাকে। মাসি উত্তেজিত অবস্থায় বলে—]

মাসি। তুই আমাকে এত বড় কথা বললি? তো'র বাপ যখন মারা গেল তখন আমার আঠারো.....চারপাশে কেউ নেই..... কোনও আত্মীয়স্বজন নেই যে সাহায্য করে..... লেখাপড়া জানিনা যে চাকরি করব.... কত ভাবে.....কত ভাবে রোজগারের চেষ্টা করেছি.... কেউ সাহায্য করেনি....খালি গা দেখেছে আর শরীর.....আমার শরীর নিয়ে—আঃ.... তোর আর অণুর জন্য আমি বিয়ে করার কথা ভাবিনি

পর্যন্ত.....আর তোরা..... তোরা.....এতদিন কেন ভাবিসনি? তোদের খাওয়া পরা কিভাবে চলছে? তোর ইস্কুলের খরচা, অণুর কলেজের খরচা কোত্থেকে আসছে? এই বাহারি গেঞ্জি.....এই স্ট্রেচলনের প্যান্ট ....এই সবই তো এসেছে.....এই.....এই শরীর.....এই শরীর বেচার টাকায়। এতদিন সব চোখে পড়েনি তোদের? আর আজ তুই আমাকে বেশ্যা বললি? বাঃ বাঃ রে সোনার ছাওয়াল! বাঃ—বাঃ—বাঃ.....থুঃ......থুঃ......থুঃ.....

হরি। আর বোলো না মাসি, আর বোলো না। মাসি, আমি তোমায় খুব ভালবাসতাম। মা'কে.....মা'কে আমার ভাল করে মনে নেই। তুমি—তুমি আমার মা ছিলে। আমি রোজগার করতুম—তাই দিয়ে সংসার চলত.....তুমি আমি দু'জনে থাকতুম—তারপর—একদিন আমার বউ আসত ঘরে.....তুমি বুড়ো হলে সে তোমার সেবা করত। এমন কেন হল না মাসি! মাসি তুমি ওদের আর ডেকো না। ওদের আর ডেকো না মাসি।

মাসি। আর হয় না। এতদিন ধরে সাধ-আহ্লাদ, ভালো ভালো ইচ্ছের সব গলা টিপে মেরে ফেলেছি। আর হয় না। এই, তুই তো একটা চাকরি পেয়েছিস, দাঁড়িয়ে গেছিস। এবারে আমাকে ছুটি দে....আমাকে রেহাই দে তোরা। আমার কাছ থেকে চলে যা হরি। পারলে ভালো থাকিস। আমার তো কিছু হল না হরি, তোর যেন সব হয়... যেন সব হয়।

হরি। আমার যে সব গেল মাসি, আমার যে....ফুটবল ছাড়া আর কিছু রইল না। আমার যে সব গেল।

[হরি কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে যায়]

মাসি। হ.....রি......

[নেপথ্যে। "কেন চেয়ে আছ, গো মা, মুখ পানে।
এরা চাহে না তোমারে চাহে না যে,
আপন মায়েরে নাহি জানে"।—
গানটি বাজতে থাকে]

দৃশ্য ঃ ২৯

[বিনয়ের বাড়ি]

বিনয়। হরি কী করছে?

অণিমা। বাথরুমে গেছে বোধহয়।

বিনয়। সামনের মাস থেকে হরির জন্য হাফ লিটার দুধের বন্দোবস্ত করলুম। ওর শরীরটা একটু ভালো করা দরকার।

অণিমা। ভালোই তো!

বিনয়। আর শোনো, ঐ ও'-র জামা-কাপড় যথেষ্ট আছে কিনা জেনে নিও।

দরকার হলে, আজকালের মধ্যে একবার দর্জির কাছে ও'-কে নিয়ে গিয়ে অর্ডার দিয়ে দিও।

অণিমা। কী দরকার অত? আবার এককাঁড়ি খরচা।

বিনয়। না, না, ও'-টা কোনও ব্যাপার নয়। আর শোনো, পাঁচশো টাকা দিয়ে ও'-র একটা ব্যাঙ্কঅ্যাকাউন্ট করিয়ে দিতে হবে। অল্প বয়সেই সঞ্চয়ের হ্যাবিটটা তৈরি করে দেওয়া দরকার। তুমি দেখো.....ছ' মাসের মধ্যে আমি হরির চরিত্র পাল্টে দেব। আমার ডিরেক্ট গাইডেন্সে থাকবে তো! ও, ভালো কথা, তোমাকে কবে থেকে বলছি হরির জন্ম সময়টা দিও, ও'-র হরস্কোপটা একবার দেখা দরকার। তা তুমি তো.....এসো হরি.... বোসো। সকালে খেয়েছ কিছু?

হরি। হ্যাঁ বিনয়'-দা।

বিনয়। হরি, তুমি গান-বাজনা পছন্দ করো?

হরি। গান? হ্যাঁ।

বিনয়। গান ব্যাপারটা খুব ইনপরট্যান্ট। এটা হচ্ছে আমীর খাঁ—রাগ মাড়োয়া আর দরবারী।

হরি। আপনার কাছে মাইকেল জ্যাকসনের রেকর্ড নেই বিনয়দা?

বিনয়। না না.....ওসব জ্যাকসন কি জানো—সাময়িক ব্যাপার...আর এ'সব গান হচ্ছে লোকায়ত মানে চিরায়ত....অবিশ্যি আমার classical কণ্ঠ-সঙ্গীত বিশেষ সুবিধে লাগে না—তা শুনলুম আমীর খাঁ সাহেব নাকি এক নতুন ঘরানার সৃষ্টি করেছেন.....তাই ভাবলুম ওঁর একটা latest রেখেই দিই......

অণিমা। কি বলছ তুমি?

বিনয়। বলছি যে জীবনের বহু ভালো দিক আছে, সেগুলো হরিকে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার, ও'-র চোখ খুলে দেওয়া দরকার।

অণিমা। তা ঠিক হরি। বিয়ের আগে আমি বুঝলি কি রকম যেন ছিলুম। তোর জামাইবাবু আমার চোখ খুলে দিয়েছে। জীবনের সব ভালো ভালো জিনিস জলের মতো বুঝিয়ে দিয়েছে আমায়।

বিনয়। হ্যাঁ, আর একটা কথা হরি.....তুমি, তুমি মোটেই পড়াশুনো করো না.... এটা ঠিক নয়—

হরি। কেন আমি পড়ি, খেলা, Sports Star, গড়ের মাঠ, স্পোর্টস উইকও পড়ি।

বিনয়। না, না, ওসব বই নয়.....এমন সব পড়তে হবে যা তোমাকে বিকশিত করবে.....সৌন্দর্য বোধ সম্বন্ধে সচেতন করবে......জীবনবোধকে জাগ্রত করবে।

হরি। আবার পড়াশুনো শুরু করতে হবে?

বিনয়। আমি আমি তোমায় হেল্প করব....আর সবচেয়ে বড় কথা বাড়ি—বাড়ির পরিবেশ.....একটা থাকার ঘর, একটা বাথরুম মানেই তো বাড়ি নয়....ওটা তো আস্তানা—আস্তানাটাকে বাড়ি বানিয়ে তুলতে

হবে! আসল কথা ইয়ে হরি তোমার তো একটি গার্লফ্রেণ্ড আছে! তাকে এই দৃষ্টিভঙ্গিটা বোঝাতে হবে তোমাকে।

• হরি। কি করে?

বিনয়। কি করে....ধরো ওর জন্ম দিনে এমন একটা কিছু প্রেজেন্ট করো শাড়ি বা জিনস নয়, এমন একটা কিছু যা—

হরি। আমি ভাবছিলাম ওকে অঞ্জনের একটা ছবি দেব।

বিনয়। অঞ্জন? অঞ্জন কে?

হরি। অঞ্জন সরকার—ইস্টবেঙ্গলের। আজকাল ও'র ছবি অনেক মেয়ে এ্যালবামে রেখে দ্যায়—এক একটা বাড়িতে শোবার ঘরে টাঙিয়ে রাখে।

বিনয়। হরি! কিছু মনে কোরো না.....তুমি বয়সে ছোট, গার্লফ্রেণ্ডের শোবার ঘরে কাউকে—এমন কি কারুর ফটোও ঢুকতে দেওয়া ঠিক নয়— I mean কেউ ঢুকলে তুমি নিজে ঢুকবে।

অণিমা। কি হচ্ছে, যতসব বাজে কথা!

বিনয়। না—আমি এ্যাটিচুডটার কথা বলছিলাম.....গার্লফ্রেণ্ডের শোবার ঘরে অঞ্জনের ছবি....ঠিক নয়.....এমন কিছু দাও যাতে ও-'র রোজ তোমার কথা মনে পড়ে।

হরি। কি রকম?

বিনয়। ধরো তোমার নিজের একটা ছবি, ভালো ফ্রেমে বাঁধানো।

হরি। না, না, সে হয় না বিনয়দা', ওর কাছে বাইচুং, রিভাল্ডো, জিদান, জিকো—এদের সব ছবি আছে—তাদের মাঝখানে আমার ছবি!

বিনয়। ঠিক আছে, তুমি নিজে একটা কিছু বানাও— •

হরি। কি বানাবো?

বিনয়। কি বানাবে না? একটা বোতলের ওপর একটা টেবিল ল্যাম্প বানাও। আমার এক ক্লায়েন্টের বাড়িতে দেখেছিলাম। very interesting.

হরি। খুব ঝামেলা হবে?

বিনয়। না না.....আমি হেল্প করব তোমায়! আমিই! আমিই জিনিসপত্র জোগাড় করে দেব—দেখবে কি রকম তৃপ্তি হবে—একটা আত্মবিশ্বাস জন্মাবে নিজের মধ্যে—

হরি। ঠিক আছে। বিনয়দা—আমি....আমি একটু বেরোচ্ছি।...ইয়ে বিনয়দা—

বিনয়। বলো।

হরি। আপনি.....আপনি খুব...ভালো।

বিনয়। দূর পাগল!

[হরি বেরিয়ে যায়]

অণিমা। সত্যিই তুমি খুব ভালো। তোমার জন্যে ছেলেটার জীবনের মোড় ঘুরে যাবে।

বিনয়। আমাদের পরিবারটি এতদিনে সম্পূর্ণ হল।

দৃশ্য ঃ ৩০

[পার্ক]

ব্যোমকালি। বিনয়বাবুর পরিবার সুখী পরিবার। বড় ভালো। খাঁটি বাঙালি মধ্যবিত্ত পরিবার, উচ্চবিত্ত হওয়ার সাধনায় রত। এদের ব্যাঙ্কে টাকা জমে খাওয়া-খরচ ছাঁটাই করে। রবীন্দ্রনাথকে এঁরা পুজো করেন, পড়েন না। শরৎচন্দ্র পড়েন, পড়ে কাঁদেন—কেন জানেন না। সিনেমা দেখেন সত্যজিৎ—সন্তোষীমা—শোলে—সব। এঁদের সবচেয়ে পছন্দ বাঙালি জাতির অধঃপতন নিয়ে উচ্চগ্রামে আলোচনা। এঁরাই হলেন খাঁটি মধ্যবিত্ত বাঙালি সুখী পরিবার।

দৃশ্য ঃ ৩১

[পার্ক]

সীতা। (গান) আমার সোনার বাংলা
আমি তোমায় ভালবাসি

[ঘড়ি দেখে]

[গান] আমার সোনার অঞ্জন
আমি তোমায় ভালবাসি

[হরির প্রবেশ]

আমার সোনার ম.....আঃ

হরি। আজ তোমার জন্মদিন.....এইটা এনেছি।

সীতা। কি ওটা?

হরি। একটা প্রেজেন্ট আমি নিজে বানিয়েছি।

সীতা। বাড়িতে বানানো—সে কি রকম বাজে মতন হয়—

হরি। না তুমি দ্যাখো—খুব ইন্টারেস্টিং।

সীতা। কই দেখি। বোতল....টেবিল ল্যাম্প!

হরি। পছন্দ হয়েছে তোমার?

সীতা। এত বড় বোতল—এতো মাঠে ছোঁড়াও যাবে না।

হরি। সীতা!

সীতা। বারে। এটা নিয়ে কি করব আমি?

হরি। তোমার শোবার ঘরে রাখবে।

সীতা। আমাদের টু-পিন প্লাগ—এটা তো থ্রি-পিন।

হরি। আমি পাল্টে দেব, বিনয়দা হেল্প করবে আমায়।

সীতা। তারপর? শোবার ঘরে এটা নিয়ে কি করব আমি?

হরি। বিছানার পাশে জ্বেলে শুয়ে শুয়ে পড়বে রাত্রে।

সীতা। আমার বিছানায় দুই বোন, আর ছোট ভাই শোয়..... বেশি রাত্তির আলো জ্বালিয়ে রাখা যায়?

হরি। বেশ, সকালে তাহলে!

সীতা। সকালে? সকালে কি?

হরি। না,—ঠিক আছে সাজবার সময় জ্বালিও।

সীতা। আমাদের ড্রেসিং টেবিল বড় বৌদির ঘরে।

হরি। তাহলে.....তাহলে.....তুমি যা ইচ্ছে কোরো। তুমি নাও এটা।

সীতা। কিন্তু আমার তো কোনও কাজে লাগবে না, আমি নিয়ে কি করব?

হরি। ঠিক.....ঠিক তো.....আমি অন্য কিছু দেব। তোমার কি পছন্দ বল?

সীতা। অঞ্জনের একটা বড় ছবি।

হরি। ঠিক আছে।

সীতা। এই.....তোমার খারাপ লাগছে?

হরি। পুরো দুটো দিন লেগেছিল ওটা বানাতে।

সীতা। এই শোনো.....তুমি এটাও দাও আমাকে। আমি কি করব জানো—অঞ্জনের ছবির নিচে এটা রেখে দেব.....ইচ্ছে হলে জ্বালব। ওর চোখ দুটো জ্বল জ্বল করবে।

হরি। ঠিক আছে, চলো। আমার চেনা একটা স্টুডিওতে অঞ্জনের একটা বড় ছবি দেখেছি, সেটা কিনে বাঁধাতে দিয়ে দিই।

সীতা। এই, তুমি—আমাকে ধান্দাবাজ ভাবলে না তো?

হরি। না,না...চলো।

সীতা। জানো....যখনই অঞ্জনের জ্বল-জ্বলে চোখ দুটো দেখব তখনই আমার তোমার কথা মনে পড়বে।

[নেপথ্যে গান]

আমার সোনার অঞ্জন আমরা তোমায় ভালবাসি
আমাদের হৃদয় দিয়ে অশ্রু দিয়ে
আমাদের সকল দিয়ে ভালবাসি
সোনার অঞ্জন আমরা তোমায়.....

দৃশ্য ঃ ৩২

[বিনয়ের বাড়ি]

বিনয়। অনিমা ৩০ সেকেণ্ড.....২৫......২০.....১০ সেকেণ্ড......অনিমা, ৫ সেকেণ্ড।

অনিমা। 'চরণ ধ্বনি শুনি তব নাথ'.....

বিনয়। গুড..... ভেরি গুড.....এক পয়েন্ট প্রায় চলে গিয়েছিল তোমার....নাথ....মানে থ.....থ......'থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন'

অনিমা। দেবদুলালের.....তাই না?

বিনয়। না, জীবনানন্দ দাশের—দেবদুলাল রেকর্ড করেছে। বলো, বলো চটপট!

অণিমা। সেন....ন....ন 'নত করে দাও হে মাথা চরণ ধূলার তলে'।

বিনয়। ভুল ভুল.....লাইনটা হবে 'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধূলার তলে'। এক পয়েন্ট গেল তোমার। আমার টার্ন....'ন' না?'—নেই তাই খাচ্ছো থাকলে কোথায় পেতে, কহেন কবি কালিদাস পথে যেতে যেতে'।

অণিমা। এটা কি বিখ্যাত কবিতার লাইন হ'লো? এ তো, এ তো লোক ঠকানো ছড়া!

বিনয়। বাঃ বিখ্যাত তো বটেই আর ছন্দে মেলানোও আছে—তাহলে চলবে না কেন?

[হরি ও সীতার প্রবেশ]

হরি। দিদি, বিনয়দা'.....এ.....সীতা।

বিনয়। সীতা! ওহো সীতা—এসো এসো..... বোসো.....আমরা কবিতার লড়াই খেলছিলাম.....মানে সন্ধ্যেবেলাটা অলসভাবে না কাটিয়ে এমন একটা কিছু করা যাতে মনের প্রসার হয়....বোসো....অস্বস্তি লাগছে না তো?

সীতা। নাঃ।

অণিমা। অস্বস্তি লাগবে কেন? হরির বাড়িতে এসেছে। আমাদের বাড়ি তো হরিরই বাড়ি।

বিনয়। আমরা খেলাটা এখন বন্ধ রাখি, কেমন! বুঝলে সীতা, বাইরের লোক...অতিথি-অভ্যাগতের সামনে নিজেদের ব্যাপার-স্যাপারগুলো চালিয়ে যাওয়া—অসভ্যতা....কি বলো অণিমা! তারপর সীতা, তোমার কথা বলো।

সীতা। আমার কথা,.....আমার কিছু বলার নেই।

বিনয়। কি বলছ তুমি.....'প্রত্যেকটি মানুষ এক অনন্ত সম্ভাবনার আকর'.... কবি আলেকজাণ্ডার পোপ বলেছেন—

অণিমা। ওসব কি ও বুঝবে? ওতো এখনও ছেলেমানুষ....কতই বা বয়স...কত বয়স তোমার সীতা?

সীতা। তেইশ।

অণিমা। তবে? এখনও তো ছেলেমানুষই বলা চলে।

বিনয়। হ্যাঁ ছেলেমানুষ...কিন্তু আমাদের থেকে আজকালকার ছেলে-মেয়েরা অনেক কিছু বোঝে....জানে....তাই না! ধরো সীতা কত কিছু দেখেছে....কত জায়গায় ঘুরেছে...হরির সঙ্গেই তো শুনলাম দিল্লি-বোম্বে অনেক জায়গায় গিয়েছে।

হরি। আমরা দল বেঁধে অনেক জায়গায় ঘুরেছি।

অণিমা। তোমরা দু'জনে—তুমি আর হরি?

সীতা। হ্যাঁ, আমরা দু'জন—আরও অনেকে।

বিনয়। আচ্ছা সীতা, তুমি তো অনেক জায়গায় খেলা দেখতে গিয়েছ....বলো তো কোন মাঠটা সবচেয়ে ভালো লেগেছে? এবং কেন?

হরি। ও'-র সব মাঠই ভালো লাগে। তাই না সীতা?

সীতা। হ্যাঁ, আমার সব মাঠই ভালো লাগে।

বিনয়। তবু একটা বেশি পছন্দ তো থাকবেই। কোনটা?

সীতা। এক একটা এক এক রকম—ধরুন বোম্বের কুপারেজ...সমুদ্রের হাওয়া ভেসে আসে, খুব মজা লাগে। তারপর দিল্লির আম্বেদকার স্টেডিয়াম—একটা ধার পুরো মাটি কেটে গ্যালারি বানিয়েছে.....তারপর যুবভারতী....এত বড় আর এত সবুজ....তবে আমার সব মাঠই ভালো লাগে যদি সেখানে—

অণিমা। যদি সেখানে সঙ্গে হরি থাকে?

সীতা। না, যদি সেখানে অঞ্জন খেলে।

বিনয়। ওহো অঞ্জন, অঞ্জন সরকার—ইস্টবেঙ্গলের প্লেয়ার—ইয়ং জেনারেশনের হীরো।

সীতা। আমার অঞ্জনকে খুব ভালো লাগে।

বিনয়। কি হল হরি? জেলাস! ঈর্ষা! হাঃ হাঃ প্রত্যেক মেয়েরই সংসারের জন্য একটি মানুষ চাই, আর স্বপ্নের জন্য একটি হীরো......জগতের নিয়ম— মেনে নিতেই হবে হরি। কি অণিমা, ঠিক বলিনি?

অণিমা। কি জানি বাপু......আমি ওসব বুঝি না।

বিনয়। সবারই থাকে—ছেলেদেরও থাকে—ক্লাস নাইনে পড়তে পড়তে দীপ জ্বেলে যাই দেখে সুচিত্রা সেনের প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম.....আর একবার বক্তৃতা শুনে অম্বিকা সোনির, অনেক বছর ঘোর কাটেনি। আর এই রেডিও-সিনেমা-থিয়েটার-টেলিভিশন থেকে ব্যাপারটা আরও বেড়েছে—ঘরে ঘরেই প্রেমের ত্রিভুজ।

হরি। সীতা ও'রকম নয়।

সীতা। কেন? তুমি আমি....আমরা সবাই অঞ্জনকে ভালোবাসিই তো। তাই বলে অঞ্জনের পক্ষে তো আর আমাদের সবাইকে ফিরে ভালোবাসা সম্ভব নয়।

বিনয়। আচ্ছা, একটা কাজ করা যাক। আমার কাছে একটা ফুটবলের রেকর্ডবুক আছে...সেইটা নিয়ে আসি....তারপর একটা কমপিটিশন করা যাবে। অণিমা, চট করে একটু কফি বানাও....দৌড় দাও। তোমরা বোসো সীতা, বইটা নিয়ে আসি।

সীতা। আমার ঘরে বসে বসে কোনও খেলা ভালো লাগে না।

বিনয়। আচ্ছা। ঠিক আছে, আমি আসছি।

[বিনয় ও অণিমা বেরিয়ে যায়]

হরি। কেমন লাগলো ওদের?

সীতা। তুমি....তুমি এইখানে থাকো?

হরি। হ্যাঁ। বিনয়দা খুব ভাল লোক। ওঁর সঙ্গে থাকলে জীবনের একটা ইয়ে—অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়।

সীতা। অর্থ? তোমার জামাইবাবুর সঙ্গে থাকলে?

হরি। হ্যাঁ। আর বাড়িটা বেশ ভালো না? এইসব বিনয়দার নিজের হাতের তৈরি।

সীতা। এই সব কিছু......টেবিলের ঢাকা, বালিশের ওয়াড়,......এই সব?

হরি। হ্যাঁ। দারুণ না? এইরকম একটা লাইফ—বেশ আইডিয়াল, না?

সীতা। কি জানি, আমার খুব বোর লাগে—কবিতার লড়াই, বালিশের ঢাকনা বসানো, রেডিও শোনা, টেলিভিশন দেখা—কি রকম....জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক নেই....সব কিছুকে ঘরের মধ্যে এনে ফেলা—সারা সন্ধে দিনের পর দিন স্বামী-স্ত্রী ঘরের মধ্যে বসে থাকা—বাব্বা।

হরি। কেন? এই জীবন কি খারাপ?

সীতা। এইসব লোককে আমার বিচ্ছিরি লাগে। এরা খেলার মজাটাও TV-র মধ্যে থেকে পাওয়ার চেষ্টা করে..... কোনও হৈ হৈ নেই, কোনও উত্তেজনা নেই—আমি হ'লে দম আটকে মরে যেতাম।

[বিনয় ও অণিমা ঢোকে]

বিনয়। (বই হাতে)বলো তো, সীতা, কোন ভারতীয় দল প্রথম শিল্ড জেতে?

সীতা। মোহনবাগান, ১৯১১ সালে

বিনয়। গুড, আচ্ছা বলো তো কোন ভারতীয় দল বেশিবার লিগ জিতেছে?

সীতা। ইস্টবেঙ্গল, মহামেডান স্পোর্টিঙের রেকর্ড পরপর ৬বার—১৯৭০ থেকে ১৯৭৫।

বিনয়। ও, তুমি এ বইটা পড়েছ। ঠিক আছে এসো, আমরা সবাই মুখোমুখি বসে একটু সুখ-দুঃখের কথা বলি।

[পর্দা পড়ে যায়]

দৃশ্য ঃ ৩৩

ব্যোমকালি। অণিমা আর বিনয় বলুক সুখ দুঃখের কথা,
কিন্তু ততক্ষণে সীতা হয়ে পড়েছে
বিরাট খেলার ভক্ত।
খেলার মাঠে তার ভূমিকা মক্ষিরাণীর;
অস্ত্রে-শস্ত্রে সাজিয়ে যেন
সে যুদ্ধে পাঠায় সৈন্যদলকে।
স্টাইকার থেকে গোলকিপার
সব্বাইকে ভালবাসে ভীষণ ভীষণ।
সীতার প্রিয় মানুষেরা যখন দ্রুত ছুটতে থাকে
খুশিতে সে বেলুন ফাটায়।
এগারোজন সবাই তাকে কাঁধ ঝুঁকিয়ে সেলাম করে।
কিন্তু হঠাৎ—
একদিন তার উৎসাহ
টেনে নিল একটি মানুষ।

[২য় পর্দাটি খুলে যায়। ক্রাউডের সঙ্গে সীতা মাঠে খেলা দেখছে]

সীতা। অঞ্জন! অঞ্জন! অঞ্জন—ন!

ক্রাউড। অঞ্জন! অঞ্জন!—ন। অঞ্জন!

ব্যোমকালি। হরি খুব ভয় পেলো
—খু—উব!
তারপর একদিন শিল্ডের ফাইনাল—
অঞ্জন লড়ছিল সিংহের বিক্রমে
শিল্ড আজ চাই তার,
—নয় হোক মৃত্যু।
খেলা শেষ হতে আর মাত্তর
দু'মিনিট—
পেনাল্টি-বাক্সের কাঁছ ঘেঁষে
সে হঠাৎ জিরাফের মতো
—মাথাটিকে বাড়ালো আকাশের উঁচুতে
—বল দেখা গেলো না.....
জাম্বো-জেটের এক জাল ছেঁড়া ধাক্কায়
বিপক্ষ কুপোকাৎ—
সে এক মুহূর্ত!
আজও কেউ ভোলেনি—
সীতা ঢুকে পড়েছিল মাঝমাঠ বরাবর।

[২য় পর্দাটি আবার খোলে ক্রাউড সহ সীতা খেলা দেখছে! সীতা হঠাৎ মাঠের মধ্যে ঢুকে পড়ে—]

সীতা। অঞ্জন! অঞ্জন!

[দুজন পুলিশ এসে তার হাত ধরে মাঠের বাইরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে। একজন ফটোগ্রাফার এই দৃশ্যের ছবি তুলে নেয়।]

ব্যোমকালি। অন্য আর একদিন—
উইং-এর পাশ থেকে আলাদা একটা বল
টেনে নিলো অঞ্জন!
পায়ের ডগায় এসে বলটাও নাচছে
সেই দু'টি দুরন্ত পা!
সীতা শুধু দেখল চোখ বুজে দেখল
বজ্রের মতো চেহারা
আমাদের শহরের লাল হলুদের দেবতা!
কোনাচে একটা শট ফসকিয়ে গেল
সেই পা থেকে—
সীতার মুখেতে এসে লাগল।
জ্ঞান-টান ফিরতে সে চোখ মেলে দেখল।
অঞ্জন ধরে আছে

তার হাত—
তার সেই স্বপ্নের দেবতা—

[২য় পর্দাটি খুলে যায়। দেখা গেল অঞ্জন সরকার সীতার হাত ধরে আছে]

ব্যোমকালি। ফুটবলকে ভালোবেসে একটি সোনার নারী
স্বপ্নময় চোখে দিল প্রেমের দেশে পাড়ি।
খেলার মাঠের অঞ্জন তার হোল চোখের তারা
কলঙ্ক কেউ দিও না—ও মেয়ে প্রেমেই আত্মহারা,
আহা সরল প্রেমের ধারা।

দৃশ্য ৩৪

[স্থান ঃ পার্ক]

ব্যোমকালি। কি ব্যাপার সীতা! কিরে হরি, মুখখানা ওরকম ভেটকে আছিস কেন? ভাবটা যেন সিওর গোল অফসাইড দিয়ে দিয়েছে!

সীতা। দেখুন না, অঞ্জনের সঙ্গে আমার একটা ছবি বেরিয়েছে—তাই তখন থেকে গজগজ করছে।

ব্যোমকালি। সে'তো গর্বের কথারে হরি, আমাদের দলের একজনের সঙ্গে অঞ্জনের ছবি বেরিয়েছে—

হরি। তোমার বৌয়ের ছবি বেরোলে কেমন লাগত কালিদা'-?

ব্যোমকালি। মাথাই নেই তার মাথাব্যাথা—বৌফৌয়ের লাইনে নেই ভাই।

সীতা। আর আমি কি ওর বৌ নাকি?

ব্যোমকালি। (গান) প্রেমের হাল কে বোঝে শালা....

হরি। পৃথিবীর কোনও ব্যাপার কি তোমার কাছে সিরিয়াস নয়, কালিদা'?

ব্যোমকালি। হ্যাঁ, ফুটবল! কি ব্যাপার রে হরি, হলদিয়ায় এ্যাপ্রেন্টিস হয়ে সীতার সঙ্গে ঘর বসাতে চাস?

হরি। কেন সেটা চাওয়া কি অন্যায়?

ব্যোমকালি। না না, অন্যায় হবে কেন ভাই? তবে তোমার আদত নেই তো!—তা দিদি জামাইবাবুর কাছ থেকে ট্রেনিং নিয়ে নিস। সকালে বিকেলে হাতের কাজ—রাত্তিরে—

হরি। কালিদা'-!

ব্যোমকালি। আহা চটিস কেন? আমরা না হয় চাঁদা করে একটা থ্রি-ব্যাণ্ড ট্রান্সজিস্টার কিনে দেবো—শনিবারের বিকেলে মন খারাপ হলে চালিয়ে দিস—মায়ের দুধের বদলে প্লাস্টিকের নিপল কিম্বা বৌয়ের বদলে কোনও বালিশ।

হরি। সীতা, তুমি তাহলে আমার কথা শুনবে না?

সীতা। বললাম তো, না। আমার ভাল লাগে না ও'সব।

হরি। সীতা, তুমি ভুল করছ....এমনি করে স্রোতে ভেসে বেড়িও না!

সীতা। আমার যা ভাল লাগে, আমি তাই করব। কেন জোর করছ? তোমার

কি অধিকার?

হরি। সীতা! সীতা, সারা জীবন লাল-হলদে দোপাট্টা পরে কাটবে না,.....শনিবারের বিকেলে খেলার মাঠের বাইরেও একটা বিরাট জীবন আছে।

সীতা। হ্যাঁ, সন্ধেবেলায় কবিতার লড়াই আছে, সারাদিন বসে বসে বালিশের ওয়াড় আর টেবিলের ঢাকনা সেলাই করা আছে.... ট্রানজিস্টরআছে.... টেলিভিশন আছে..... আমার.... আমার ঘেন্না করে.... আমার তোমাকেও ঘেন্না করে। আমি যাচ্ছি কালিদা'।

[সীতা বেরিয়ে যায়]

ব্যোমকালি। লড়কিও কো হোঁঠোপে নহী, আগর জন্নৎ ক'হী হ্যায় তো খেলকে ময়দানমে—স্বর্গ যদি কোথাও থাকে....তো এই পোড়ো দেশে যুবভারতীতেই বা কী আছে—

হরি। কালিদা, তুমি যাও এখন।

ব্যোমকালি। হরি, শোন—

হরি। কালিদা-! (বেরিয়ে যায়)

ব্যোমকালি। (গান) প্রেমের হাল কে বোঝে শালা
কিছু নেই এতে মালমশল্লা
চেয়ে আছে শুধু মধুবালা
প্রেমের হাল কে বোঝে শালা—

দৃশ্য ৩৫

[বিনয় ও অনিমার বাড়ি।]

অণিমা। কি হয়েছে হরি? কি হয়েছে তোর?

হরি। সীতা চলে গেছে।

অণিমা। চলে গেছে?—দেখিস, এতে তোর ভালোই হবে—ও অন্য ধাতের মেয়ে।

হরি। আর কোনওদিন আসবে না বলে গেছে—

অণিমা। ওর জন্যে এত করলি তুই....দিল্লি বম্বে নিয়ে গেলি, কত টাকা খরচা হোল...নিজের পয়সায় কোনওদিন ওসব জায়গায় ও যেতে পারত?

বিনয়। হ্যাঁ, পয়সা কিছু খরচা হয়েছে তোমার ওর জন্য...

হরি। না, আমার তো ভালোই লাগত ওকে নিয়ে যেতে। আমিই তো ওকে সবসময় নিয়ে গেছি।

অণিমা। যাই বলিস বাবা—অনেক খরচা বেঁচে গেল তোর...বছরে অতগুলো খেলা, দু'জনের টিকিটের দাম....হাফটাইমে কিছু খাওয়া.....গাড়ি ভাড়া......

বিনয়। তুমি.......তুমিই সবসময় খরচ-খরচা করতে?

অণিমা। কোথায় গেল সীতা?—কার সঙ্গে গেল?

হরি। বোধহয়, বোধহয়.....অঞ্জন—

অণিমা ও বিনয়। অঞ্জন!

বিনয়। টিকবে না হরি, টিকবে না—ও শীগ্গিরই ফিরে আসবে...গোড়াতে গ্ল্যামারের জোরে কিছুদিন চলে যায়, কিন্তু গ্ল্যামার দিয়ে সারাজীবন সংসার হয় না, কি বলো অণিমা?

অণিমা। হ্যাঁ, দেখছি তো চারপাশে.....

বিনয়। ঐ জেল্লা দু'দিনে ধুয়ে যাবে হরি—ফুটবলারের জীবন পদ্মপাতায় জল.....পায়ের কাজ কমে যাবে, দম চলে যাবে, থেকে থেকে লাম্বাগোর ব্যথা, মাস্‌ল স্প্রেন—হঠাৎ একদিন দেখবে রিজার্ভের লিস্টে নাম।

অণিমা। সেটা কোনও মেয়ে সহ্য করতে পারে?

বিনয়। কিছুদিন রিজার্ভ—তারপর ড্রপ্‌ড্‌—টিম থেকে বাদ.....

অণিমা। তখন তো সে একেবারে ফালতু....ফুটবলও খেলতে পারবে না, অন্য কাজও জানে না.... তোর জামাইবাবুকে দ্যাখ—এমন একটা কাজ জানে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত করে খেতে পারবে.....একটা ফুটবলার কি সারাজীবন ফুটবল খেলতে পারবে?

বিনয়। হরি, একটা কাজ শেখো হরি—হাতের কাজ..... দেখবে সীতা শেষ পর্যন্ত তোমাকেই রেসপেক্ট করবে, মেয়েরা সবসময় নিরাপত্তা চায়, তাই না অণিমা?

অণিমা। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। নিরাপত্তার চেয়ে নিরাপদ আর কি আছে?

বিনয়। একটা কাজ শেখো হরি—একটা কাজ শেখো..... দেখবে যখন ঐ ছোকরার খেলার ক্ষমতা চলে যাবে, আর খেলার জন্যই চাকরি তো ওদের... খেলা ফুরোলেই চাকরির পোজিশন চলে যাবে....তখন ঐ সীতাই মাথা নিচু করে তোমার কাছে ফিরে আসবে।

অণিমা। তোর জামাইবাবু যা বলছে তাই কর, বুঝলি—

হরি। বেশ। আচ্ছা, সীতা কি.....ফিরে আসবে?

বিনয়। যদি নাই বা আসে—ওর থেকে ভালো মেয়ে আসবে। অনেক কম চঞ্চল, অনেক বেশি ঠাণ্ডা, অনেক বুঝদার, অনেক বেশি গেরস্ত।

হরি। তাই হবে বিনয়দা। আমি কাজ শিখব কিন্তু কোথায় পাব?

বিনয়। আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।—আমার এক ক্লায়েন্টের চেনা, বেশ ভালো জায়গা। দশ পনর হাজার খাইয়ে দিলেই—

[পর্দা পড়ে যায়]

দৃশ্য ঃ ৩৬

[কারখানা]

নেপথ্যে বক্তৃতা। আপনারা জানেন বন্ধুগণ গত পরশু এই কারখানার মালিক কোনও কারণ না দেখিয়ে ১৩ জন শ্রমিককে ছাঁটাই করেছে। অথচ প্রতিদিনই বে-আইনিভাবে নিজেদের চেনাশোনা লোককে ব্যাকডোর দিয়ে চাকরি দেওয়া হচ্ছে।

[পুলিশের গাড়ি ও বুটের আওয়াজ। সাইরেনের শব্দ]

শ্লোগান। বে-আইনী ছাঁটাই করা চলবে না......

সমবেত। চলবে.....না চলবে না......

শ্লোগান। ব্যাকডোরে চাকরি দেওয়া বন্ধ কর.....

সমবেত। বন্ধ কর....বন্ধ কর.....

[দু'জন অ্যাপ্রেন্টিস মাইমে কাজ করতে থাকে]

[হরির প্রবেশ। পরনে নতুন ওভার-অল। কর্মরত দু'জন অ্যাপ্রেন্টিসের দিকে তাকিয়ে ম্লান এবং নার্ভাস হাসি হাসে]

হরি। কি'রে সম্রাট? কি'রে জহর

[সোমনাথ ও জহর ইশারা করে দেশলাই ও সিগারেট চায়। হরি না বলে। দু'জনে দাঁড়িয়ে হরিকে মারতে থাকে]

সম্রাট। প্যান্ট খোল শালা।

হরি। সোমনাথ! তোরা!

সোমনাথ। শালা, ব্যাকডোরে চাকরি, হারামি!

হরি। আঃ সোমনাথ!

জহর। ভাত মারার তাল, শালা!

[ওরা কুৎসিৎ চিৎকার করে ও হরি আর্তনাদ করে। মঞ্চ অন্ধকার হয়ে যায়]

[হরি মঞ্চের মাঝখানে এসে দাঁড়ায়। ব্যোমকালি বাঁ দিকে এবং বিনয় ডান দিকে দাঁড়ায়]

ব্যোমকালি। সৎ জীবনের প্যাঁচ-পয়জার কেমন লাগল হরি?

বিনয়। পালিয়ে এসো না হরি। লেগে থাকো। মানুষ হও......

ব্যোমকালি। ওদের একজন বানিয়ে ফেলেছে তো'কে হরি? মুচলেকা দেওয়া হয়ে গেছে?

বিনয়। ওরা তোমাকে যাচাই করে নিল, হরি। দেখে নিল, তোমার ধাতটা কেমন? ওরা বুঝে নিয়েছে তুমি বেশ জঙ্গী আছ। এখন তোমাকে ওরা দলে টেনে নেবে।

ব্যোমকালি। ওদের দলে ঢোকার শর্ত ওদের কাছে দাস্‌খত লিখে দেওয়া। সব সময় ওদের চালে চলতে হবে.......ওরা তোর কাছে দাসত্ব চায়....আমরা শুধু তো'র গলা চাই। সবুজ গ্যালারিতে ফিরে আয়.......হরি!

বিনয়। ওরা দেখতে চেয়েছিল তুমি মানতে পার কিনা।—তোমার কষ্ট হয়েছিল, তবু তুমি মেনে নিয়েছ, এখন তুমি ওদেরই একজন......ওরা তোমাকে বুকে টেনে নেবে।

ব্যোমকালি। হ্যাঁ, বুকে টেনে নেবে—তারপর সারাজীবন ধরে তোকে নিংড়ে, শুষে—ছিবড়ে করে ফেলে দেবে।

বিনয়। হরি, আমার কথা শোনো, জীবনটা একটা ফুটবল ম্যাচ নয়। ওরাও একদিন সেটা বুঝবে, শেষ জিৎ তোমারই হবে হরি। লক্ষ্মী ছেলে, সোনা ছেলে, লেগে থাকো, ভিড়ের মধ্যে কোনও ভবিষ্যৎ নেই। চালিয়ে যাও হরি। আসল গাঁট তোমার পার হয়ে গেছে। কাজ করো হরি, কাজ করো—কাজ করো।

[হরি বিনয়ের দিকে যায়]

ব্যোমকালি। ঠিক আছে হরি,—তাই যদি তোর মন চায়.... হ.... রি..... ই... ভা....লো.....থা—কি—স......।

[সাইরেনের আওয়াজ। অ্যাপ্রেন্ট্রিসদের প্রবেশ। ওরা নেপথ্যে যান্ত্রিক বাজনার তালে তালে হরির সঙ্গে নাচ শুরু করে। আবার সাইরেন বাজে। অ্যাপ্রেন্ট্রিসরা মঞ্চের ডান দিক দিয়ে চয়ে যায়। হরি পকেট থেকে ছোট ট্রানজিস্টার রেডিও বার করে কারখানার গেটের পিছনে গিয়ে শুনতে থাকে। নেপথ্যে বেতার ঘোষণা শোনা যায়—]

ঘোষণা। ....অর্থাৎ ৫৮০ কিলোহার্ডজে। এখন যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ইস্টবেঙ্গল বনাম মহামেডান স্পোর্টিং দলের প্রদর্শনী খেলার ধারাবিবরণী রিলে করে শোনানো হচ্ছে। ধারাবিবরণী দিচ্ছেন পল্লব বসুমল্লিক, প্রদীপ ব্যানার্জি, জয়ন্ত চক্রবর্তী। এখন আপনাদের নিয়ে যাচ্ছি যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে

[নেপথ্যে কোলাহল শোনা যায়। ২য় পর্দা খুলে যায়। ক্রাউড প্রথম অঙ্কের শেষ ভঙ্গিতে ফ্রিজ। রেফারির বাঁশী বাজে।]

ব্যোমকালি। খেলা শেষ। জিতেছি আমরা। জিতিয়েছি আমাদের টিমকে। এখন পৃথিবীতে আমাদের চেয়ে সুখী কে? এবার যাব টেন্টে। চা, ওমলেট প্যাঁদাব! রাজার বাচ্চা প্লেয়ারদের গ্যাস দেব। তারপর রাস্তায়। অপনেন্ট টীমের সাপোর্টারিরা উল্টোপাল্টা বাতেলা করলেই পড়বে ঝাড়। ঐ আসছে আমার এক চামচা। আমার নিজেরও বহুত সাপোর্টার আছে।

ক্রাউড। জরুর কালিদা, ঠিকই তো।

ব্যোমকালি। ঐ যদু তাদেরই একজন। কিরে যদু?

যদু। কেয়া বাত, কালিদা?

ব্যোমকালি। হ্যাঁরে তুই আমার সাপোর্টার তো?

যদু। জরুর কালিদা'—নিশ্চয়।

ব্যোমকালি। জিদানের একটা অটো নিবি? ৬০টাকা লাগবে।

যদু। আমি স্টুডেন্ট কালিদা, ৬০ টাকা কোথায় পাব?

ব্যোমকালি। কেন সকালে যে মাদার ডেয়ারির দুধ বেচছিস, পয়সা কড়ি দিচ্ছে না নাকি?

যদু। সে আর ক'পয়সা? চলি কালিদা।

ব্যোমকালি। আয়। সামনের শনিবার। মহামেডানের সঙ্গে। দেখা হবে।

যদু। হাঁ— হাঁ [যদু চলে যায়]

ক্রাউড। হে হে হে হে হে— হেঃ

[ক্রাউড উদ্দাম নৃত্য শুরু করে। হরি ট্রানজিস্টর কানে দাঁড়িয়ে থাকে]

শেষ সাক্ষাৎকার

মূল নাটক : ভ্লাদলেন দোজর্‌ৎসেভ

মঞ্চ	॥	খালেদ চৌধুরী
মঞ্চ নির্মাণ	॥	মনু দত্ত
আবহ ও পোশাক	॥	স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত
শব্দ প্রক্ষেপণ	॥	হিমাংশু পাল
আলো	॥	জ্যোতি দত্ত
রূপসজ্জা	॥	রণজিৎ মিত্র। সুমৌলীন্দ্র আচার্য
মঞ্চাধ্যক্ষ	॥	দেবাশীষ চৌধুরী
প্রথম অভিনয়	॥	২২শে সেপ্টেম্বর ১৯৮৮ একাডেমি অফ ফাইন আর্টস, সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা

এই নাট্যঘটনা বিকেল চারটে থেকে সন্ধ্যে ছ'টা পর্যন্ত একটানা চলে। ঘটনাস্থল ভারতবর্ষের কোন রাজ্যের—ধরা যাক পশ্চিমবঙ্গের। স্বাস্থ্য দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রীর ঘর।

প্রথম অঙ্ক

রাষ্ট্রমন্ত্রী তাঁর দপ্তরে বসে আছেন। ঘরটি পুরানো ধরণের, বসবার আসবাব সবই আধুনিক ও আরামপ্রদ। রাষ্ট্রমন্ত্রী তাঁর টেবিলের কাগজ-পত্র নাড়াচাড়া করছেন, কাঁধে-কানে টেলিফোন, কথা বলছেন।

ডঃ কর্মকার। হ্যাঁ, উনি আমার শিক্ষক—তো কি হলো? তুমি তো ওঁর ছাত্রর স্ত্রী। গাড়িটা নিয়ে যাও, ওঁকে রিসিভ করো...ডক্টর চ্যাটার্জী জানেন আমি কে—আমি কি কাজ করি। হ্যাঁ কাজ শেষ হলে বাড়ি ফিরে যাবো....প্লেনটা ঠিক সন্ধ্যে ছ'টায় পৌঁছনোর কথা। না আমি ভুলে যাইনি....হ্যাঁ, ড্রাইভার জানে...তুমি নিজেও তো ওটা করে নিতে পারো। সবটা নিজে সামলে নেবে। শোনো, এটা রিসেপশন আওয়ার...এখন আমার কাজ সাধারণ মানুষের সঙ্গে দ্যাখা করা....তাদের ব্যক্তিগত সমস্যার কথা শোনা এবং নিজের পরিবারের সঙ্গে কথা বলে সময় নষ্ট না করা। আই অ্যাম সরি..লোকজন অপেক্ষা করছে....এখন ছাড়তেই হবে। (রিসিভার রেখে দ্যান, টেবিলে—ডেস্কে কিছু একটা খুঁজতে থাকেন।)

ডঃ চৌধুরী। (ডঃ কর্মকারকে) পরের লোকটিকে ডাকব?

ডঃ কর্মকার। (হাত নেড়ে বিরত করেন) একটু অপেক্ষা করুক।...জার্মানদের সঙ্গে চুক্তির খসড়াটা কোথায়?

ডঃ চৌধুরী। (ওঁর হাতে কাগজ দেয়) সব ঠিক আছে!

ডঃ কর্মকার। (কাগজ দেখতে দেখতে) এতে আমি সই করব না। এটা এখানে কেন? (কিছু একটা কেটে দেন) কে ড্রাফ্‌ট করেছে? এ কি? সইয়ের তলায় ''ডক্টর শুভংকর কর্মকার : মন্ত্রী''—কেন? আমি রাষ্ট্রমন্ত্রী, তাই লেখা উচিত। (কিছু লেখেন)

ডঃ চৌধুরী। (নিজের জায়গায় বসেই শান্তভাবে) স্বাস্থ্য-অধিকর্তা ওটা লিখেছেন। বললেন জর্মানরা ইম্প্রেস্‌ড হবে।

ডঃ কর্মকার। জর্মানরা ঠিক ধরে ফেলবে। (লেখেন) এটা আবার টাইপ করাও।

ডঃ চৌধুরী। চুক্তিপত্র সই হতে হতে আপনি পূর্ণমন্ত্রী হয়ে যাবেন...

ডঃ কর্মকার। যা-ইচ্ছে তাই করতে পারো না। সরকারী ঘোষণা না হওয়া পর্যন্ত আমি পূর্ণমন্ত্রী নই। (লেখেন) আর সাধারণভাবে নিয়ম কানুন মেনে চলার অভ্যাস করো। পরের লোকটিকে ডাকো।

চৌধুরী কাঁধ ঝাঁকায়, দরজার দিকে যায়, দরজা খোলে।

ডঃ চৌধুরী। (সাক্ষাৎ প্রার্থীদের বসবার ঘরে যায়) এবারে কে? ভেতরে আসুন। (নিজের ডেস্কে ফিরে যায়)

'মানুষ' ঘরে ঢোকেন, তাঁর পেছনে বীণা

মানুষ। (ইতস্তত ভাব। ডক্টর কর্মকারের দিকে তাকান) নমস্কার...

ডঃ কর্মকার। নমস্কার, আসুন।

ডঃ চৌধুরী। (মানুষের ইতস্তত ভাব লক্ষ্য করে) বসুন, প্লীজ—(বীণাকে) আপনি কাছে এসে বসুন।

বীণা। ঠিক আছে, আমি এইখানে বসছি (একটা কোণে বসে)

মানুষ রাষ্ট্রমন্ত্রীর দিকে তাকিয়েই থাকেন, তারপর তাঁর সহযোগীর দিকে। তারপর ডেস্কের কাছাকাছি একটি শক্ত চেয়ারে বসে পড়েন।

ডঃ কর্মকার। বলুন... কি করতে পারি?

মানুষ। এ...ব্যাপারটা হচ্ছে (চশমা পরে নেন ও দেওয়াল-ঘড়ির দিকে তাকান) আপনাদের ঘড়িটা ভুল।

ডঃ কর্মকার। কি বললেন আপনি?

মানুষ। বলেছিলাম, ঘড়িটা ফাস্ট যাচ্ছে...(ঘড়িটা নির্দেশ করেন)

ডঃ কর্মকার। (দেওয়াল ঘড়ির দিকে তাকান নিজের হাত-ঘড়ির সঙ্গে মেলান) ঠিকই, ঘড়িটা ফাস্ট আছে।...তবে আসল কথা, আমাদের কাজ-কর্ম যেন ঢিলে তালে না চলে। উম্। নিন এবার বলুন।

মানুষ। (মৃদু হাসেন) সময় সম্পর্কে সজাগ থাকাই ভালো। (উঠে ঘড়ির কাছে যান) আমি ভেঙে ফেলব না। ঘড়ির ব্যাপারটা আমি বুঝি। (নিপুন দক্ষতায় কাঁটা দুটি ঠিক করে দেন) কিছু মনে করবেন না। ঐ মোটামুটি ব্যাপারটা আমার ভালো লাগে না। (নিজের চেয়ারে ফিরে যান) খুব ভালো বনেদী ঘড়ি। আমার ফ্ল্যাটটা যদি একটু.......

ডঃ চৌধুরী। আপনি কি ফ্ল্যাটের খোঁজে এসেছেন? (সাক্ষাৎকারের খাতা খোলেন)

মানুষ। না না, আমার ফ্ল্যাটটা যথেষ্ট ভালো। বলছিলাম ঘরে অনেক জায়গা থাকলে এই জাতের ঘড়ি মানায়।

ডঃ চৌধুরী। মাপ করবেন আপনার নামটা কি বলবেন? এ্যাপয়েন্টমেন্ট করা ছিল তো?

মানুষ। হ্যাঁ (উঠে সাক্ষাৎকারের খাতায় নিজের নাম নির্দেশ করেন) ঐতো ওটা আমার নাম। আপনার নামটা কি?

ডঃ চৌধুরী। (কিছু একটা লেখে, খাতার সঙ্গে মেলায়) আপনি কোনো ব্যক্তিগত প্রয়োজনে এসেছেন?

মানুষ। আপনার পরিচয়টা বললেন না তো।

ডঃ চৌধুরী। (নিজেকে সংযত করে) আমি রাষ্ট্রমন্ত্রীর বিশেষ সচিব, উনি রাষ্ট্রমন্ত্রী, এবং উনি জানতে পারলে খুশি হবেন আপনি কেন এসেছেন।

মানুষ। জানি। আপনিও কি ডাক্তার?

ডঃ কর্মকার। কিছু মনে করবেন না। আরও অনেকে অপেক্ষা করে আছে। ঘড়ি, লেখাপড়া...এইসব নিয়েই আলোচনা চলতে থাকলে মুস্কিল।

মানুষ। বাইরে কেউ নেই।

ডঃ কর্মকার। কি বলছেন আপনি? (চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে) আর নেই?

মানুষ। আমিই শেষ সাক্ষাৎপ্রার্থী।

ডঃ চৌধুরী। (সাক্ষাৎকারের খাতায় চোখ) আরও ছ'জন দ্যাখ্যা করতে চায়। (উঠে বসবার ঘরের দরজা খোলে)

মানুষ। আপনি আমাকে বিশ্বাস করছেন না?

ডঃ চৌধুরী। ঠিক বলেছেন। লোকগুলো অত কাঠখড় পুড়িয়ে এ্যাপয়েন্টমেন্ট করল...দ্যাখ্যা করার সময় সব হাওয়া। আশ্চর্য!!

ডঃ কর্মকার। (সোৎসাহে) খুব ভালো। তাহলে বরং ছ'টা পর্যন্ত টিভিতে নেহেরু কাপের খেলা দেখব। এখানে তো থাকতেই হবে, হঠাৎ কেউ হাজির হয়ে যেতে পারে।

মানুষ। (নিজের ঘড়ি দ্যাখেন) তার মানে আমাদের হাতে পুরো দু'ঘন্টা সময় আছে।

ডঃ কর্মকার। তার অনেক আগেই কথাবার্তা সেরে ফেলতে পারব। (উদার হাসি হাসেন) শুরু করে দিই।

মানুষ। (ডঃ চৌধুরীকে) আপনি কিন্তু ডাক্তার কি না এখনও বলেন নি।

ডঃ কর্মকার। (বীণার দিকে তাকান) আপনার কথাটা কি গোপনীয়?

মানুষ। এখানে আর কেউ থাকবেন আমি ভাবিনি।

ডঃ চৌধুরী। (ডঃ কর্মকারকে) স্যার, আমি ঘর ছেড়ে চলে যাব?

ডঃ কর্মকার। হ্যাঁ, চৌধুরী মশাই একজন ডাক্তার। আপনি ওর সামনে যা বলার বলতে পারেন।

মানুষ। (কিছু একটা মনে করার চেষ্টা করেন) চৌধুরী...চৌধুরী...ডক্টর চৌধুরী...আপনি কখনো সিটি হসপিটালে কাজ করতেন?

ডঃ কর্মকার। হ্যাঁ, উনি সিটি হসপিটালে কাজ করতেন, আমিও করতাম। এবার কাজের কথা শুরু হোক্।

মানুষ। ও। তাহলে আপনি ওঁকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন?

ডঃ কর্মকার। (নিজেকে সংযত করেন) আমি ওঁকে সঙ্গে নিয়ে আসিনি। এই কাজটা খালি ছিল এটা আমি ওঁকে দিয়েছি। আপনি কিছু চাইতে এসেছেন— চেয়ে ফেলুন। (মানুষ কিছু বলেন না। ফলে অধৈর্য হতে শুরু করেন) উম? নয়? তাহলে বোধকরি কোন পরামর্শ দিতে এসেছেন? তাই তো? স্বাস্থ্য দফতরের জন্য কোন যন্ত্রপাতি...কোন নতুন ওষুধ... কোন বিশেষ পদ্ধতির কথা বলতে এসেছেন? ঠিক? আপনি কি আমাদের মিনিস্ট্রিতে চাকরি করেন? না? (হেসে ফেলেন) আরে আপনি আদৌ কিছু বলবেন? (বীণাকে) তাহলে আপনি শুরু করুন।

বীণা। (ত্রস্ত) আমি?

ডঃ কর্মকার। উনিতো মনে হচ্ছে সত্যি সত্যি পুরো দু' ঘন্টা কাজে লাগাতে চান।

মানুষ। কথাটা বলা খুব সহজ নয়...

ডঃ কর্মকার। অন্তত চেষ্টা করুন।

মানুষ। আপনি চাইছেন আমি সরাসরি আসল কথাটা—

ডঃ কর্মকার। হ্যাঁ, একেবারে আসল কথাটা।

মানুষ। (চৌধুরীর দিকে তাকান) ওঁর সামনেই—

ডঃ কর্মকার। হ্যাঁ,ওঁর সামনেই।

মানুষ। (প্রয়োজনীয় সাহস সঞ্চয় করতে থাকেন) বেশ, আমি বলতে এসেছিলাম...আপনি... ছেড়ে দিন...

ডঃ কর্মকার। বুঝলাম না কথাটা। (নীরবতা) আমি...ছেড়ে দেব? কি ছেড়ে দেব? আমি বুঝতে পারছি না।

মানুষ। (দৃঢ়ভাবে) আপনার মন্ত্রীত্ব ছেড়ে দিন।

ডঃ কর্মকার কিছুক্ষণ মানুষের দিকে তাকিয়ে থাকেন। তারপর সহযোগীর দিকে তাকান। ডঃ চৌধুরী হাতের ঈশারায় বোঝাতে চান যে লোকটি সম্ভবত মাতাল—

ডঃ কর্মকার। (উঠে মানুষের কাছে যান) আপনি কি...মদ্যপান করে এসেছেন?

মানুষ। (অত্যন্ত ধীর) আমি কখনো মদ্যপান করি না।

ডঃ কর্মকার। (বিরতি) তাহলে, আমার অনুরোধ, আপনি এই অফিস থেকে বেরিয়ে যান।

মানুষ। আমি আন্দাজ করেছিলুম আপনি প্রথমে এই কথাই বলবেন...

ডঃ কর্মকার। আপনার আন্দাজের বাহাদুরি আছে। কিন্তু আপনাকে আমার এইটাই প্রথম এবং শেষ কথা।

মানুষ। আমি অবশ্য ভেবেছিলাম, প্রথমে আপনি আমার সবকথা শুনতে চাইবেন, ভাবতে চেষ্টা করবেন কেন এরকম পরামর্শ দিচ্ছি— তারপর আমাকে ঘাড় ধরে বার করে দেবেন।

ডঃ কর্মকার। ভুল ভেবেছিলেন। আমার বিন্দুমাত্র কৌতূহল নেই। নমস্কার। (বীণাকে) আপনি...আপনি...নমস্কার। (বীণা দাঁড়ায়)

মানুষ। (বীণাকে) বীণা, বসে থাকো।

ডঃ চৌধুরী। দেখুন মশাই, কি ভেবেছেন...কাজের জায়গায় এরকম অদ্ভুত ব্যবহার করছেন? এটা অফিস, মাল খাওয়ার জায়গা নয় এটা। এখান থেকে যান।

মানুষ। খবরদার, আমার গায়ে হাত দেবেন না। আপনি ঠিকই বলেছেন, এটা বার্ নয় এবং আপনিও বারের পোষা গুন্ডা নন। আমি নিয়মমাফিক এ্যাপয়েন্টমেন্ট করে এখানে এসেছি এবং এটা সরকারী সাক্ষাৎকারের সময়।

ডঃ চৌধুরী। (ডঃ কর্মকারকে) আমি পুলিশ ডাকছি।

ডঃ কর্মকার। (ডেস্কের সামনে বসে কাগজপত্র নাড়া-চাড়া শুরু করেন) তাই করো।

বীণা। (নিচু গলায়) আমি আপনাকে বলেছিলাম।

মানুষ। সেইজন্যই তো আমি হঠাৎ আসল কথাটা বলতে চাইনি।...আপনি বললেন, বলে ফেলুন...ওঁর সামনেই বলুন...এই তার ফল। (ডঃ চৌধুরীকে ডায়াল করতে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে) পুলিশ ডাকার

মতো কিছুতো হয়নি...

ডঃ চৌধুরী। হ্যালো। আপনি অফিসার-অন-ডিউটি? আমি রাষ্ট্রমন্ত্রীর ঘর থেকে বলছি...কাউকে পাঠান তো...এখানে একটা উটকো ট্রাবল-মেকার ঝামেলা করছে...ধন্যবাদ।

মানুষ। ট্রাবল-মেকারই বটে। (বিরতি) অবশ্য পুলিশরাও তো মানুষই। (ডঃ কর্মকার তো যতক্ষণ না পুলিশ আসছে—চুপচাপ করে বসে না থেকে—আমরা আলোচনাটা সেরে নিতে পারি।

ডঃ চৌধুরী। (ডঃ কর্মকারকে) স্যর, আমাদের হাতে অনেকটা সময় আছে। ওদের কখ্‌খনো যথেষ্ট গাড়ি থাকে না... এখন দিনের শেষ বেলা...মিনিট চল্লিশের আগে কেউ এখানে আসবে না...

দরজায় ঠক্‌ঠক্ শব্দ। দরজা খুলে একজন পুলিশ সার্জেন্ট ঢোকে

(বিহ্বল) একি! এরই মধ্যে?

ডঃ চৌধুরী। (মাথা নাড়িয়ে মানুষকে দেখায়) এই আজব চিড়িয়াটিকে এখান থেকে নিয়ে যান।

মানুষ। (সার্জেন্টকে) আপনি কি হেলিকপ্টারে এলেন? উনি তো এই মিনিটখানেক আগে ফোন করলেন।

সার্জেন্ট। আপনি আমার সঙ্গে আসুন।

মানুষ। আপনাদের সার্ভিস কোড বলে প্রথমেই নিজের পরিচয় দেওয়ার কথা। আপনার পরিচয়টা কি?

সার্জেন্ট। আমি...সার্জেন্ট মলয় বিশ্বাস, মন্ত্রীর সিকিউরিটি গার্ড। এবার আপনি আসুন।

মানুষ। ওহোঃ। এইটা আমার মাথাতেই আসেনি। ভেবেছিলাম থানা থেকে কাউকে ডেকে আনা হচ্ছে। আপনি তাহলে সিকিওরিটি গার্ড। যাকগে, কিই বা তফাৎ? আমি বুঝিয়ে বলছি...

সার্জেন্ট। আপনি অফিসের বাইরে বুঝিয়ে বলবেন...

মানুষ। শুনুন ইয়াং ম্যান...

সার্জেন্ট। আপনার কাছে আমি ইয়াং ম্যান-ট্যান নই, আমাকে সার্জেন্ট বলে ডাকবেন।

মানুষ। হ্যাঁ, ঠিকই তো।

ডঃ চৌধুরী। যা বলেছিলাম... বুঝতে পারছেন।

সার্জেন্ট। আমি ইউনিফর্ম পরে আছি।

মানুষ। বটেই তো। এই ইউনিফর্মে আপনাকে চমৎকার মানিয়েছে। ইউনিফর্ম দেখে আমার কখনো ভয় করে না, সাধারণ মানুষেরাই তো এইসব পরে। কথা বলি—মানুষটির সঙ্গে, ইউনিফর্মের সঙ্গে তো বলি না।

ডঃ চৌধুরী। আলোচনাটা থামান। শান্তি বিঘ্নিত করছে লোকটা—আপনি বার করে দিতে পারছেন না?

মানুষ। কি বললেন?—শান্তি বিঘ্নিত করছি! আমি কি কি করেছি? আপনিই

বলুন? এমনিই ওঁকে যথেষ্ট অপ্রস্তুত অবস্থায় ফেলেছেন... (সার্জেন্টকে) সার্জেন্ট, আপনার সঙ্গে যেখানে বলবেন আমি যাব, কিন্তু আগে আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দিন।

সার্জেন্ট। কি— ?

মানুষ। এখানে কি ঘটেছে আপনি জানেন?

সার্জেন্ট। কি—বলুন?

মানুষ। আমি সাক্ষাৎকারের জন্য নির্দিষ্ট সময়ে আগে থেকে এ্যাপয়েন্টমেন্ট করে রাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দ্যাখা করতে এসেছি। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে কথা বলতে এসেছিলাম। কথাটা সবে শুরু করেছি—আমি চিৎকার করিনি, গালি-গালাজ করিনি, মারামারি করিনি, জিনিসপত্র ছুঁড়িনি...আপনার সারভিস ইন্সট্রাকশন অনুযায়ী 'আমি শান্তি বিঘ্নিত করেছি' একথা বলা যাবে কি? তাহলে আপনি কেন এখানে এসেছেন?

সার্জেন্ট। আমাকে এখানে ডাকা হয়েছে—আদেশ পালন করা আমার কাজ।

মানুষ। কার আদেশ? আপনার একটা সারভিস কোড আছে, ইন্সট্রাকশন আছে, রুলস্ আছে, আপনার ওপরে একজন কমিশনার আছেন। কোথায় লেখা আছে—অভিযুক্তের সঙ্গে কথা না বলে, কারণ জানতে না চেয়ে আপনি এ্যাকশন নিতে পারেন?

ডঃ চৌধুরী। সার্জেন্ট, আপনাকে যা বলা হয় করুন।

মানুষ। দেখছেন। এই লোকটি আপনাকে সার্ভিস কোডের বিরুদ্ধে—দেশের আইনের বিরুদ্ধে কাজ করতে প্ররোচিত করছেন। এর ফল কি হতে পারে জানেন? আর আপনি তো জানেনও না আমি কে?

সার্জেন্ট। (দ্বিধান্বিত) আমি বুঝতে পারছি না এখানে কি হচ্ছে? এই ভদ্রলোক সত্যি কোনও গোলমাল করেছেন?

ডঃ চৌধুরী। উনি আমাদের কাজে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছেন।

ডঃ কর্মকার। থামো। সার্জেন্ট, ব্যাপারটা আমার নিজেরাই সামলে নিতে পারব।

মানুষ। (সার্জেন্টকে) আমরা নিজেরাই সামলে নিতে পারব। কিছু মনে করবেন না...ওরা ঐ শুধু শুধু...(সার্জেন্ট ঘর ছেড়ে চলে যায়)

ডঃ কর্মকার। (উঠে দাঁড়িয়ে সাক্ষাৎকারের খাতাটি দ্যাখেন) মাপ করবেন, আপনি কে?

মানুষ। মানে?

ডঃ কর্মকার। না, আপনি এক্ষুনি বললেন, "আপনি তো জানেনও না আমি কে?" তো— আপনি কে?

ডঃ চৌধুরী। আপনি কি সি. বি.আই থেকে আসছেন? (মানুষ নিরুত্তর) কোন সরকারী কমিশনের পক্ষ থেকে এসেছেন? আপনি কি পার্টির কন্ট্রোল কমিশনের লোক?

মানুষ। না, না।

ডঃ চৌধুরী। আমাদের সঙ্গে এইভাবে কথা বলার কোন ফর্মাল এক্তিয়ার আছে

আপনার? আপনি ঠিক কে?

মানুষ। ওঃ এবারে বুঝেছি। হ্যাঁ...কোন একটি "আজব চিড়িয়া" একটা অপ্রত্যাশিত পরামর্শ নিয়ে আপনার কাছে এল...তার মানে...কে বলতে পারে...সে হয়তো খুব গণ্যমান্য কোন ভি.আই.পি। না, সেই অর্থে আমি একেবারেই নগণ্য।

ডঃ চৌধুরী। বুঝলাম না কথাটা।

মানুষ। আমি একজন সাধারণ নাগরিক। কোন অপরাধের জন্য আমার কখনো শাস্তি হয়নি, আমি কোন পার্টির পুরস্কার পাইনি। আমি একেবারেই আপনাদের মত সাধারণ একজন মানুষ।

ডঃ চৌধুরী। (রেগে) স্যর, এই ভাঁড়ামো তো আর সহ্য হচ্ছে না।

ডঃ কর্মকার। উনি আদৌ ভাঁড় নন। বুঝতে পারছো না? উনি অত্যন্ত সিরিয়াস লোক। শুনলে না...ভদ্রলোক বিবাহিত নন, একেবারেই আমাদের পাঁচজনের মত সাধারণ মানুষ।

ডঃ চৌধুরী। ঠিক। আমারও তাই মনে হচ্ছিল। আমি ওঁর কাছে জানতে চাই...

ডঃ কর্মকার। একটু দাঁড়াও চৌধুরী...(মানুষকে) এতো খুব ভালো কথা যে আপনি একজন সাধারণ নাগরিক। তা আপনি বলছেন কোন অপরাধের জন্য আপনার কখনো শাস্তি হয় নি। খুব ভালো। আপনি কোনদিন বিদেশে ভ্রমণও করেন নি?

মানুষ। না, স্থানীয় ভাবেই যা ঘোরা-ফেরা করেছি।

ডঃ কর্মকার। অপূর্ব। তা আপনি চাইছেন আমি মন্ত্রীত্ব থেকে পদত্যাগ করি। আপনার এই ভাবনাটা খুব ইন্টারেস্টিং বুঝলেন। আমি এটা নিয়ে ভাবব। আচ্ছা, এই ভাবনাটা আপনার মাথায় প্রথম কবে এল?

মানুষ। খুব বেশীদিন নয়? কেন একথা জিজ্ঞেস করছেন?

ডঃ কর্মকার। তো আপনি এই নিয়ে ভাবতে লাগলেন ভাবতে লাগলেন, ভাবতে লাগলেন...(কাছে গিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মানুষের মুখটা দেখতে থাকেন)

মানুষ। ভাবনাটা এত তীব্রভাবে আমাকে পেয়ে বসেছে...মাঝে মাঝে মনে হয় যন্ত্রণায় মাথা ছিঁড়ে যাচ্ছে।

ডঃ কর্মকার। (আরও কাছে যান) মাথায় যন্ত্রণা! বলছেন, মাথা ছিঁড়ে যায়! (এমন ভাবে কথা বলেন যেন মানুষ-এর মানসিক ভারসাম্যহীনতা পরীক্ষা করতে চাইছেন) খুব ভালো।

ডঃ চৌধুরী। (ইঙ্গিত বুঝতে পেরে) ধুত্তোর। (টেলিফোনের কাছে যায়)

ডঃ কর্মকার। তো আপনি নিজের কাজ কর্ম করে যান, আর তারই ফাঁকে ফাঁবে এই বিষয়টা নিয়ে চিন্তা করতে থাকেন...

ডঃ চৌধুরী। আমি খবর দিচ্ছি।

ডঃ কর্মকার। আচ্ছা, আমায় বলুন তো ভাই, এই রকম অভিজ্ঞতা আপনার আগে কোনদিন হয়েছিল?

মানুষ। ডঃ কর্মকার। আপনার সহযোগীটিকে থামাবেন। উনি নিশ্চয়ই

পাগলা গারদে ফোন করেছেন...আপনাকে আবার অপ্রস্তুতে ফেলবেন। ভেবেছেন আমি এসবের জন্য তৈরি না হয়েই এসেছি?

নীরবতা

ডঃ কর্মকার। (হঠাৎ) কিন্তু আপনি যা বলেছেন সেতো পাগলের প্রলাপ। সেটা বুঝতে পারছেন না?

মানুষ। হুম্‌ম্‌ । অবশ্যই পারছি।

ডঃ চৌধুরী। আমি কি ওদের খবর দেব?

ডঃ কর্মকার। তুমি দয়া করে একটু চুপ করবে।

ডঃ চৌধুরী কাঁধ ঝাঁকায়, কিন্তু রিসিভার রেখে দ্যায়। ঘুরে গিয়ে মানুষের কোনাকুনি বসে, গভীর ভাবে তার দিকে তাকিয়ে থাকে।

তাহলে বলুন আমাকে, ব্যাপারটা কি?

মানুষ। ডক্‌টর কর্মকার, আমি এই বিশ্বাস নিয়ে আপনার কাছে এসেছি—আপনি সব বুঝবেন। তা না হলে আপনার নামে একটা লম্বা নালিশ ঠুকে দিয়ে উত্তরের অপেক্ষা করতাম। কিন্তু আমি ভাবলাম—না। কেন এমনটা করব? উনি একজন ভালোমানুষ।—আমি সোজা ওঁর কাছেই যাব।

ডঃ কর্মকার। আপনি ঠিকই করেছেন। আমার ধারণা, আমাদের মিনিস্ট্রির কেউ একজন আপনার কোন সাংঘাতিক ক্ষতি করেছে আর তাই আপনার মনে হচ্ছে বিভাগীয় রাষ্ট্রমন্ত্রীর পদত্যাগ করা উচিত।

মানুষ। দেখুন... আমাকে অপমান করা খুব শক্ত।

ডঃ কর্মকার। হ্যাঁ, সেটা দেখতেই পাচ্ছি। বেশ, হয়তো আপনার নয়, আপনার কোন আত্মীয় বা বন্ধুর ক্ষতি করা হয়েছে। চিন্তা করবেন না। আমি উপযুক্ত ব্যবস্থা করব।

মানুষ। আসল কথা, আপনার এইখানে থাকার কোন অধিকার নেই। খোলাখুলি বলছি, কিছু মনে করবেন না।

ডঃ কর্মকার। এতে বেশ জটিল পরিস্থিতি। (ডঃ চৌধুরীর দিকে তাকান)

ডঃ চৌধুরী। (বুঝদারের ভাব করে) আপনার ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারছি না, স্যার।

ডঃ কর্মকার। (ডঃ চৌধুরীকে থামতে ইঙ্গিত করেন) বেশ। আমার এখানে থাকার অধিকার নেই। কিন্তু কেন?

মানুষ। আমি বুঝিয়ে বলছি। তার আগে একটা কথা ঃ আপনি অনেক বছর ধরে হার্ট সার্জন ছিলেন, তারপর এখানে এসেছেন। আপনি কি আবার সাজরীর কাজে ফিরে যেতে পারেন?

ডঃ কর্মকার (বিরক্ত) আপনার হয়তো জানা নেই আমি এখনও হার্ট অপারেশন করে থাকি।

মানুষ। জানি, মাসে চারটে। সেটা কি হিসেবের মধ্যে পড়ে? তিনি কেমন সার্জন যিনি অফিসের সব কাজ সেরে সপ্তাহে একবার মাত্র অপারেশনের ছুরি ধরেন—কোন কোন সপ্তাহে তাও পেরে ওঠেন

না। ভালো সার্জনের হাত ঠিক থাকে প্রতিদিন অপারেশন করলে—যেমন একসময় আপনি করতেন।

ডঃ কর্মকার। আপনি কি বলতে চাচ্ছেন এতক্ষণে ধরতে পেরেছি (সপ্রসন্ন সহযোগীর দিকে তাকান) ব্যাপারটা বুঝলে। অবশেষে রহস্যের মীমাংসা হল।

ডঃ চৌধুরী। (হাত নেড়ে) এই ভদ্রলোককে বোঝা—দেবাঃ ন জানন্তি।

মানুষ। আমি খবরের কাগজের এই লেখাগুলো পড়ছিলাম। সময়ের চাপে...হলদে হয়ে গ্যাছে। (ব্রীফকেস থেকে কিছু কাগজের কাটা টুকরো বার করেন) দেখুন একবার। আপনাকে বলছে 'অন্যতম শ্রেষ্ঠ হার্ট সার্জন''...'থোরাসিক সাজরীর যাদুকর।''...এই যে...আপনি (কাগজের একটা ছবির দিকে নির্দেশ করেন) নিজেকে চিনতে পারেন? এ-ছবিটা আপনার পদ্মবিভূষণ পাওয়ার সময় তোলা

ডঃ কর্মকার। (তৃপ্ত দ্যাখায়) হ্যাঁ...এ্যাঁ...হ্যাঁ...তুমিও আছো এখানে চৌধুরী। (ওকে ছবিটা দেখিয়ে আগ্রহে পড়তে শুরু করেন)

মানুষ। কোথায়? (ছবিটি দেখতে থাকেন)

ডঃ চৌধুরী। এই হলাম আমি। তখন দাড়ি ছিল।

মানুষ। (বিমর্ষ) সেইজন্যই গোড়ায় আপনাকে চিনতে পারিনি।

ডঃ চৌধুরী। (ঠাট্টা করে) তখন বয়স অল্প, চেহারায় জেল্লা ছিল।

মানুষ। এতক্ষণে বুঝতে পারছি ...

ডঃ চৌধুরী। কি বুঝতে পারছেন আপনি?

মানুষ। না...মানে...আপনিও এই সবকিছুর অংশীদার...

ডঃ চৌধুরী। হ্যাঁ, ডক্টর কর্মকার পদ্মবিভুষণ পাবার দু'বছর আগে আমি ঐ কার্ডিওলজি সেন্টার-এ জয়েন করি। (ডঃ কর্মকারকে) সে সব দিন গিয়েছে...মনে আছে, স্যর?...এক-এক দিনে তিনটে অপারেশন...এই যে কাগজে লিখছে...(পড়ে)''ডকটর কর্মকার সর্বক্ষণ অপারেশন থিয়েটার-এই থাকেন...'' খাঁটি কথা লিখেছে..(ডঃ কর্মকারকে) এই ভদ্রলোক ঠিকই বলেছেন, স্যার...আপনার ঐ যাদুকরের মতো হাত নিয়ে..আপনি এই মন্ত্রীর গদীতে বসে হাতে কলম নিয়ে...সত্যিই লজ্জার...

মানুষ। (বাধা দিয়ে) কথাটা তো আপনার সম্পর্কেও প্রযোজ্য, ডকটর চৌধুরী।

ডঃ চৌধুরী। হ্যাঁ, আমি একমত। কিন্তু যৌবনের সেই বাঁধুনি...সেই চনমনে ভাব—ফিরে পাওয়া খুব কঠিন। আপনি ... দেখলেন তো স্যার—লোকেরা ভোলেনি। এই মুহূর্তটা সেলিব্রেট করার জন্য আমাদের কিছু একটা পান...ইয়ে চা-পান করা দরকার। দাঁড়ান। (ফ্ল্যাস্ক, গ্লাস, ছোট ব্রান্ডির বোতল বার করতে থাকে) বর্ষার দিনে লেবু-চায়ের সঙ্গে দু'তিন ফোঁটা ব্র্যান্ডি মিশিয়ে—একে বলে ফ্রেঞ্চ টী (বীণাকে)

আপনার নাম তো বীণা?

মানুষ। আগেই বলেছি আমি মদ্যপান করিনা।

ডঃ চৌধুরী। আমরা কেউই করিনা, বীণাদেবী, কাছাকাছি এসে বসুন। আপনি একজন মহিলা—এককোণে বসে থাকবেন—এদিকে চলে আসুন। (চেয়ার টেনে বীণাকে বসতে সাহায্য করে)

মানুষ। বীণা, তুমি ওখানেই বোসো। (কোণের চেয়ারটা দ্যাখান)

বীণা উঠে দাঁড়ায়

ডঃ চৌধুরী। না, আপনাকে আমাদের সঙ্গে বসতে হবে—এখানে আপনি একমাত্র মহিলা।

মানুষ। (বীণাকে) পরিচিত চেয়ারে বসাই...বোধহয় নিরাপদ...

বীণা নিজের চেয়ারে ফিরে যায়

ডঃ চৌধুরী। (মানুষকে) আপনি মশাই—(বীণাকে) বীণা দেবী, আপনাকে তো উনি খুব কড়া শাসনে রেখেছেন। (গ্লাস বার করে)

ডঃ কর্মকার। (কাগজের ক্লিপিংস থেকে শেষ পর্যন্ত নিজেকে সরাতে পেরেছেন) হ্যাঁ...এ্যাঁঃ। সে-সব দিন গিয়েছে বটে...মনে হয় কি যেন হারিয়ে ফেলেছি ... ঐ সেন্টারের জন্য প্রচন্ড পরিশ্রম করেছিলাম...আর কি সব রোগীকে বাঁচিয়েছিলাম...সত্যি বলতে প্রায় শ্মশান থেকে ফিরিয়ে এনেছি এক একটা মানুষকে।

মানুষ। আমি জানি। আমি পড়েছি সে-সব কথা।

ডঃ কর্মকার। ধন্যবাদ। খুব ফ্ল্যাটার্ড লাগছে। ভাবাই যায় না অন্য কোন লোক আমার কাজ নিয়ে আগ্রহ দ্যাখাচ্ছে— পুরোনো খবরের কাগজের লেখা কেটে কেটে জমিয়ে রাখছে।...এখন আমি সম্পূর্ণ অন্য মানুষ। অতীতে কখনো ফিরে যাওয়া যায় না। কখ্খনো না।

মানুষ। আর ফিরে যেতে পারবেন না? বড় দুঃখের।

ডঃ কর্মকার। এটা ঐ যৌবনের বাঁধুনি, চনমনে ভাব সেসব ফিরে পাওয়ার ব্যাপার নয়...সে হয়তো ফিরে পাওয়া যায়। আসলে রক্তের জাতটা বদলে যায় আর তত দ্রুত বাহিত হয় না—রঙটাও যেন তত লাল থাকে না। (ফোটোর দিকে নির্দেশ করেন) অনেকটা ঐ ফুটবল কোচের মত, হঠাৎ একদিন লোকটা কোচ হয়ে গ্যালো। রক্তের সেই গতি সেই রঙ ফিরে পেতে গেলে...একটা অসাধারণ কিছু চাই...সেটা যে কি আমি জানিও না।

মানুষ। সেই জন্যেই আমি এসেছি।

ডঃ কর্মকার। না, না। ঝাঁঝরির ফুটো দিয়ে জল শুধু বেরোতেই পারে। (কথাবার্তা শেষ হওয়ার ইঙ্গিত করেন) আচ্ছা ভাই ... তাহলে...।

মানুষ। খুবই দুঃখের ব্যাপারটা।

ডঃ কর্মকার। আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। পুরনো সব স্মৃতি মনে করিয়ে দিলেন। (করমর্দন করেন) আপনার সঙ্গে আবার দ্যাখা হলে ভালো লাগবে। পুরানো দিনের সবকথা আলোচনা করা যাবে। আচ্ছা—

মানুষ। (হাত সরিয়ে নেন) হ্যাঁ সেইসব পুরানো কথাই আমি আলোচনা করতে চাই...

ডঃ কর্মকার। (বীণার দিকে এগিয়ে যান) যদি আমার আর একটু সময় থাকত...আজকের কাজগুলোই সামলে উঠতে পারিনা! যা গ্যালো...তা গ্যাছেই। (বীণাকে নমস্কার করেন) আচ্ছা ভাই, আপনার ভালো হোক্। আপনার নাম তো বীণা।...আচ্ছা।

ডঃ চৌধুরী। আপনি কিছু মনে করবেন না... ঐ পুলিশ-টুলিশ ডেকে আমি... (কাগজগুলো ফিরিয়ে দ্যায়) আমার ওপর রেগে থাকবেননা। (বীণার কাছে যায়) সত্যি আপনি একজন বন্ধু পেয়েছেন বটে (প্রায় বার করে দিতে থাকে)।

মানুষ। বীণা, তোমার এত তাড়া কিসের? (বীণা দরজার কাছাকাছি থেমে যায়)

ডঃ কর্মকার। আপনি...ওগুলো হপ্তা খানেকের জন্য রেখে যেতে পারেন? আমি কোনদিন ঐ খবরের কাগজের ক্লিপিংস জমিয়ে রাখিনি...সময়ও ছিলনা। আমি নিজে একবার ওগুলো দেখবো-আমার মেয়েকেও দ্যাখ্যাবো।

তারপর আপনাকে ফেরৎ পাঠিয়ে দেব। চৌধুরী, ওঁর ঠিকানাটা রেখে দাও, প্লীজ।

মানুষ। আমি দিতে পারব না....ওগুলো আমার নয়।

ডঃ কর্মকার। আপনার নয়? কার তাহলে এই কাগজগুলো?

মানুষ। ওগুলো যার...সে আজ আমাদের মধ্যে নেই।

ডঃ কর্মকার। ওঃ হো। বুঝেছি।

ডঃ চৌধুরী। হুম্। ভদ্রলোক আমাদের পেশেন্ট ছিলেন? (নিজেকে ডেস্ক গুছোতে থাকে— ইঙ্গিতে বোঝায় সময় অতিক্রান্ত)।

মানুষ। না। ও সাংবাদিক ছিল। (খবরের কাগজের ক্লিপিংসগুলো ব্রীফকেসে রেখে দেন)

ডঃ কর্মকার। হুম্।

ডঃ চৌধুরী। বুঝেছি। ভদ্রলোক ডঃ কর্মকার সম্পর্কে কিছু লিখেছিলেন?

মানুষ। ও পাঁচবছর আগে একটা প্রবন্ধ লিখেছিল (কাগজের ক্লিপিংস দেখিয়ে) মোটামুটি ঐ সময় নাগাদ। কিন্তু লেখাটা ছাপা হয়নি। ঘটনাটা আপনার মনে পড়ছে, ডঃ কর্মকার?

নীরবতা। ডঃ চৌধুরী দু'একটা আলো নিবিয়ে দেয়

ডঃ চৌধুরী। (অপেক্ষা করার ঘরের দিকে যায়, ফিরে আসে।) একটা লোকও নেই। আশ্চর্য। (ডঃ কর্মকারকে লক্ষ্য করে। ডঃ কর্মকার যেন কিছু মনে করার চেষ্টা করছেন)

মানুষ। আপনার পদ্মবিভূষণ পাবার ঠিক আগেই ঘটনাটা ঘটেছিল। মনে পড়ছে না আপনার? (চশমা বার করে পরে নেন, যেন কোন প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃতি পাঠ করার উদ্দেশ্যে)

ডঃ চৌধুরী। (ওর ধারণা ডঃ কর্মকার মানুষ এর কাছ থেকে রেহাই চান—পথ খুঁজে পাচ্ছেন না) ডঃ কর্মকারের ওসব মনে নেই... বুঝতেই পারছেন, সে এমন একটা সময় যাচ্ছিল... (নিজের বর্ষাতি বার করে পরতে থাকে।)

মানুষ। আপনার—আপনার মনে নেই?

ডঃ চৌধুরী। আমার? যে প্রবন্ধ ছাপা হয়নি সেটা মনে রাখব কি করে? (ডাঃ কর্মকারের কোট বার করে) যা ছাপা হয় না তা তো আমরা পড়ি না। (ডঃ কর্মকারকে কোট দ্যায়)।

ডঃ কর্মকার যন্ত্রের মত কোটটা নেন, কিন্তু দৃষ্টি মানুষ-এর ওপর

আচ্ছা?—আবার দ্যাখা হবে? (বীণাকে) দ্যাখা হবে আবার। (হঠাৎ চোখে পড়ে মানুষ উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর কোট খুলে ফেলছেন) আপনি কি এখানে রাত্রিবাসের প্ল্যান করছেন? ...(মানুষ তাঁর কোট চেয়ারের পেছনে ঝুলিয়ে রাখেন) আপনি কি এখানে রাত্রিবাসের প্ল্যান করছেন?...(মানুষ তাঁর মাফলার খুলে ফ্যালেন) আপনি মশাই একটা শিশু...(বিরতি) ডক্‌টর কর্মকার আপনার ঐ প্রবন্ধের কথা মনে করতে পারছেন না। আসুন তাহলে।

ডঃ কর্মকার। (অবশেষে কথা বলেন—শান্তভাবে, ধীরে ধীরে) অনির্বাণ মজুমদার তাহলে মারা গ্যাছে?

নীরবতা

মানুষ। মারা যায়নি, কিন্তু বেঁচেও নেই।

ডঃ কর্মকার। (একই রকম শান্ত ও ধীর) কি হয়েছে ওর? আমি কোন সাহায্য করতে পারি?

মানুষ। ও এখন পুরোপুরি এ্যালকোহলিক। সর্বক্ষণ মদ ছাড়া বাঁচতে পারে না।

ডঃ চৌধুরী। অনির্বাণ...অনির্বাণ...নামটা যেন কোথায় শুনেছি...

ডঃ কর্মকার। (একটু থেমে) ও, তাহলে সেইজন্যে আপনি এখানে এসেছেন? (বিরক্ত) আপনি জানেন ও ডাক্তার নয়—কোনদিন ছিল না—এবং আমার সম্পর্কে ওর ঐ প্রবন্ধে শুধুমাত্র অজ্ঞতাই প্রকাশ পেয়েছিল?

মানুষ। আর সেইজনাই আপনি ঐ প্রবন্ধটা যাতে ছাপা না হয় তার ব্যবস্থা করেছিলেন? শুধুমাত্র ভুল-ভ্রান্তির জন্যই ওর লেখাটা আপনি আটকে দিয়েছিলেন?

ডঃ চৌধুরী। (হঠাৎ মনে পড়ে যায়) অনির্বাণ? ওঃ অনির্বাণ?

ডঃ কর্মকার। চৌধুরী, তুমি বাড়ি যাও। আমি এ ব্যাপারটা দেখছি।

ডঃ চৌধুরী। (ইতস্ততঃ) আপনি যা বলেন...কিন্তু আপনি চাইলে দরকার নেই।

ডঃ কর্মকার। না আমি নিজেই দেখছি ব্যাপারটা। এর সঙ্গে তোমার কোন সম্পর্ক নেই।

মানুষ। কি বলছেন আপনি? উনি যদি সেই ডক্‌টর চৌধুরী হন...

ডঃ কর্মকার। তুমি যাও। আমরা নিজেরাই কথা কয়ে নেব।

মানুষ। উনি যদি সেই ডক্টর চৌধুরী হন যিনি তখন আপনার সঙ্গে কার্ডিওলজি সেন্টালের কাজ করছিলেন...

ডঃ কর্মকার। উনি সেই একই লোক, কিন্তু উনি এখন বাড়ি যাবেন এবং আমরা নিজেরাই কথা বলে নেব।

মানুষ। না, আমি চাই ডক্টর চৌধুরী এখানে থাকবেন।

ডঃ চৌধুরী। স্যার, আপনি যদি চান—আমি...

ডঃ কর্মকার। না, উনি এখন বাড়ি যাবেন। ওঁর এখানে থাকার কোন দরকার নেই।

মানুষ। (সুদৃঢ়) না। ওঁকে বাদ দিয়ে এই আলোচনা অসম্ভব।

ডঃ কর্মকার। (ফেটে পড়েন) এখানে আমিই আদেশ দিয়ে থাকি। চৌধুরী, তুমি এখন যেতে পারো।

মানুষ। ডক্টর চৌধুরীর সঙ্গে আমাকে কথা বলতেই হবে। আপনারা দুজনেই এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত।

ডঃ কর্মকার। শুনুন। নিজেকে কি ভেবেছেন? জোর করে এইভাবে আমার ঘরে ঢুকে...

ডঃ চৌধুরী। (একই ভঙ্গিতে) আমি বুঝতে পারছি না এইসব কেন সহ্য করছি—কেন এর সঙ্গে কথা বলছি আমরা!

মানুষ। কারণ আপনারা আমার কথা শুনতে বাধ্য।—সেইজন্য।

ডঃ কর্মকার। আমি... আপনার কথা শুনতে বাধ্য?

ডঃ চৌধুরী। আমরা বাধ্য? বেরোন তো এখান থেকে। কোটটা পরে নিন, আমরা এখন যাব।

মানুষ। একবার তো ওসব হয়ে গ্যালো। আর আপনারা কোট টোট পরে ফেললেন...জনগণের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় তো শেষ হবে সেই...(নিজের ঘড়ি দ্যাখেন)।

ডঃ চৌধুরী। তা নিয়ে আপনার মাথা ঘামানোর দরকার নেই। আমরা জানি কখন কোন্ কাজ করতে হবে। নিন, যথেষ্ট হয়েছে। আমি এখন অফিস বন্ধ করব।

মানুষ। (উঠে দাঁড়ান) আমি এখানে বেড়াতে আসিনি। এ কোথায় বসে আছেন আপনারা? আপনাদের বাড়ির বৈঠকখানায়? (একটি দেওয়ালের দিকে এগিয়ে, সেখানে একটা পোট্রেট ঝুলছে) ইনি কে বলে আপনাদের ধারণা? (দেওয়ালে ঘুষি মারতে থাকেন) এসব কি আপনাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি? এ সবকিছু আমার—ওর (বীণাকে দ্যাখান) আপনাদের অস্তিত্ব আমার ওপর—ওর ওপর নির্ভর করে। (উত্তেজিত হতে থাকেন) এবং সাক্ষাৎকারের নির্দিষ্ট সময়ে আমার এখানে আসা কেউ আটকাতে পারে না। জনগণের পার্টির প্রধানের কাছে যাবার অধিকার—নির্বাচিত মন্ত্রীর কাছে আসবার অধিকার আমার আছে।

ডঃ কর্মকার। এতো জ্বালাময়ী ভাষণ।

মানুষ। এর কোন্ কথাটায় আপনার আপত্তি? নাকি এর উল্টোটায় আপনার সুবিধে? আপনার যখন ইচ্ছে লোকজনের সঙ্গে দেখা করবেন...যতক্ষণ পছন্দ ততক্ষণ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন...

ডঃ কর্মকার। উফ্‌ফ্...আবার শুরু হলো।

ডঃ চৌধুরী। (দরজা খুলে অপেক্ষার ঘরে তাকায়) জাহান্নামে যাক্। এ্যাপয়েন্টমেন্ট করে লোকগুলো সব কোথায় গ্যালো।

ডঃ কর্মকার। (সহযোগীকে) টিভি-টা বন্ধ করো। চা-টা গুলো সরাও। এটা কাজের জায়গা। (কোট নিয়ে দিশেহারা)।

ডঃ চৌধুরী টিভি অফ করে, চা-টা সরিয়ে রাখে। কোট ফেলে দেন।

ও. কে ফাইন। কি আলোচনা করতে চান?—শুরু করুন। (নিজের চেয়ারে বসেন)

ডঃ চৌধুরী আলো জ্বালিয়ে দ্যায়, কোট খুলে রেখে নিজের ডেস্কের সামনে বসে।

মানুষ। (গভীর শ্বাস নেন) ওটা কি ফোটানো জল? (কাঁচের পাত্র থেকে গ্লাসে জল ঢালেন)।

ডঃ চৌধুরী। (ডঃ কর্মকারকে লোক-দ্যাখানো ভঙ্গিতে) বুঝতে পারছি না, স্যার...আমার এখন কি কর্তব্য।

ডঃ কর্মকার। (কাঁধ ঝাঁকান) জানি না.. নোট নাও...

মানুষ। (জল খান, বসেন) তাহলে...অনির্বাণ মজুমদারের সেই প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল ঃ আপনি—ডক্টর কর্মকার যখন কার্ডিওলজি সেন্টারে ছিলেন, মহসীন নামে একজন এঞ্জিনীয়ার আপনার কাছে আসে...আপনি মহসীনের হার্ট অপারেশন করতে অস্বীকার করেন। আপনি তার স্ত্রীকে বলেছিলেন : মড়ার বুকে আমি ছুরি চালাই না।

ডঃ কর্মকার। (শান্তভাবে) ওকথা আমি বলিনি।

মানুষ। (ব্রীফকেস থেকে কিছু বার করেন) এই যে— সেই রোগীর স্ত্রী আপনার সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা প্রসঙ্গে লিখলেন...(কাগজটা দ্যাখান)

ডঃ কর্মকার। (কাগজের দিকে না তাকিয়ে শান্তভাবে) সেই রোগীর স্ত্রী মিথ্যে কথা বলছেন।

মানুষ। ধরা গেল তিনি মিথ্যে বলছেন। কিন্তু আপনি মহসীনের এওরাটিক্ অ্যানিয়ারিজম্ অপারেশন করতে অস্বীকার করেছিলেন।

ডঃ কর্মকার। এই সিদ্ধান্ত আমার বিবেচনা সাপেক্ষ। আমার মনে হয়েছিল অপারেশন করলে এই রোগী বাঁচবে না। এবার সন্তুষ্ট আপনি?

মানুষ। একটা কথা জিজ্ঞেস করি—অপারেশন ছাড়া মহসীনের বাঁচবার কোন আশা ছিল?

ডঃ কর্মকার। এই সিদ্ধান্ত আমার বিবেচনা সাপেক্ষ। আমার মনে হয়েছিল অপারেশন করলে এই রোগী বাঁচবে না। এবার সন্তুষ্ট আপনি?

মানুষ। একটা কথা জিজ্ঞেস করি—অপারেশন ছাড়া মহসীনের বাঁচবার

কোন আশা ছিল?

ডঃ কর্মকার। না, কোন আশা ছিল না, তাতে কি?

মানুষ। অর্থাৎ কোন রকম সাহায্য না করে একটা মানুষকে আপনি মরতে দিতে রাজি ছিলেন?

ডঃ কর্মকার। কথাটা আপনার কাছে ভয়ংকর শোনাতে পারে, কিন্তু আমাদের ডাক্তারদের এটা প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা। আমরা জানি, কখনো কখনো ডাক্তারদের কিছু করার থাকে না। আর কিছু?

মানুষ। আপনার শিক্ষক—দিল্লীর ডক্টর চ্যাটার্জী—এসবই জানতেন। কিন্তু আরও একটা কথা উনি জানতেন—উনি বিশ্বাস করতেন, একটা মানুষকে বাঁচানোর সব রাস্তা যখন বন্ধ হয়ে যায়, তখনও লড়াই করতে হয়—এমনকি চিৎকার করে, দেওয়ালে ঘুষি মেরেও, সেই লড়াই চালিয়ে যেতে হয়।

ডঃ কর্মকার। এসব আপনি ঐ অনির্বাণের প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছেন। ওর ওই ভাবাবেগ আমার কাছে মূল্যহীন। আমি দাম দিই তথ্যকে, ঘটনাকে। কোন ঘটনার উল্লেখ করতে পারেন?

মানুষ। শুধু একটা। সেই মহসীনকে ডক্টর চ্যাটার্জী অপারেশন করেছিলেন এবং তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন।

ডঃ কর্মকার। (হঠাৎ) দাঁড়ান। ডক্টর চ্যাটার্জী? (ডঃ চৌধুরীর দিকে তাকান) কি বুঝছো ব্যাপারটা?

মানুষ। হ্যাঁ আপনি ভুলে গেছেন। দিল্লীতে একটা ছুটির দিনে ডক্টর চ্যাটার্জী মহসীনের অপারেশন করেছিলেন।

ডঃ কর্মকার। সেটা আমি জানি—আমি সেকথা বলছি না। (ডঃ চৌধুরীর দিকে কৌতুহলী দৃষ্টিতে) আমি বলছি একটা প্লেনের কথা... যেটা আজ সন্ধ্যে ছ'টায় এখানে ল্যাণ্ড করবে।

ডঃ চৌধুরী। (কাঁধ ঝাঁকায়) না, তা হতে পারে না। ওটা জাস্ট একটা কোইন্‌সিডেন্স।

ডঃ কর্মকার। আশ্চর্য...(মানুষের দিকে ঘুরে) হ্যাঁ...তা ঐ ঘটনার জন্য আমি দোষী হব কেন? একজন ডাক্তার ভালো, আর একজন তার চেয়ে খারাপ। তার মানে ওর অপারেশন না করে আমি ঠিকই করেছিলাম। অনির্বাণকে বলেছিলাম এইভাবেই ডাক্তাররা কাজ করেন। ডক্টর চ্যাটার্জী ঐ রোগীকে বাঁচিয়েছেন, আমি হয়তো বাঁচাতে পারতাম না। আর তাই যদি ঘটতো, আজকে কারো কিছু বলার থাকতো না। মহসীন মারা যেত, এ বিষয়ে কোন প্রবন্ধও লেখা হত না...শুনুন, অনির্বাণের তখন বয়স অল্প, অনুভূতিগুলো সজাগ; সাংবাদিক জীবনে এটাই ওর প্রথম বড় কাজ। ও একটাই সার বুঝেছিল—"ছাত্র রোগীর অপারেশন করতে অস্বীকার করেছে—শিক্ষক সেই রোগীরই প্রাণ বাঁচিয়েছেন"। কিন্তু ও আসল সমস্যাটি ধরতে পারে নি।

মানুষ। আমি এ বিষয়ে একমত। অনির্বাণের আরও গভীরে যাওয়া উচিত ছিল...সবকিছুর মূল কারণটা খুঁজে বার করা উচিত ছিল যা হোক। আপনি বলছেন ডক্টর চ্যাটার্জী আপনার চেয়ে ভাল ডাক্তার?

ডঃ কর্মকার। (সহজ হন) সেটা আপনি বলতে পারেন। ওঁকে আমার সহস্র প্রণাম।

মানুষ। তাহলে আপনারা দু'জনে একই পেশায় একই কাজ করেন অথচ ডক্টর চ্যাটার্জী নন, আপনি পদ্মবিভূষণ সম্মান পেলেন কি করে?

ডঃ কর্মকার। (ধৈর্য্য রাখতে চেষ্টা করেন) আমি তো নিজেকে নির্বাচন করিনি। দেশের শ্রেষ্ঠ ডাক্তার বৈজ্ঞানিকরা আমার কাজের মূল্যায়ন করে আমার নাম পছন্দ করেছেন, আমাকে এই সম্মানের যোগ্য মনে করেছেন। এটা অবশ্য সম্ভব যে ডক্টর চ্যাটার্জীও এই সম্মানের যোগ্য। কিন্তু এইভাবেই তো এইসব ঠিক হয়। সবসময়ে সব যোগ্য ব্যক্তিরাই তো রাষ্ট্রীয় সম্মান পান না। এই সব সম্মানের সংখ্যাও খুব বেশি নয়।

মানুষ। উঁহুহুঁহু...আপনার পদ্মবিভূষণ পাওয়া নিয়ে যখন কথাবার্তা চলছে, ঠিক তখনই আপনার কাজ করার পদ্ধতি আমূল বদলে গিয়েছিল।

ডঃ কর্মকার। দাঁড়ান। আপনি কি তখন আমার সঙ্গে কাজ করতেন? আপনাকে তো মনে পড়ছে না।

মানুষ। পুরানো নথিপত্র ঘেঁটেই আমি সব জানতে পেরেছি, হাসপাতালে খুবই যত্ন করে রাখা আছে।

ডঃ কর্মকার। অন্য লোকদের রেকর্ডস ঘাঁটবার অধিকার কে দিয়েছে আপনাকে? চৌধুরী, কি হচ্ছেটা কি ওখানে? একটা রাস্তার লোক মেডিক্যাল রেকর্ডস ঘাঁটাঘাঁটি করে যাচ্ছে? মেডিক্যাল আর্কাইভ্স্-এর দায়িত্বে কে আছে?

ডঃ চৌধুরী। আমি দেখছি।

মানুষ। আমি রাস্তার লোক কেন?

ডঃ কর্মকার। ওহ্ আপনি তাহলে হাসপাতালেই কাজ করেন?

মানুষ। না, আদৌ না।

ডঃ কর্মকার। কিন্তু আপনিতো একজন ডাক্তার, তাই না? আমি লক্ষ্য করেছি আপনি এ ব্যাপারে অনেক কিছুই বোঝেন।

মানুষ। এই কেসটার জন্য যতটুকু বোঝা দরকার ততটাই।

ডঃ কর্মকার। বুঝলাম না। আপনি ডাক্তার নন? তাহলে কোন অধিকারে এওরটাল সার্জারি সম্পর্কে কথাবার্তা বলছেন?

মানুষ। আমি? এওরটাল সার্জারি-র বিষয়ে...আমি তো কোন কিছু বলিনি।

ডঃ কর্মকার। কি বলছেন? আপনি আমার সম্পর্কে প্রাকটিক্যালি চিকিৎসায় অবহেলার অভিযোগ এনেছেন।

মানুষ। না, মানবিক দায়িত্বহীনতার কথা বলছি—ডাক্তার হিসেবে আপনাকে আমি কিছু বলছি না...কিন্তু মানুষ হিসেবে? সে আপনি একজন সার্জন বা কেমিস্ট বা ফুটবল কোচ যাই হোন না কেন...

ডঃ কর্মকার। হাসপাতালের নথিপত্রে তো কারো সম্পর্কে ক্যারেকটার সার্টিফিকেট থাকে না, ওখানে সব কেস হিস্ট্রি থাকে। সেগুলো ডাক্তারদের কাজে লাগে। আপনি ওর মধ্যে কি খুঁজছিলেন?

মানুষ। থোরাসিক ওয়ার্ডে যেসব মানুষ আপনার চিকিৎসার অপেক্ষায় ছিল, আমি তাদের ইতিহাস পড়ছিলাম—সেইসব মানুষ—আপনি অপারেশন করতে রাজি হননি...তাই তারা মারা গেল...সেইসব মানুষ—যারা বেঁচে গেল কারণ আপনি তাদের অপারেশন করেছিলেন...। আমি বুঝতে চেষ্টা করছিলাম কোন্ নীতির ভিত্তিতে আপনি রোগীদের বাছাই করছিলেন।

ডঃ কর্মকার। বা বাঃ। সেটা জানতে পারলে আমি নিজেই খুব খুশী হতাম। তাহলে আপনার মতে একটা নীতি আমার ছিল।

মানুষ। তাহলে আমার একটা ছোট আবিষ্কারের কথা বলি—আপনি সত্যিই রোগীদের বেছে বেছে অপারেশন করতেন।

ডঃ কর্মকার। সুন্দর বলেছেন। আপনি ডিটেকটিভ হলে পারতেন।

মানুষ। (আন্তরিক ভাবে) এক সময় সত্যিই ভেবেছিলাম ডিটেকটিভ হব।

ডঃ কর্মকার। বাল্যকালের সেই স্বপ্ন এখন সফল করার চেষ্টা করছেন? ঠিক আছে, আপনি বলছেন আমি বেছে বেছে রোগীদের অপারেশন করতাম।

মানুষ। আগে তা করতেন না। এই ঝাড়াই বাছাই আপনি শুরু করেছিলেন পদ্মবিভূষণ পাওয়ার কয়েক মাস আগে থেকে; অর্থাৎ যখন এ ব্যাপারে আলোচনা চলছিল তখন থেকে। যেন আপনি একটা প্রতিযোগিতায় নেমেছিলেন এবং প্রত্যেকটা অপারেশন থেকে নিজের পয়েন্টস বাড়াবার চেষ্টা করছিলেন—(লক্ষ্য করেন যে ডঃ কর্মকার ও ডঃ চৌধুরী পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করছেন) কি হয়েছে? আপনি নোট নিচ্ছেন না কেন ডঃ চৌধুরী?

ডঃ চৌধুরী। আপনার ভাবনাটা এখনও সম্পূর্ণ হয়নি, তাই অপেক্ষা করছি।

মানুষ। আমার কথা শেষ।

ডঃ চৌধুরী। আমরা ঠিক বুঝতে পারিনি।

মানুষ। আমার কথা বুঝতে পারছেন না, বলছেন?

ডঃ চৌধুরী। বলছি, ইঙ্গিত আভাস আমরা বুঝতে পারি না। আর একটু স্পষ্ট করে বলুন। তাহলে ওঁর পদ্মবিভূষণ পাওয়া নিয়ে যখন আলোচনা চলছে তখন ঠিক কি কারণে ডঃ কর্মকার রোগীদের বাছতে শুরু করলেন?

মানুষ। ডক্টর চৌধুরী। বুঝতে পারছি ভারতীয় দণ্ডবিধি অনুযায়ী "মিথ্যা অপবাদ"-এর অভিযোগ কি শাস্তি হতে পারে সেটা আপনি ভালো ভাবেই জানেন। কিন্তু আমিও ওটা জানি।

ডঃ চৌধুরী। তাহলে এই অশালীন ইঙ্গিতের জন্য অনুগ্রহ করে আপনি রাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে ক্ষমা চান। অন্যথায় "মিথ্যা অপবাদ"-এর অভিযোগে ভারতীয়

দণ্ডবিধির নির্দিষ্ট ধারা অনুযায়ী আপনার শাস্তির সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে। এখানে আমরা কেউ পাঠশালার দুগ্ধপোষ্য শিশু নই।

মানুষ। আমি আর একটু জল পেতে পারি, প্লীজ? (নিজেই এক গ্লাস জল ঢেলে নেন) বেশ...ডক্টর কর্মকার, আমি ক্ষমা চাইছি।

ডঃ চৌধুরী। এইবার আমরা লিখে নেব : "ভদ্রলোক তাঁর মিথ্যা অপবাদ-এর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তিনি প্রতিশ্রুতি দেন, যা তিনি প্রমাণ করতে পারবেন না সেইসব উক্তি থেকে বিরত থাকবেন, এবং শুধুমাত্র তথ্য নির্ভর ঘটনা নিয়েই আলোচনা করবেন।"

ডঃ কর্মকার। কোন ঘটনার কথা আপনি বলতে পারেন?

মানুষ। হ্যাঁ একটা। আপনি রোগীদের বাছাই করেছিলেন, এটা একটা ঘটনা। আপনি কোন কোন রোগীর অপারেশন করছিলেন, কোন কোন ক্ষেত্রে করছিলেন না।

ডঃ কর্মকার। ধরা গেল আপনি ঠিক বলছেন।

মানুষ। এত হাল্কা ভাবে আপনি বলতে পারছেন? কয়েকটা মানুষ মরে গেল; আপনি তাদের মৃত্যুদণ্ডে স্বাক্ষর দিলেন এই লোকটি বাঁচবে—ঐ লোকটি মারা যাক। এর অন্য কোন ব্যাখ্যা যদি না দিতে পারেন তাহলে আমাকে একটাই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হয় যে, সম্ভাব্য রাষ্ট্রীয় সম্মান প্রাপকদের নিয়ে যখন আলোচনা চলছিল...তখন... (হঠাৎ থেমে গিয়ে অপর দু'জনের দিকে তাকান)

ডঃ চৌধুরী। কী হোল আবার? বলুন...যা বলছিলেন বলে ফেলুন।

মানুষ। ...তখন আপনি সিদ্ধান্ত নিলেন আপনি ঈশ্বরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন এবং আপনি বলে দেবেন কে বাঁচবে কে মরবে।

ডঃ কর্মকার। ঠিক আছে । কল্পনা করার চেষ্টা করুন। একটা মানুষ বছরের পর বছর, দিন নেই রাত নেই, মরে যেতে চাইছে এইরকম কতকগুলো জ্যান্ত শরীর নিয়ে কাটা ছেঁড়া করে যাচ্ছে। মানুষটা ছুরি চালাচ্ছে, জুড়ে দিচ্ছে, সেলাই করছে—কনুই পর্যন্ত তার হাত দুটোয় রক্ত। জেনে রাখুন এওর্‌টপ্লস্টি অপারেশন ঠিক দাঁত তোলার মত কাজ নয়। (অঙ্গুলি নির্দেশ করে) এইখানে আপনার এওর্‌টা ভয়ংকর ফুলে উঠেছে—যেন রক্তে টইটম্বুর একটা ছোট বেলুন—যে কোন মুহূর্তে ফেটে যাবে। সেই ফুলে ওঠা জায়গাটার চার পাশের দেওয়ালগুলো ক্রমেই পাতলা আরো পাতলা হয়ে যাচ্ছে। তখন ওটাকে ডিফিউজ করে সিনথেটিক মেটিরিয়াল দিয়ে রিপ্লেস করতে হয়। তারপর সেই মরণোন্মুখ মানুষটির মধ্যে জীবনের স্পন্দন ফিরিয়ে আনতে হয়। কিন্তু সেই মানুষটার শরীর হয়তো এই প্রক্রিয়া মেনে নিতে রাজি হল না, তার টিশুগুলো হয়তো শুকোলো না, হঠাৎ তার শরীরে দেখা যেতে লাগলো থ্রমবো-এমপ্লোলিসিস্ কিম্বা এ্যাসেফিক্সিয়ার লক্ষণ। এই যে কথায় বলে একজন সার্জন প্রত্যেকটি অপারেশনের সময় নিজেও একবার করে মরে—এই কথাটার মানে

আমি জানি। আমি ক্লান্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম।

নীরবতা

মানুষ। ক্লান্ত...ক্লান্ত...(হঠাৎ চনমনে হয়ে ওঠেন) ঠিক আছে, ধরা যাক আপনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন...

ডঃ কর্মকার। ক্লান্তি বোধ করার অধিকার নেই একজন মানুষের?

মানুষ। একজন ব্যক্তির—হ্যাঁ। কিন্তু একটা হাসপাতলের ডাক্তারের—না। ডক্টর কর্মকার, আপনি যদি ক্লান্তই হয়ে পড়েছিলেন তাহলে আপনি কাজটা ছেড়ে দিলেন না কেন? অপর কোন ডঃ কর্মকার আপনার জায়গায় বসতেন...

ডঃ চৌধুরী। কারণ আর একজন ডক্টর কর্মকার নেই। ঈশ্বর! এই সামান্য কথাটা বুঝছেন না!

মানুষ। কি বলছেন—নেই? আপনাকে ছাড়াও তো কার্ডিওলজি সেন্টার সুন্দর চলছে।

ডঃ চৌধুরী। কিন্তু তখন চলতে পারতো না!

মানুষ। তার কারণ উনি সেখানে থেকে গিয়েছিলেন। জানেন, সমাজের যে কোন ক্ষেত্রে একজন নেতা সরে গেলে কিছু সমস্যার সৃষ্টি হয়, কিন্তু নতুন ব্যক্তিত্বের বিকাশ শুরু হয় ঐ একই সঙ্গে। ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন, তবুও আপনি থেকে গেলেন, আর ক্ষমতার চাপে অন্য সবাইকে সংকুচিত করতে লাগলেন। ভেবে দেখুন, আপনি একজন রোগীকে অপারেট করবেন না, আর কেউ তাকে ছুঁতে সাহস করবে। টপ্ সার্জন রায় দিয়েছেন এ রোগীর বেঁচে থাকার কোন আশা নেই— কে সেখানে বোকার মত এগোবে! সেটাতো দুর্বিনীত ব্যবহার বলেই গণ্য করা হবে। (ক্রমেই আরো দৃঢ় হতে থাকেন) যে মুহূর্তে আপনি বললেন মহসীনের বাঁচবার কোন আশা নেই, সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ষ্টাফ ওর ব্যাপারে হাল ছেড়ে দিল।...এবং এমন একটা লোককে ছুটি দিয়ে দিল যার নড়া-চড়া করা নিষেধ এবং যাকে ট্রেনে করে দেশের আবার এক প্রান্তে নিয়ে যেতে হল...যার সঙ্গে অক্সিজেন নেই ... লাইফ সাপোর্ট এর ব্যবস্থা নেই এবং যার জন্য দিল্লী ষ্টেশনে কোন এ্যামবুলেন্স রাখা ছিল না। লোকটা যে পথেই মারা যায়নি তার একমাত্র কারণ ওর সহযাত্রীরা অবস্থা বুঝতে পেরে সেই দীর্ঘ যাত্রাপথে একটাও কথা বলেনি। ট্যাক্সিতে যেতে যেতে লোকটা মারা যায়নি কারণ সৌভাগ্যক্রমে ডক্টর চ্যাটার্জীর হাসপাতালের গেটের সামনে পৌঁছে ওর এওর্টা ফেটে গিয়েছিল।

ডঃ কর্মকার। বেশ, যদি স্বীকার করি আমি সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত নই—তাহলে আপনি খুশি হবেন? যখন ক্লান্তি লাগছিল হয়তো তখনই আমার সরে যাওয়া উচিত ছিল। এখানেই ব্যাপারটার ইতি টানা যাক্।

মানুষ। সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত নই ...

ডঃ কর্মকার। হ্যাঁ, সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত নই।

মানুষ। আপনি কিন্তু বড় আদর করে নিজের পিঠটা চাপড়ে দিলেন। 'সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত নই'...যদিও বা এটা শুধুমাত্র ক্লান্তির ব্যাপার হত, আমি অন্য অভিযোগ করতাম: বলতাম, কার্ডিওলজি সেন্টারের অপদার্থ অন্যায় পরিচালনার জন্য চারজনের মৃত্যু ঘটেছিল, এবং পঞ্চম মৃত্যুটি ঘটত মহসীনের। অপরেশন না হওয়ার ফলে যদি ও মারা যেত, আপনার নির্বাচন পদ্ধতির কথা কারো মাথায় আসতো না, ভাবতো কি দূরদৃষ্টি! এই সূক্ষ্ম পার্থক্যটুকু কেউ বুঝতো? কিন্তু মহসীন আপনার সব হিসেব গোলমাল করে দিল—বলা ভালো ওর স্ত্রী। কিছুতেই আপনার রায় মানবে না। সে চলে গেল স্বামীকে নিয়ে ডক্টর চ্যাটার্জীর কাছে। তিনি ওকে বাঁচালেন। কে বলতে পারে ঐ সৎ চিকিৎসকের হাতে পড়লে অন্যরাও হয়তো বাঁচত।

ডঃ চৌধুরী। প্রসঙ্গত, ডক্টর চ্যাটার্জীর হাতে প্রচুর রোগী মারা গিয়েছে। আমাদের সেন্টারের মৃত্যুহারের চেয়ে অনেক বেশি।

মানুষ। কারণ উনি বেছে বেছে অপারেশন করেন নি। উনি আমাকে বলেছেন, এ ব্যাপারে ওঁর একটাই নীতি: আর কোন পথ না থাকলে পথ একটাই—অপারেশন।

ডঃ চৌধুরী। (লাফিয়ে ওঠে) উনি আপনাকে এই কথাটা বলেছেন?

ডঃ কর্মকার। (লাফিয়ে ওঠেন) ওঃ ব্যাপারটা তাহলে...এইবার বুঝতে পারছি।

মানুষ। (বুঝতে পারেন না) কি? হ্যাঁ, উনি তাই বলেছিলেন...যদি কোন বিকল্প না থাকে...

ডঃ চৌধুরী। আপনি তাহলে ডক্টর চ্যাটার্জীর সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন?

মানুষ। হ্যাঁ, আমি ওঁর সঙ্গে দেখা করেছিলাম। প্লেনে করে দিল্লী গিয়েছিলাম।

ডঃ কর্মকার। (আক্রমণাত্মক) তাহলে আপনার জন্যই উনি এখানে আসছেন?

মানুষ। কে আসছেন? ডক্টর চ্যাটার্জী? এখানে?

ডঃ কর্মকার। আপনিই ওকে এখানে ডেকে আনছেন?

মানুষ। আমি ওকে ডেকে পাঠাবো? আমার স্পর্দ্ধা হবে? সত্যি!

ডঃ কর্মকার। বেশ ডেকে পাঠাননি, কিন্তু আপনার উস্কানিতেই উনি আসতে পারেন।

মানুষ। ঐ মানুষকে আমি বিরক্ত করব! ওঁর কাছে অপারেশনের জন্য কত লোক অপেক্ষা করে আছে।

ডঃ কর্মকার। আমিও তাই বলছি। আপনি ওখানে গিয়ে সব আবোল-তাবোল বকেছেন, আর সেইজন্যই উনি এখানে আসছেন।

মানুষ। আমি কারও নাম করিনি। কতগুলো সাধারণ প্রশ্ন করেছিলাম: উনি কিছু জানতে না চেয়ে প্রত্যেকটির উত্তর দিয়েছিলেন—আমি অনেক কিছু জানতে পেরেছি।...ডক্টর চ্যাটার্জী কোন্ ফ্লাইটে আসছেন?

ডঃ চৌধুরী। (শান্ত হয়ে যায়) আপনার কথা একটু বলুন। কাজকর্ম না করেও আপনার চলে যায়? স্যুটকেশটা গোছালেন প্লেনে চেপে ওঁর সঙ্গে

দেখা করতে চলে গেলেন।

মানুষ। খুব একটা অবসর থাকে না। আর পাঁচজনের মতই আমি কাজকর্ম করি।

ডঃ চৌধুরী। কি কাজ করেন আপনি?

মানুষ। তাতে কিছু এসে যায়?

ডঃ চৌধুরী। এমনি—কৌতূহল।

মানুষ। সে রকম কিছু নয়, একটা সাধারণ কাজ করি। আপনি জানতে চাচ্ছেন কেন?

ডঃ চৌধুরী। কার সঙ্গে কথা বলছি জানতে পারলে ভালো লাগত।

মানুষ। বুঝতে পারছি না। আমি মজুর বা বিজ্ঞানী বা অধ্যাপক যাই হই না কেন, তফাৎটা কি হচ্ছে?

ডঃ চৌধুরী। না, সত্যি কিছু এসে যায় না।

মানুষ। তবে কেন জিজ্ঞেস করছেন? আমি সাধারণ নাগরিক হিসেবে এখানে এসেছি, কোন অফিসিয়াল ক্যাপাসিটিতে নয়।

ডঃ চৌধুরী। আপনি কাজ করেন কখন? পুরানো মেডিক্যাল রেকর্ডস ঘাঁটছেন, প্লেনে করে ডক্টর চ্যাটার্জীর সঙ্গে দ্যাখা করতে যাচ্ছেন, অনেক সময় চলে যায়। একটা মোটা ফাইল বানিয়ে ফেলেছেন। কেন? নালিশ রুজু করবেন সেই জন্য...

মানুষ। আগেই বলেছি—আমি তো তা করিনি, আমি সোজা আপনাদের কাছে এসেছি। আমার বিশ্বাস ছিল, আপনি একজন মানুষ হিসেবে বুঝবেন, যদি আমি বলি "দায়িত্বশীল জায়গায় যাঁরা বসে আছেন তাঁদের সৎ হওয়া উচিত-যা তাঁরা মুখে বলেন কাজেও সেটা করা উচিত।" নইলে কি করে তাঁদের বিশ্বাস করব?...এবং আমি আপনাকে বলব—'আপনার পদত্যাগ করা উচিত।"

ডঃ কর্মকার। (রাগত) যদি এই আলোচনা চালিয়ে যেতে চান তাহলে আপনার বারফট্টাই বন্ধ করুন। পদত্যাগ করব কি করব না...(টেবিলের কিছু কাগজ মুঠো করে ধরেন) আজ এত বছর পরে এইটা পদত্যাগের কারণ হতে পারে না...(কিছু কাগজ টেবিলে ছুঁড়ে ফেলেন) তাছাড়া আপনি আমাকে মন্ত্রী বানাননি এবং আপনি আমাকে পদত্যাগ করাতে পারেন না। আমার সারাজীবনের অর্জিত প্রতিষ্ঠা কোন অধিকারে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করছেন? ঐ সেন্টারে আমরা কাজ শুরু করেছিলাম একেবারে শূন্য থেকে। ঐ সেন্টারে আমি খেয়েছি, শুয়েছি, রাতের পর রাত জেগে কাটিয়েছি—কেউ ভাবতেও পারেনি এমনটা সম্ভব—কেউ আমাকে অপারেশন করার সুযোগও দিত না...আপনি ওখানে নোংরা ঘাঁটতে গিয়েছিলেন...জানতে চেয়েছিলেন সত্যি সত্যি কি ঘটেছিল আমার প্রথম রোগী কে জানেন? কে আমার হাতে লুকিয়ে অপারেশন করাতে রাজি হয়েছিল? সেই মহিলা যিনি পরে আমার স্ত্রী হয়েছিলেন...ওর বুকে

একটা লম্বা কাটা দাগ আছে...আর কয়েকটা দিন দেরি হলে ওর এওর্‌টা বার্স্ট করত... তাই ঐ লম্বা দাগটা আমি ওকে উপহার দিয়ে ছিলাম। আটবছর প্র্যাকটিস করার পর আমার একটা হার্ট অ্যাটাক হয়...কিসের জন্য?...সস্তায় বাজিমাত করার চেষ্টায়? এখনও কিছু লোক আছে ঐ সেন্টারে যাদের সঙ্গে আমি কাজ করেছি। তাদের সাথে আপনি কথা বলেছেন?

মানুষ। আমি বুঝতে পারছি না। আপনি কি রফা করার পরামর্শ দিচ্ছেন?

ডঃ কর্মকার। (অসম্মানিত) আমি রফা করার পরামর্শ দেব!! (বলার ধরণ বদলান) হ্যাঁ, আমি পরামর্শ দিচ্ছি, আপনার কথায় যদি কিছু সত্য থেকেও থাকে, আপনার কথা বলার ধরণটা পাল্টান। ঐ নাকউঁচু ভাব দেখলে আমার...আপনার ঐ জ্বালাময়ী ভাষণ...(বাধা পাবার আশংকায়) ঠিক আছে—জ্বালাময়ী ভাষণ নয়...বড় বড় কথার কারসাজি। (হাতের ইঙ্গিতে থামান) দাঁড়ান। অকারণে একঘণ্টা আপনার কথা শুনেছি। ঐ উঁচু বেদী থেকে নেমে আসুন—এই মাটিতে যেখানে সব কিছু ধোঁয়াটে জটিল— যেখানে রক্ত-মাংসর মানুষেরা বাস করে—যে মানুষদের মধ্যে ভালো খারাপ দুই-ই আছে। মনে করেছেন, আপনিই একমাত্র ত্রুটিহীন সম্পূর্ণ মানুষ!!

মানুষ। আমার কথা তুলছেন কেন? আমি তো রাষ্ট্রমন্ত্রী নই।...বেশ, আমাকে নিয়েই আলোচনা হোক্।

ডঃ কর্মকার। একটা বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী ছাড়া কোন কিছু বোঝা যায় না।

মানুষ। ও—আপনি প্রশংসা শুনতে চাইছেন?

ডঃ কর্মকার। চৌধুরী। এ লোকটা আমাকে পাগল করে ছাড়বে। প্রত্যেকটা কথা বেঁকিয়ে চুরিয়ে...প্রত্যেকটা কথা...

মানুষ। আপনি খুব খারাপ লোক নন একথাটা কেন বোঝাতে চেষ্টা করছেন? যাতে আপনার খারাপগুলোকে আমি ভালো হিসেবে দেখতে পাই? আমরা তো কেউ পাঠশালার দুগ্ধপোষ্য শিশু নই। আমরা প্রাপ্তবয়স্ক।

ডঃ কর্মকার। (বাকরুদ্ধ) ম্—ম্।

ডঃ চৌধুরী। অর্থাৎ ডক্টর কর্মকারের সারাজীবনের কাজ—আপনার কাছে মূল্যহীন? এইভাবেই আপনি মানুষের বিচার করেন?

নীরবতা

মানুষ। ঠিক আছে... (শান্তভাবে) আপনি ঠিকই বলছেন। ওঁর কৃতিত্ব আমি কেড়ে নিতে পারি না। কিন্তু একটা কথা আমি ভাবছি। কিভাবে আমরা আমাদের জীবনকে বিচার করব? নিজেদের শ্রেষ্ঠ কাজের মাপকাঠিতে? নাকি যা সবচেয়ে নিকৃষ্ট যার জন্য আমরা লজ্জা পাই, তাই দিয়ে? (যেন নিজের সঙ্গে কথা বলছেন, সোচ্চারে ভাবছেন) ধরা যাক্ আমাদের খারাপ কাজগুলো আমাদের অভিযোক্তা, আর শ্রেষ্ঠগুলো...আমাদের স্বপক্ষের উকিল আর এই

দুয়ের মাঝেই কি বিচারের আদালত বসেছে? (থামেন, হেসে ফেলেন) না, না ওভাবে কোথাও পৌঁছানো যাবে না। আমাকে আপনারা এখনও বার করে দিতে পারেন, কিন্তু আমার চোখের কোণের জল তো টলটল করতেই থাকবে। শুনুন, আমার চিন্তা গুলিয়ে দেবেন না।

ডঃ চৌধুরী। (পারস্পরিক আলোচনার জমি খোঁজে) দাঁড়ান। আপনি তো ঠিকই বলেছেন—আমাদের খারাপ কাজ আমাদের কাঠগড়ায় দাঁড় করায়—আর যা ভালো, তা আমাদের পক্ষ নিয়ে ওকালতি করে—এবং এই দু'য়ের তুল্যমূল্য আমাদের বিচার হতে পারে...

মানুষ। না, না। কথাটা অনেক সকল। ভালো নিয়ে আমরা গর্ববোধ করি আর খারাপের জন্য আমাদের জবাবদিহি করতে হয়। (ডকটর কর্মকারকে) আমি সব উল্টে পাল্টে দিচ্ছি না। আপনিই সেটা করেছেন। আমি চেষ্টা করছি সবকিছুকে তাদের যথাযথ জায়গায় সাজিয়ে দিতে। আমি অস্বাভাবিক কিছু বলিনি। যাঁরা দায়িত্ব নিয়েছেন তাঁদের সৎ হওয়া উচিত, যা তাঁরা বলেন সেটা তাঁদের করা উচিত,—অন্যথায় আমরা তাঁদের বিশ্বাস করতে পারব না। (কাঁধ ঝাঁকান)

ডঃ চৌধুরী। কে আপত্তি করেছে? ঠিকই বলেছেন। এখন আমি আপনার কথা ধরতে পারছি। (নিজের পালে হাওয়া টেনে নেয়) আমি বলছি আমাদের বিচারক কে?...আমাদের বিবেক। ভাবছেন মহসীনের ঘটনায় আমরা বিচলিত হইনি? আমার স্পষ্ট মনে আছে। ডক্টর কর্মকারের নার্ভাস ব্রেকডাউন হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ প্রচণ্ড সিগারেট খেতে শুরু করলেন। যে কোন মুহূর্তে আর একটা হার্ট এ্যাটাক হতে পারত। (সিগারেট বার করেন) আপনি ধূমপান করেন?

মানুষ। এখানে খাওয়া যেতে পারে?

ডঃ চৌধুরী। এখন এখানে সবকিছু করা যেতে পারে। (বীণাকে) আপনি তো...(বীণা ঘাড় নাড়ে) ঠিকই তো। (মানুষকে) আচ্ছা, উনিতো কিছুই বলছেন না। (মানুষকে একটা সিগারেট এগিয়ে দেয়)

মানুষ। ধন্যবাদ, আমার আছে। (সিগারেট বার করে ধরান)

ডঃ চৌধুরী। আপনার সঙ্গে ওঁর সম্পর্কটা কি? (বিরতি) মানে ওঁর এ ব্যাপারে কি ভূমিকা? (বিরতি) উনি কি সাক্ষী থাকছেন? ঠিক আছে। (সিগারেট ধরায়, মানুষের কাছাকাছি এগিয়ে বসে) এই যে বললেন, মহসীনের ব্যাপারে আমরা হাত গুটিয়ে নিয়েছিলাম এটা ঠিক কথা নয়। ওর সঙ্গে একজন ডাক্তার দিল্লী গিয়েছিল...

মানুষ। (বাধা দিয়ে) কিন্তু আপনাদের হাসপাতাল থেকে নয়। আউটপেশেন্ট ক্লিনিকের একজন স্বেচ্ছায় গিয়েছিল।

ডঃ চৌধুরী। হ্যাঁ...কিন্তু সেও তো ডাক্তারই ছিল। দুজনকে পাঠানোর কোন মানে হয়? হ্যাঁ, ট্যাক্সি ব্যাপারটা খুবই বিশ্রী হয়েছিল। কথাটা শুনে

আমিতো হিম হয়ে গিয়েছিলাম। এ্যামবুলেন্সের ব্যাপারটার জন্য যারা দায়ী তাদের প্রচণ্ড ধমকানো হয়েছিল। এরপর যখন মহসীন ফিরে এল, আমরা সঙ্গে সঙ্গে ওকে হাসপাতালে ভর্তি করে নিয়েছিলাম। এই অপারেশনের পরে সুস্থ হয়ে ওঠার সময়টা, বুঝলেন রোগীর পক্ষে মারাত্মক। ডক্টর কর্মকার ব্যক্তিগতভাবে কেসটার দ্যাখাশোনা করছিলেন। সেরে ওঠার পর একটা স্বাস্থ্যকর জায়গায় বিশ্রাম নেবার ব্যবস্থাও উনি করে দেন। একথা ভাববেন না আমরা আমাদের আগের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করছিলাম। কোন প্রয়োজন ছিল কি? ধরুন কোন পর্যায়ে যদি মহসীন মারা যেত তাহলে তো এটাই প্রমাণ হোত যে কার্ডিওলজি সেন্টার ওর বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিল? কিন্তু আমরা সজাগ দৃষ্টিতে লক্ষ্য রেখেছিলাম যাতে ও সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠে। হ্যাঁ, আমাদের বিবেক আমাদের যন্ত্রণা দিচ্ছিল। আসলে আপনি আলোচনাটা এমনভাবে শুরু করেছিলেন। যার জন্য আমরাও ডিফেন্সিভ হয়ে গেলাম। আপনি অন্যভাবে কথা বললেন ডক্টর কর্মকার নিজে থেকেই বলতেন—"হ্যাঁ, ব্যাপারটা বড় বিশ্রী হয়েছিল।" ঠিক বলিনি, স্যার?

ডঃ কর্মকার। আমায় একটা সিগারেট দাও।

ডঃ চৌধুরী। ডেস্কের মধ্যে কয়েকটা মেন্থল আছে।

ডঃ কর্মকার। (মানুষকে) আপনার একটা সিগারেট দেবেন? ওর ঐ মেন্থল সিগারেট খেতে আমার ঘেন্না করে।

মানুষ। (প্যাকেট খোলেন) ফিলটার্ড নয় কিন্তু। (চৌধুরীকে) আপনি কোনদিন পোষ্ট অফিসে চাকরি করেছেন?

ডঃ চৌধুরী। কেন?

মানুষ। আপনি সবকিছু কেমন সুন্দর একটা মোড়কে সাজিয়ে ফেলতে পারেন।

ডঃ চৌধুরী। এই—আবার শুরু হল!

মানুষ। আমি আপনার বিবেকের সঙ্গে সানন্দে কোলাকুলি করতে চাই, কিন্তু কোথায়...কোথায় সে? (হাওয়ায় হাত হাতড়ান)

ডঃ কর্মকার। আপনাকে বলতে দ্বিধা নেই, সেই ঘটনার কথা ভাবলে এখনও আমার গা শিউরে ওঠে। মদ্যপানের অভ্যাস থাকলে আমি নিজেই এ্যালকহলিক হয়ে যেতাম। আপনি জানেন না, এইখানটায় কি ঘটে গিয়েছে (নিজের বুকে হাত দিয়ে দেখান)।

মানুষ। ডক্টর কর্মকার, আপনাকে একটা প্রশ্ন করব? একটি সত্যিকারের প্রশ্ন?

ডঃ কর্মকার। বলুন।

মানুষ। আপনার এই বিবেক দংশন বস্তুটি সঠিক কি? শুধুমাত্র আত্মানুসন্ধান, নাকি তার কোন বাহ্যিক রূপ আছে? (বিরতি) আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি কথায় নয়, সবার সামনে আমাদের কাজ দিয়ে আমাদের

বিবেকের সততা প্রমাণ করতে হয়।

ডঃ কর্মকার। আপনি জানেন, তখন রাত্রিদিন ঐ অপারেশন থিয়েটারে কাটাতাম; জীবনের আরো অন্যান্য প্রশ্ন আমাকে ঐ ঠাণ্ডা ঘরের মধ্যে ছুঁয়ে যেত। আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি।...কিন্তু আপনাকে জানাতে চাই, যখন আপনার হাতে স্ক্যালপেল রয়েছে আর সামনে পড়ে রয়েছে একটা মানুষের শরীর, তখন নিজেকে নিয়ে ভাববার কোনো সময় আপনার থাকে না—সে ভাবনা নিজেকে যন্ত্রণা দেবার জন্যই হোক আর পিঠ চাপড়াবার জন্যই হোক।

মানুষ। বেশ, নিয়তি আপনাকে একটা ইঙ্গিত পাঠালো, অনির্বাণ আপনার কাছে এল, সাংবাদিকতায় হাতে খড়ি হচ্ছে তার। সর্বোত্তম রাষ্ট্রীয় সম্মান প্রসঙ্গে যাঁদের নাম আলোচিত হচ্ছে তারই একজন উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে একটা ঝকঝকে লেখা তৈরি করার দায়িত্ব পড়েছে তার ওপর। আপনাকে চাক্ষুষ দেখার আগে থেকেই ও আপনার ভক্ত। সেদিন তখন সন্ধ্যে পেরিয়ে রাত—হাসপাতালে আপনার অফিসের দরজার বাইরে অপেক্ষা করে আছে ছেলেটি মহান চিকিৎসকের সাক্ষাতের অপেক্ষায়। করিডোরে হঠাৎ দেখা মহসীনের স্ত্রীর সঙ্গে।... সেই ভদ্রমহিলা দিল্লী থেকে স্বামীকে জীবিত ফিরিয়ে এনেছেন—আপনার মুখোমুখি আর একবার দাঁড়াবেন। সেই মুহূর্তে ছেলেটি সত্য আবিষ্কার করল এবং "ডাক্তারকে খোলা চিঠি" এই নামে একটা প্রবন্ধ লিখে ফেলল। (প্রবন্ধটি বার করেন) অবশ্য প্রবন্ধটি যতক্ষণ না ছাপা হচ্ছে, ওর চুপচাপ থাকাই উচিত ছিল। তা নয়, সোজা এটা নিয়ে সে গেল অভিযুক্তেরই কাছে। এই শিক্ষাই সে পেয়েছিল। কিন্তু আপনি—তখন তাকে কি করলেন? যদি সত্যি-সত্যিই আপনারা বিবেক তাড়িত বোধ করে থাকেন...

ডঃ চৌধুরী। আমরা কি করেছি ওকে?

মানুষ। আপনিও আগে ওখানে ছিলেন। বলতে চান আপনার মনে পড়ছে না? (বীণার মধ্যে উত্তেজনা শুরু হয়, উঠে দাঁড়ায় আবার বসে পড়ে)

ডঃ চৌধুরী। না, মনে পড়ছে না। আমাদের সম্পর্কে কি আজে-বাজে কথা বলেছে আপনাকে?

মানুষ। বড় অদ্ভুত চরিত্র ঐ ছেলেটির তাই না? আপনি তৎক্ষণাৎ ধরে ফেলেছিলেন এবড় কঠিন ঠাঁই।

ডঃ চৌধুরী। বাজে বকবেন না। ওকে কেউ সিরিয়াসলি নেয়নি। ছোকরার শুধু কথার ফুলঝুরি, আসল অভিজ্ঞতা এক ফোঁটাও ছিল না।

মানুষ। যে যেভাবে দেখে, ডক্টর চৌধুরী। অভিজ্ঞতা ওর ঠিকই ছিল, কিন্তু তার জাতটা আলাদা। এই জাতের মানুষ আমি চিনি, বড় সহজেই ঠকে যায়। ওরা কোথাও বিজ্ঞাপন দেখল: "মাটন রোল" এটা চিবোবে। যদিও তাতে মাটন প্রায় নেই আছে ময়দাভাজা আর

পেঁয়াজকুচি তবুও এটা চিবোবে আর মনে মনে বলবে ঃ "মাটন রোলটা কি ভালো।" আবার অন্য কোথাও একটা লেখা দেখতে পেল: "দেশের জন্য প্রাণ দাও"...সঙ্গে সঙ্গে ওরা ছুটবে দেশের জন্য প্রাণ দিতে। শুধু একটা চিহ্ন ওরা বুঝে উঠতে পারে না। 'ইন্দিরা বিকাশ পত্রে সঞ্চয় করুন, সাড়ে পাঁচ বছরে টাকা ডবল করুন।" এই মানুষগুলো কোথা থেকে আসে আমি জানি না। কিন্তু এদেরকে কষ্ট দেওয়া মহাপাপ।

ডঃ চৌধুরী। এক সেকেন্ড দাঁড়ান। এই অনির্বাণ আপনার কে হয়?

মানুষ। ও একটা বিধ্বস্ত মানুষ।

ডঃ চৌধুরী। সে আমরা শুনেছি। ও এ্যালকহলিক। কিন্তু আপনাকে এইসব কথা বলার সময় ও কি নেশার ঘোরে ছিল?

মানুষ। ও নিজে আমাকে প্রায় কিছুই বলেনি। শুধু প্রবন্ধটা পড়তে দিয়েছিল। বলেছিল এটা ছাপা হয়নি। আমি সেই কাগজের অফিসে গিয়েছিলাম...যাদের এই ঘটনাটা মনে আছে তাদের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। তারা আমাকে বলেছে লেখাটা বন্ধ করার জন্য প্রধান সম্পাদকের উদ্দেশ্যে কি পরিমাণ কামান দাগা হয়েছিল। আপনারা, বলা যায়, ট্যাংক বিধ্বংসী গোলাবর্ষণ করেছিলেন। আর বলছেন, আপনারা বিবেক-তাড়িত বোধ করছিলেন।

ডঃ কর্মকার। (মাথা তোলেন) কে বলেছে একথা। কার সঙ্গে যোগাযোগ করেছি আমি? কাকে ভয় দেখিয়েছি, কাকে অনুরোধ করেছি, কার কাছে দাবি করেছি লেখাটা যাতে ছাপা না হয়?

মানুষ। হা ঈশ্বর। এখানে তো ঐ পদ্ধতিতে কাজ হয়না। জানেন, আমি কিছুদিন থেকে ভাবছি, নষ্ট করার শক্তি কি প্রচন্ড হতে পারে। তাতে কি? ওভাবে তাকাবেন না। আপনি কি মনে করেন আমাদের অভিজ্ঞতাগুলো সবসময় ইতিবাচক? আমি সম্প্রতি একটা নতুন সূত্র আবিষ্কার করেছি—তৃতীয় স্তরের প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার সাহায্যে সবকিছু বানচাল করে দেওয়া সম্ভব। (সামনে ঝোঁকেন) স্বাস্থ্য দপ্তরের সেক্রেটারি সংবাদপত্রের সম্পাদককে ফোন করলেন। তখন তিনি আপনার তৃতীয় স্তরে বিরাজমান। আপনি কার্ডিওলজি সেন্টারের মুখ্য প্রশাসক।—স্বাস্থ্য দফতরের সেক্রেটারি—আপনার ওপরের তৃতীয় স্তর।

ডঃ কর্মকার। তাহলে আমি ব্যাপারটি ঘটাইনি। ধন্যবাদ। তা আপনি সেই ভদ্রলোককে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেছেন নিশ্চয়?

মানুষ। বলতে চাইছেন—আপনি এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না? মজার ব্যাপার, একমাত্র আপনিই অনির্বাণের প্রবন্ধটা পড়েছিলেন।

ডঃ কর্মকার। খবরের কাগজে অনেক লোকই কাজ করে।

মানুষ। তাহলে আপনাকে বলি আপনার পড়ার পর অনির্বাণ দুদিন ভাবনা-চিন্তা করে নতুন করে প্রবন্ধটা লিখছিল, তারপর ওটা নিয়ে গিয়েছিল

সংবাদপত্রের দফতরে। কিন্তু ততক্ষণে সেই তৃতীয় স্তরের গোলন্দাজরা গোলাবর্ষণ শুরু করে দিয়েছে। এবারে এই প্রক্রিয়ার নির্যাসটুকু নিশ্চয়ই ধরতে পেরেছেন?

ডঃ কর্মকার। আপনার এই যুক্তির কুটকচালীতে আমি ক্লান্ত। তৃতীয় স্তর...চতুর্থ...

মানুষ। না, না, শুধুমাত্র তৃতীয়। চতুর্থ স্তরে ঘোরাফেরা করলে আপনার অসুবিধাই হতো। ওরা আপনার পিঠ চাপড়াতো না। কিন্তু তৃতীয় স্তর নাগালের মধ্যে—একদিকে তিনি আপনারই লোক, অপর পক্ষে তিনি আপনার খানিকটা উঁচুতেও বটে। এ বিষয়ে আমি যথেষ্ট ভেবেছি। তৃতীয় স্তরের প্রক্রিয়া—এটা (শব্দ খুঁজতে চেষ্টা করেন) ...এর ক্ষমতা অসীম। আপনার ভুলটা হয়েছিল এই প্রক্রিয়ার ওপর আপনি পুরোপুরি ভরসা করতে পারেননি। এতেই আপনার কাজ হয়ে যেতো। দেশের চোখে এই শহরের চিকিৎসকদের মাথা হেঁট হয়ে যাবে—এই আবেদনে সাড়া না দিয়ে কোন উপায় ছিল সম্পাদকের? তাছাড়া এই শহরের একজন পদ্মবিভূষণ পাচ্ছেন—সেতো এখানকার ডাক্তারদের জয়, এখানকার সংবাদপত্রের দামী খবর। আপনার ব্যবস্থাটি নিশ্ছিদ্র নিরাপদ ছিল। তবুও আপনি আগ বাড়িয়ে ছেলেটির সমূহ সর্বনাশ ঘটালেন। কোন ঝুঁকি নিতে চাইলেন না।

ডঃ কর্মকার। আমরা কি করেছিলাম?

মানুষ। আপনাদের মধ্যে কার মাথায় এলো ওই সম্পাদককে বোঝানো দরকার যে অনির্বাণ পাঁড় মাতাল? আপনার, ডক্টর কর্মকার? নাকি আপনি, চৌধুরী সাহেব?

ডঃ কর্মকার। (উঠে দাঁড়ান) আপনার এই স্পর্ধা হল কি করে?

মানুষ। আপনি অস্বীকার করতে পারবেন না। ঐ একটা টেলিফোনের জন্য ছেলেটিকে সংবাদপত্র থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। এসব কিছুর লিখিত প্রমাণ আছে।

ডঃ কর্মকার। আমি কখনো এরকম কিছু বলিনি।

মানুষ। তাহলে আপনি নন। আপনারা তিনজন মাত্র এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন। অনির্বাণ নিশ্চয়ই নিজের এতবড় সর্বনাশ করবে না। তাহলে চৌধুরী সাহেব, আমরা কি দশ গুণবো?

ডঃ চৌধুরী। (সক্রোধে, কলম রেখে দেয়) অনির্বাণকে আপনি কতদিন চেনেন?

মানুষ। পুরো ছ'মাস।

ডঃ চৌধুরী। শুনুন আমার ধারণা ও... বেশ পুরনো পাকা মাতাল। আমাদের অফিসে ও সেদিন এসেছিল সম্পূর্ণ মত্ত অবস্থায়।

বীণা। (লাফিয়ে ওঠে) মিথ্যে কথা।

মানুষ। বীণা, দাঁড়াও।

বীণা। একথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যে।

মানুষ। বীণা, আমি তোমাকে বলেছিলাম।...

বীণা। ওই দিনটায় ও মদ খেতে পারে না।

মানুষ। (বীণাকে) ওঁদের বলতে দাও। (ডঃ কর্মকারকে) অনির্বাণ সেদিন আপনাদের কাছে মত্ত অবস্থায় এসেছিল, ঠিক তো?

ডঃ কর্মকার। কি ঠিক তো?

ডঃ চৌধুরী। ও মত্ত অবস্থায় এসেছিল।

ডঃ কর্মকার। (ডঃ চৌধুরী) আমার মনে হয় এইসব অবান্তর কথা নিয়ে...

ডঃ চৌধুরী। আপনি নিশ্চয় ভুলে গেছেন।

মানুষ। সেটা সম্ভব।

ডঃ চৌধুরী। নিশ্চয়ই।

ডঃ কর্মকার। (চৌধুরীকে) এটা তোমায় কে করতে বলেছিল?

ডঃ চৌধুরী। আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি না।

মানুষ। উনি আপনার কথা বুঝতে পারছেন না। আপনি একটু বুঝিয়ে বলুন না।

ডঃ চৌধুরী। ওর তখন কোন হুঁশ ছিল না।

ডঃ কর্মকার। তার সঙ্গে এই ঘটনার কি সম্পর্ক?

ডঃ চৌধুরী। ও বেহেড মাতাল অবস্থায় এসেছিল।

মানুষ। (ডঃ কর্মকারকে) আপনি মোটেই খেয়াল করলেন না—এটা সম্ভব?

ডঃ চৌধুরী। আপনি ভাবছেন, আমি ঠিক মনে করতে পারছি না। ও সেদিন সম্পূর্ণ মত্ত ছিলো।

মানুষ। (ডঃ কর্মকারকে) আপনার এখন মনে পড়ছে? অনির্বাণ আপনার কাছে এসেছিলো।

ডঃ কর্মকার। আমি জানি না। সে পাঁচবছর আগের কথা...আমার মনে পড়ছে না...

ডঃ চৌধুরী। কি মনে পড়ছে না আপনার? এ বিষয়ে কারো কোন সংশয়ই থাকতে পারে না, নেশার ঘোরে ও বেহুঁশ ছিলো।

মানুষ। (চৌধুরীর দিকে নির্দেশ করে ডঃ কর্মকারকে) এ বিষয়ে কারো কোন সংশয় থাকতেই পারে না—নেশার ঘোরে ও বেহুঁশ ছিলো।

ডঃ চৌধুরী। (ডঃ কর্মকারকে) আপনি শুনলেন কথাটা?

ডঃ কর্মকার। তো আমার কাছ থেকে কি জানতে চাইছেন?

ডঃ চৌধুরী। (মানুষকে) এই ব্যাপারে যদি আপনার কোনো সংশয় না থাকে তাহলে আর কি চাইছেন আপনি?

মানুষ। চৌধুরী সাহেব, আমার কথাটা বুঝতে এত সময় লাগছে কেন?

ডঃ চৌধুরী। কি বলতে চাচ্ছেন আপনি?

মানুষ। তাহলে ও তখন বেহেড বেহুঁশ মত্ত অবস্থায় ছিল তাই বলছেন তো?

ডঃ চৌধুরী। হ্যাঁ ও তখন বেহুঁশ মাতাল ছিল। তাতে কি?

মানুষ। (একটা কাগজ বের করেন যাতে আইনবিধি লেখা রয়েছে) আপনি যা বলছেন ভারতীয় দণ্ডবিধিতে একেই "মিথ্যা অবপাদ" বলা হয়ে

থাকে।

ডঃ কর্মকার। শুনুন। আমার কথা সবাই শুনুন।

মানুষ। এইখানে শতকরা একশো ভাগ প্রমাণ রয়েছে যে সেইদিন অনির্বাণ সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিক ছিল। ওই দিন ওর ড্রাইভিং লাইসেন্সের পরীক্ষা ছিলো। এই প্রমাণপত্রটি আমি মোটর ভেহিকেলস্ ডিপার্টমেন্ট থেকে পেয়েছি।

ডঃ চৌধুরী। কোথা থেকে আপনি কি খুঁড়ে বার করেছেন তাতে আমার কিছু আসে যায় না...

ডঃ কর্মকার। ভেবেছেন কি আপনারা? আপনারা দুজনে একি করছেন?

ডঃ চৌধুরী। আর সব ছেড়ে দিচ্ছি, এই লোকটা আইনের কিছুই বোঝে না। এ ঘটনা ঘটেছে পাঁচ বছর আগে। হাস্যকর।

মানুষ। আমরা আজ এখন থেকে দিন গুনতে শুরু করব। কারণ একটু আগেই আপনি কথাটার পুনরাবৃত্তি করেছেন। আপনি এইখানে বসে বলেছেন, "নেশার ঘোরে ও বেহুঁশ ছিলো।"

ডঃ চৌধুরী। ও, এই মতলব আপনার।

মানুষ। ঘটনাটা পাঁচবছর আগে ঘটেছিল, এই অজুহাতে আপনি পার পাবেন না।

ডঃ চৌধুরী। এতক্ষণে বুঝতে পারছি।

মানুষ। উনি ভেবেছিলেন আমি খেলা করছি।

ডঃ চৌধুরী। তাহলে আমি কিছুই বলি নি।

মানুষ। (বীণাকে দেখিয়ে) ওই আমার সাক্ষী। আমিও একজন সাক্ষী এবং আমার ধারণা ডঃ কর্মকার আপনার কথাগুলো শুনেছেন। উনি নিশ্চয়ই কাউকে মিথ্যা কথা বলতে দেবেন না।

ডঃ চৌধুরী। (হাত ছুঁড়ে) উনি কোনো কিছুই শোনেন নি।

মানুষ। ডঃ কর্মকার, আপনি ওঁর কথা শুনেছিলেন?

ডঃ কর্মকার। আপনারা দুজনে কি পাগল হয়ে গেছেন?

মানুষ। না, কিন্তু আপনি ওঁর কথাগুলো শুনেছেন কি?

ডঃ কর্মকার। থামান এসব।

মানুষ। আপনি একজন সাক্ষী হবেন। ওরা আপনাকে প্রশ্ন করবে আপনি কথাগুলো শুনেছেন কিনা।

ডঃ কর্মকার। এইরকম একটা পাগলামির সঙ্গে আমি নিজেকে জড়াতে রাজি নই।

মানুষ। আমি বলছি একটা মানুষের বিবেক-এর কথা। আপনি ওঁর কথা শুনেছেন? উনি বলেছেন...

ডঃ কর্মকার। আমি উত্তর দিতে বাধ্য নই।

মানুষ। আদালতে আপনাকে সতর্ক করে দেওয়া হবে যদি আপনি...

ডঃ কর্মকার। জাহান্নামে যাক্। যথেষ্ট হয়েছে।

মানুষ। ...মিথ্যে সাক্ষ্য দেন।

ডঃ কর্মকার। আপনি ঠেলতে ঠেলতে আমাকে একটা চূড়ান্ত জায়গায় নিয়ে যাচ্ছেন।

মানুষ। (তারও শেষ সীমায় দাঁড়িয়ে) আপনি নিজের কানে শুনেছেন ডঃ চৌধুরী এই অফিসে বসে তিনজন লোকের উপস্থিতিতে এই কথা বলেছেন যে অনির্বাণ যখন আপনার অফিসে সংবাদপত্রের প্রবন্ধটি নিয়ে আলোচনা করতে আসে তখন সে মত্ত বেহুঁশ ছিল।

ডঃ কর্মকার। আমি কোন কথাই শুনিনি।

নীরবতা। ডঃ কর্মকার কাঁচের পাত্রটির কাছে যান। গ্লাসে খানিকটা জল ঢেলে পান করেন।

মানুষ। (স্বল্প বিরতির পর) বীণা...সবকিছু এত কঠিন কেন? সত্য আমাদের পক্ষে। আইন আমাদের পক্ষে। তবুও আমি এত ঘামছি কেন? এরা সবাই কি আইনের উর্দ্ধে? (কণ্ঠস্বরে হিস্টিরিয়ার আভাষ) প্রত্যেকবার প্রত্যেকবার সামান্য সুবিচার চাইলে কেন মনে হয় আমি যেন চক্রব্যূহে বলী অভিমন্যু, আর সপ্তরথীরা চার পাশ থেকে আমাকে অমোঘভাবে ঘিরে ধরেছে। (টলতে টলতে টেলিফোনের দিকে এগিয়ে যান। ডায়াল করে ক্লান্তস্বরে বলে) আমি কি অনির্বাণের সঙ্গে কথা বলতে পারি? অনু, তুমি? তুমি ভাল আছ তো? সত্যি বলছ? কারণ? তোমার সবুজ পাঞ্জাবীর ডান পকেটটা দেখ— একটা ঠিকানা লেখা আছে, চল্লিশটা টাকাও রাখা আছে, একটা ট্যাক্সি ধরে এইখানে চলে এসো। আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করছি।...

দ্বিতীয় অঙ্ক

মানুষ। (টলতে টলতে টেলিফোনের দিকে যান, ডায়াল করেন, ক্লান্তস্বরে বলেন) আমি কি অনির্বাণের সঙ্গে কথা বলতে পারি? অনু তুমি? তুমি ভালো আছো তো? সত্যি বলছ? কারণ? তোমার সবুজ পাঞ্জাবীর ডান পকেটটা দ্যাখো—একটা ঠিকানা লেখা আছে চল্লিশটা টাকাও রাখা আছে, একটা ট্যাক্সি ধরে ঐ ঠিকানায় চলে এস। আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করছি। (টেলিফোন রেখে দেন)

ডঃ কর্মকার। (সিন্দুকের পাশে দাঁড়ান) এটার উদ্দেশ্য কি? আমার অনির্বাণের সঙ্গে দেখা করার কোন ইচ্ছে নেই।

মানুষ। ওর এ্যাপয়েন্টমেন্ট করা আছে। ডক্টর চৌধুরী, আজকের সাক্ষাৎপ্রার্থীর তালিকাটা দেখুন, ওর নাম রয়েছে ঃ "অনির্বাণ মজুমদার ব্যক্তিগত বিষয়।" আজ এখানে প্রত্যেকেই ব্যক্তিগত প্রয়োজনে এসেছে।

ডঃ কর্মকার। (শাসনের সুরে) অনুগ্রহ করে টেলিফোন করুন, অনির্বাণকে আসতে বারণ করে দিন।

মানুষ। ও এর মধ্যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছে।

ডঃ কর্মকার। (চূড়ান্তভাবে নিজের কোটটা তুলে নেন) তাহলে আমি চলে যাচ্ছি। (ডঃ চৌধুরীকে) গাড়ি ডেকে পাঠাও, আমার শরীর ভালো লাগছে না। (কোট পরার চেষ্টা করেন) অন্তত এটুকু অধিকার আমার এখনও আছে।

ডঃ চৌধুরী টেলিফোনের কাছে যায়, ফোনে তোলে, হঠাৎ থেমে

ডঃ চৌধুরী। আর আমি কি করব?

ডঃ কর্মকার। (কোটের হাতায় হাত ঢুকছে না) আমি কি করব? তুমি কি করবে? গাড়িটা কে ডাকবে?

মানুষ। চৌধুরী, আপনি কি করবেন? আপনার বসের মত আপনিও অসুস্থ হয়ে পড়ুন না—এ কদিনের জন্য।

ডঃ চৌধুরী। হ্যাঁ, নয় কেন?

মানুষ। আশা করব আদালতে শুনানীর আগেই আপনি সুস্থ হয়ে উঠবেন। দুজন সাক্ষী—বড় কম কথা নয়।

ডঃ চৌধুরী। সে আমরা দেখব।

মানুষ। শুনানীর দিন পেছিয়ে দেওয়া হবে। একদিন না একদিন আপনি সুস্থ হবেনই। হবেন না?

ডঃ চৌধুরী। হ্যাঁ, কোন একদিন।

মানুষ। আপনাকে বাদ দিয়ে কোন শুনানী হচ্ছে না। আপনিতো সাক্ষী নন, আপনিই অভিযুক্ত। আর আমার ধারণা মন্ত্রী মহাশয় আপনাকে ত্যাগ করবেন না। উনিও আসবেন (ডঃ কর্মকারের দিকে তাকান)।

ডঃ চৌধুরী। রাষ্ট্রমন্ত্রী।

মানুষ। পূর্ণমন্ত্রী। আমার ধারণা ততদিনে নিশ্চই সেটা পাকাপাকি হয়ে যাবে।

নীরবতা। ডঃ চৌধুরী ও ডঃ কর্মকার পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকেন। তারপর মানুষ-এর দিকে—

(কোট পরে নেন) না, ডক্টর কর্মকার, কিছুই বদলায়নি; সবকিছু ঠিক পাঁচ বছর আগের মতই আছে তখন রাষ্ট্রীয় সম্মান পাওয়ার কথা আর এখন আপনার পূর্ণমন্ত্রী হবার সময়। সেবারে ছিল অনির্বাণ, এবারে আমি।

ডঃ কর্মকার। (কোট না খুলে, নিজের চেয়ারে বসেন) শুনুন। এতক্ষণ আমি নিজের নয়, আপনার কথাই বেশি করে ভাবছিলাম। এই ব্যাপারে আপনারই জিত হবে আপনি নিশ্চিত হচ্ছেন কি করে?

মানুষ। আমি নিশ্চিত। (ভাবতে থাকেন) বোধকরি আমি সত্যের পক্ষে আছি সেই জন্য। প্রত্যেকবার যখন এই রকম একটা কিছু নিয়ে ভাবতে থাকি, আমি নিজেকে প্রশ্ন করি: ঠিক করছি না ভুল করছি। ঐ একটা বিষয়ে আমার যত চিন্তা।

ডঃ কর্মকার। (ভুরু কুঁচকে) প্রত্যেকবার?

মানুষ। প্রত্যেকবার।

ডঃ কর্মকার। এই তাহলে প্রথম নয়? এই ধরণের কাজ আপনি কি নিয়মিত করে থাকেন?

মানুষ। ঠিক কিভাবে বলব...(উদ্ধত) তার সঙ্গে এর কি সম্পর্ক?

ডঃ চৌধুরী। আপনি তাহলে একজন দালাল। (মৃদু হাসেন) সলিসিটর। লোকেরা কাজের জন্য আপনাকে ভাড়া করে...

মানুষ। আমাকে? (দৃঢ়ভাবে) আমাকে ভাড়া করার সাধ্য কারও নেই...

ডঃ কর্মকার। বেশ, তারা আপনাকে অনুরোধ করে যাতে...

ডঃ চৌধুরী। নিকুচি করেছে। এতক্ষণে বুঝেছি এর পেছনে কে আছে—

ডঃ কর্মকার। কে?

ডঃ চৌধুরী। এক্ষুণি বলছি, স্যার...(মানুষকে) তা এইসব কাণ্ডকারখানা আপনি অনেকদিন ধরেই চালিয়ে যাচ্ছেন?

মানুষ। (বীণাকে) কেমন বুঝছো তুমি? (ডঃ চৌধুরীকে) বেশ আপনার কথাই মেনে নেওয়া যাক। ধরুন এইসব কাণ্ডকারখানা অনেকদিন ধরেই চালাচ্ছি।

ডঃ চৌধুরী। (হেসে) আপনি তাহলে এ ব্যাপারে পেশাদার।

মানুষ। কোনো কিছুর প্রত্যাশা ছাড়াই আমি এসব করি কিনা একথাটাই জানতে চাইছেন? এই ধরণের ইঙ্গিত করতে চাইছেন তো?

ডঃ চৌধুরী। একেবারে কোন কিছু ছাড়াই?

মানুষ। আমাকে বিশ্বাস করছেন না?

ডঃ চৌধুরী। (ব্যঙ্গ করে) তা আপনার খরচপত্র কিরম হয়?

মানুষ। ওঃ, খরচ অনেক হয়।

ডঃ চৌধুরী। এই কেসটায় কি রকম হচ্ছে?

মানুষ। আপনি দুশ্চিন্তা করবেন না। আমার মাইনে বেশ ভালোই, বোনাস আছে। একভাবে ঠিক চালিয়ে নিই।

ডঃ চৌধুরী। তাহলে এইসব কাজে আপনার যথেষ্ট খরচ হয় কিন্তু আয় কিছুই হয় না। আপনারা গ্রাহকেরা অত্যন্ত অকৃতজ্ঞ। এই রকম কাজের জন্য আমি অনেক পয়সা দিতাম, খুব পরিশ্রমের কাজ তো।

মানুষ। (গম্ভীরভাবে) আমি জানি।

ডঃ চৌধুরী। তাহলে নিজের গাঁটের কড়ি খরচা করে আপনি পরের ঝামেলা মেটান। ডক্টর সুনন্দা সান্যালের সঙ্গে আপনার কত দিনের জানাশোনা?

ডঃ কর্মকার। (বিস্মিত) চৌধুরী।

ডঃ চৌধুরী। মাফ করবেন, স্যার...আপনার প্রাক্তন মন্ত্রী কিন্তু মেডিক্যাল রেকর্ডস-এর দায়িত্বে আছেন। (ডঃ কর্মকারের কাছে টেলিফোন ডাইরেক্টরি নিয়ে যায়) এই যে স্যার—ডক্টর সান্যাল। আপনি তখন খোঁজ নিতে বলেছিলেন, তা আমি বার করেছি। তখন ঠিক খেয়াল করতে পারিনি।

ডঃ কর্মকার। (উঠে দাঁড়ান) শাট আপ। (মানুষের কাছে যান) কথাটা সত্যি?

মানুষ। কি সত্যি? হ্যাঁ, ডক্টর সুনন্দা সান্যাল এখানে কাজ করেন। আমি এখন জানতে পারলাম উনি আপনার প্রাক্তন মন্ত্রী।

ডঃ চৌধুরী। স্বভাবতই উনি আপনাকে সত্যি কথাটা বলবেন না।...(চালিয়েই যেত, কিন্তু ডক্টর কর্মকারের কঠোর দৃষ্টিতে থেমে যায়। জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ায় ইচ্ছাকৃত ভারিক্কি ভাব)

ডঃ কর্মকার। আপনি এখন জানলেন কথাটা? আপনি মিথ্যে বলছেন না? (বিরতি) আপনার কি একটা কিছু আছে যা আপনাকে বিশ্বাস করতে বাধ্য করে।

মানুষ। (মাথা নেড়ে) আপনি যদি ওঁর সম্পর্কে এই ধরণের সন্দেহ করতে পারেন...কল্পনা করতে পারছি কি ধরণের ডিভোর্স আপনাদের হয়েছিল...

ডঃ কর্মকার। দু'জন মানুষের মধ্যে অনেক কিছু—সবকিছুই ঘটতে পারে।

মানুষ। আমার কেমন ধারণা ছিল প্রাক্তন মন্ত্রীর সঙ্গে পুরুষদের সম্পর্ক অনেকটা ঐ ভাইবোনের মত হয়ে যায়। অবশ্য ঠিক জানি না; আমিতো কখনো বিয়ে করিনি।

ডঃ কর্মকার। ও পশ্চিমে চলে গিয়েছিল। সে অনেক দিন আগের কথা। ও নিশ্চয়ই ফিরে এসেছে...(হঠাৎ) আমি ওর হার্ট অপারেশন করিনি। তিনি আমার দ্বিতীয় স্ত্রী।

মানুষ। আমি জানি। ইনি অভিনেত্রী।

ডঃ কর্মকার। আপনি কি করে জানলেন?

মানুষ। হাসপাতালে খোঁজ নিয়েছিলাম। সবাই আপনাকে জানে, আপনার বিষয়ে সবকিছুই জানে। ওরাই বলেছিল, আপনি আপনার পেশেন্টকে বিয়ে করেছেন—ভদ্রমহিলার একটি ছোট মেয়ে ছিল, আপনি মেয়েটিকে মানুষ করেছেন। শুনে ভাবলাম বড় সহজ কাজ নয়। আর এর থেকে আপনার সম্পর্কেও একটা ধারণা হোলো।

ডঃ কর্মকার। কি?

মানুষ। আপনি ওঁর আওর্টা অপারেশন করেছিলেন। নিশ্চয়ই স্পষ্ট বুঝেছিলেন যদি একটা কিছু ঘটে যায়, সারা জীবন আপনাকে অপরের সন্তান মানুষ করতে হবে।

ডঃ কর্মকার জানালার কাছে যান, সারা শরীরে ক্লান্তি। পকেটে হাত রেখে উল্টোদিকের বাড়িগুলোর ছাতের দিকে নিমগ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন।

সম্ভবত সেইজন্যই স্থির করেছিলাম কোনো লিখিত অভিযোগ করব না। নিজেই আপনার কাছে আসব, এ নিয়ে আলোচনা করব।

ডঃ কর্মকার। (মুখ না ফিরিয়েই) ডক্টর সান্যাল কেমন আছেন?

মানুষ। ওঁর সঙ্গে আমি দেখা করিনি।

ডঃ কর্মকার জানালার বাইরে তাকিয়ে থাকেন, হঠাৎ রুখে দাঁড়ান।

ডঃ কর্মকার। চৌধুরী, ঐ দেরাজে ফ্লাস্কে ভর্তি কফি আছে।...

ডঃ চৌধুরী। (হঠাৎ উদ্ধত) তা গিয়ে নিয়ে আসুন।

ডঃ কর্মকার। আমার সঙ্গে ওভাবে কথা বোল না।...ঠিক আছে। আমিই নিয়ে আসছি। (দেরাজের কাছে যান) দিনের শেষ বেলায় ঠিক এই সময়ে কেমন ঘুম-ঘুম পায়। চোখ খুলে রাখতে পারি না। ঠোঁট ভারি হয়ে আসে...(থার্মস বার করেন, খোলেন...কিছু একটা খোঁজেন)

মানুষ। আপনার হইপক্সিয়া আছে। আমি জানি আপনার কেমন লাগছে।

ডঃ কর্মকার। আপনি কি করে জানবেন? আপনি তো চল্লিশের আশে পাশে। (ডঃ চৌধুরীকে) কাপগুলো কোথায়?

মানুষ। আমারও এই সময়টায় খুব ক্লান্ত লাগে।

ডঃ কর্মকার। (কাপ খুঁজে পান। নিজের ডেস্কে ফিরে যান) বটেই তো। আপনিতো দু-শিফ্‌টে কাজ করেন। (কফি ঢালেন।) সকালে নিজের কাজ, বিকেল থেকে সলিসিটরের কাজ। (ডঃ চৌধুরীকে) আরো কাপ দরকার।

ডঃ চৌধুরী। (দাঁত চেপে) একগাদা কাপ আপনার ঠিক ডানদিকে রয়েছে।

ডঃ কর্মকার ডঃ চৌধুরীর দিকে চোখ তুলে তাকান। আশা করেন সে চোখ নামিয়ে নেবে। কিন্তু ডঃ চৌধুরী জেদ ছাড়ে না। এবারে মানুষ উঠে দাঁড়ান, কাপগুলো নামান, সেগুলি নিয়ে এসে ডঃ কর্মকারের সামনে টেবিলে রাখেন।

ডঃ কর্মকার। (স্পষ্টতই কফি ঢালার অভ্যাস নেই) আমি এখনও বুঝতে পারছি না। আপনি কি ফ্যাক্টরিতে কাজ করেন? নাকি অফিসে? নাকি অধ্যাপক? (থেমে) মানে আপনার প্রধান জীবিকা ঠিক কি?

মানুষ। তাতে সত্যিই কিছু এসে যায়? আমি একজন মানুষ—তাই কি যথেষ্ট নয়?

ডঃ কর্মকার। আপনি ভয় পাচ্ছেন আপনার চাকরীর জায়গায় আমরা ঝামেলা পাকাবো?

মানুষ। বেশ বলছি...কিন্তু একথাটা জানা এত জরুরী হয়ে উঠল কেন? আপনার মনোভাব এতে পাল্টে যাবে?

ডঃ কর্মকার। ঠিক আছে—ছেড়ে দিন। আপনার জীবিকা নিয়ে আমার মাথা ঘামানোর কি দরকার! (বীণার উদ্দেশ্যে কাপ এগিয়ে দেন) এই যে, আপনার। (ওর দ্বিধা লক্ষ্য করেন) কাপটা ধরুন, প্লীজ...এটা কফি। (মানুষকে) দয়া করে ওঁকে অনুমতি দেবেন। ঈশ্বর! আপনার কাছে উনি অনুমতি চাইছেন। (আবার কাপটা দেবার চেষ্টা করেন, কিন্তু বীণা নেবে না) প্রভু বটে একজন আপনার। আপনি কিছু বলছেন না কেন? চুপচাপ থাকাই আপনার ভূমিকা? বড় কঠিন কাজ; আপনার ক্ষতি-পূরণ পাওয়া উচিত। (মানুষকে একটি কাপ এগিয়ে দেন) এই যে—আপনি। শুনুন কিছুক্ষণ ক্ষান্ত দেওয়া যাক। বিরতি—বিশ্রাম।

মানুষ। (কাঁধ ঝাঁকিয়ে) ঠিক আছে।

ডঃ কর্মকার। আপনি কফি খান?

মানুষ। হ্যাঁ, আমি কফি খাই। (কাগজ নামিয়ে রেখে কাপ তুলে নেন)

ডঃ কর্মকার। (কাপে চুমুক দিয়ে) আমাদের আগে কখনও দেখা হয়েছে?

মানুষ। হ্যাঁ, হয়েছে।

ডঃ কর্মকার। (যথার্থ উৎসুক) সত্যি। কোথায়?

মানুষ। ঐ যে কার্ডিওলজি সেন্টারের কনফারেন্স রুমের সামনের দেওয়ালে কতকগুলো পোর্ট্রেট ঝোলানো আছে? আপনার ছবিও আছে ওখানে। গত পরশু আমি ওগুলোর সামনে দাঁড়িয়েছিলাম...আর ভাবছিলাম সত্যিই কি মুখ দেখে বোঝা যায় আমরা কেমন মানুষ।

ডঃ কর্মকার। (বাধা দিয়ে) আমাকে নয়, আপনি আমার ছবি দেখেছেন?

মানুষ। (সামান্য বিরতি) তারপরে আপনি এলেন।

ডঃ কর্মকার। (বিস্মিত) আমি! গত পরশু?

মানুষ। আপনি হেঁটে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ আপনার (হাত দিয়ে ছবির আকার দেখান)...সামনে দাঁড়িয়ে গেলেন। মনে পড়ছে না আপনার?

ডঃ কর্মকার। (সামান্য বিরতি) এক মিনিট, হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়ছে...আমি...(আত্মসচেতন হাসি লুকিয়ে রাখতে পারেন না) হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন...আমি যেতে যেতে হঠাৎ দেখলাম ছবিটা বেঁকে রয়েছে।

মানুষ। (খুশি) তাহলেই দেখলেন।

ডঃ কর্মকার। (কথার সঙ্গে হাসতে থাকেন) বুঝতে পারছি, নিজের ছবির সামনে দাঁড়িয়ে আমি...নিশ্চয় মুখটা ফানি লাগছিল। কি করা উচিত ছিল আমার—জমাদারণীকে ডেকে সোজা করে দিতে বলা?

মানুষ। আপনি ইয়ার্কি মারছেন। সেতো আরো ছেলেমানুষি হোত। (হাসতে থাকেন)

ডঃ কর্মকার। সত্যি। (যেন জমাদারণীকে নির্দেশ দিচ্ছেন) আমার ছবিটা বেঁকে গেছে, যাও, সোজা করে দাও।

মানুষ। ওঃ সে একেবারে বীভৎস হোত। চূড়ান্ত। সাংঘাতিক। (হাসেন)

ডঃ কর্মকার। (খুশি) তার চেয়ে নিজেই ঠিক করে দেওয়া ভালো। (চোখ টেপেন)

মানুষ। (একমত) নিশ্চয়ই, অবশ্য কেউ দেখছে না—সেই ফাঁকে...

ডঃ কর্মকার। (গম্ভীরভাবে) আপনার ছবি বেঁকে রয়েছে—দেখেও চলে যেতেন? আপনি কি করতেন?

মানুষ। জানি না। (হঠাৎ ভাবেন) আমি আদৌ ছবিটা ঝোলাতাম না। কেন?—আমি তো ফিল্মস্টার নই। তাছাড়া মানুষ বদলে যায়...আর সবসময় যে ভালোর দিকেই বদলায় তাও তো নয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে একটা লোকের কত কি ঘটতে পারে। অনেক দোষ জন্মাতে পারে, একেবারে নষ্ট হয়ে যেতে পারে...তখন কি করা? ছবিটা নামিয়ে নেওয়া। হ্যাঁ, মানুষ মরে যাওয়ার পরে অবশ্য অন্য কথা। তখন ঠিকই আছে। কে যে কী সময় ঠিক বলে দেয়।

ডঃ চৌধুরী। আমার মনে হয় ইন্টারভ্যাল শেষ হয়ে গেছে। কিছু একটা করা দরকার।

ডঃ কর্মকার। (একটু বিরতি) হ্যাঁ, ঠিক। কি করব আমি? (মানুষকে) আমরা এখন কি করব?

মানুষ। আমরা অপেক্ষা করব, অনির্বাণের জন্য অপেক্ষা করব।

ডঃ চৌধুরী। আজ হঠাৎ আপনার এই অনির্বাণ কি চায়? এতগুলো বছর চুপচাপ, হঠাৎ ঠিক করে ফেলল একটা কিছু করতে হবে।

মানুষ। ও নিজে কোন কিছু সিদ্ধান্ত নেয়নি। ও জানেও না কোথায় যাচ্ছে— কেন যাচ্ছে।

ডঃ চৌধুরী। তাহলে ওকে এখানে ডেকে আনছেন কেন?

মানুষ। একটা বিষয় এখনও স্পষ্ট নয়...রহস্য থেকে গেছে।

ডঃ চৌধুরী। আবার রহস্য। এখনও যথেষ্ট হয়নি?

মানুষ। আমি ওকে আপনাদের সামনে একটা প্রশ্ন করতে চাই। হয়তো অপ্রত্যাশিত কিছু ভেসে উঠতে পারে।

ডঃ কর্মকার। আমি একজন দুঁদে উকিলকে চিনতাম—ঠিক আপনার মতই। লোকটা পাঁচজনের গোপন কেচ্ছা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে ভালোবাসতো...

মানুষ। (বাধা দিয়ে) ভালোবাসা কথাটা সঠিক নয়। এরকম কাজ কেউ ভালোবাসতে পারে না। যে মানুষ এই সব কাজে আনন্দ পায় ...

ডঃ কর্মকার। ঠিক আছে। ভালোবাসতো না, কিন্তু এই কাজই করতো। সারাজীবন ধরে। (বিরতি) আপনি কখনো এভাবে নিজের কথাটা ভেবেছেন? (থামে) তাই যদি হয় আপনার গা ঘিনঘিন করেনা? এই দুর্গন্ধ শুঁকে শুঁকে নখ দিয়ে আঁচড়ে মাটির তলা থেকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে নোংরা খুঁজে বার করা—অসহ্য লাগে না।? প্রত্যেক দিন রাত্রে বিছানায় শুয়ে ঘেন্নায় আপনার বমি পায় না?

মানুষ। আমিও এক ভদ্রলোককে চিনতাম। জীবনে একটা পিঁপড়ে পর্যন্ত মারেননি, সত্যিকারের সাধুসন্ত ছিলেন। ভদ্রলোক। অন্য লোকদের ক্লেদ ময়লা ওর গায়ে লাগতো না, আশ্চর্য পরিচ্ছন্ন ছিলেন। আমার মনে হতো—ভদ্রলোকের কোন আত্মাই নেই, নয়তো উনি একটি নিপাট বজ্জাৎ। ঠিক এই কথাটাই একদিন ওঁকে বলেছিলাম আমি! ভদ্রলোক খুব চমকে গেলেন। ...উনি আমার বাবা।

নীরবতা।

ডঃ কর্মকার। নিজের বাবাকে আপনি একথা বললেন? (বিরতি) ঠিকই ... নিজের বাবার ওপর যদি এত নিষ্ঠুর হতে পারেন ...

মানুষ। (হঠাৎ চিৎকার করে ওঠেন) ওঁর চারপাশের সব মানুষগুলোর জীবন ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু উনি তখন গতশতকের বঙ্কিমচন্দ্রের অতিনাটকীয় উপন্যাস পড়তে পড়তে চোখের জল ফেলতে ব্যস্ত থাকতেন। রোজ সকালে উনি সেতারে টোড়ি-বামকেলি-ভৈরবী

রাগ বাজাতেন, যেন মার্গসঙ্গীতের স্রোতাস্বিনী ধারায় উনি হাত ধুতেন। (সেতার বাজানোর ভঙ্গি করেন) যেন সেতারের তার দিয়ে নখের ময়লা পরিস্কার করতেন ...(হিস্টিরিয়া) চারপাশে যা সব ঘটে যাচ্ছে সেই সবকিছুই সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে উনি কি ঈশ্বরের সঙ্গে গোপন সংলাপ বলতেন?

ডঃ কর্মকার। আপনার চিৎকার করার কোন প্রয়োজন নেই।

মানুষ। অন্য কীভাবে একজন সৎলোক বাঁচবে? যে শুধুমাত্র নিজের কথা ভাবে না—অন্য পাঁচজনের কথা চিন্তা করে যে নিজেকে সার্থক মনে করে? হ্যাঁ—আমার পেট গুলিয়ে আসে, ঘেন্নায় আমার বমি পায়, আমার নাক দিয়ে কান দিয়ে বমি বেরিয়ে আসতে চায়। আমার সহ্যের সীমা আছে। মানুষ কি শুধু নিজের স্বার্থের কথাই ভাববে?

ডঃ কর্মকার। আপনি নিজেকে সংযত করুন ...

মানুষ। ছোঁবেন না আমাকে—স্পর্দ্ধা... আপনি আমাকে নোংরা বলেন? একার ক্লেদ?! কার নোংরা?! আপনার।

নীরবতা।

ডঃ চৌধুরী। (হঠাৎ) অনির্বাণ যদি আদৌ কিছু না জানে ... তার মানে এ ব্যাপারে ওর কোন উদ্যোগ নেই।

মানুষ। (এখনও বিরক্ত) না ওর ভেতরে আর কোন উদ্যোগ অবশিষ্ট নেই। সেইটাই ভয়ংকর। আপনারা ওর ভেতরের সামাজিক দায়বোধ নিঃশেষ করে দিয়েছেন, আর আমি চেষ্টা করছি ওকে এই জীবনের মধ্যে ফিরিয়ে আনতে—

ডঃ চৌধুরী। কেউ নিশ্চয় আপনাকে এই সব করতে তাতিয়েছে।

মানুষ। চৌধুরী। কি বলতে চাচ্ছেন আপনি? কি খচখচ করছে আপনার মধ্যে?

ডঃ চৌধুরী। আমি বলছি কে আপনাকে দিয়ে এসব করাচ্ছে।—ঐ মহসীনের স্ত্রী?

মানুষ। আমি ওঁকে কোনদিন দেখিইনি।

ডঃ চৌধুরী। কি বলেছেন আপনি? ওর অভিযোগ আপনি আমাদের দেখালেন। বললেন পেশেন্টের স্ত্রীর কথাবার্তা লেখা রয়েছে আপনার কাছে।

মানুষ। এইসব উনি অনির্বাণকে বলেছিলেন পাঁচবছর আগে। এই কাজটা শুরু করার সময় অনির্বাণের কাগজপত্রের মধ্যে খুঁজে পেয়েছি।

ডঃ চৌধুরী। তাহলে আপনি ঐ ভদ্রমহিলার সঙ্গে কখনও দেখা করেন নি?

মানুষ। (সন্দিগ্ধ) এতে আপনি অবাক হচ্ছেন কেন?

ডঃ চৌধুরী। এ্যাঁ, না কিছু না...

মানুষ। ওঁর সঙ্গে আমার দেখা করা উচিত ছিল?

ডঃ চৌধুরী। আপনি সব কথা ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে দেখেন।

মানুষ। কেন যেন মনে হচ্ছে আমার সঙ্গে ভদ্রমহিলার দেখা হলে আপনার

কোন ভয়ের কারণ আছে। হয়তো উনি আরও এমন কিছু জানেন...

ডঃ চৌধুরী। আপনি মশাই একটা বুলডোজার। আমি ধরে নিয়েছিলাম আপনি এই নিয়ে এত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খোঁজ নিয়েছেন—হয়তো এবিষয়ে জড়িত সকলের সঙ্গে, ঐ মহসীন পরিবারের সঙ্গেও আপনি দেখা করেছেন।

মানুষ। মহসীনেদের কাছে আমি কি করতে যাব? আমার শুধু দরকার ছিল ঐ মেডিক্যাল রেকর্ডগুলো দেখা আর অনির্বাণের বিরুদ্ধে আপনারা যা যা করেছেন তার খোঁজ নেওয়া তাছাড়া বুঝতেই পারছেন—সেই ভয়ংকর অভিজ্ঞতা নিয়ে কোন আলোচনা মহসীন পরিবারের কাছে কি প্রচণ্ড কষ্টের হতো? তবুও আমি ওঁদের সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলাম, কিন্তু অনির্বাণ বলল আমি যেন ওদের বিরক্ত না করি—

ডঃ কর্মকার। কখ্খনো না। গতবছর মহসীনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল... ওর স্বাস্থ্য বেশ খারাপ যাচ্ছিল। আর কিছুদিনের মধ্যেই ওই সিনথেটিক মেটিরিয়াল থেকে রক্ত চুঁইয়ে চুঁইয়ে ওর লাঙ্‌স্‌-এ পৌঁছে যাবে। আমি নিশ্চিত, ছ'মাস থেকে একবছরের মধ্যে ওকে আর একবার আয়োর্টোপ্লাস্টি অপারেশন করাতে হবে। ওকে কোন কারণেই বিরক্ত করা উচিত নয়। তাহলেই ওর ব্লাড প্রেসার চড়ে যাবে এবং লোকটি মরে যাবে।

মানুষ। যাইহোক, ওই ভদ্রলোককে না জড়িয়েও তো সবকিছু স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। (চৌধুরীর দিকে তাকান, তাঁর দ্বিধার পেছনে কি আছে ধরতে পারেন না।) চৌধুরী মনে হচ্ছে আপনি খুব ধাঁধায় পড়েছেন ঠিক আছে, ক্ষতিবৃদ্ধি যখন কিছু হচ্ছে না আমি বলছি কে আমাকে এর মধ্যে নিয়ে এসেছে। ঐ বীণা।

ডঃ চৌধুরী। কেমন বুঝছেন, স্যর?

ডঃ কর্মকার। আপনিই তাহলে এ সবকিছুর মূলে উঁ? (বীণার কাছে যান) এসব কিছুর মধ্যে আপনার কি ভূমিকা? আপনার সঙ্গে কি অনির্বাণের কোন আত্মীয়তা আছে?

নীরবতা

বীণা। (কাঁদতে কাঁদতে শান্তভাবে) আপনারা ওকে ধ্বংস করে ফেলেছেন... কেন এমন করলেন...ও সবে শুরু করেছিল (কান্নায় কথা আটকে যেতে থাকে) লজ্জায় আপনাদের নেশাগ্রস্ত হওয়ার কথা—ওর নয়। (চিৎকার করে) একটা পবিত্র নিষ্পাপ মানুষ। কত ক্ষমতা ছিল ওর। (প্রায় হিস্টিরিয়া)

ডঃ কর্মকার। শান্ত হোন প্লীজ... শান্ত হোন...(চৌধুরীর দিকে তাকান)।

মানুষ সাহায্য করার জন্য লাফিয়ে ওঠেন

(মানুষকে) আপনি বসুন, ভদ্রমহিলা হিস্টিরিকাল হয়ে গেছেন। ও একজন ডাক্তার—

ডঃ চৌধুরী। (বীণার কাছে জল নিয়ে যায়) আমাদের সিডেটিভ ছিল না? এই

জলটা খান(বীণাকে জল দেয়) আমি এক্ষুনি আসছি...(মানুষকে) আপনি এইভাবে ওকে উত্তেজিত করে তুললেন।

বীণা। (ধাক্কা দিয়ে হাত সরিয়ে দেয়) সরে যান আমার কাছ থেকে।

ডঃ চৌধুরী। এক ঢোক খান।

বীণা। আপনি বদমাইশ। আপনি মিথ্যেবাদী।

ডঃ চৌধুরী। আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক আছে। শুধু একটু জল খান।

বীণা। (হাত সরিয়ে দেয়) আপনি মিথ্যে কথা বলছেন। সেইদিন ও নেশা করেনি। ও একেবারে...

ডঃ চৌধুরী। ঠিক আছে, ঠিক আছে। এটা খাবার জল (খাওয়ানোর চেষ্টা করে) স্রেফ এক চুমুক খান...

বীণা। (জল ছিটকে দেয়) আপনাদের অফিসেও সেদিন...

ডঃ চৌধুরী। হ্যাঁ, আমাদের অফিসে সেদিন ও সুস্থ স্বাভাবিক ছিল (হঠাৎ খুব চড়া আদেশের গলায় কথা বলতে থাকে) চুপ, একেবারে চুপ। এই যে এই একটা আয়না। (আয়নাটা তুলে নেয়) এই যে দেখছেন এটার দিকে তাকান। (আয়না রেখে দেয়) সাবধান। ছোঁবেন না এটা। আপনার ঠোঁট দুটি আয়নায় ছোঁয়ান। হাল্কা করে (আয়না সামনে ধরে) এইতো।

ডঃ কর্মকার। (মানুষকে ইঙ্গিত করেন) আর একটা কথাও নয়।

সবাই চুপ। বীণা ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে আসে।

ডঃ চৌধুরী। (কঠিন গলায়) আপনার শুয়ে পড়া দরকার। (ইশারায় ওকে কাউচের কাছে নিয়ে যায়)

বীণা। (ফোঁপায়) আমি আর এরকম করব না।

মানুষ। বীণা, তুমি ঐখানে বাইরে অপেক্ষা করো, প্লীজ।

বীণা। আমি এখন ঠিক হয়ে গেছি।

মানুষ। তুমি এখানে না থাকলেই ভালো।

বীণা। আর হবে না। আমি আর ওরকম করব না। আমি এখানে থাকব।

ডঃ কর্মকার। এরকম চলতে পারে না। আমি একজন ডাক্তার হিসেবে কথাটা বলছি—

বীণা। (দৃঢ়) আমি শেষ পর্যন্ত এখানে থাকতে চাই।

ঘৃণার চোখে ডঃ চৌধুরীর দিকে তাকায়, সোজা হয়ে বসে

ডঃ কর্মকার। (সহযোগীকে) তুমি এদিকে এস।

মানুষ। (দৃঢ়) বীণা, পাশের ঘরে যাও, প্লীজ।

বীণা। (আকুতি) শুনুন...(চেষ্টা অর্থহীন বুঝে ঘর ছেড়ে চলে যায়)

নীরবতা

ডঃ কর্মকার। আমরা সবাই চেঁচাচ্ছিলাম উনি চুপ করে বসেছিলেন—ওর ভেতরে ওটা জমে উঠেছিল...

মানুষ। হ্যাঁ, এতগুলো বছর ধরে। আপনারা কি মনে করেন,...অতি প্রিয় মানুষ... ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে...প্রতিদিন চোখের সামনে একটু একটু

করে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে... তাঁর সঙ্গে বাস করা খুব সহজ। অনির্বাণ অনাথ আশ্রমে বড় হয়েছিল, দুর্বল ছিল মানুষটা। বীণা ছিল প্রায় ওর মায়ের মত। ওর সব কিছু বীণার হাতে তৈরী। তারপর হঠাৎ একদিন ছেলেটা দুমড়ে মুচড়ে শেষ হয়ে গেল। জানেন, ও এখনও নিজের অতীত নিয়ে কথা বলতে ভয় পায়। ও আপনাদের ভয় করে কেন?

ডঃ চৌধুরী। আপনার এই ধারণাগুলো প্রাগৈতিহাসিক, ছেলেমানুষী—ওর এ্যালকহলিক হয়ে যাবার মত কোন কারণ ছিল না।

মানুষ। আমি মনে করি—ছিল। ওর বিশ্বাস নষ্ট হয়ে গিয়েছিল— ভেতরটা ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল।

ডঃ চৌধুরী। হ্যাঁ, তাতো বটেই। প্রবন্ধটা ছাপা হল না—আর সঙ্গে সঙ্গে ও মদের মধ্যে ডুবে গেল। আপনার কল্পনার বাহাদুরি আছে।

মানুষ। একটা সৎ নির্ভীক লেখা ছাপা হল না! একটা অবিচার করা হল। ওর অন্য কোন লেখাও আর ছাপা হয়নি—আপনাদের বিষোদগারের ফলে খবরের কাগজের দরজা ওর জন্য বন্ধ হয়েছিল।

ডঃ কর্মকার। দয়া করে একটু আস্তে কথা বলবেন।

মানুষ। একটা অমোঘ ধারণা—সত্য প্রকাশ করা অসম্ভব, কারো কাছে সত্যের কোন দাম নেই।

ডঃ কর্মকার। ওঃ ভগবানের দোহাই..

মানুষ। আপনারা ওর প্রাণশক্তি নিংড়ে নিয়েছিলেন...

ডঃ কর্মকার। একটু দাঁড়ান, আস্তে। কথা না— কেউ যদি ক্রমাগত কতকগুলো শব্দের গোলা ছুঁড়তে থাকে...তাহলে তো আমি কিছুই... আপনি চেঁচাচ্ছেন কেন...আপনি তো মেঠো বক্তা নন—আপনি একজন সলিসিটর...আপনি অনিবার্ণের জন্য এখানে এসেছেন-ওঁর স্ত্রীর জন্য—তাইতো? উনি ওঁর স্ত্রী?

মানুষ। (অনেক শান্ত) উনি এখনও ওঁর স্ত্রী।

ডঃ কর্মকার। আপনি ওঁদের বাড়িতে যান?

মানুষ। ওটা আর বাড়ি নয়, একটা ধ্বংসস্তূপ।

ডঃ কর্মকার। ঠিক আছে—তাই নিয়েই কথা বলা যাক। আমরা অতীতের কথাটা কিছুক্ষণের জন্য ভুলে যাই। (মানুষ বাধা দিতে উদ্যত, লক্ষ্য করেন) ঠিক আছে—ঠিক আছে—কিছুক্ষণের জন্য। তারপর আবার পুরোনো কথায় ফিরে যাওয়া যাবে। এবং আমি সব কিছুর উত্তর দেব।

মানুষ। কথাটা ভুলবেন না।

ডঃ কর্মকার। আমি ভুলবো না।

মানুষ। ঠিক তো?

ডঃ কর্মকার। হ্যাঁ, ঠিক। বেশ, এবার বলুন, আমরা কি করতে পারি? বলুন তো, ছেলেটি কি সম্পূর্ণ এ্যালকহলিক না বেশিমাত্রায় মদ্যপান করে?

মানুষ। এ দুইয়ের মধ্যে কি তফাৎ আমি জানি না।

ডঃ চৌধুরী। আমরা ওর চিকিৎসার ব্যবস্থা করছি। ওকে এই ফীল্ডের বেষ্ট ডাক্তারের কাছে পাঠাবো। কোন সমস্যা হবে না, আমরা ওকে একটা স্যানিটোরিয়ামে পাঠাবো।...চারপাশে বাগান...সামনে পাহাড়...স্যর, ঐ হিলভিউতে পাঠালে কেমন হয়? একেবারে ছোট খাটো স্বর্গ।

ডঃ কর্মকার। ঠিক আছে—কোথায় কিভাবে সে পরে ঠিক করা যাবে। আরও একটু এগিয়ে যাওয়া যাক। আমি আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি...ওদের বাড়িটা ঠিক কি অবস্থায়—এই যে আপনি বললেন ধ্বংসস্তূপ? বাড়িটা ভাঙার নোটিশ দিয়েছে...নাকি রিপেয়ার করলেই চলে যাবে?

মানুষ। (বুকের ওপর হাত রাখেন) আমি এই ধ্বংসস্তূপের কথা বলছি। এখানে সবকিছু অসাড়...

ডঃ কর্মকার। মদ ছেড়ে দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। সবচেয়ে আগে দরকার, পাঁচজনের সঙ্গে মেলামেশা দরকার...

মানুষ। একটা মানুষের ভেতরে যদি কোনো শক্ত খুঁটি না থাকে ডাক্তারি চিকিৎসা তাকে কোনো সাহায্য করতে পারে না।

ডঃ কর্মকার। ও আসুক—আমরা ওর সাথে কথা বলবো।

মানুষ। বিশ্বাস করুন, আমি ওর সাথে বারবার দীর্ঘ আলোচনা করেছি।

ডঃ কর্মকার। আপনি তো ডাক্তার নন, স্পেশালিষ্টও নন। আপনি এ ব্যাপারে অসহায়। স্পেশালিষ্ট ওর মদ খাওয়ার কারণটাই নির্মূল করে দেবে আর সঙ্গে সঙ্গে ও বদলাতে শুরু করবে।

মানুষ। আপনি ভাবছেন সব কিছুর মূলে মদ—আমি মনে করি মদ্যপান একটা প্রতিক্রিয়া। (দৃঢ়ভাবে) আমি ওর বিশ্বাস ফিরিয়ে দিতে চাই, আমি ওকে বলতে পারতে চাই : দ্যাখো, ন্যায়ের জয় হয়েছে, শুধু লড়াইটা চালিয়ে যেতে হয়।

ডঃ চৌধুরী। (হাত নাড়িয়ে) এই আবার শুরু হোল। শুধু একটা বৃত্তের মতো ঘুরে চলেছি। আপনাকে বাস্তব সম্মত একটা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে। আমি ওর থাকবার ব্যবস্থা করব, ওর স্ত্রীর সঙ্গেই। ওদের দক্ষিণে কোথাও পাঠিয়ে দেবো আমরা। যতদিন প্রয়োজন তার দ্বিগুণ সময় ওরা থাকুন ওখানে।

ডঃ কর্মকার। এক মিনিট দাঁড়াও। (ডক্টর কর্মকার ধীরে ধীরে মানুষের কাছে যান, মুখোমুখি দাঁড়ান। চুপচাপ) আচ্ছা, আমি যদি অনির্বাণের কাছে ক্ষমা চাই?

মানুষ। (অনেকক্ষণ থেমে) কিসের জন্য?

ডঃ কর্মকার। (বিরতি। ডঃ কর্মকার তীব্র ঘৃণায় একদৃষ্টে মানুষের দিকে তাকিয়ে থাকেন) যা চাইতে এসেছিলেন, আপনি এখনও তাই চাইছেন?

মানুষ। আমি শুধু চাইছি যা ঘটা উচিত তা ঘটুক।

ডঃ কর্মকার। আমি জিজ্ঞেস করছি : আপনি কি চান আমি ক্ষমা চাই?

মানুষ। হ্যাঁ। (বিরতি) শুধু কথায় নয়, কাজ দিয়ে। আপনাকে পদত্যাগ করতেই হবে।

ডঃ কর্মকার। (মানুষের কোটের কলার ধরে নিজের খুব কাছে টেনে নেন) হুম্‌ম্‌। (কি বলবেন ভেবে পান না)

ডঃ চৌধুরী। (ওঁদের ছাড়ানোর চেষ্টা করে) ডক্টর কর্মকার, একি করছেন আপনি—এক্ষুণি বন্ধ করুন এসব। (মানুষকে) আপনি সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন। ডক্টর কর্মকার, ক্ষান্ত হোন। (ডঃ কর্মকারকে টেনে সরিয়ে নেয়) সত্যি, কি কাণ্ড!

ডঃ কর্মকার। (ডঃ চৌধুরীর হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেন) ছেড়ে দাও আমাকে। (নিজের পোশাক ঝেড়ে নেন, বীণা যেখানে বসেছিল সেই কোণে চলে যান, একটা বিশেষ তালে পা ঠুকতে থাকেন। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বাইরের ঘরের দরজা খোলেন) বীণা, এখানে এসো, নইলে তোমার এই সলিসিটরকে খুন করব।

বীণা দরজায় এসে দাঁড়ায়।

ডঃ চৌধুরী। (বীণার কাছে যায়, কিন্তু তার সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়ার কথা ভেবে গতি ধীর হয়ে যায়) বীণা, ভাই, এখানটায় আসুন তো আপনি। আচ্ছা, আপনিই যখন রয়েছেন ওর সঙ্গে কথা বলে কি লাভ? বীণা, মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী যে সুযোগ দিতে চাইছেন তাতে করে আপনি আপনার স্বামীকে এমন জায়গায় নিয়ে যেতে পারবেন যেখানে সেরা ডাক্তারদের হাতে সবচেয়ে ভালো চিকিৎসা হবে। উনি সেরে উঠবেনই। আমরা শয়ে শয়ে লোককে সারিয়ে তুলেছি। আপনি দক্ষিণে কোথাও যেতে যান? আপনারা দু'জনেই যেতে পারেন। আপনাদের বাড়ি নিয়ে কোন সমস্যা থাকলে আমরা চেষ্টা করব ঠিক করে দিতে। (একটু দূরত্ব বজায় রাখে) ছোট ছোট ব্যাপার এগুলো, কিন্তু খুব জরুরী, তাই না? এইসব এক্ষুণি এখানেই ঠিক করে নেওয়া যেতে পারে। ওঁর সঙ্গে কথা বলা অসম্ভব। এখনও আরও নোংরা ঘাঁটতে চান উনি। (মানুষকে) এবারে আপনি আর ধার পাবেন না। (বীণাকে) ব্যাপারটা নিয়ে যদি একটা কেচ্ছা রটে যায়, তাহলে আমরা আপনাকে সাহায্য করতে পারব না। কাজেই আপনি কিছু বলুন।

নীরবতা

আপনি মনে করেন অনির্বাণের জন্য ওঁর সত্যি মাথাব্যথা আছে? ওঁর ভারি বয়েই গেল। উনি শুধু নিজের কথাই ভাবেন। এইসব ঘটনা ঘটিয়ে উনি মজা পান। প্রোফেশনাল লোক উনি। (কাছে এগিয়ে যায়, বীণা পেছিয়ে যায়) আপনি ভাবতে পারেন : ডক্টর কর্মকার নিজে বললেন আপনার স্বামীর কাছে ক্ষমা চাইবেন। কিন্তু আপনার এই অভিভাবকটি তাতে রাজি নন। উনি বেণীর সঙ্গে মাথাটিও চান। (মানুষকে) সেটি হচ্ছে না। আমরা কয়েকটা

টেলিফোন করব, সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে। (বীণাকে) আমি আপনাকে এই কনক্রীট প্রস্তাব দিলাম : আপনি এতে রাজি? আপনার স্বামী কিছুক্ষণের মধ্যে এসে পড়বেন। বীণা, আমরা সময় নষ্ট করছি। উনি এসে যাবেন অথচ আমাদের ওঁকে বলার মত কিছু থাকবে না। একটা বাস্তবসম্মত প্রস্তাব—আর একটা আজগুবি আব্দার—এই দুয়ের মধ্যে একটা আপনাকে বেছে নিতে হবে। (মানুষকে) হ্যাঁ, আজগুবি চিন্তা। আপনি জেনে রাখুন যত ভয়াবহ পরিস্থিতি হোক আমরা কখনই পদত্যাগ করব না। (বীণাকে) শেষ পর্যন্ত কোন্‌টা আপনার কাছে বড় : ওঁর ওই হামবড়াই না নিজের স্বামীর ভবিষ্যৎ? (ডঃ কর্মকারকে)আমি হাল ছেড়ে দিচ্ছি। (আচ্ছন্ন অবস্থায় ইতস্তত ঘুরে বেড়ায়)

বীণা। (ফেটে পড়ে) খবরের কাগজে ফোন করুন...(মানুষ দ্রুত ওর দিকে ঘোরেন। বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকেন)

ডঃ চৌধুরী। আপনার কথা বুঝিনি।

বীণা। (ডঃ কর্মকারের দিকে অনুরোধের ভঙ্গিতে) দয়া করে কাগজের অফিসে ফোন করুন।

ডঃ কর্মকার। কোন কাগজ?

বীণা। যে খবরের কাগজে ও তখন কাজ করছিল—এই মুহূর্তে একটা কাজ খালি আছে ওখানে আমি গিয়েছিলাম...অনির্বাণের জন্য বলতে গিয়েছিলাম...আমি কথা দিয়েছি ও আর কখনো...ওরা অনুকে চাকরিটা দিতে রাজি...কিন্তু সেই পাঁচ বছর আগের ঘটনা....সেইজন্যই ওরা...(মানুষের কাছ থেকে বাধা পাওয়ার ভয়ে দ্রুত বলতে থাকে) ওদের ফোন করুন...ওদের বলুন সেইদিন অনু সুস্থ স্বাভাবিক ছিল... ও নেশা করে যায়নি...ওদের বলুন যে ব্যাপারটা...আমি জানি না...একটা ফোন করে বলুন ও সত্যি কথা লিখেছিল...। এটা করতে আপনার কিচ্ছু কষ্ট হবে না ডাক্তারবাবু।

ডঃ কর্মকার। ও, এই চাইতে এসেছেন আপনি? (মানুষের দিকে তাকান, তারপর বীণার দিকে) সেই জন্যেই এতসব কিছুর প্রস্তাবনা?

ডঃ চৌধুরী। (কাঁধ ঝাঁকায়) আমরা ফোন করে বলে দিতে পারি একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়ে গিয়েছিল।... পাঁচবছর আগে ঠিক কি ঘটেছিল কে আর মনে রেখেছে।... গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে এর মধ্যে। (বীণাকে) এতে খুশি? (মানুষকে) ব্যস, তাইতো?

বীণা। (লক্ষ্য করে মানুষ তার দিকে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। ছুটে যায় ওঁর কাছে) আমাকে দয়া করে ক্ষমা করুন। আমি এত ক্লান্ত...আর আমি সহ্য করতে পারছি না।...দিনের পর দিন চোখের সামনে মানুষটা কুঁকড়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে ... পারছি না। (মানুষের জামার হাতা ধরে প্রায় হাঁটু গেড়ে বসে বড়ে) প্লীজ, আমাকে ক্ষমা করুন।

মানুষ। (হঠাৎ ঘোর কাটিয়ে বীণাকে তুলে ধরেন, বুকে জড়িয়ে ধরেন)

প্লীজ, ওরকম কোরো না। উঠে দাঁড়াও। অনেক অনেক হয়েছে। আমি বুঝতে পারছি। একটা মেয়েকে দুর্বল করে দেবার বড় ভালো উপায় এটা। ঠিক আছে...ঠিক আছে, ওরা ফোন করুক...জাহান্নামে যাক ওরা...একটা ফোন করে ওরা ওদের সব পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে ফেলুক। ...করুক ফোন ওরা।

ডঃ চৌধুরী। আমরা কালকেই ফোন করে কথা বলে নেব।

মানুষ। (বীণাকে বসতে সাহায্য করেন) ফোন করুন ওদের...বলুন অনির্বাণ নেশা করেনি—ও সেদিন মহাত্মা গান্ধীর স্ট্যাচুর মত খাড়া দাঁড়িয়েছিল।

ডঃ চৌধুরী। কি বলতে হবে সেসব আমরা জানি।

মানুষ। আপনি ওদের ফোন করুন, ডাক্তার। প্রধান সম্পাদককে বলুন অনির্বাণ ওর কাজটা বেশ ভালো ভাবে করেছিল...বলুন ও সত্যনিষ্ঠ সাংবাদিকতা করেছিল...ও এই চাকরিটার যোগ্যতা রাখে...

ডঃ চৌধুরী। আপনি আর উস্কানি দেবেন না।

মানুষ। আর তার অর্থ এই যে রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের জন্য আপনাকে মনোনয়ন করা উচিত হয়নি...বরং আপনাকে বরখাস্ত করে আদালতে হাজির করা উচিত ছিল...

ডঃ চৌধুরী। মেয়েটির মাথায় এসব চিন্তা ঢোকাচ্ছেন কেন?

মানুষ। এবং কেন আপনি নোংরা কাদার মধ্যে এর মুখ গুঁজে দিয়েছিলেন...

ডঃ চৌধুরী। আপনি ভদ্রমহিলাকে রাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে বাধা দিচ্ছেন। উনি আমাদের একটা বিশেষ অনুরোধ করেছেন।

মানুষ। ...আপনি প্রকৃতপক্ষে জীবিত মানুষদের খাতা থেকে ওর নাম খারিজ করে দিয়েছেন।

ডঃ চৌধুরী। আমরা ওর সঙ্গে কথা বলছি। উনি ইচ্ছে মতো সিদ্ধান্ত নেবেন। এইটাই—এইটাই উনি চাইছেন।

মানুষ। ওঁদের বলুন, ডাক্তার, আপনি সবকিছু স্বীকার করতে রাজি...

ডঃ চৌধুরী। (বিরক্ত) ডাক্তারবাবু নিজে জানেন কি বলতে হবে। কি, কিভাবে, কাকে—উনি জানেন। নিজেকে কি ভেবেছেন মশাই? আপনি তো ভাড়া করা দালাল।

বীণা। (লাফিয়ে ওঠে) খবরদার। ওঁর সঙ্গে ওভাবে কথা বলবেন না। উনি একজন সৎ লোক। (মানুষের সামনে দাঁড়ায়, যেন বন্ধুকে রক্ষা করতে চায়)

ডঃ চৌধুরী। আমি ব্যাপারটা মেটাতে চাইছি, কিন্তু উনিই তো...

বীণা। এই মানুষকে ভাড়া করা যায় না। যদি আর সবাই ওঁর মতো হতো।

ডঃ চৌধুরী। আমি বললুম আমরা ফোন করব। আপনি নিজেই তো করতে বললেন। কিন্তু উনি চাইছেন আপনি পিছিয়ে যান যাতে ওঁর তালে খেলাটা চলে।

বীণা। একথা সত্য নয়।

মানুষ। বীণা, এসবের কোন দাম নেই।

বীণা। (মানুষকে) আমাকে প্লীজ ক্ষমা করুন...

মানুষ। বীণা, শান্ত হও...

বীণা। (মানুষকে) আমাকে ক্ষমা করুন। আমি আসলে দুর্বল। আর আমি এরকম করব না।

মানুষ। ঠিক আছে, তুমি শান্ত হও। তুমি চাইলে সবকিছু ভুলে গিয়ে আমরা সোজা বেরিয়ে যাব।

বীণা। (ডঃ চৌধুরীর দিকে দৃঢ়ভাবে) আমার জন্য আপনাকে ফোন করতে হবে না।

মানুষ। বীণা, শোনো, এত দ্রুত সিদ্ধান্ত নিও না...

বীণা। না।

মানুষ। বীণা, তুমিই সিদ্ধান্ত নাও। আমি কিছু মনে করব না। আমার কোন কিছুর প্রয়োজন নেই! (একটু থেমে) তাড়াহুড়ো কোরো না। ব্যাপারটা খুব সীরিয়াস। ওঁর যা দিতে চাচ্ছেন বড় কম কথা নয়। তোমরা দু'জন ভালো থাকলে আমি খুশিই হবো। সত্যি। আমি কোনদিন তোমাকে কিছু বলব না।

বীণা। (নিঃশব্দ চোখের জলে) আমি আপনার জন্য ঐ বাইরে অপেক্ষা করছি।

দফতর ছেড়ে চলে যায়

ডঃ চৌধুরী। (গোড়ায় কিছুটা হতভম্ব, তারপর প্রশংসায় বাহবা দেবার ভান করে) কি অসাধারণ মহিলা। বাঃ বাঃ (হঠাৎ ভণিতা ঝেড়ে ফেলে) কি আশ্চর্য নির্বোধ। (ডেস্কে গিয়ে ব্রাণ্ডির বোতল বার করে, তাকিয়ে থাকে। হঠাৎ সশব্দে ডেস্কের ওপর রাখে) এই লোকটা স্রেফ একটা জুয়াড়ী। ওরা আমাদের নিয়ে বাজি ধরেছে। যদি না হয়, আমার নামে কুকুর পুষবেন।

মাটিতে লাথি মারে, যেন পৃথিবীর শক্তি পরীক্ষা করছে।

মানুষ। আপনি কখনো বুঝবেন না। কোনদিন বুঝবেন না, চৌধুরী...কিছু কিছু মানুষ আছে যারা কখনো জুয়ার দান ধরে না। ঐ মেয়েটিকে এর আগে কেউ কোনদিন এরকম একটা প্রস্তাব দেয়নি। এতগুলো বছর—ভালোবাসার মানে হারিয়ে গেছে, লজ্জায় সংকোচে মাথা হেঁট হয়ে গেছে, প্রতিদিন জীবনটা একটু একটু করে ক্ষয়ে যাচ্ছে...হঠাৎ সেই মেয়েটিকে একটা ছোট খাটো স্বর্গের স্বপ্ন দেখানো হলো...সেখানে স্টেথোস্কোপ ঝোলানো সাদা কোট পরা দেবদূত ঘুরে বেড়ায়...দু'জনে এতদিন পরে দক্ষিণ দেশে যেন মধু চন্দ্রিমায় নিমন্ত্রণ পেয়েছে...তারই সঙ্গে অনির্বাণের সেই স্বপ্নের চাকরি.. মেয়েটির কাছে কি প্রচণ্ড লোভনীয়।

ডঃ চৌধুরী। (চিৎকার করে) আপনি ওর মাথায় এইসব আজগুবি চিন্তা ঢোকাচ্ছেন। হ্যাঁ, আপনি। ও শুধু নিজের স্বামীর জন্য একটা চাকরি

চাইছিল...কিন্তু আপনি ওকে দুঃশাসনদের বুকের রক্তে বেণীবন্ধনের লোভ দেখাচ্ছেন। আপনি চান শুধু আপনার জিৎ হোক্। সবকিছুর মূলে আপনি। আপনি বাগড়া না দিলে এতক্ষণে আমরা ওর সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে ফেলতাম।

নীরবতা

মানুষ। আমি ওকে বলেছি...আপনি তো শুনলেন।

ডঃ চৌধুরী। আপনি যথেষ্ট চেষ্টা করেন নি। "আমি কিছু মনে করব না,...আমার কোন কিছুর প্রয়োজন নেই"। ওসব ঢঙের কথা আমি বুঝি না।

মানুষ। কি বুঝেছেন আপনি?

ডঃ কর্মকার। (নিজের জুতোর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে শান্তভাবে) আমার ধারণা আপনি আন্তরিক চেষ্টা করেন নি। মনে হচ্ছিল যেন আপনার পেশাদারী অহংকারে ঘা লেগেছে।

মানুষ। বেশ, আমি আপনাকে সত্যি কথাই বলব। এখানে আসার সময় সবচেয়ে খারাপ পরিণতির জন্য তৈরি হয়ে এসেছিলাম। কিন্তু আমাদের আলোচনায় আমি বেশ খুশি। আমি আপনাকে কথা বলতে বাধ্য করেছি—এমনকি দরকষাকষি করতেও...। আমি এখন ইচ্ছে করলেই চলে যেতে পারি। কে আমাকে দোষী করবে? আমি নিজে? অনির্বাণ? বীণা? আপনি? চৌধুরী সাহেব তো আহ্লাদে নৃত্য করবেন। কিন্তু আমার কাছে ওঁর কোন অস্তিত্বই নেই—আমার চোখে উনি একজন মৃত মানুষ।

ডঃ চৌধুরী। (হাসে) ও আচ্ছা। সম্পূর্ণ মৃত? তাহলে আমি সরে পড়ি।

মানুষ। (ভ্রুক্ষেপ করেন না) কিন্তু আপনি, ডাক্তার, আপনি স্বতন্ত্র। এবার শুধু আপনি আর আমি। আমি যখন চলে যাব—আপনি গাড়ি ডাকবেন না; আপনার সহযোগীকে বাড়ি চলে যেতে বলবেন...এবং এখানে একা বসে থাকবেন—

ডঃ চৌধুরী। আমার আর এই নক্‌সা সহ্য হচ্ছে না। (ক্লোসেটের কাছে যায়)

মানুষ। (ডঃ চৌধুরীর অস্তিত্ব অস্বীকার করেন) আপনার কোন শান্তি থাকবে না। মনটা ভারি হয়ে যাবে। নিজের ওপর আপনি চটে উঠবেন, মুখের ভেতরটা কেমন বিস্বাদ হয়ে যাবে। আপনি নিজেকে প্রশ্ন করবেন : ব্যাপারটা কি হলো? ঐ লোকটি কে? ওকি আমার বিচার করতে এসেছিল, আমার আত্মার মুখোমুখি দাঁড়াতে চেয়েছিল? নাকি—ওকি সেই অতীতের আমি—মেডিক্যাল কলেজের সেই ক্ষুধার্ত ছাত্রটি যার বিবেকটা খুব পরিষ্কার ছিল? তাহলে ওকে আমি তাড়িয়ে দিলাম কেন? কেন ওকে বললাম না : "একটু দাঁড়াও, তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে—তুমি বোধহয় ঠিক সময়েই এসেছো"।

ডঃ চৌধুরী। (নিজের কোট/ব্যাগ তুলে নেয়) আমি মৃত হতে পারি, কিন্তু আমি পাগল নই।

ডঃ কর্মকার। (কপাল টিপতে টিপতে) যেন একটা চাপা সংক্রামক কিছু এখানে লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, কখনো ওখানে...আমি বুঝতে পারছি...সব জায়গায় গোলমাল... টেম্পারেচার বাড়ছে আবার কমছে...কিন্তু কিছুতেই আমি রোগটা ধরতে পারছি না...। (বিরতি) আমি আপনাকে বুঝে উঠতে পারছি না। আপনি।—

মানুষ। আমি?

ডঃ কর্মকার। আপনি। কখনো ডিটেকটিভের মত ব্যবহার করছেন কখনো বা বিচারক, আবার কখনো ব্ল্যাকমেইলারের মত...এখন আবার আপনি আমার বিবেক হয়ে উঠতে চাইছেন...আমার আত্মা আমার পরমার্থ নিয়ে আপনি চিন্তিত...কেন?

মানুষ। আর যদি আমি সুস্থ স্বাভাবিক হই, ডাক্তার...শুধুমাত্র একজন সম্পূর্ণ সুস্থ মানুষ?

ডঃ চৌধুরী। (কোট পরে) সব মানুষই সুস্থ যতক্ষণ না ডাক্তারি পরীক্ষা করা হচ্ছে।

ডঃ কর্মকার। তাহলে কোন্ উদ্দেশ্যে আপনি এসব করছেন, আমাকে বলবেন? অন্যলোকের স্বার্থ নিয়ে আপনার কিসের মাথাব্যথা?...অনির্বাণ, কার্ডিওলজি সেন্টার, আমার মন্ত্রীত্ব, আমার পরমার্থ—সবেতেই আপনি চিন্তিত। আপনি কি নিজেকে সকলের বিবেক, সব মানুষের বিচারক মনে করেন?

মানুষ। সত্যিকারের কোন তদন্তকারী এলে এই একই প্রশ্ন করতেন? কি জন্যে এসেছে জানতেও চাইতেন না... কেন? এই কাজ করে সেই লোকটি কিছু পয়সা পেয়ে থাকে সেইজন্যে? কিন্তু আমি তো সেই একই আইন একই মানদণ্ডের মর্যাদা রাখতে চাইছি...

ডঃ কর্মকার। কিন্তু আপনি কেন, যাকে কেউ দায়িত্ব সঁপে দেয়নি? কি কুরে কুরে খাচ্ছে আপনাকে? হ্যাঁ, অনেক সরকারী এবং পাবলিক প্রতিষ্ঠান আছে। আপনাকে বুঝতে পারতাম যদি আপনি সেইসব জায়গায় যেতেন। কত কত লোকই তো নালিশ করে। কিন্তু কখনো শুনিনি কোন মানুষ একেবারে একা উন্মাদের একাগ্রতা নিয়ে...এবং এই কাজকে তার দ্বিতীয় পেশা করে তোলে...

ডঃ চৌধুরী। (আয়নার সামনে টাই ঠিক করতে থাকে) ঠিক পার্ট-টাইম দালালের মতো।

নীরবতা

মানুষ। (নিজেকে কঠিন করে তোলেন) বেশ ঠিক আছে। কিছুতেই আর কিছু আসে যায় না। (মাথা নাড়েন) দালালই বটে আমি। আমার কোন দ্বিতীয় পেশা নেই। একটাই পেশা আমার। মানুষকে সারিয়ে তোলা আমার কাজ। যাদুঘরের মালখানায় আমি সময় কাটাই, ঝুল-কালিতে ঢেকে যাওয়া মুখ উদ্ধার করি আমি। একদিন একটি মহিলা আমার কাছে এল, একটি ছবি দেখালো : "শুনুন", মেয়েটি

বললো, "এই ছবিটির কতো বয়স, কতো দাম হবে এটার?" কিন্তু ছবিটার বয়স মেয়েটির মতই। ওটার কানাকড়িও দাম নেই, আর মেয়েটি চোখের জল ফেলছে। (দরজার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেন) আপনারা ওকে দেখেছেন। ও একটা গভীর খাদের ধারে দাঁড়িয়ে আছে। আমি বললাম : "কি হয়েছে তোমার?" এমনি করেই আমরা জীবনকে চিনতে শিখি...

ডঃ চৌধুরী। (স্তম্ভিত) একটু দাঁড়ান। আপনি বললেন ঃ পেশাদার — এটাই আপনার পেশা।

মানুষ। আপনি বলেছেন কথাটা। পেশাদার! পেশাদার হলে এতক্ষণে শুরু থেকেই আপনার ভাষায় কথা বলতাম। আর সর্বক্ষণ তার সঙ্গে আপনি ঐ ব্রাণ্ডির বোতলগুলো শেষ করতেন...

ডঃ চৌধুরী। শুনুন, কথা বাড়াবেন না। আপনিই বলেছিলেন এই কাজ আপনি অনেকদিন ধরে করে যাচ্ছেন —

মানুষ। যদি তাই বিশ্বাস করতে চান—তর্ক করে কি লাভ? আমি বলেছিলাম। যদি আমরা ধরে নিই...

ডঃ কর্মকার। (বিরক্ত। কিছু একটা ভাবছেন) যদি আমরা ধরে নিই—কিই বা তফাৎ—কিন্তু এই সবের দায় আপনি নিজেই বা নিলেন কেন?

মানুষ। কেন নেব না আমি? এই পৃথিবীতে এসেছি—অন্যে ফসল ফলাবে, আমরা শুধু ভোগ করে যাব? নিজের হাতে আমরা কোন কিছুই ফলাব না?... যতটা নিজের সাধ্যমত পারি। সর্বক্ষণ শুনতে পাই...সাফল্য নির্ভর করে আমাদের প্রত্যেকের পরিশ্রমের ওপর—প্রত্যেকেই যেন নিজের প্রভু হয়ে না উঠে দুর্নীতির বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম করে বাড়তি উৎপাদন করে—নিজের সব শক্তি উজাড় করে দেওয়া—প্রত্যেকের পক্ষে বাধ্যতামূলক— প্রত্যেকের এটা কর্তব্য। ...এইসব কথা সর্বক্ষণ শুনতে পাই—রেডিওয়, সংবাদপত্রে, টেলিভিশনে। হয়তো আমি এসব স্বপ্ন দেখেছি। কিন্তু আপনি? আপনি একথা পড়েননি? শোনেননি এইসব? নিজেই কি বারবার বলেননি এই কথাগুলো?

ডঃ কর্মকার। আপনি এইসব সিরিয়াসলি বিশ্বাস করেন?

মানুষ। এসব কথায় আপনার হাসি পাচ্ছে কেন?

ডঃ কর্মকার। আপনি অনুগ্রহ করে আমার সবকথায় চুলচেরা বিচার বন্ধ করবেন? আমি আপনাকে বুঝতে চেষ্টা করছি।

মানুষ। এই কথাগুলো যদি আপনি বিশ্বাস না করেন তাহলে ওখানে বসে আছেন কি করে?

ডঃ কর্মকার। শুনুন...আপনি বুদ্ধিমান লোক... কেন আপনি... কেন আপনি সবকিছু ভাষাগত অর্থে ধরে নেন?

মানুষ। অন্য কোন্ অর্থ ধরব? বলুন আমাকে?

ডঃ কর্মকার। কি বলব...আমি জানি না। আপনি দেখতে পান—চারপাশের সবাই

ঐ শ্লোগানগুলোর পেছনে দৌড়চ্ছে? (কথা খুঁজে পান না।)

মানুষ। বলুন। বলে যান। কোন একটা চিন্তা আপনি শেষ করেন না। যেন আপনি ভয় পান—এই বুঝি ধরা পড়ে গেল—সবকিছু কত অর্থহীন। আপনি কোনদিন নিজেকে সম্পূর্ণ প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন?

ডঃ চৌধুরী ইতিমধ্যে কোট পরে ফেলে নিজের ডেস্কে ফিরে কাগজপত্র গুছোতে থাকে। নীরবতা।

এর ফলে কি হয় জানেন? সবকিছু জড়ো হতে থাকে। ব্যাচেলারের মত সবকিছু ছন্নছাড়া। (নিজের মাথাটা দেখিয়ে) নিজের এই বাড়ির ভেতরটা আমরা এমন অগোছালো করে ফেলতে পারি—আর কোনদিন এটাকে পরিচ্ছন্ন করা যাবে না। (থেমে) আপনার কখনো এরকম হয়নি! (থেমে) কপালের দপ্‌দপানি থামানোর জন্য কোনদিন চেষ্টা করেননি নিজের ভেতরটা সাজিয়ে গুছিয়ে নিতে? (থেমে) সহ্য করেন কি করে, ডাক্তার, নিজের একেবারে ভেতরটার—সত্ত্বার গভীরে ঐ চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা। ঐ বাচ্চা ছেলের মত প্রশ্ন...ভাঙা ভাঙা উত্তর... কোন ভাবনার চূড়ান্ত পরিণতি নেই—সবকিছুই অস্পষ্ট ঝাপসা। আপনার বয়স পঞ্চান্ন হলো। (ভেসে যান) এরই মধ্যে পঞ্চান্ন। আর দশ কি পনেরোটা বছর পুঁজি। আপনার ভয় করে না? যখন সব প্রতিপত্তি চলে যাবে— একেবারে একা... একটি নশ্বর মানুষ-কি হবে তখন? কিছু নেই আর—ফোন করার মত লোকজন, গাড়ি, অফিস—কিছু না। (নিজের ভাবনায় নিজেই ভেসে যান) দুর্বল একটা শরীরের খোলসে শুধু একটা মানুষ...যখন সেই মানুষও আর নিজেকে মিথ্যে বলে না—যখন সম্পূর্ণ সততা নিয়ে প্রচণ্ড সাহসের সঙ্গে সেই অমোঘ প্রশ্নে মুখোমুখি হতে হয় : ঐ জীবনটা...ওটা কি আমার জীবন? তখন কে আপনাকে শাস্তি দেবে?... স্বাস্থ্য দপ্তরের কেরাণীর দল?...আপনার ঐ চৌধুরী? শুধুমাত্র আপনি নিজেই তা দিতে পারেন। (চারপাশে তাকান) আমার বেঁচে থাকার কোন অর্থ ছিল?—এইটাই চূড়ান্ত প্রশ্ন। এই নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি। আর পাঁচজনের মতামতে আমার মন ভরেনি। শেষ পর্যন্ত আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি : একটা মানুষের জীবন তবেই সার্থক যদি তার মধ্যে বিশৃঙ্খলা নয় একটা বিন্যাস থাকে। (আসবাসপত্র সরাতে থাকেন) যে জীবন কতগুলো আকস্মিকের ধাক্কায় কতকগুলো কাকতালীয়র চাপে গড়িয়ে চলেনি—যে জীবনকে আমার প্রবল ইচ্ছা আমার বিশ্বাস দিয়ে আমি নিয়ন্ত্রিত করেছিলাম। যখন এই সত্য আমি বুঝলাম—তার সরলতায় যুক্তির প্রাঞ্জলতায় আমার মাথা ঝিমঝিম করে উঠলো। জানেন সবকিছু সোজা সরল করে দেখতে পেলে...আপনার নেশা লেগে যাবে—চারপাশের বন্ধ দেওয়ালগুলো সরে যাচ্ছে. .তখন কোন

কিছুতেই আর ভয় করে না...আমি কোন কিছুকে ভয় পাই না... কেন? কারণ আমি জানি কিভাবে আমি বাঁচতে চাই। কিভাবে? আমি চাই আমার ভেতরে একটা বিন্যাস একটা ছন্দ থাকুক।

ইতিমধ্যে তিনি ডক্টর কর্মকারের ডেস্ক কেন্দ্রে রেখে দুটো কাউচ, আর্মচেয়ার, চেয়ারগুলো দিয়ে একটা করিডোর বানিয়ে ফেলেছেন—যার মাথায় দাঁড়িয়ে ডক্টর কর্মকার।

আপনার কখনো অনুভব হয়েছে প্রকৃতি মানুষের চেয়ে শ্রেয়তর আর কিছু সৃষ্টি করতে পারবে না। প্রকৃতির ঝুলিতে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। আপনি তার শ্রেষ্ঠ সন্তান। (ডেস্কটা সরিয়ে ফেলেন, ডক্টর কর্মকার যেন এই অদ্ভুত রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন) আর এই মহামূল্য জীবনের প্রতিদানে আপনি প্রকৃতিকে ফিরিয়ে দিতে পারেন—শ্রী, ছন্দ, বিন্যস। অবিন্যাস্ত অগোছালো কোন কিছু প্রকৃতি সহ্য করতে পারে না। বাছাই চলতে থাকে। একটাই আকাংঙ্খা মানুষ সুন্দর হোক।

ডঃ চৌধুরী হঠাৎ সাক্ষাৎকারের খাতা উল্টোতে থাকে, উনি লক্ষ্য করেন না।

বীণা যখন বলল অনির্বাণের কি হয়েছে, আমি এর সংশয়ে বুঝলাম অনির্বাণের ভেতরে আবার প্রকৃতির সেই ছন্দ সেই বিন্যাস ফিরিয়ে আনতে হবে, আর তার অর্থ যা পাপ যা কুৎসিত—তাকে নির্মূল করতে হবে...(চুপ করেন, বাস্তবের জগতে ফিরে এসেছেন। কয়েক মুহূর্ত ঐখানেই দাঁড়িয়ে থাকেন। যা করেছেন তার জন্য অপ্রস্তুত) মাপ করবেন (চেয়ারগুলো পুরোনো জায়গায় নিয়ে যান, একটা কাউচ নিয়ে যেতে থাকেন) এইটা আগে কোথায় ছিল?

ডঃ কর্মকার। ঠিক আছে, কোন ক্ষতি হয়নি—

মানুষ। এটা যেখানে ছিল সেখানেই রেখে দিচ্ছি।

ডঃ কর্মকার। ছেড়ে দিন ওটা।

মানুষ। জানিনা কি যেন আমাকে ভয় করেছিল—

ডঃ কর্মকার। আমার এক আশ্চর্য অনুভূতি হচ্ছে—অদ্ভুত—

মানুষ। আমি এভাবে কোনদিন কারো সঙ্গে কথা বলিনি।

ডঃ কর্মকার। আমার অনুভব হচ্ছে যেন বৃষ্টি শুরু হয়েছে—অনেক অনেকক্ষণ আগে—কিন্তু আমি খেয়াল করিনি—

ডঃ চৌধুরী। (চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে) এইবারে বুঝতে পেরেছি। এতক্ষণে ধরতে পেরেছি। (সাক্ষাৎকারের খাতাটা নিয়ে মানুষের কাছে যায়) অন্য সব এ্যাপয়েন্টমেন্টগুলো বানানো ছিল। (বিরতি) আমি ধরতে পারিনি কেন আর কেউ দেখা করতে আসেনি। সাক্ষাৎকারের খাতায় নাম ভর্তি, অথচ বসবার ঘরে কেউ নেই। (বুঝতে পারে না তার এই আবিস্কারে কেন ডঃ কর্মকারের কোন প্রতিক্রিয়া নেই) এরা সব ওর লোক, এখন বুঝতে পারছেন তো স্যর?

ডঃ কর্মকার। তাতে কি?

ডঃ চৌধুরী। কি বলছেন আপনি—তাতে কি? এই ছ-ছ'টা লোক ওর লোক। দেখুন।

ডঃ কর্মকার। (শান্তভাবে) চৌধুরী, এখন আর কিছুতেই কিছু এসে যায় না।

ডঃ চৌধুরী। কিছু এসে যায় না? এইটাই তো আসল প্যাঁচ। আপনি বুঝতে পারছেন না এটা একটা পরিস্কার ষড়যন্ত্র।

ডঃ কর্মকার। আমি তো বললাম ওসবে আমার আর কিছু এসে যায় না। তোমার ওই আবিস্কার তুমি ভুলে যাও।

ডঃ চৌধুরী। কিন্তু একবার দেখুন কি দেখাচ্ছি (ওঁর হাতে সাক্ষাৎকারের খাতা তুলে দেয়)

ডঃ কর্মকার। শোনো তোমার কোটটা তো পরাই হয়ে গেছে—তাহলে চলে যাচ্ছ না কেন? অনেক কিছুই তো করলে।

ডঃ চৌধুরী। আপনি কি পাগল হয়ে গেলেন? বুঝতে পারছেন না? এটা একটা সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র—আপনাকে তাড়ানোর জন্য—

ডঃ কর্মকার। চৌধুরী।

ডঃ চৌধুরী। ঠিক যখন পূর্ণমন্ত্রীত্ব আপনার হাতের মুঠোয়—

ডঃ কর্মকার। (আদেশের স্বরে থামিয়ে দেন) তুমি আমাকে বিরক্ত করছ।

ডঃ চৌধুরী। আমি বিরক্ত করছি আপনাকে?

ডঃ কর্মকার। হ্যাঁ, আমাকে।

ডঃ চৌধুরী। (স্তম্ভিত) আমি আপনাকে বিরক্ত করছি!

ডঃ কর্মকার। হ্যাঁ তুমি করছ।

ডঃ চৌধুরী। আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি না, স্যর।

ডঃ কর্মকার। অনেক কিছুই তুমি বুঝতে পারো না।

ডঃ চৌধুরী। কি বুঝতে পারিনি আমি? তার মানে আপনি নিজেই—আমার কোন সাহায্য ছাড়া—নিজেই এ ব্যাপারে রাস্তা বার করে ফেলেছেন?

ডঃ কর্মকার। তুমি থামবে কি থামবে না?

ডঃ চৌধুরী। ও, তাহলে আপনি সবকিছু ঠিকঠাক করে ফেলেছেন, সব ঠিকঠাক—আর আমরা এখন কাটা সৈনিক!!

ডঃ কর্মকার। তুমি দয়া করে চুপ করবে?

ডঃ চৌধুরী। না, করব না। এটা আপনার একার ব্যাপার নয়, আমিও আছি এর মধ্যে। আমার বিরুদ্ধেই ক্রিমিনাল চার্জের কথা বলা হয়েছে। আর আপনি ভাবছেন আমি চুপ করে থাকব।

ডঃ কর্মকার। চৌধুরী।

ডঃ চৌধুরী। লোকটা আমাদের দুজনের মধ্যে লাগিয়ে দিচ্ছে আমি বুঝতে পারছি না ভেবেছেন? ও—আপনি তাহলে স্বতন্ত্র? আপনার ভেতরে একটা আত্মা আছে, পরমার্থের আকাঙ্খা আছে। আর আমিতো একটা মৃত লোক, তাই না? (চিৎকার করে) ও এক এক করে আমাদের শেষ করতে চায়। আপনি হঠাৎ নরম হয়ে গেলেন।

ডঃ কর্মকার। এখান থেকে বেরোও,...বেরোবে তুমি?

ডঃ চৌধুরী। কি-ই-ই? (চুপচাপ। বোঝা যায় এই উত্তেজনার জন্য ডঃ কর্মকারের খেদ হচ্ছে) ডক্‌টর কর্মকার, এজন্যে আপনাকে আমি কোনদিন ক্ষমা করব না। সবকিছুর জন্যই ধন্যবাদ। আমার জন্য চিন্তা করবেন না, আমি এখন থেকে নিজেরটা নিজেই সামলে নিতে পারবো! যা কিছু ঘটে গেল, আমি যদি ছেড়ে চলে যাই, আপনি নিশ্চয় অবাক হবেন না?

ডঃ কর্মকার। (দ্বিধাগ্রস্ত) হ্যাঁ, হ্যাঁ—তুমি বরং এখন বাড়ি যাও—কাল সকালে ঠাণ্ডা মাথায় আমরা এটা নিয়ে কথা কয়ে নেব—যা হোক একটা—

ডঃ চৌধুরী। নিজের চেয়ারে বসে বোকার মত কথা বলবেন না। উনি আমাকে বাড়ি পাঠাচ্ছেন! ভেবেছেন শুধু আপনার ভরসাতেই বেঁচে আছি? যে কোন হাসপাতালে আমাকে লুফে নেবে। আমি একজন ডাক্তার, সেক্রেটারি নই। অনেক আগেই আমার উচিত ছিল আপনাকে ছেড়ে দিয়ে নিজের আখের গোছানো।

ডঃ কর্মকার। হয়তো তাই—হয়তো তাই—আমি দুঃখিত (উঠে বাঁদিকে যায়)।

ডঃ চৌধুরী। চেষ্টা করুন একটা লোক জোগাড় করতে—যে আপনার কোটের হাতায় হাতদুটো ঢুকিয়ে দেবে—নাকি এর মধ্যে কাউকে পেয়ে গেছেন? আপনি বরং এই প্রচারকটিকে ভাড়া করুন না, হুঁঃ? সারাদিন বসে বসে ও আপনাকে বিবেকের গান শোনাবে (মানুষকে) আপনার পরে আফশোস হবে না! আমাদের ডাক্তারবাবু বড় ভালো লোক। এত অসহায়। ওঁর সুন্দর একটা কৌশল আছে। জানেন—সব কিছু করে ওঠার সময় নেই সবকিছু মনে রাখতে পারেন না...এত ভালো—আপনার ইচ্ছে করবে ওঁর হাতদুটোকে আলতো করে কোটের হাতার মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে। আপনি বক্তৃতা লিখতে পারেন...প্রবন্ধ—মেডিক্যাল কংগ্রেস আরও নানান সেমিনারের জন্য পেপার? (ডঃ কর্মকারকে) এইসব আপনার জন্য আমি লিখে দিয়েছি—(মানুষকে) ওঁর ভাষণগুলো সব সময় এত সুন্দর। খাঁটি বক্তার মতো পড়তেন উনি...ওঁর ঐ সুলিপ্ত সাধা গলায়। যখন ঐ অনির্বাণ ওঁর কাছে এসেছিল ওঁকে দেখলে আপনার তাজ্জব লেগে যেত। সারা মুখে কি অপরিসীম বিস্ময়—ওঁর ঐ আত্মার গভীরে কি প্রচন্ড কাঁপুনি। তখন ওঁর ঐ অবস্থা দেখে আপনার এত কষ্ট হতো—মনে হতো ওঁকে সাহায্য না করা একটা পরম পাষণ্ডের কাজ। আমাদের ডাক্তার বাবু সবকিছু করতে চান, কিন্তু কিভাবে করা হলো উনি জানতেও চান না, পরে কাউকে জবাবদিহি করবার দায়ও রইলো না। আমি—আমিই সবকিছু করেছি যাতে ঐ প্রবন্ধটা ছাপা না হয়। (ডঃ কর্মকারকে—তিনি খোলা জানালার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন) আপনি আমাকে দিয়ে করাতে চেয়েছিলেন। আমিই সব কিছু করেছিলাম যাতে আপনি সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মানে ভূষিত হন—যেটা পাওয়ার স্বপ্নে আপনি মশগুল

ছিলেন। আমার উদ্যোগেই ঐ কার্ডিওলজি সেন্টারের এত বোলবোলাও। এইখানে আপনাকে এনেছি, আমি এবং আমিই আপনাকে পুরো মন্ত্রী বানাতাম। সবকিছু এখন জাহান্নামে যাক।

মানুষ। বিমল।

ডঃ চৌধুরী। (হঠাৎ থেমে যায়) কি ? (বিরতি, হতচকিত) আপনি আমাকে বলছেন? (বিরতি) হুঁ, আমার মনেও নেই কে আমাকে শেষ কবে নাম ধরে ডেকেছে—সবসময় চৌধুরী, চৌধুরী—আপনি হঠাৎ কি কারণে এত ভাবালু হয়ে উঠলেন?

মানুষ। বিমল আমি একটা প্রশ্ন করতে চাই। এত ঘনিষ্ঠ ভাবে বলছি কিছু মনে করবেন না।

ডঃ চৌধুরী। (সন্দিগ্ধ) বলুন?

মানুষ। এই সবকিছু আপনি কেন করেছিলেন? কিসের স্বার্থ ছিল আপনার?

নীরবতা

ডঃ চৌধুরী। আমি?

মানুষ। হ্যাঁ, আপনি। আপনার ভেতরে এক শক্তি।

ডঃ চৌধুরী। জানতে চাচ্ছেন এসব করে আমি কি চেয়েছিলাম?

মানুষ। বিমল, আপনি একজন ডাক্তার।

ডঃ চৌধুরী। সত্যি কথা বলতে, আমি কোনদিন ডাক্তার হতে চাইনি। (বিরতি) এত যন্ত্রণা—মানুষের শরীরের ওই রক্ত-মজ্জা-থুথু-কফ-প্রত্যেকদিন-—(উজ্জীবিত হয়ে ওঠে) আমি বরাবর খুব ভালো সংগঠক, হয়তো আগের জন্মে কোন একটা বড় ম্যানেজার ট্যানেজার ছিলুম। কে জানে! আপনি যেকোন সমস্যা নিয়ে আসুন, একটু সময় দিন আমাকে, আমি ঠিক সমাধান করে ফেলব। উনি পারবেন না, উনি একজন সার্জন। আপনি পারবেন না, আপনার শুধু কথা। উনি শরীর কাটা ছেঁড়া করতে জানেন, আর আমি জানি কি করে বাঁচাতে হয়। আপনি বুঝছেন না? আপনি ভাবেন আমি একটা পরগাছা, পরজীবী, তাই না? (সিরিয়াস হয়ে যান) বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সংগঠকের ভূমিকা খুব দামী। এরকম কোন পেশা নেই? থাকা উচিত ছিল। এইসব কাজ করতে কত সময় লাগে। কে সেই কাজগুলো করবে বলুন? কে ভালো পারবে এই কাজ—উনি না আমি? বলুন আমাকে। (বিরতি) হ্যাঁ তাই। সেইজন্যই আমি সম্মান দাবি করি। আমি যখন ঐ কার্ডিওলজি সেন্টারে এলুম দেখলুম কি সাংঘাতিক অবস্থা—যথেষ্ট যন্ত্রপাতি নেই, জায়গা নেই, লোকজন নেই—কিন্তু অসংখ্য লোক অপারেশনের জন্য অপেক্ষা করছে। পিলপিল করে মানুষ আসছে সেন্টারে, কিন্তু একশো জনের চেয়ে একজনের বেশি নেওয়ার ক্ষমতা নেই আমাদের। আমি ওঁকে বললুম—এ চলতে পারে না, লক্ষ লক্ষ টাকা দরকার সেন্টারকে গড়ে তোলবার জন্য। কিন্তু কে দেবে আমাদের অত টাকা? সেইসব প্রতিষ্ঠানের

ভাগ্যে টাকা জোটে যাদের হাল ধরে আছে নামী-দামী লোকেরা—যাদের সবাই এক ডাকে চেনে, এমন সব লোক যারা এক একজন জ্যান্ত ধণ্বন্তরী। তখন আমি ওঁকে বললুম উনি রাষ্ট্রীয় সম্মান পেলে টাকা আপসে আসবে। (বিরতি) আমি নিজের জন্য কি চেয়েছিলাম? আমার তখন একটাই কাজ। যন্ত্রটা যাতে তরতর করে চলতে শুরু করে। সবে ওটা চলতে শুরু করেছে, হঠাৎ উদয় হলো আপনার ঐ অনির্বাণ। মেশিনটায় আটকা পড়ে গেল। ব্যস...

মানুষ। বিমল!

ডঃ চৌধুরী। আপনার ঐ "বিমল" বলাটা বন্ধ করবেন। সাদা-মাটা চৌধুরী। বন্ধুত্ব করার কি দরকার। আপনি তো চোরাগোপ্তা মারার জন্যই এসেছিলেন—(ক্যারাটের ভঙ্গি করে) হা। কি এসে যায় (ডঃ কর্মকার জানালা দিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছেন, তাঁকে অতিক্রম করে ব্র্যান্ডির বোতলের দিকে যেতে থাকে, হঠাৎ ওঁর পেছনে দাঁড়িয়ে) নাইট্রোগ্লিসারিনের শিশিটা আপনার ঘড়ির পকেটে আছে। (মানুষের দিকে ঘুরে), সত্যি বলছেন, আপনি মদ খান না? (বোতলের দিকে ইঙ্গিত করে) কোনদিন না? দু'এক ফোঁটা। (বোতল তুলে নেয়) এক ফোঁটা। (হাত নাড়ে, ক্যাবিনেটে বোতল রেখে দেয়) তাহলে, আপনার আর কোন প্রশ্ন আছে? (ওয়েষ্ট পেপার বাস্কেটে বোতল ছুঁড়ে দেয়)

মানুষ। ওই প্রবন্ধের সবকিছু সত্যি ছিল?

নীরবতা

ডঃ চৌধুরী। (কাঁধ ঝাঁকিয়ে) হ্যাঁ, যা ঘটেছিল তাই ও লিখেছিল।

মানুষ। তাহলে মহ্সীনকে অপারেশন করা আপনাদের উচিত ছিল?

ডঃ চৌধুরী। (অল্প বিরতি) না।

মানুষ। না?

ডঃ চৌধুরী। না।

মানুষ। মহ্সীনের আগে যে চারজন রোগী মারা গিয়েছিল তাদের?

ডঃ চৌধুরী। (আগের মতোই শান্ত) না ওদের না। (হাত ঝাঁকায়) অপারেশন করলে যারা বাঁচবেই শুধু তাদেরই করা উচিত ছিল, সম্ভাব্য মৃতদের নয়। আমি বলছি আপনাকে, ওটা ছিল কার্ডিওলজি সেন্টারের জীবন-মরণের লড়াই।

মানুষ। তাহলে 'ক্লান্তি' ব্যাপারটা সত্যি নয়? কেউ ক্লান্ত ছিল না। আপনারা চাইছিলেন সময় নিজের গতিতে চলুক, ইতিমধ্যে কার্ডিওলজি সেন্টারের কোথাও অসহায় মহ্সীন মারা যেতেই পারে।

নীরবতা। চৌধুরী মানুষের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে।

ডঃ চৌধুরী। আপনি কোন কিছুই বোঝেন না। সংখ্যাগরিষ্ঠদের দাবী বলে একটা কথা আছে এবং সেটা শুধু ডাক্তারী নয় সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। প্রসঙ্গত, সেইটাই গণতন্ত্র যাতে সংখ্যাগরিষ্ঠদের স্বার্থ সংরক্ষিত হয়।

একথাটা আপনি বোঝেন? (বিরতি) কেউ একটি বিশেষ লোকের জন্য চিন্তা করতে পারে, আবার সাধারণভাবে জনগণের জন্য চিন্তা করা যায়। কোন্‌টা বেশী 'জরুরী' ? (বিরতি) চোখের সামনে দশটা লোক ডুবে যাচ্ছে, অপর দিকে একটা মানুষ। এক্ষেত্রে কাকে বাঁচাবেন আপনি? হয়তো উনবিংশ শতাব্দীতে— মানসিকভাবে আপনি যে যুগে এখনও বাস করেন—লোকজন অনেক কম ছিল, প্রত্যেক মানুষের আলাদা করে যত্ন নেওয়া সম্ভব ছিল। কিন্তু এই বিংশ শতাব্দীতে মানুষ একটা একটা করে ডোবে না। রাবণের গুষ্টির মতো অসংখ্য লোক। আমাদের কাজ করতে হয় সেই বিশাল জনগণের জন্য। এবং তাদের প্রত্যেকের মূল্য অর্থাৎ ভ্যালুস্ আছে, প্রত্যেকের একটা করে ইচ্ছে আছে। অবশ্যই অনির্বাণের যা ঘটে গেছে—নিদারুণ অভিজ্ঞতা। ব্যাপারটা অত্যন্ত দুঃখের। কিন্তু সার দিয়ে যত লোক অপারেশনের প্রতীক্ষায় দিন গুনছে তাদের জন্য আমার বেশি কষ্ট হয়। আমাদের প্রয়োজন ছিল এমন বিপুল আয়োজনের যাতে করে শয়ে শয়ে লোকের প্রাণরক্ষা করতে পারি। কিন্তু যদি ঐ প্রবন্ধটা ছাপা হতো, কেউ কোন সুযোগ আমাদের দিত? ডঃ কর্মকার পদ্মবিভূষণ পেতেন না, কোন বিকাশ ঘটত না। ডাক্তারের সংখ্যা বাড়তো না। পড়ে থাকত শুধু পম্পেই-এর ধ্বংসাবশেষ। (হাত ঝাঁকায়। সোজা সাইফন থেকে জল খায়। মানুষের দিকে তাকায়—সে হাসছে) এ্যাতো মজার কি হলো?

মানুষ। না, কিচ্ছু না।—হঠাৎ মনে পড়ে গেল— লেনিন তার সহযোগী একজনকে একটা চিঠি পাঠিয়েছিলেন... সেই সহযোগী কে ছিলেন আপনি জানেন নিশ্চয়ই, জানেন না?

ডঃ চৌধুরী। হ্যাঁ, লেলিনের লেখা—সোভিয়েত বিপ্লবের ইতিহাস কিছু কিছু পড়া আছে। হ্যাঁ আমরা জানি সহযোগী কে ছিলেন—উনি ছিলেন একজন নামকরা সীমান্তরক্ষী।

মানুষ। সেই বিখ্যাত সীমান্তরক্ষী ছিলেন জনগণের সরকারের খাদ্য বিভাগীয় প্রধান। মানুষটা অসুস্থ ছিলেন তবুও অমানুষিক পরিশ্রম করে নিজেকে নিঃশেষ করে ফেলেছিলেন।...ভদ্রলোক দুদিন অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন সবাই তাকে বলছিল—কাজটা কমিয়ে শরীরটাকে বাঁচান। কিছুতেই শুনবেন না ভদ্রলোক। তখন লেনিন তাঁকে লিখে পাঠালেন "সরকারী সম্পত্তি অবহেলা করার জন্য আপনাকে আমি সতর্ক করে দিচ্ছি।'

ডঃ চৌধুরী। (ঘাড় দুলিয়ে) দারুণ মজার গল্প।

মানুষ। সেই মানুষটি তাঁর নিজের স্বাস্থ্যকে অবহেলা করেছিলেন। (উঠে দাঁড়ান) কিন্তু আপনারা অন্যের স্বাস্থ্য নয়, জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছিলেন। আন্দাজ করতে পারেন আপনার বিষয়ে লেনিন কি সিদ্ধান্ত নিতেন? আমার মনে হয় না ঐ দশটি ডুবন্ত মানুষের—

কূট-কচালে উদাহরণ দিয়ে আপনারা পার পেয়ে যেতেন। (ধীরে ধীরে) একটা মানুষ চোখের সামনে ডুবছে; তখন লাইফবোট কিম্বা ডুবুরীর সংখ্যা বাড়ানোর চিন্তা অপরাধ, পাপ—ঐ লোকটাকে তখন বাঁচাতে হবে। যতগুলো মানুষকে পারেন বাঁচান; সেই প্রচেষ্টায় যতটা পারেন শক্তি ব্যয় করুন। যেমন ডঃ চ্যাটার্জী করেছিলেন। আপনাদের ঐ বিশাল জনগণের জন্য কাজ করার কোন অধিকার নেই কারণ একটা মানুষের জীবনের কানাকড়ি দাম আপনারা দেন না। আপনার ঐ নীতিশাস্ত্রের একেবারে মাঝখানটাতেই বিরাট গর্ত রয়েছে। (হাত দিয়ে দ্যাখান) আমি আপনাকে বিশ্বাস করি না। সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বার্থ—ওরকম কিছু সত্যি নেই, যা আছে তা শুধু নির্লজ্জ সুবিধাবাদ আর আমলাতন্ত্রের উল্লাস। (বুকসেল্ফের কাছে যান; যাতে লেনিন রচনাবলী সাজানো রয়েছে) আপনার জাতের লোকদের লেনিন দুমাইল দূর থেকে চিনে নিতে পারতেন। (বুক সেলফের কাঁচের পাল্লা খোলার চেষ্টা করেন) লেনিনের চিঠি টেলিগ্রাম এগুলো পড়েছেন? আপনার ধরণটা কিছু নতুন নয়, চৌধুরী সাহেব। সর্বকালে সব দেশে আপনার মতো লোক বারবার এসেছে। (আবার বুক সেলফ্ খোলার চেষ্টা করেন) যে লোকগুলোর শিরদাঁড়া আপনারা চিরকালের মতো ভেঙ্গে দিয়েছেন—আপনাদের প্রগতির ঐ সুললিত কাব্য তাদের কানে কঠিন গদ্যের মতোই শুনিয়েছে—(বুক সেলফ্ কিছুতেই খুলতে পারেন না) ব্যাপারটা কি? আপনারা কি পাল্লাগুলো কোনদিন খোলেনও নি? (পাগলের মতো চেষ্টা করেন) কোন মূঢ় অহংকারে (সমস্ত শক্তি দিয়ে চেষ্টা করেন) সব ঘরে এইগুলো...(ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে) হঠাৎ সেলফে্র ওপর থেকে একটা ছোট পেপার ওয়েট তুলে তাই দিয়ে বুক সেলফে্র কাঁচ ভেঙ্গে ফেলেন। কিছুক্ষণ হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। ওটি রাখেন এবং ঘুরে দাঁড়ান, দৃষ্টি উদভ্রান্ত।)—একটু বাতাস লাগুক...(ফ্রেম থেকে টুকরো কাঁচগুলো বার করতে থাকেন)

ডঃ চৌধুরী। তাহলে এমনিভাবেই যুক্তিকে উল্টে দেন। আমি এটা ভেবে বার করিনি। এটা আমার আবিস্কার নয়। এটা একটা বস্তুনিষ্ঠ নিয়ম। এটাকে নিয়ে আপনি একটা বিরাট হৈ চৈ করতে পারেন, অনির্বাণ যেমন করেছিলো। প্রসঙ্গত, আমি যদি ভুল না করে থাকি—অনির্বাণ কিন্তু ওখানেই থেমে যায়নি। ঐ প্রবন্ধটা নিয়ে ও একটা জাতীয় সংবাদপত্রের কাছে গিয়েছিলো। তারপর কি হলো? সে প্রবন্ধটা কোথায় গেল? অর্থাৎ ওরা ওই লেখাটাকে বিশেষ পাত্তা দেয়নি। তাই ছাপানোরও প্রয়োজন বোধ করেনি। এরকম একটা চেষ্টা ও করেছিলো...আপনি জানতেন?

নীরবতা

মানুষ। (চারপাশে বিহ্বলভাবে তাকান) আমি জানি কথাটা কিন্তু আপনি

কিভাবে জানলেন?

ডঃ চৌধুরী। অনির্বাণ নিজেই আমাদের বলেছিলো। যতটা শান্তশিষ্ট ওকে মনে করেন তা ও নয়। ও ডঃ কর্মকারকে ফোনে খুব চেঁচামেচি করে বলে—অনেক বড়ো সংবাদপত্রের কাছে ও যাচ্ছে—আমরা কি ভাবছি তাতে ওর কিছু এসে যায় না, যা করবার ও করবেই—এসব আরও নানান কথা।

মানুষ। ডঃ কর্মকার। কথাটা সত্যি?

ডঃ চৌধুরী। (তাঁর হয়ে উত্তর দেয়) অনির্বাণকে জিজ্ঞেস করুন।

মানুষ। (ভাবতে ভাবতে) তাহলে তো ঘটনা আমুল 'বদলে গেল। (নিজের ব্রিফকেসের কাছে যান।)

ডঃ চৌধুরী। এখন নিশ্চয়ই বলবেন আমরা ঐ সংবাদপত্রের সঙ্গেও যোগাযোগ করেছিলাম? ওখানে আমাদের কিছু করার ছিল না; আমাদের হাতের নাগালের বাইরে। আমরাও জানতুম ও একটা বড় সংবাদপত্রের কাছে গিয়েছে, কিন্তু কোনটা? হঠাৎ ছুঁড়ে দেওয়া একটা ঢিল... কোথায় খুঁজে পাব ওটা?

মানুষ। (কাগজের মধ্যে কিছু একটা খোঁজেন) কিন্তু আপনি ওটা লুফে নিয়েছিলেন।

ডঃ চৌধুরী। না। কোন উপায় ছিল কি?

মানুষ। একটাই এবং একমাত্র রাস্তায়—সাংঘাতিক বুদ্ধির দরকার, এবং আপনি সেটা বার করে ফেলেছিলেন।

ডঃ চৌধুরী। (ডঃ কর্মকারকে) এবার উনি অভিযোগ করছেন আমাদের সাংঘাতিক বুদ্ধি।

মানুষ। (খুঁজতে থাকেন) সেটা ছিল শীতকাল; জানুয়ারীর শুরু। রাষ্ট্রীয় পুরস্কার ঘোষণার সময় প্রায় এসে গেছে। অনির্বাণ ফোন করে আপনাদের ভয় দেখাল একটা জাতীয় সংবাদপত্র থেকে...কোনটা তা সে বলেনি, একজন রিপোর্টার আস্‌ছে তদন্ত করতে...একটা বিশাল স্ক্যান্ডালের মুখোমুখি আপনারা। (সঠিক কাগজটা এখনও খুঁজে পাচ্ছেন না।)

ডঃ চৌধুরী। সেটা মনে আছে আমার, হ্যাঁ মনে পড়ছে। তো এরপরে কি হলো?

মানুষ। (কাগজগুলো দেখতে থাকে) এই পুরো ঘটনা পরম্পরায় একটা বিষয় আমি কিছুতেই বুঝতে পারছিলাম না...এখন বলতে পারি কেমন করে সেই অন্ধকারেই ঢিলটা ধরে ফেলেছিলেন...সেই কাগজটা কোথায় গেল?...এবার আমি বুঝতে পারছি কিভাবে আপনারা অনির্বাণকে ফাঁদে ফেলেছিলেন। (খুঁজে পান) এই যে পেয়েছি। আমি পড়ে শোনাচ্ছি ঃ—"অনির্বাণ, তোমার প্রচেষ্টার জন্য ধন্যবাদ। এই অবস্থায় কোন উত্তেজনা আমার পক্ষে মারাত্মক। তোমার কাছে আমার জীবনের মূল্য যদি থাকে ঐ প্রবন্ধটা ছাপানো বন্ধ করো। ধরে নাও এটা আমার ইচ্ছা, আমি খুব দুঃখিত, মহসীন।"

ডঃ চৌধুরী। ওটা দেখতে পারি আমি (মানুষ ওটা দূরে ধরে রাখেন, চৌধুরী পড়ে) তাহলে আমরা ততটা বুদ্ধিমান নই যতটা ঐ মহসীন। ও নিজের মত বদলেছিল। বুঝলেন, ঐরকম একটা ভারী অপারেশনের পর উত্তেজনা খুব খারাপ। ও'ত চাইবেই না কাগজে ওকে নিয়ে রগ্‌রগে গপ্‌পো ছাপা হোক। কেমন করে ও মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছে, কিভাবে ট্যাক্‌সির মধ্যেই ওর অ্যাওর্টা বর্স্ট করেছিলো।...ঐসব কেচ্ছার উত্তেজনায়, ওর তখন যা শারীরিক অবস্থা, মারাও যেতে পারত।

মানুষ। না, আপনি চিঠির তারিখটা দেখুন। ছ'ই জানুয়ারী।

ডঃ চৌধুরী। (চিঠির দিকে তাকায়) ছ'ই জানুয়ারী। তাতে কি হল?

মানুষ। পাঁচ'ই জানুয়ারী আপনারা মহসীনকে আবার কার্ডিওলজি সেন্টারে ভর্তি করে নেন। পরবর্তী চিকিৎসার জন্য। এ খবরটা আমি মেডিকেল রেকর্ডস অফিস থেকে পেয়েছি। তার মানে যেদিন মহসীন আপনাদের হাসপাতালে ভর্তি হল—তার পরের দিনই ও অনির্বাণকে ঐ অদ্ভুত চিঠিটা লিখে ফেলল—"তোমার কাছে আমার জীবনের কোন মূল্য যদি থাকে, প্রবন্ধটা ছাপানো বন্ধ করো।"

ডঃ চৌধুরী। আপনি পাগল না কি? এর সবকিছুর জবাবদিহি করতে হবে আপনাকে।

মানুষ। (তৎক্ষণাৎ) আমি তৈরী। এইজনাই আপনি জানতে চাইছিলেন আমি মহসীনের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেছি কি না? আসলে আপনি জানতে চাচ্ছিলেন, আমি সবচেয়ে দামী কথাটা—কেন এই চিঠিটা লেখা হয়েছিল—সেই কারণটা জানি কি না—।

ডঃ চৌধুরী। ওটা মোটেই সবচেয়ে জরুরী ব্যাপার নয়।

মানুষ। আমি বলছি হাসপাতালের কেবিনে মহসীনকে একলা পেয়ে আপনি কি বলেছিলেন তাকে—

ডঃ চৌধুরী। ওর স্বাস্থ্যের কথা।

মানুষ। নিঃসন্দেহে। ওর স্বাস্থ্য যে ওরই উপর নির্ভর করছে সেই কথা—।

ডঃ চৌধুরী। আর একটা কথা বললে আপনার বিরুদ্ধে আমি মানহানির মামলা করব।

মানুষ। করুন। আমি তো চাই। তাহলেই তো আদালতে এই কথাটা প্রমাণ হবে যে একটা মানুষ—অপারেশনের পর এতটাই অসুস্থ, যে কোন মুহূর্তে সে মারা যেতে পারে—সেই মানুষটাকে ব্ল্যাকমেল করে আপনি বাধ্য করেছিলেন, অনির্বাণকে ঐ চিঠি লিখতে। আপনি নিশ্চিত জানতেন—অনির্বাণ মহসীনের ইচ্ছার মর্যাদা দেবে ও কিছুতেই একটু মুমূর্ষু রোগীর প্রাণের ঝুঁকি নেবে না এবং বাধ্য হয়ে ঐ প্রবন্ধটা ছাপানো বন্ধ করবে—বীণা। (বীণা ভেতরে আসে উত্তেজিত মানুষ ব'লে চলে) বীণা মহসীনের কাছ থেকে ঐ চিঠিটা

পাবার পর অনির্বাণ কি ওর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলো?

বীণা। (ভীত) কোন চিঠি?

মানুষ। এই চিঠিটা, হাসপাতাল থেকে লেখা।

ডঃ চৌধুরী। (মানুষকে) এই ভদ্রমহিলাকে আপনি রেহাই দিন।

বীণা। (চিঠিটা দেখে) এইটা...কোথায় ছিল এটা?

মানুষ। এই কাগজপত্রের মধ্যে। অনির্বাণ ওর সঙ্গে কথা বলেছিলো? (বীণা নিশ্চুপ) আমি বুঝতে পারছি না, হ্যাঁ না না? (বীণা এখনও নিশ্চুপ)

ডঃ চৌধুরী। (মানুষকে) একবার হিস্টিরিয়ায় আপনার সাধ মেটেনি?

মানুষ। এই চিঠিটার সম্বন্ধে তুমি কিছু জাননা?

বীণা। (অস্পষ্ট) হ্যাঁ—

মানুষ। অনির্বাণ হাসপাতালে মহসীনের দেখা করেছিল না করেনি? (বীণার হাবভাবে বোঝা যায় এ বিষয়ে আলোচনা করার স্বাধীনতা তার নেই)

ডঃ চৌধুরী। (ডঃ কর্মকারকে) ওকে থামান; থামাবেন কি? মুখে কুলুপ এঁটেছেন?

মানুষ। (বীণা তবুও চুপ) ব্যাপারটা কি বীণা? তোমার মনে পড়ছে না? (বীণা চুপ) বেশ, অনির্বাণ যে কোন মুহূর্তে এসে পড়বে আমরা ওকেই জিজ্ঞাসা করব—

বীণা। (তৎক্ষণাৎ) প্লীজ করবেন না—।

মানুষ। (বিরতি। যেন বুঝতে শুরু করেন) বলতে চাইছো করা উচিত হবে না? অনির্বাণ কি তোমাকে এই নিয়ে কথা বলতে বারণ করেছিল? তার মানে ও মহসীনের সঙ্গে দেখা করেছিল। ও জানতো এটা ব্ল্যাকমেল...এটা ফাঁস করে দেওয়া ওর পক্ষে সম্ভব ছিল না কারণ তাতে মহসীনের মৃত্যু ঘটতে পারত। এ নিয়ে কোন কথা বলা সম্ভব ছিল না। এই সাংঘাতিক কথাটা ওকে পাঁচবছর নিজের বুকের ভিতর লুকিয়ে রাখতে হয়েছে। (কর্মকারকে) এই অবস্থায়তো যে কোন মানুষ নেশা করে সব ভুলে থাকতে চাইবেই... হয়ত আরও কিছু... (চৌধুরীকে) বড় ভাল অপারেশন চৌধুরীসাহেব' ঠিক নিজের স্টাইলে। (ডঃ কর্মকারকে) এটা ওর মতলব ছিল, ডাক্তারবাবু।

ডঃ চৌধুরী। (তার প্রভুকে) এই সাংঘাতিক মিথ্যা অপবাদের আপনি সাক্ষী থাকবেন—

মানুষ। (ডঃ কর্মকারকে) আপনি কিছু বলছেন না কেন?

ডঃ চৌধুরী। (মানুষকে) এবং যদি আপনি পাগল প্রতিপন্ন না হন তাহলে...

মানুষ। (চৌধুরীর কথায় কোন ভ্রুক্ষেপ করেন না) সেই সময় কিন্তু এসেছে। আপনি আমার কথা শুনছেন?

ডঃ কর্মকার। (হতভম্ব) এক মিনিট দাঁড়ান—

মানুষ। (সঙ্গে সঙ্গে) আপনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আমার কোন প্রশ্ন এড়িয়ে যাবেন না; মনে আছে?

ডঃ কর্মকার। হ্যাঁ মনে আছে—

ডঃ চৌধুরী। আর কি মনে আছে আপনার?

ডঃ কর্মকার। (হাত দিয়ে ওকে সামনে থেকে সরিয়ে দেন) আমার মনে আছে। আমার ধারণা এই রকমটাই ঘটেছিলো—আমি সন্দেহ করেছিলাম।

ডঃ চৌধুরী। কি? নিজেকে সামলান। এক মিনিট পরেই এরজন্য আপনি অনুতাপ করবেন। অনির্বাণ এখানে আসবে এবং আপনার কোন কথায় ও সায় দেবে না। তখন কি বলবেন আপনি?

মানুষ। তখন আমরা মহসীনের স্ত্রীকে প্রশ্ন করব।

ডঃ চৌধুরী। (সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণাত্মকভাবে) না, ওর স্ত্রীকে নয়। তাহলে কিন্তু আমি নিজেকে যে কোন উপায়ে বাঁচাব। তাহলে আমরা একেবারে মহসীনকেই কথাটা জিজ্ঞাসা করব। (নিজের ফোনের খাতায় নম্বর খুঁজতে থাকে) এবং সেটা পরে নয় এক্ষুণি...এক্ষুণি করব। (টেলিফোনের দিকে যায়)

বীণা। না। ওকে কিছুতেই জিগ্যেস করবেন না।

ডঃ চৌধুরী। আমাকে করতেই হবে। ওর সাক্ষ্যই তো সবচেয়ে দামী। (ডায়াল করে)

বীণা। (মানুষকে) অনির্বাণ আমাকে এরজন্য কোনদিন ক্ষমা করবে না।

ডঃ কর্মকার। (চৌধুরীর কাছে গিয়ে) এই কাজ তুমি করবে না। (বোতাম টিপে ধরেন)

ডঃ চৌধুরী। (ওঁকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়) আমি এটা করবই। আগেই তো ঠিক হল না— যে যার মতো চ'রে খাবে। (আবার ডায়াল করে)

বীণা। (চৌধুরীকে) ডঃ চৌধুরী আপনার কাছে ভিক্ষা চাইছি—

ডঃ কর্মকার। (দেওয়াল থেকে তার খুলে ফ্যালেন) আমি জানি কোন কিছুই তোমার আটকায় না।—কিন্তু এইটা আমি করতে দেব না। মহসীনকে কিছুতেই উত্তেজিত করা চলবে না। তাতে করে ওকে হত্যা করা হবে।

ডঃ চৌধুরী। আপনি? আপনি আটকাবেন আমায়? কিন্তু আমি তো আর আপনার কর্মচারী নই। আমি এখন নিজেই নিজের প্রভু। (কাছের অন্য টেলিফোন তুলে নেয়) আর কেউ আমাকে আটকাতে পারবে না।

ডঃ কর্মকার। (এইটার তারও দেওয়াল থেকে খুলে নেয়) চৌধুরী। আমি তোমাকে মেরে ফেলবো।

ডঃ চৌধুরী। (রিসিভার ছুঁড়ে ফেলে) আমি তাহলে কালকে করব, পরশু করব, প্রত্যেকদিন ফোন করে যাবো, যতদিন না এই ভণ্ড জোচ্চোরদের শিক্ষা হয়—যতদিন না এই ঘটনাটা সম্পূর্ণ ধামাচাপা পড়ে।

মানুষ। দাঁড়ান। (বিরতি) ঠিক আছে। এই পর্যন্তই। এই কেস মুলতুবী রইল, চিরকালের মতো। শুধু ঈশ্বরের দোহাই দয়া করে মহসীনকে কিছু বলবেন না। (সব কাগজপত্র ব্রীফকেসে রাখতে থাকেন) ঠিক আছে,

কিচ্ছু ঘটেনি—আমরা আসিই নি। আমরা এখানে ছিলাম না—
সব ঠিক রইল—খেলা ড্র। আমরা যাচ্ছি।

বীণা দৌড়ে যায় ওঁর কাগজপত্র গুছিয়ে দিতে।

ডঃ চৌধুরী। আমাকে মহসীনের চিঠিটা দিন।

মানুষ। (চৌধুরীর দিকে তাকান) চিঠিটা?

ডঃ চৌধুরী। হ্যাঁ, যে চিঠিটা হাসপাতাল থেকে অনিবার্ণকে লিখেছিলো। আমি আর কিছু চাই না।

নীরবতা।

বীণা। ওকে দিয়ে দিন এটা—(নিজেই ওকে দিয়ে দেয়)

সবকিছু গোছানো হয়ে গেছে।

মানুষ। আমাকে মাফ করবেন।

ওরা দুজনেই চলে যায়। দরজা বন্ধ হয়ে যায়। অফিস ঘর শান্ত। চৌধুরী চিঠিটা ভাঁজ করছে কিন্তু হাত কাঁপছে। তারপর সেটা পকেটে রেখে দেয়; আসবাবপত্র ঠিক জায়গায় সাজিয়ে রাখতে থাকে। সময় বয়ে যেতে থাকে।

ডঃ চৌধুরী। (নিশ্চুপ ডঃ কর্মকারের দিকে না তাকিয়ে, কথা বলতে থাকে, যেন নিজের সঙ্গেই কথা বলে)—এই হলো ব্যাপার। (নিজের ডেস্কের কাছে যায়। একটা সাদা কাগজ বেছে নেয়) তাহলে কালকে কি হচ্ছে? (লিখতে থাকে) দশটা—জার্মানদের সঙ্গে চুক্তি নিয়ে আলোচনা...বারোটা দশ—হাসপাতাল—ও, আমি প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম সাড়ে চারটে—টেলিভিশন। আপনি কাল টেলিভিশনে ভাষণ দিচ্ছেন। আমার কথা শুনছেন আপনি?

ডঃ কর্মকার। (চাপা স্বরে) হ্যাঁ, হ্যাঁ। একবার খোঁজ নিতে হবে—কেমন আছে ও...

ডঃ চৌধুরী। কার কথা বলছেন আপনি? (লিখতে থাকে)

ডঃ কর্মকার। ...ওর ঐ সিন্থেটিক পাস্‌টা এখনও ঠিকঠাক কাজ করছে কিনা...

ডঃ চৌধুরী। আপনি কি মহসীনের কথা বলছেন?...ও ছ'মাস আগে মারা গেছে। (লিখতে থাকে)

ডঃ কর্মকার। (চমকে ওঠেন এবং ধীরে ঘুরে দাঁড়ান) কি? কিন্তু তুমি...ঐ টেলিফোন...

চৌধুরী নিজের কাগজপত্র থেকে সরে দাঁড়ান এবং ঘৃণার চোখে ডঃ কর্মকারের দিকে তাকায়।

ডঃ চৌধুরী। (কাগজপত্রের কাছে ফিরে যায়) আর পাঁচটা পঞ্চাশে আপনাকে ফাইন আর্টস এক্‌জিবিশ্‌ন হলে যেতে হবে। (লিখতে থাকে) আপনি ওখানে এক্‌জিবিশন উদ্‌বোধন করবেন। (উঠে দাঁড়ায়, ডঃ কর্মকারের হাতে আগামীকালের কর্মসূচী দেয়) এই আপনার কালকের কাজ।

ডঃ কর্মকার যন্ত্রের মতো কাগজটা হাতে নেন, সহযোগীর দিকে বজ্রাহতের

মতো তাকিয়ে থাকেন।

(প্রায় দরজার কাছে পৌঁছে) তাহলে আমি যাচ্ছি...(বিরতি) ডঃ চ্যাটার্জীর কথা ভুলে যাবেন না। (হাতের ঘড়ি দেখে) ওর প্লেন এতক্ষণে ল্যাণ্ড করে গেছে...আপনার মনে আছে তো...(বিদায়সূচক হাত নেড়ে ঘর ছেড়ে চলে যায়)

ডঃ কর্মকার কিছুক্ষণ দরজার দিকে তাকিয়ে থাকেন, আগামীকালের দিনলিপি পড়তে থাকেন। ঘড়িতে ঢং ঢং করে ছ'টা বাজে।

ডঃ কর্মকার। (মাথা তোলেন, ঘড়ির দিকে তাকান) হ্যাঁ। হ্যাঁ। (বিরতি) সাক্ষাৎকারের সময় শেষ। শেষ।

দিনলিপির কাগজটা ছিঁড়ে ফেলেন মাটিতে ফেলে দেন।

ফেরিওয়ালার মৃত্যু

মূল নাটক : আর্থার মিলার

মঞ্চ	৷৷	খালেদ চৌধুরী
আবহ ও পোশাক	৷৷	স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত
শব্দ প্রক্ষেপণ	৷৷	হিমাংশু পাল
আলোক উপদেষ্টা	৷৷	তাপস সেন
আলো	৷৷	অশোক প্রামানিক
রূপসজ্জা	৷৷	সুমৌলীন্দ্র আচার্য
মঞ্চাধ্যক্ষ	৷৷	দেবাশীষ চৌধুরী
নির্দেশনা সহায়তা	৷৷	গৌতম হালদার, দেবশঙ্কর হালদার

[মিলারের এই নাটকটি স্বল্পাধিক তিন দশক আগে রূপান্তরিত হয়ে বাংলা মঞ্চে অভিনীত হয়ে গিয়েছে। আমাদের বন্ধু প্রয়াত অসীম চক্রবর্তী 'জনৈকের মৃত্যু' নাম দিয়ে এই কাজটি করেছিলেন। ষাটের দশকের শুরুতে আমি প্রযোজনাটি দেখেছিলাম, আজ আর বিশেষ মনে নেই সে অভিজ্ঞতা। আমার মনে হয়েছে এই নাটকটি এখন মৌলিক বিষয়ের তীক্ষ্ণতায় এবং বিন্যাসের নানান পরতে—অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক। তাই আবার করা। প্রাথমিক পর্বে রূপান্তর করেছিলেন স্নেহভাজন নাট্যকার দেবাশিস মজুমদার। পরবর্তীকালে তিন-চার মাস ধরে আমি (দেবাশিসের অনুমতি নিয়েই) আমার মতো নাটকটিকে সাজাতে থাকি। সেই প্রক্রিয়ায় রূপান্তরের খোল-নলচে বদলে যায়। নাটকটির বর্তমান রূপটি আমার, যার ভিত্তি দেবাশিসের করে দেওয়া; তার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।]

প্রথম অঙ্ক

[হাল্কা বাঁশির সুর...মিষ্টি সুন্দর। যে সুরে ঘাস, গাছ, দিগন্তের অনুষঙ্গ। পর্দা ওঠে।

আমাদের সামনে সেল্‌সম্যানের ছোট্ট বাড়ি। তাতে যেন স্বপ্নের ছোঁয়া—যে স্বপ্নের জন্ম বাস্তবের মাটিতেই। মঞ্চে আছে তিনটি চেয়ার। একটা সোফা, একটা ফ্রিজ, একটা খেলার ট্রফি। দু'দিকের দেওয়ালে কয়েকটি খোলা দরজা জানলা। পেছনের দেওয়ালে দু'টি দরজা স্টেপস্‌-সহ। একটু উঁচুতে।

বাড়িটির তিনদিক ঘিরে রয়েছে ঢাউস অ্যাপার্টমেন্ট হাউসের ঝাঁক। যেন খাঁচায় আটকে ফেলেছে সেলস্‌ম্যানের বাড়িটাকে। তিনপাশে রক্তিম আলোর আভা। শুধু এবাড়িতেই আকাশের আলো—সামনের দিক থেকে আসা। অমলকান্তি চৌধুরী, সেলস্‌ম্যান, বাইরে থেকে ঢোকে। সেই শুরুর বাঁশির সুর তার কানে আছে, কিন্তু সে সচেতন অস্তিত্বে নেই। সে দু-হাতের ভারি দুটো 'স্যাম্পেল-বক্স' নামিয়ে রাখে। হাতে ব্যথা, শরীরে প্রচণ্ড ক্লান্তি। মুখে অস্ফুট সংলাপ, 'ওমা, আর পারি না মা।' তার পরনে সাদা-মাটা ছিমছাম পোশাক। সে আবার শক্তি সঞ্চয় করে বাক্স দু'টি তুলে নেয়। এবাড়িরই কোনও একটি ঘরে চলে যায়।

পার্বতী, অমলের স্ত্রী—যেখানেই থাকুক, সামান্যতম শব্দেও স্বামীর উপস্থিতি টের পায়। প্রায়শই হাসিখুশি পার্বতী—স্বামীর ব্যবহারের ধারালো দিকগুলোকে প্রতিক্রিয়াহীনভাবে নিতে শিখেছে কঠোরতম সংযমের সাহায্যে। স্বামীর প্রতি তার অনুভব ভালোবাসার চেয়েও বড়—শ্রদ্ধা-পূজার নিবেদন মেশা সেই অনুভব। স্বামীর সহজাত অব্যবস্থচিত্ততা, তার মেজাজ, তার ছোট ছোট নির্দয়তা, তার স্বপ্নের বিশালত্ব—এ-সবই পার্বতীর কাছে অমলের গভীরতম অস্থির তীব্রতার চিহ্নস্বরূপ। এই তীব্র আকাঙ্ক্ষা তাকে নাড়া দেয়, সহানুভবী করে, কিন্তু চরিত্রগত কারণে এগুলি অস্পর্শিত অনুচ্চারিত থেকে যায়।]

পার্বতী। (অমলের আওয়াজ পেয়ে) কে—তুমি...

অমল। হ্যাঁ—আমি—ফিরে এলাম...

পার্বতী। ওমা, হঠাৎ কি হলো?...(স্বল্প বিরতি) কি গো, তোমার কিছু হয়নি তো?

অমল। না, না, কিছু হয়নি।

পার্বতী। গাড়ি অ্যাকসিডেন্ট করো নি তো?

অমল। (কিঞ্চিৎ বিরক্ত) বললাম তো কিছু হয়নি! শুনতে পাওনি?

পার্বতী। শরীর খারাপ লাগছে তোমার?

অমল। না ...ক্লান্তিতে ভেঙে যাচ্ছে শুধু...আমি পারলাম না, পার্বতী, কিছুতেই পেরে উঠলাম না।

পার্বতী। (সযত্নে অতি সন্তর্পণে) সারাদিন কোথায় ছিলে? কী চেহারা হয়েছে?

অমল। কল্যাণী-মদনপুর ছাড়িয়ে একটু গেছি—হঠাৎ মনে হলো, আর চলতে পারছি না—গাড়িটা থেকে থেকে পিচের রাস্তা ছেড়ে বাঁদিকের ঢালে নেবে যেতে লাগলো!

পার্বতী। (সাহায্যের চেষ্টায়) ওহ্—বোধহয় স্টিয়ারিংটা গোলমাল করছে। তোমার ঐ গ্যারেজের মদনবাবু অস্টিন গাড়ির ধাত বোঝে না।

অমল। না-না গণ্ডগোলটা আমার। ...হঠাৎ খেয়াল হলো আশি কিলোমিটার স্পিডে গাড়ি চলছে...শেষ পাঁচ মিনিট তো মনেই নেই আমি কি করেছি...মনটা যেন কিছুতেই বশে থাকছে না...

পার্বতী। হয়তো চশমাটা গোলমাল করছে...অনেকদিন তো পাওয়ার চেক করাওনি!

অমল। না না, চোখ ঠিকই আছে...তারপর পনের কিলোমিটার স্পিডে—এইটুকু পথ আসতে চার ঘণ্টা লাগলো...

পার্বতী। (মেনে নিয়ে) আসলে তোমার বিশ্রাম নেওয়া দরকার।

অমল। এইতো সেদিন কালিম্পং ঘুরে এলাম!

পার্বতী। মনকে তো ছুটি দাওনি তুমি!

অমল। সকালে আবার রওনা দেব!...গা-গতরে যা ব্যথা...

পার্বতী। একটা অ্যাসপিরিন এনে দেবো? ব্যাথাটা একটু কমবে—

অমল। জীবন-ভোর জেলায়-জেলায় ঐসব রাস্তা দিয়েই তো ঘুরেছি... তবু আজ যেন সব অদ্ভুত সুন্দর লাগছিল। কাঁচগুলো নামিয়ে দিয়ে...হই-হই করে হাওয়া ঢুকছে...ভিজে মাটির গন্ধ...সবুজ-সবুজ গাছ—সরে সরে যাচ্ছে...এতো নতুন—এতো নতুন লাগছে সব কিছু...সারাটা পথ...হঠাৎ গাড়িটা রাস্তা ছেড়ে ছেড়ে ঢালের দিকে নেবে যেতে লাগলো—ডানদিকে ঝোঁক নিলে হয়তো মানুষ মেরে বসতাম! (দু' আঙুল দিয়ে চোখ টিপে ধরে) আমি...আমি জানি না...অদ্ভুত সব চিন্তা আমার মাথায় ঘুরতে থাকে আজকাল...

পার্বতী। লক্ষীটি, শোনো—ওদের সঙ্গে আর একবার কথা বলো! কেন ওরা তোমাকে কলকাতায় কাজ করতে দেবে না?

অমল। আমাকে কলকাতায় লাগবে না ওদের। সারা জীবন মফস্বলের জেলায় জেলায়—উত্তরবঙ্গ, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া—এইসব অঞ্চলে ওদের মাল ফিরি করেছি...ঐ মফস্বলেই আমার কদর।

পার্বতী। ওরা কি আশা করে এই বয়সেও ফি-হপ্তা তুমি জেলায়-জেলায় চরকি-পাক খেয়ে বেড়াবে?

অমল। কাল আমার শান্তিপুরে আগরওয়াল ব্রাদার্সকে মাল দেখানোর কথা। মা-কালী! নিশ্চয়ই পটিয়ে ফেলবো ওদের। (কোট পরতে থাকে)

পার্বতী। (কোট খুলতে থাকে) কাল বরং তুমি ঐ শরদিন্দুবাবুকে বলো তোমাকে কলকাতায় পোস্টিং দিতেই হবে।

অমল। সেই বুড়ো জয়বিন্দুনারায়ণ বেঁচে থাকলে এ্যাদ্দিনে কলকাতার চিফ সেলস্‌ম্যান হয়ে যেতাম। সে মানুষটার দিল ছিল-রাজা মানুষ ছিল...আর ওর এই ছেলেটা—শরদিন্দু—কিচ্ছু বোঝে না...আরে, আমি যখন প্রথম এই কোম্পানিতে এলাম—এরা তো জানতোই না, উত্তরবঙ্গ হিমালয়ের এই পারে না ঐ পারে!

পার্বতী। তা এইসব কথা তুমি ঐ শরদিন্দুকে বলছো না কেন?

অমল। (উৎসাহিত) আমি বলবো—নিশ্চয়ই বলবো! ঘরে রুটি মাখন-টাখন কিছু আছে?

পার্বতী। চট্ করে কটা পরোটা ভেজে দেবো?

অমল। না, না, তুমি শুতে যাও—আমি একটু দুধ খেয়ে—ছেলেরা ফিরেছে?

পার্বতী। শুয়ে পড়েছে। কতোদিন পরে দু'ভাই এ বাড়িতে একসঙ্গে—দাড়ি কামালো, চান করলো, খেলো, সন্ধ্যে নাগাদ একসঙ্গে বেরোলো—গোটা বাড়ি আফটার-শেভের গন্ধে ম-ম করছে...এত মজা লাগছিলো!

অমল। হিসেব মেলাও তো পার্বতী। তিল তিল করে বাড়ি বানালে, ধার প্রায় শোধ, বাড়ি এখন তোমার—সে বাড়িতে থাকার কেউ নেই!

পার্বতী। দ্যাখো বড়বাবু, জীবন তো এমনি— ছাড়তে ছাড়তেই চলে যাওয়া!

অমল। না, না, কিছু কিছু মানুষ পারে—পেয়ে যায়! সকালে আমি বেরনোর পরে বাবু কিছু বলছিলো?

পার্বতী। কি আর বলবে...তবে ট্রেন থেকে নেমে বাড়িতে পা দিতে না দিতেই ছেলেটাকে ঐভাবে বকা-ঝকা করাটা তোমার ঠিক হয়নি! অতো মাথা গরম করলে চলে?

অমল। আরিব্বাবা! আমি কখন মাথা গরম করলাম। সেরেফ জানতে চেয়েছি রোজগারপাতি কেমন চলছে—এটা বকা-ঝকা হলো?

পার্বতী। কিন্তু তুমিও তো একবার ভাববে। হুট্ করলেই কি আজকাল রোজগার মেলে?

অমল। না-না! কিরকম অদ্ভুত মুডি হয়ে গেছে ছেলেটা! আমি যাওয়ার পরে ক্ষমা চেয়েছে?

পার্বতী। কেমন গুম্ মেরেছিলো অনেকক্ষণ। কি প্রচণ্ড শ্রদ্ধা করে তোমাকে...আমি জানি, একবার নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারলে তোমাদের এই তর্কঝগড়া থেমে যাবে।

অমল। সেই নেপালের কোন হোটেলের ট্যুরিস্ট গাইড হয়ে ও ছেলে কোনওদিন পায়ের তলায় মাটি পাবে না। গোড়ায় গোড়ায় —ইয়াং মাইণ্ড, যা প্রাণে চায় করুক, যাক যেখানে খুশি—

দশ বছর হয়ে গেলো, মাসান্তে হাজার দেড়-হাজারের বেশি কামাতে পারে না!

পার্বতী। আহা—চেষ্টা তো করে যাচ্ছে!

অমল। চৌত্রিশ বছর বয়সেও চেষ্টা করে যাচ্ছে। গোলমালটা কি জানো—ও বড্ড অলস।

পার্বতী। লক্ষ্মীটি—প্লিজ—শোনো—

অমল। বাবু হতচ্ছাড়া একনম্বর কুঁড়ের বাদশা!

পার্বতী। ছেলে দুটো ঘুমোচ্ছে! যাও, কিছু খেয়ে নাও তুমি। যাও!

অমল। হঠাৎ উনি বাড়ি ফিরে এলেন কেন? কারণটা কি?

পার্বতী। আমি জানি না। ও খুব দিশেহারা। বিশ্বাস করো, ছেলেটা বড়ো একা।

অমল। বাবুয়া চৌধুরী দিশেহারা...একা! পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্র, চারপাশে সুযোগ—তার মাঝখানে একটা ছেলে, যার যৌবন টগবগ করছে, যাকে দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়, যে সারাদিন পাগলের মতো খাটতে পারে—সে কিনা আজ দিশেহারা...একা! আর যাই হোক—আমাদের বাবুকে তো কেউ কখনও কুঁড়ে বলতে পারবে না—বলো?

পার্বতী। না না—কক্ষনো না।

অমল। (উৎসাহিত) সকালে উঠলেই আমি বাবুর সঙ্গে কথা বলে নেবো। ওকে এই সেলস্ লাইনেই একটা ব্যবস্থা করে দেবো আমি—চড়চড়িয়ে উঠে যাবে। মনে আছে—কলেজের ছেলে-মেয়েরা কেমন ওর পেছনে দৌড়তো। যখন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতো আমাদের ক্যাপ্টেন বাবুয়া...(স্মৃতিচারণে হারিয়ে যায়)

পার্বতী। (প্রসঙ্গ বদলের জন্য) একটু তপসে মাছ ভেজে দেবো?

অমল। কেন, তপসে কেন? তুমি জানো আমি ভেটকি ছাড়া ফ্রাই খাই না!

পার্বতী। ভাবলুম একটু স্বাদের বদল হবে।

অমল। আমি কোনও বদল চাই না! আচ্ছা, দোহাই তোমার—একটা জানলা অন্তত খুলে রাখতে পারো না?

পার্বতী। (অসীম ধৈর্যে) সব জানলাই তো খোলা আছে—চেয়ে দ্যাখো!

অমল। বাড়িটা খাঁচা হয়ে গেলো একেবারে..... দেওয়াল আর জানলা, জানলা আর দেওয়াল—বুকভরে বাতাস নেবার জো নেই! এইসব ঢাউস অ্যাপার্টমেন্ট হাউসগুলোর বিরুদ্ধে সরকারের আইন করা উচিত। মনে আছে তোমার—সামনের সেই দেবদারু গাছ-দুটোর কথা! আমি আর বাবু কেমন দোলনা টাঙিয়েছিলাম একটা! আর এখন—?

পার্বতী। তবুও ভেবে দ্যাখো, কোথাও না কোথাও তো আশ্রয় চাইবেই মানুষ!

অমল। না! এই শহরের চিটে-গুড়ের গন্ধ না শুঁকলে মানুষের শান্তি হচ্ছে না যে! ঐ গাছ দুটো কেটে ফেলার জন্য প্রোমোটার ব্যাটাকে জেলে

পোরা উচিত ছিলো! মনে পড়ে, পার্বতী—এইতো সেই সময়...এখনই তো বেল জুঁই রজনীগন্ধা ফুটে উঠবে...এদিকে গোছা-গোছা কদম, ওদিকে হাস্নুহানার ঝাড়... বাড়ি বাগান জুড়ে মন-কাড়া এক গন্ধ—এইতো সেই সময়—

[অমলের কথার শেষে বাবু ও খুশিকে পেছনে আলো-আঁধারিতে দেখা যায়। তারা এই কথাগুলো শুনছে]

পার্বতী। যাও, গিয়ে কিছু খেয়ে নাও। আস্তে কিন্তু...পারবে তুমি?

অমল। (দোষী-ভাব) তুমি আমায় নিয়ে দুশ্চিন্তা করো না তো, পার্বতী।

বাবু। ব্যাপারটা কি?

খুশি। শোন না!

পার্বতী। তোমার অনেক ক্ষমতা—মিছিমিছি দুশ্চিন্তা করবো কেন?

অমল। তুমি আমার ভরসা—তুমিই আমার শক্তি, পার্বতী।

পার্বতী। একটু সহজ হওয়ার চেষ্টা করো না, লক্ষ্মীটি! কেন তিলকে তাল করো?

অমল। আমি আর বাবুর সঙ্গে ঝগড়া করবো না। ও যদি নেপালে ফিরে যেতে চায়—যাক!

পার্বতী। বাবু ঠিক নিজের পথ খুঁজে নেবে।

অমল। নিশ্চয়ই নেবে! কিছু মানুষ থাকে—একটু বয়স না হলে জগৎটার তাল পায় না। ওর অনেক ক্ষমতা...

পার্বতী। হ্যাঁ গো, আসছে রোববার আকাশটা ভালো থাকলে—চলো না, দুই ছেলেকে নিয়ে গাড়িতে করে কাছে পিঠে কোথাও বেড়িয়ে আসি—

অমল। না না—গাড়িটায় অনেক ঝামেলা রয়েছে—সামনের কাঁচ দু'টোই লকড্ হয়ে গেছে—খোলাই যাচ্ছে না—

পার্বতী। তুমি যে এক্ষুনি বললে আজ যখন যাচ্ছিলে—কাঁচগুলো নামিয়ে দিয়ে...

অমল। আমি বললাম—কক্ষনো না...(থেমে যায়। সেই বাঁশির সুর ভেসে আসে), আরে আশ্চর্য! এ তো ভারি আশ্চর্য...(ভয়ে বিস্ময়ে কথা ফুরিয়ে যায়।)

পার্বতী। কি হয়েছে—কি বলছো তুমি?

অমল। অত্যাশ্চর্য! আমি মরিস মাইনর গাড়িটার কথা ভাবছিলাম (স্বল্প বিরতি) উনিশ শ' ছিয়াত্তর—তখন আমাদের সেই লাল ছোট্ট গাড়িটা...একবার ভাবো, মনে হচ্ছিল আমি যেন সেই গাড়িটাই চালাচ্ছি!

পার্বতী। তাতে কি হয়েছে? নিশ্চয়ই কোনো কারণে পুরনো দিনের কথা মনে পড়ে গিয়েছিলো।

অমল। আশ্চর্য! তৃচ্ তৃচ্!.সেইসব দিন মনে পড়ে? বাবু কেমন ঘষে ঘষে ঝকঝকে করে ফেলতো গাড়িটা! ওটা বেচে দিলাম যখন-ডিলার

ভদ্রলোক তো বিশ্বাসই করছিলো না এক লক্ষ আটানব্বই হাজার মাইলের ধকল সহ্য করছে ঐ গাড়ি! (মাথা নাড়ে) হাঃ! তুমি ঘুমিয়ে পড়ো—আমি এক্ষুনি আসছি। (বেরিয়ে যায়)

খুশি। খেয়েছে রে—মনে হচ্ছে গাড়ি আবার কোথাও ধাক্কা মেরেছে।

পার্বতী। (অমলের উদ্দেশে) চৌকাঠ-টা দেখে যেও। দুধটা মাঝের তাকে—বার করে রাখবো? (সাড়া না পেয়ে পার্বতী কোটটা তুলে নিয়ে অন্য ঘরে চলে যায়।)

[বাবু ও খুশি দু'জনেই সামনের দিকে আসতে থাকে]

খুশি। বাবার ব্যাপার-স্যাপার দেখে ক্রমেই নার্ভাস লাগছে!

বাবু। চোখ-দুটো মনে হয় গেছে।

খুশি। না—না—চোখ-টোখ ঠিকই আছে—আসলে মনটাই অস্থির।

বাবু। আমি এবার ঘুমোবো।

খুশি। বাবার ওপর এখনও রেগে আছিস তুই?

বাবু। না-বাবা তো—ঠিকই আছে—

অমল। (দূর থেকে ভেসে আসে) ইয়েস্ স্যার, ওয়ান ল্যাখ নাইনটি-এইট থাউজ্যান্ড মাইলস্—একলক্ষ আটানব্বই হাজার!

খুশি। দাদা, আবার কতদিন পরে—আমরা দু'জনে সেই ঘরে সেই আমাদের পুরনো খাটে—

অমল। (বাইরে থেকে) আহ্হা! কি চকচকে পালিশ করেছিস রে! বাবুরে—বাঃ বাঃ!

খুশি। তোর সেই পুরোনো মেজাজ, পুরনো কেতা—কোথায় গেলো বলতো? (বাবুকে উত্তেজিত পায়চারি করতে দেখে) কি হোলো তোর, দাদাভাই?

বাবু। বাবা সবসময় আমাকে ব্যঙ্গ করে কেন বলতো?

খুশি। না না, ব্যঙ্গ করবে কেন? আসলে—

বাবু। যা কিছু বলি—সবসময় মুখে একটা বিদ্রূপের হাসি...কিছুতেই কাছে যেতে পারি না—

খুশি। আসলে বাবা চায় তোর খুউ-ব ভালো হোক! ব্যস! ভেতরে ভেতরে কিছু একটা ঘটে যাচ্ছে! আজকাল নিজের সঙ্গেই কথা বলে!

বাবু। হ্যাঁ, আজ সকালে—কিন্তু বাবা তো বরারবই একটু বিড়বিড় করতো।

খুশি। কিন্তু এ্যাতোটা না...আর আশ্চর্য কি জানিস—সর্বক্ষণই বাবা তোর সঙ্গে কথা বলে!

বাবু। আমার সঙ্গে—কি বলে?

খুশি। ঠিক বুঝতে পারি না।

বাবু। আমার সম্পর্কে কি বলে বাবা?

খুশি। ঐ সেই—তুই এখনও স্থিতু হলি না...এখনও তুই হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছিস—এই সব আর কি!

বাবু। বাবার এই অবস্থার জন্য আরও অনেকে দায়ী।

খুশি। মানে...

বাবু। ছাড় ওসব। সমস্ত দোষ এখন আমার ঘাড়ে চাপালে তো হবে না।

খুশি। না—বলছি।...তুই যদি ঠিক-ঠাক একটা লাইন পেয়ে যেতিস! আচ্ছা, তোর এখনকার এই কাজটায় কোনও প্রসপেক্ট আছে?

বাবু। আমি জানি না। সত্যি বলতে কি ভবিষ্যৎ কথাটার সঠিক মানে কি আমি জানি না। এমনকি ঠিক কী যে চাওয়া উচিত তাও আমি জানি না।

খুশি। বুঝলাম না—আর একটু খুলে বল।

বাবু। সেই কলেজ থেকে বেরবার পর থেকে আজ অব্দি কতো রকমই তো করলাম...খুচখাচ ব্যবসা, হিসেব রাখা, গুদামের মাল মেলানো, পোলট্রির দেখা-শোনা, ছোট-ছোট কোম্পানির স্যাম্পেল নিয়ে দিনের পর দিন রোদে বৃষ্টিতে মানুষের দোরে-দোরে কড়া নাড়া—আরও কতো রকম কতো প্রকারের জীবন ধারণ যে এরই মধ্যে হয়ে গেলো আমার—কেন? না ভবিষ্যৎ গড়তে হবে! নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে!—কেন? না এগারো মাস কাজের পর একমাস বেঁচে থাকার জন্য ছুটি পাওয়া যাবে! ব্যস্! শুধু এইজন্য, এইজন্যই চারপাশের লোকেদের কনুই মেরে পেছনে ফেলে তোমাকে এগিয়ে যেতে হবে—এরই নাম ভবিষ্যৎ!

খুশি। ঐ ওখানকার কাজ তোর ভালো লাগছে না—নারে?

বাবু। খুশি, সেই সত্তরের মাঝামাঝি বাড়ি ছাড়ার পর থেকে সাতটা স্টেটে কম করে পঁচিশ রকমের কাজ করেছি...আর এখন সেই নেপালে এক হোটেলের ট্যুরিস্ট গাইড... ওখানে এখন বসন্ত—চারপাশে সান্ত্রীর মতো খাড়া খাড়া পাহাড়... ঝর্ণার রূপোলি ফিতে...কতো সবুজ কতো ফুল কতো রঙ...আর নানান জাতের বাচ্চার মেলা...আমার পেছনে বাপ মা'দের সঙ্গে সঙ্গে নানান জাতের নানান ভাষার কতো বাচ্চা—গান গাইছে কিচির মিচির করছে ঝগড়া করছে...গাল ফুলিয়ে হাসছে ঠোঁট ফুলিয়ে কাঁদছে—সে দৃশ্য বুঝি পৃথিবীর কোথাও নেই...আর তারই হঠাৎ একেবারে ভেতরে যেন ইলেকট্রিক শক লাগে—মনে হয়, একগাদা বাচ্চার পালের মাঝখানে আমি আঠারো-শো টাকার জন্য ট্যুরিস্ট গাইড হয়ে এই বিদেশ-বিভুঁয়ে এ আমি কী করছি—আমার যে চৌত্রিশ বছর বয়স হয়ে গেলো—আমাকে যে ভবিষ্যৎ গড়তে হবে! আর তখনই ভেতরটা আমার ফাটতে থাকে—পাগলের মতো দৌড়তে দৌড়তে ঘরে ফিরে আসি! আর এখানে পৌঁছেও আমি ছাই বুঝি না আমি কী করবো! (স্বল্প বিরতি)...সারাটা জীবন ছুটেছি যেন জীবনটা নষ্ট না হয়ে যায়—আর যখনই ঘরে ফিরেছি—নিশ্চিত বুঝেছি, আমার সব কষ্ট নষ্টেই গিয়েছে!

খুশি। তুই আসলে কবি, দাদা—তুই বড্ড আদর্শবাদী!

বাবু। নারে, আমি একটা-জগা-খিচুড়ি। মাঝে মধ্যে মনে হয় আমার বিয়ে করা উচিত ছিলো, নয়তো কোনও একটা কাজে লেগে থাকা উচিত ছিলো-সেসব করলুম না বলেই হয়তো এরকম একটা দামড়া-বালক রয়ে গেলাম।...তুই বেশ ভালো আছিস—তাই না রে?

খুশি। ধ্যুস্—ছাড় তো!

বাবু। কেন—তুই তো বেশ ভালোই রোজগার করছিস?

খুশি। তা করছি...তবু, এখন আমার চিন্তা আমাদের ঐ পারচেজ ম্যানেজারটা কবে মরবে, বুঝলি। ও মরলেই আমি। লোকটা একের পর এক সম্পত্তি বানায়, বাড়ি কেনে—আজ গড়িয়াহাট, কাল সল্টলেক, পরশু আলিপুর...প্রচুর পয়সা...আর আশ্চর্য—সম্পত্তি হাতের মুঠোয় পেয়ে গেলেই ওর ভোগের তৃষ্ণা চলে যায়! আমি ওর মতো হবো। এক-একদিন ভাবি, আমিও ভাবি—কেন, ওর মতো হবো কেন? এসব পাগলামি? পরক্ষণেই মনে পড়ে যায়, আমি তো ছোটবেলা থেকে এ-সবই চেয়েছি—নিজের অ্যাপার্টমেন্ট...গাড়ি...সারি-সারি সুন্দরী মেয়েদের মুখ—তাহলে? তাহলেও দেখেছি, মন খারাপ হয়ে যায়, একা লাগে, মাইরি বলছি!

বাবু। (উৎসাহী) শোন, তুই আমার সঙ্গে যাবি?

খুশি। তুই আর আমি—সেই কাঠমাণ্ডুতে?

বাবু। হ্যাঁ...কিছু পয়সা রোজগার করতে পারলে তুই আর আমি ওখানে একটা হোটেল লিজ নিয়ে নিতে পারি।...লাগোয়া জমি পেলে মুরগি পুষবো, ফুলের চাষ করবো, গতরে খাটবো দু'জনে।

খুশি। কি নাম দিবি?—বাবুর বাগান?

বাবু। দু'জনে দু'জনের জন্যে লড়বো—জানবো বিশ্বাস করার মতো কেউ একজন পাশে আছে।

খুশি। (মুগ্ধ) আমিও সেই স্বপ্ন দেখিরে দাদাভাই। এক-এক সময় ইচ্ছে করে কোম্পানির হলঘরের ঠিক মাঝখানটায় একেবারে উদোম হয়ে দাঁড়িয়ে যাই—চিৎকার করে বলি : "আও, মস্তানো, লড়ো মেরে সাথ!" এক বেটা পারবে না—তবুও ঐ শুয়োরের বাচ্চাগুলোর হুকুম তামিল করে যেতে হবে!

বাবু। তবে চল—দু'জনে পালাই!

খুশি। কিন্তু দাদাভাই, ওখানে আমি কী করবো?

বাবু। কিন্তু তোর বন্ধুকে দ্যাখ—সম্পত্তি বানাচ্ছে,বাড়ি কিনছে—অথচ ভোগ করতে পারছে না!

খুশি। তবুও ঐ ব্যাটাই যখন কোম্পানিতে ঢোকে—সব দরজাগুলো যেন কিসের ম্যাজিকে ওর সামনে চিচিং-ফাঁক হয়ে যায়...নারে, দাদাভাই, আমি এখানেই...ঐ সব কটা হামবড়া অফিসারদের একবার দেখিয়ে দিতে চাই আমারও এলেম আছে! খুশি চৌধুরী একটা রাস্তার ফালতু নয়। সে-ও ছু-মন্তর জানে। ইচ্ছে করলেই কোম্পানির সব টপ

পোজিশনে চলে যেতে পারে! তুই একটু সবুর কর...আমি করে দেখাবো... তারপর আমি যাবো, তোর সঙ্গেই যাবো, মাইরি বলছি!...কিন্তু দাদাভাই, একটা কথা বল, আজ যে আমার গার্ল-ফ্রেণ্ডকে দেখলি, কেমন দেখলি?

বাবু। ভালো, ভালোই তো।

খুশি। আর ওর সঙ্গে যে মেয়েটা এসেছিলো?

বাবু। হ্যাঁ হ্যাঁ, সে-ও ভালো।

খুশি। দাদাভাই, তুই কেমন বদলে গেছিস ! মেয়েদের ব্যাপারে তুই-ই ছিলি আমার গুরু, অথচ...তোর ইন্টারেস্ট সব চলে গেছে?

বাবু। মানে যদি এমন একটা মেয়ে হতো—ধীর শান্ত... চোখে মুখে মায়া মমতা...

খুশি। আমারও না ঐ-রকমই পছন্দ—জানিস তো!

বাবু। না ভাই—ও-রকম মেয়ে তোমার ঘরে এলে তুমি আর রাতে কোনওদিন ঘরেই ফিরবে না।

খুশি। মা-কালি! ফিরবো। কিন্তু ঐ যে বললাম— ভেতরে একটা কিছু থাকা চাই—একটা চরিত্র, একটা টান, যেমন আমাদের মায়ের আছে। জানিস, আজ যে ঐ মায়াবতীকে দেখলি—একমাস পরে ওর বিয়ে!

বাবু। ভাগ ব্যাটা, চালবাজি করিস না!

খুশি। সত্যি! আমাদের কোম্পানির ফিনান্স ম্যানেজারের সঙ্গে ওর আসছে মাসে বিয়ে। সে শুনছি শিগগীর ম্যানেজার হয়ে যেতে পারে। হঠাৎ মনে হলো, দিই লোকটার সুখশান্তি তছনছ করে! ব্যস, মেয়েটাকে পটিয়ে ফেললাম—নষ্ট করে দিলাম। শুনলে আমায় ঘেন্না করবি, ওদের বিয়েতে আমি প্রেজেন্ট নিয়ে যাবো, পেট পুরে খেয়েও আসবো। তারপর ধর—সাপ্লায়াররা অর্ডার পাওয়ার জন্য মাঝে-মধ্যে হাজার দেড় হাজার পকেটে গুঁজে দেয়—নিতে চাই না আমি। আমি সৎ থাকতেই চাই—তবুও নিয়ে ফেলি! নিজেকেই নষ্ট করে ফেলি! তারপর নিজেকেই ঘেন্না করি! (আত্মঘৃণার হাসি হাসে)

বাবু। চল—শুতে যাই।

খুশি। আসল ব্যাপারটাই কিন্তু ঝুলে রইলো!

বাবু। আমার মাথায় একটা নতুন মতলব এসেছে! তোর পি. সি. সেনের কথা মনে আছে?

খুশি। পি. সি. সেন!— স্পোর্টস্ ইন্ডিয়ার মালিক? সে-তো এখন মস্ত লোক। তুই ওর ওখানে আবার কাজ করবি নাকি?

বাবু। না না! আমি কাজ ছেড়ে দেবার সময় ভদ্রলোক খুব আদর করে আমায় বলেছিলেন, "কোনও দরকার হলে নিশ্চয়ই আমার কাছে এসো।"

খুশি। হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে।

বাবু। শুনেছি, ভদ্রলোক কিছুদিন হলো ফিনান্স কর্পোরেশন না কি একটা খুলেছেন। তো ভাবছি, ওঁর কাছে একবার যাবো—যদি লাখ দু-তিন লোন পেয়ে যাই...কাঠমাণ্ডুতে একটা ছোটখাটো হোটেল লিজ নিয়ে নিতে পারি। তারপর নিজের ইচ্ছেমতো—

খুশি। আরে ঐ ভদ্রলোক তো তোকে ক্রিকেট-কোচিঙের জন্য বিলেত পাঠাতে চেয়েছিলেন! তোকে অসম্ভব ভালোবাসতেন—

বাবু। হ্যাঁ। কিন্তু ভয় হচ্ছে একটাই...পি. সি. সেন কি এখনও মনে রেখেছেন, ওঁর গোডাউন থেকে আমি ছ-টা ক্রিকেট ব্যাট চুরি করেছিলাম!

খুশি। দূর দূর! গত দশ বছরে ওরা কম করে দশ লাখ ব্যাট বিক্রি করেছে। তোর ছ-খানা ব্যাটের কথা ওরা মনে রেখে দেবে! তাছাড়া চুরির কথা ধরতে পারলে পি. সি. সেন তো সেদিনই তোকে তাড়িয়ে দিতো!

বাবু। আমি আগে ভাগে রিজাইন না করলে আমায় বোধহয় তাড়িয়েই দিতো...আমি ঠিক জানি না...অবিশ্যি আমাকে প্রচণ্ড ভালোবাসতো-—সেটা আমি জানি...

অমল। (দূর থেকে) বাবু, তুই কি ইঞ্জিন-টা ধুবি?

খুশি। শ্ শ্ শ্! (সেই দিকে তাকিয়ে) শুনছিস তুই?

বাবু। (বাবার হাসি ও বিড়বিড়ানি শুনে) লোকটার হুঁশ নেই। মা সব কিছু শুনতে পাচ্ছে!

অমল। (বাইরে থেকে) উঃ বাবু, সোয়েটারে কালি লাগিও না!

খুশি। তুই আর চলে যাস না। আমার ভয় করছে রে দাদাভাই!

অমল। (বাইরে থেকে) কি শুনছি আমি, বাবু, তোর নাকি একজন গার্ল-ফ্রেন্ড হয়েছে?

বাবু। মা সব কথা শুনতে পাচ্ছে, ভাইরে!

খুশি। (অনিচ্ছুক বাবুকে টানতে-টানতে) চল শুতে চল। সকালে বাবার সঙ্গে একটু কথা বলিস, দাদাভাই!

[ওদের আলো নিবে যায়—ওরা বাইরে। অমলকান্তির ওপর আলো। আবছা-আলোয় দেখা যায় অমল ফ্রিজ থেকে দুধের বোতল বার করে। পেছনের অ্যাপার্টমেন্ট হাউসের সব আলো এখন রক্ত-চক্ষু। আবহ সঙ্গীত।]

অমল। মেয়ে-বন্ধুদের ব্যাপারে একটু সাবধান থাকাই ভালো—বুঝলে বাবু। কোনও প্রতিশ্রুতি দেবে না, কারণ এইটা মনে রেখো—তুমি যা বলবে ওরা তাই বিশ্বাস করবে...তাছাড়া তোমার বয়স অল্প... লেখাপড়া শেষ করোনি...(বোতল থেকে গ্লাসে দুধ ঢালে। সম্পূর্ণ আত্মমগ্ন, মুখে হাল্কা হাসি) কি বললি?...(অন্য চেয়ারের দিকে বড়ো হাসি হেসে) মেয়েরা রেস্টুরেন্টে যেচে-যেচে তোর পয়সা দিয়ে দেয়! (জোরে হাসে) তুই তাহলে একেবারে হিরো বল! (এবার যেন নির্দিষ্ট কাউকে বাস্তবতার স্বরগ্রামে কথা বলে) তুই অতো যত্ন করে গাড়িটা পালিশ করিস—আমার খুব মজা লাগে...উঁহু, হাব-ক্যাপ শ্যাময় দিয়ে

ঘষতে হয়...হ্যাঁ-হ্যাঁ, কাঁচগুলো খবরের কাগজ ভিজিয়ে মুছে ফেল। বাবু, খুশিকে দেখিয়ে দে...এইতো—গুড ভেরি গুড (ওপর দিকে তাকিয়ে) বাবু একটু সময় পেলেই আমাদের প্রথম কাজ ঐ বড় ডালটা—ছাতের ওপর ঝুঁকে পড়েছে—ওটা কেটে ফেলা।... তোমাদের জন্য একটা প্রাইজ রাখা আছে—

বাবু। (বাইরে থেকে) কি এনেছো বাবা?

অমল। না—আগে হাতের কাজ শেষ করো—তারপর। জানলি বাবু, বহরমপুরে একটা খাগড়াই কাজ করা দোলনা দেখে এসেছি—পরের বার এনে ঐ গাছ-দুটোয় টাঙিয়ে দেবো। খালি মজাসে দোল খাও।

[অমলকান্তির দৃষ্টি-পথের দিক থেকে ছোট বাবু ও ছোট খুশি ঢোকে। খুশির হাতে বালতি কাগজ ন্যাকড়া। বাবুর হাতে ক্রিকেট ব্যাট, পরনে জুনিয়র বেঙ্গল লেখা সোয়েটার।]

খুশি। প্রাইজটা কোথায় বাবা?

অমল। গাড়ির পেছনের সিটে। (খুশি বেরিয়ে যায়)

বাবু। কি এনেছো বাবা, আমায় বলো, কি এনেছো?

অমল। তুমিই বলো!

বাবু। (বেরিয়ে যাওয়ার উদ্যোগে) কিরে ওটা খুশি?

খুশি। (বাইরে থেকে) একটা পাঞ্চিং ব্যাগ!

বাবু। মা-কালি! তুমি কি করে জানলে আমরা পাঞ্চিং ব্যাগ চাইছিলাম?

[খুশি ঢুকে আসে—এসে হ্যান্ড-স্ট্যান্ড শুরু করে।]

অমল। আমি তোমাদের বাবা বলে!

খুশি। বাপি, আমি কিন্তু অনেকটা লম্বা হয়েছি।

বাবু। আমার নতুন ব্যাটটা দেখেছো, বাবা!

অমল। (ব্যাট দেখতে দেখতে) এটা কোথায় পেলে তুমি?

বাবু। কোচ বলেছে আমায় শ্যাডো প্র্যাকটিস করতে।

অমল। সেইজন্য ব্যাটটা দিয়ে দিয়েছে তোকে!

বাবু। মানে...লকার-রুম থেকে ধার নিয়েছি। (গোপন বোঝাপড়ার হাসি)

অমল। (চুরি ধরার মজায় হেসে) আমার ইচ্ছে ওটা তুমি ফিরিয়ে দাও।

খুশি। বলেছিলাম দাদা-ভাই, বাপি পছন্দ করবে না!

বাবু। ঠিক আছে—আমি ফেরৎ দিয়ে দিচ্ছি।

অমল। (সম্ভাব্য তর্ক থামিয়ে) আহা, ওকেও তো প্র্যাকটিস করতে হবে, হবে না? (বাবুকে) তোর এ্যাতো উৎসাহ দেখে কোচ নিশ্চয়ই খুব খুশি হয়?

বাবু। কোচ সব্বাইকে আমার উদাহরণ দেয়!

অমল। কারণ সে তোমায় পছন্দ করে। আর কেউ ঐ ব্যাট নিলে তুলকালাম হয়ে যেতো! যাহোক, সব খবর বলো তোমাদের।

বাবু। তুমি এত বাইরে বাইরে থাকো...মা-কালি... তোমাকে ছাড়া বড্ড একা একা লাগে।

অমল। আচ্ছা! কটা দিন সবুর করো, এরপর আমি নিজেই একটা ব্যবসা করবো—তখন আর বাড়ি ছেড়ে কক্ষণও যেতে হবে না। এসব এক্ষুণি কাউকে বলার দরকার নেই।

খুশি। মানে ঐ রাজেন কাকার মতো?

অমল। না না! ওর চাইতে অনেক বড়ো। রাজেন কাকাকে তো কেউ তেমন পছন্দ করে না। মানে করে—কিন্তু বেশি পছন্দ করে না।

বাবু। বাবা, এবার তুমি কোথায় গিয়েছিলে?

অমল। প্রথমে গেলাম ময়নাগুড়ি। বাপরে! সেখানে গিয়েই তো দেখি এলাহী কাণ্ড! হোটেলের লাউঞ্জে মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান এসেছে...

বাবু। মেয়র!! তারপর?

অমল। তারপর আর কি। উনি বললেন 'নমস্কার'...আমিও বললাম 'নমস্কার'! ব্যস শুরু হয়ে গেলো কথাবার্তা..খাওয়া দাওয়া...

বাবু। তারপর কোথায় গেলে?

অমল। তারপর শুধু মাল বেচা আর খাওয়া দাওয়া, বুঝলি...মালদায় ফজলি আম, বহরমপুরে ছানার বড়া, কৃষ্ণনগরে সরপুরিয়া, রাণাঘাটে পান্তুয়া— সেখান থেকে সোজা বাড়ি!

বাবু। মা-কালি! তোমার সঙ্গে একবার যেতে ইচ্ছে করে, বাপি!

অমল। যাবি? গরমের ছুটিতে চ'।

বাবু। সত্যি নিয়ে যাবে?

অমল। তুই, খুশি আর আমি...আর যা সুন্দর জায়গা আছে না এই বাংলাদেশে—দেখলে তোদের তাক লেগে যাবে—আর দেখবি ঐসব জেলার শহরগুলোতে আমার কি রকম খাতির—কতো লোক যে আমায় ভালোবাসে...তাহলে, ঠিক আছে—গরমের ছুটিতে...!

বাবু। তুমি বেশ আগে আগে যাবে...আর তোমার পাশে-পাশে স্যাম্পেলের বাক্সগুলো বয়ে নিয়ে যাবো!

অমল। আরিব্বাবা..সেতো এক ধুন্ধুমার কাণ্ড হবে রে—আমি আর সঙ্গে দুই রাজপুত্তর...সব দোকান সব কোম্পানির লোকেরা তো আপ্‌সে মাল কিনে নেবে আমাদের— সে-তো এক ধুন্ধুমার কাণ্ড! (বাবু ও খুশি প্রচণ্ড খুশিতে হাসে) আচ্ছা বাবু, তুই যে জুনিয়র বেঙ্গলের ট্রায়াল খেলছিস—শুনে তোর কলেজের সবাই কি বলছে?

খুশি। বাপি, সেতো তুমি জানো না—দাদাভাই কলেজের এদিক থেকে ওদিকে গেলে ছেলেমেয়েরা অটোগ্রাফ খাতা নিয়ে ছেঁকে ধরছে!

বাবু। বাপি, সেদিনের খেলায় প্রথম ছক্কাটা আমি তোমার জন্য মারবো— মেরেই টুপিটা আকাশের দিকে ছুঁড়ে দেবো—

খুশি। টুপি খোলে তো ফিফ্‌টি নয়তো সেঞ্চুরি করলে।

বাবু। বাবার জন্য সব নিয়ম বাদ—সাইট স্ক্রিনের ওপর দিয়ে লাল রঙের বলটা বাতাসে ভাসতে ভাসতে উধাও হয়ে যাবে—আর আমি বাপির দিকে আমার টুপিটা...

অমল। (বাবুর কপালে চুমু খেয়ে) দাঁড়া, জেলায়-জেলায় সব বন্ধুদের যখন বলবো না—

[রাহুল দৌড়ে ঢোকে, পরনে বারমুডা। আন্তরিক উদ্বিগ্ন অনুগত কিশোর]

রাহুল। বাবু—এখনও তুমি এখানে কি করছো! আজ আমার সঙ্গে তোমার ম্যাথমেটিক্স করার কথা না!

অমল। রাজেনের ছেলে! তোমাকে এতো ফ্যাকাশে লাগছে কেন, রাহুল?

রাহুল। কাকু, ওর তো পরীক্ষা এসে গেলো—অঙ্কের ভবতারণবাবু ওর ওপর ভীষণ চটে আছেন। আমি একদিন শুনেছি—উনি টিচার্সরুমে বলছিলেন, "বাবু কি করে অঙ্কে পাশ করে দেখবো আমি।" আর ঐ ভবতারণবাবুই এবার ফাইনালে আমাদের হেড এগ্‌জামিনার না ট্যাবুলেটর কি যেন হয়েছেন শুনছি!

অমল। তাহলে বাবু, তুমি বরং যাও, এক্ষুণি পড়তে যাও!

বাবু। বাপি, আমার এই খেলার সোয়েটারটা কেমন হয়েছে বললে না!

অমল। বাঃ বাঃ! রঙটাও ভালো— লেটারিংও অতি সুন্দর! দারুণ!

রাহুল। কাকু, ও নিজে নিজে গেঞ্জি-সোয়েটারে 'জুনিয়র বেঙ্গল' এইসব ছাপিয়ে নিয়েছে—তার মানে এই নয় যে ও পরীক্ষাতেও পাশ করে যাবে। ভবতারণবাবু কিন্তু বলেছেন...

অমল। কি সব বাজে বকছো! আই. আই. টি, রুড়কি ইঞ্জিনিয়ারিং, যাদবপুর ইউনিভার্সিটি থেকে ওর জন্য স্কলারশিপ নিয়ে বসে আছে—আর এরা ফেল করিয়ে দেবে?

রাহুল। ভবতারণবাবু কিন্তু ভীষণ রেগে আছেন...

অমল। ঠিক আছে, ঠিক আছে—বেশি ভবতারণবাবু ভবতারণবাবু কোরো না তো...তুমি বড্ড এঁটুলিপনা করো...দিন দিন একটা ফ্যাক্‌শা ভূত হচ্ছো!

রাহুল। আমি তাহলে বাড়িতে আছি বাবু— তোমার ইচ্ছে হলে এসো!

[রাহুল বেরিয়ে যায়। ওরা তিনজনে হাসতে থাকে।]

অমল। এই রাহুল ছেলেটাকে কেউ বিশেষ পছন্দ করে না—না?

বাবু। না—করে, তবে বেশি করে না!

অমল। আমিও তাই বলি—ও পরীক্ষায় যতোই ফার্স্ট হোক, কর্মক্ষেত্রে দেখবে ও তোমাদের থেকে দশমাইল পেছনে পড়ে আছে... আসল কথা হলো—নিজেকে সকলের পছন্দসই করে নেওয়া!—ব্যস, তাহলেই দেখবে আকাশ তোমার হাতের মুঠোয়! আমাকেই দেখো না—কোনওদিন কোথাও লাইনে দাঁড়াতে হয় না। একবার নামটা শুনলো—অমলকান্তি চৌধুরী—ব্যস—পারচেজ ম্যানেজার—খোদ ম্যানেজারের দরজা পট-পট করে খুলে গেলো— সোজা ঢুকে যেতে পারি আমি!

বাবু। তোমার খদ্দেরদের এবার পটকে ফেলেছো তো, বাপি?

অমল। জলপাইগুড়িতে শুইয়ে দিয়েছি, আর শিলিগুড়িতে সব কটা নক-

আউট!

[পার্বতী সেই আগের মতো, মাথায় রিবন, হাতে ভিজে কাপড়ের বালতি।]

পার্বতী। এই যে, বড়বাবু!

অমল। এই যে বড় বউ! আরে—বাড়িতে দু-দুটো জোয়ান ব্যাটা থাকতে মাকেই সবকিছু করতে হচ্ছে আজকাল!

বাবু। বালতি-টা ধর খুশি!

খুশি। কোথায় নিয়ে যাবো, মা'ণি?

পার্বতী। দড়ির ওপর মেলে দে সব। আর বাবু, তোর বন্ধুরা সব উঠোনে বসে আছে—ডাকছে তোকে।

বাবু। ধ্যুর—এখন বাপি ফিরেছে না বাড়িতে!

অমল। (অত্যন্ত খুশিতে) তো ওদের বলে আয় কি করবে না করবে!

বাবু। ঠিক আছে। খুশি, কুইক মার্চ! (দু'জনে বালতি নিয়ে চলে যায়)

পার্বতী। সব ওরই বয়সী ছেলে—অথচ কেমন মান্য করে ওকে। পাড়ার সবাই তো মেতে আছে বাবুর ঐ ট্রায়াল ম্যাচ দেখবে বলে।...কিছু বেচতে পারলে?

অমল। জলপাইগুড়িতে বেচেছি পাঁচশ'...আর শিলিগুড়িতে মোট সাতশ'...

পার্বতী। উরিব্বাস! দাঁড়াও, কাগজ পেন্সিল দিই। (ফ্রিজের ওপর থেকে কাগজ পেন্সিল আনে) তার মানে দাঁড়ালো আঠারোশো..প্রায় উনিশশো...

অমল। না মানে এখনও হিসেবটা করিনি... তবে...

পার্বতী। মোট কতো বেচেছো তুমি?

অমল। ধরো আমি...আমি তোমার বেচেছি—জলপাইগুড়িতে মোট একশো আশি...তার মানে...না, গোটা ট্যুরটায় ধরো তোমার মোট দুশো-র মতো....

পার্বতী। (নির্দ্বিধায়) মোট দুশো—তাতে হলো...(অঙ্ক কষে)

অমল। আসলে শিলিগুড়িতে তিনটে দোকান হালখাতার জন্য বন্ধ ছিল—নইলে আমি রেকর্ড ব্রেক করে দিতুম...

পার্বতী। মোট ছ'শ পঁয়তাল্লিশ টাকা..খুব ভালো তো!

অমল। তোমার ধার-দেনা কতো?

পার্বতী। ধরো রেফ্রিজারেটার বাবদ একশ' চুয়াল্লিশ টাকা—

অমল। অতো টাকা কেন?

পার্বতী। ইনস্টলমেন্ট আর ফ্যান-বেল্ট সারানোর জন্য সতেরো টাকা—

অমল। এটা তো নতুন ফ্রিজ!

পার্বতী। লোকটা বললো, এরকম নাকি হয়—

অমল। ঠকে গেলাম না তো!

পার্বতী। ওদের কোম্পানিরই তো সবচেয়ে বড়ো বিজ্ঞাপন ছিলো!

অমল। আর কি বাকি?

পার্বতী। আলমারির জন্য আটশ' পঁয়ষট্টি টাকা, পাম্প সারানোর জন্য একত্রিশ টাকা আশি পয়সা—পনের তারিখের মধ্যে দিয়ে দিতে হবে—তারপর

ছাদ-সারাইয়ের বাকি একশ' উননব্বই টাকা—

অমল। ছাদ থেকে জল পড়ছে?

পার্বতী। না, খুব ভালো সারাই করেছে। আরও টুকিটাকি নিয়ে তোমার তেরশো টাকার মতো প্রায় লাগবে।

অমল। আরও তেরশো টাকার ওপর! উফ্ ভগবান! আমি তো...আমি সামনের সপ্তাহে মুর্শিদাবাদ যাবো। ওখানে সবাই আমাকে খুব পছন্দ করে! না...জানো, পার্বতী, লোকেরা আজকাল আর আমায় পছন্দ করে না—

পার্বতী। ওকি অবুঝের মতো কথা—

অমল। আমায় দেখলে সব হাসাহাসি করে...

পার্বতী। কেন, লোকেরা কেন তোমায় নিয়ে হাসাহাসি করবে? অমন কথা কক্ষণও বোলো না তুমি!

অমল। আমায় দেখলে সবাই হাসাহাসি করে—আমি বড্ড কথা বলি। মানুষের মিতভাষী হওয়া উচিত। রাজেনের এই গুণটা আছে—অল্প কথায় সারতে পারে—সবাই ওকে সেজন্য কতো সমীহ করে!

পার্বতী। তুমি মোটেই বেশি কথা বলো না—তুমি হচ্ছে দিখখোলা মানুষ—

অমল। (মুচকি হেসে) হ্যাঁ, আমি বলি, "হেসে নাও দু'দিন বইতো নয়" (হাসি মিলিয়ে যায়) না...বড্ড ভাঁড়ামো করি আমি—

পার্বতী। কেন—তোমাকে কতো লোক কেমন—

অমল। সেদিন স্টুয়ার্ট ম্যাকলিয়ডে পারচেজ ম্যানেজারের ঘরে ঢুকতে যাচ্ছি—আমাকে দেখে একজন সেলস্‌ম্যান চোখ টিপে কি যেন বললো...আর সবাই হো-হো করে হেসে উঠলো—মাথায় রক্ত চড়ে গেলো—সোজা গিয়ে তার গালে সপাটে এক থাপ্পড়—সে একেবারে...আমি জানি না আমার পোশাক-আশাকগুলো বোধহয় পুরনো ধাঁচের হয়ে যাচ্ছে...আমি পুরনো হয়ে যাচ্ছি...

পার্বতী। আমার কাছে তুমি পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর পুরুষ...

[অন্ধকার থেকে অন্য এক মহিলার উচ্চহাস্য ভেসে আসে]

আর তোমার ছেলেরা—ক'জন আছে নিজের সন্তানদের কাছ থেকে এতো ভালোবাসা এতো শ্রদ্ধা পায়!

অমল। (তীব্র আবেগে) আমার ছন্নছাড়া জীবনে তুমি আমার আলো, আমার আশ্রয়...একা একা রাস্তায় ঘুরতে থাকি—হঠাৎ মনে হয় তোমাকে ছুঁই... তোমাকে ধরি—তোমার বুকের ভেতরে মুখ লুকিয়ে যেন বেঁচে যেতে পারি...

[সেই হাসি এখন আরও জোরালো—অমল মঞ্চের ক্রম-দীপ্যমান অঞ্চলে চলে আসে। তারই পাশে দেখা যায় এক মহিলা বিদায়ী প্রসাধন শেষ করছে এবং হাসছে।]

কারণ...কারণ বড়ো একা লাগে...বিশেষ করে যখন ব্যবসা মন্দা যায়...ট্রেনে—বাসে গাড়িতে একা একা লাগে—মনে হয় আর বুঝি

একটুকরো মাল বেচতে পারবো না—ভয় হয়, তোমার কোনও সংস্থান করতো পারবো না—ছেলে-দুটোর ভবিষ্যতের কোনও পথ আমি খুঁজে পাবো না...

মিস্ হাজরা। আমায় তুমি খুঁজবে কেন? তোমাকেই তো আমি খুঁজে নিয়েছি।

অমল। (খুশি) সত্যি! তুমি খুঁজে নিয়েছো আমায়?

মিস্ হাজরা। আমিই তো! রিসেপশনে বসে বসে প্রতিদিন লক্ষ্য করি—কতো সেলস্‌ম্যান ঝাঁকে ঝাঁকে আসছে যাচ্ছে—কিন্তু তুমি একেবারে আলাদা! দারুণ মজাদার মানুষ তুমি!

অমল। আচ্ছা—তুমি এক্ষুণি চলে যাবে?—কেন?

মিস্ হাজরা। বারে! সাড়ে এগারোটা বাজে যে...

অমল। (দু'হাত ধরে) আর একটু থাকো না...

মিস্ হাজরা। আমার বাড়ি ঘর-দোর নেই বুঝি...

অমল। তুমি...তুমি আবার আসবে তো?

মিস্ হাজরা। বারে— কেন আসবো না! তোমার কাছে এলে তো আমার মন ভরে থাকে—কতো সুন্দর সুন্দর কথা বলো! তুমি, তুমি জানো না তুমি কতো ভালো!

অমল। তুমি আমাকে খুঁজে নিয়েছিলে—হ্যাঁ?

মিস্ হাজরা। হ্যাঁ। কারণ তুমি এখনও একটা ছোটো ছেলে তো... কোথায় হারিয়ে যাবে—তাই...

অমল। তাহলে পরের বার শিলিগুড়িতে এলে আবার দেখা হবে—

মিস্ হাজরা। হবে না!...ও—পরের বার আর অপেক্ষা করতে হবে না—সোজা পারচেজ ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবো আমি!

অমল। পাক্কা! তাহলে তো আর একবার 'অধরে অধরে...'!

মিস্ হাজরা। উফ্ তুমিতো আমায় মেরে ফেলবে দেখেছি ...ওহ্ কতো কষ্ট করে ঢাকাই শাড়ি এনে দিলে—সুন্দর হয়েছে...থ্যাঙ্ক ইউ! চলি..গুড নাইট!

অমল। গুড নাইট! "খুলিয়া রাখিয়ো সখী দুয়ার তোমার/রাতের চন্দন চর্চা মধুর ভাণ্ডার!"

মিস্ হাজরা। ওঃ অমল...

[মহিলা হাসিতে ফেটে পড়ে। সেই হাসিতে মেশে পার্বতীর হাসি। মহিলা অন্ধকারে হারিয়ে যায়। পেছনের অংশ আলোকিত, পার্বতী সেখানেই বসে—এখন একটা ঢাকাই শাড়ি রিপু করছে।]

পার্বতী। তুমি শুধু শুধু ও-সব ভাবছো। সত্যিই তুমি সুন্দর—আমার চিরদিনের সুন্দর...

অমল। (আগের জায়গা থেকে পার্বতীর কাছে এসে) পার্বতী, তোমার সব ক্ষতি আমি পূরণ করে দেবো—

পার্বতী। কি ক্ষতি করেছো তুমি আমার! আমি তো দিব্যি আছি—সুখে আছি—অনেকের চাইতে ভালো—

অমল। (রিপু কর্মের দিকে চোখ পড়ে) ওটা কি?

পার্বতী। কিছু না। সেই আদ্যিকালের একখানা ঢাকাই শাড়ি। একটু রিপু করে রাখছি। এসবের তো আজকাল আকাশ-ছোঁয়া দাম...

অমল। বন্ধ করো, বন্ধ করো এ সব! আমি যেন এ-বাড়িতে ঐ শাড়ির রিপু আর না দেখি! ফেলে দাও ওটা! (পার্বতী দ্রুত শাড়িটা পেছনে লুকিয়ে ফেলে।)

রাহুল। (দৌড়ে ঢোকে) কাকু, বাবু আছে? ও কিন্তু মোটেই পড়ছে না কাকু।

অমল। তা তুমি ওকে পরীক্ষার হলে একটু দেখিয়ে দিও—

রাহুল। না—এটাতো ফাইনাল পরীক্ষা... এমনিতে তো আমি দেখাই—কিন্তু এবারে শুনেছিভীষণ কড়াকড়ি—ধরলেই এক্সপেল—

অমল। কোথায় গেছে কোথায়, বাঁদরটা! আমি আজ চাবকাবো ওকে—

পার্বতী। আর শুনছো কোথা থেকে একটা নতুন ব্যাট নিয়ে এসেছে— ফেরৎ দিয়ে দিতে বলো ওকে—

অমল। আসুক আজ—চাবকে পিঠের ছাল-চামড়া তুলে দেব!

পার্বতী। আজকাল তুমি না থাকলে যা অসভ্যতা করে—

[পেছনে সেই মহিলার হাসি।]

অমল। চুপ করো!

রাহুল। ভবতারণবাবু কিন্তু ওকে অঙ্কে ফেল করাবেনই কাকু—ও যদি না প্রাণ-পণ খাটে...

অমল। বেরোও—বেরোও তুমি এখান থেকে—

[রাহুল চলে যায়।]

পার্বতী। রাহুল ঠিকই বলেছে—তুমি কিন্তু এবার ওকে—

অমল। (ফেটে পড়ে) ও কোনও অন্যায় করেনি! তুমি চাও ও ঐ রাহুলের মতো একটা কেন্নো তৈরি হোক! ওর মধ্যে একটা, একটা তেজ আছে—একটা অন্যরকম ব্যক্তিত্ব...।

[পার্বতী কথার মধ্যে উদ্গত কান্না চাপতে চাপতে ভেতরে চলে যায়। অমল আহত। বিহ্বল। এখন আবার রাত। পেছনের অ্যাপার্টমেন্ট হাউসগুলি আবার রক্তচক্ষু।]

কি চুরি করেছে, বাবু? বলেইছে তো ফিরিয়ে দেবে?—কেন চুরি করে ও?...আমি কি বলেছি ওকে? আমি তো সারা জীবন ওকে ভালো বই খারাপ বলিনি একটাও...তবে..

[খুশি—পরনে পাজামা, ভেতরে আসে। অমল তার উপস্থিতি টের পায়।]

খুশি। চলো, এবার শুতে চলো...

অমল। তোদের মা নিচু হয়ে হয়ে গোটা বাড়ির মেঝেগুলো মোছে... কোমরের ব্যথা বেড়ে যায়—তোরা দেখতে পাস না?

খুশি। ঠিক আছে, চলো এখন...তুমি আজ রাতে হঠাৎ ফিরে এলে যে?

অমল। ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম...মদনপুরের কাছে একটা বাচ্চাকে প্রায় চাপা দিয়ে দিচ্ছিলাম! বড়দার সঙ্গে সেবার কেন যে বর্মায় চলে গেলাম না...বড়দা একটা জিনিয়াস! আঃ, কি ভুল যে

করেছি! তখন হাতে ধরে সেধেছিলো...

খুশি। শোনো, এখন আর সে-সব কথা ভেবে তো—

অমল। শোনো বাছা, একটা মানুষ—জীবনটা শুরু করলো একবস্ত্রে—আর যখন শেষ করলো—অঢেল সম্পত্তির মালিক...

খুশি। ঠিক আছে, আর একদিন শুনবো বড়জেঠুর কথা—

অমল। লোকটা খালি-হাতে চলে গেল একদিন বর্মা—শুধু জঙ্গল—ঢুকে পড়লো সেই জঙ্গলের ভেতর—যখন বেরিয়ে এলো, মাত্র একুশ বছর বয়স—দু'হাতের মুঠোয় কুবেরের ঐশ্বর্য! ...দুনিয়াটা মুখ-বন্ধ ঝিনুকের মতো— সেটাকে খুলতে জানতে হয়—

খুশি। আমি তো তোমাকে বলেছি, তুমি রিটায়ার করে ফেলো, আমি ঠিক সামলে নেবো—

অমল। আমি তোমার চাকরির কটা টাকার ভরসায় রিটায়ার করবো! তুমি তোমার ফ্ল্যাট, জামা জুতোর ফ্যাশন,বন্ধু, তোমার বান্ধবীদের সামলাবে না আমাকে রিটায়ার করাবে?.... বাজে বোকো না, বাজে বোকো না তো। ওঃ ভগবান—আমার মাথাটা আবার দপদপ করছে!—ওরে, তোরা কোথায় গেলি—কোথায় গেলি তোরা বাবারা?—চারপাশে যে আগুন জ্বলছে, রাস্তার ধারের সেই সবুজ সবুজ গাছগুলো জ্বলেপুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে... তোরা দেখতে পাচ্ছিস না—তোরা দেখতে পাচ্ছিস নাকি—আমার হাতের তালু থেকে স্টিয়ারিংটা বেরিয়ে যাচ্ছে...বেরিয়ে যাচ্ছে—

[রাজেন দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়। ধীর। স্বল্পভাষী। সহজে নড়ে না। সর্বদাই মমতায় গভীর, এই মুহূর্তে বিচলিত। পরনে পাজামা, ড্রেসিং গাউন, শ্লিপার। ভেতরে ঢোকে।]

রাজেন। কিরে—সব খবর ভালো তো?

খুশি। হ্যাঁ রাজেন কাকু, সব...

অমল। কি হয়েছে—কি?

রাজেন। গোলমাল শুনলুম এদিকে—তো ভাবলুম...এই দেওয়ালগুলোর কিছু একটা করা যায় না?—তুমি এদিকে জোরে হাঁচলে, তো দেখি আমার দড়ির গামছাখানা উড়ে গেলো!

খুশি। এবার শুতে চলো বাবা, এসো।

[রাজেন খুশিকে চলে যেতে ইঙ্গিত করে।]

অমল। তুমি যাও, আমি পরে যাচ্ছি।

খুশি। দেরি কোরো না কিন্তু...(বেরিয়ে যায়)

অমল। তুমি হঠাৎ—কি ব্যাপার?

রাজেন। ঘুম আসছিলো না...মনে হয় অম্বল হয়েছে।

অমল। তুমি এখনও খেতে শিখলে না!

রাজেন। কেন আমি তো মুখ দিয়েই খাই!

অমল। তুমি কিচ্ছু জানো না। ভিটামিন-টিটামিন ঠিকমতো খেতে হয়।

রাজেন। যাকগে—দু'হাত হবে নাকি?

অমল। (ইতস্তত করে) তাস আছে?

রাজেন। (পকেট থেকে তাস বার করে) হ্যাঁ... তা ঐ ভিটামিনে কি হয়?

অমল। (তাস বাঁটতে বাঁটতে) ওতে তোমার হাড় শক্ত হয়।—কেমিস্ট্রি!

রাজেন। অ! বুক-জ্বালায় হাড় এলো কোত্থেকে?

অমল। কি বকছো কি—এ্যাঁ?

রাজেন। অমনি গায়ে মেখে নিলে?

অমল। সব বিষয়ে বক্-বক্ বক্-বক্! (খেলা চলতে থাকে)

রাজেন। অমল, তুমি একটা চাকরি করবে?...

অমল। আমার একটা চাকরি আছে। তোমার তো ভারি আস্পর্ধা—আমায় চাকরি অফার করছো?

রাজেন। গায়ে মেখো না!

অমল। তুমি অপমানটাও কোরো না!

রাজেন। আমি বুঝতে পারছি না—তুমি এভাবে কি করে চালাবে?

অমল। আমার চাকরিটা বেশ ভালো।..তুমি আমার এখানে বারবার কেন আসো?

রাজেন। আমায় চলে যেতে বলছো?

অমল। বাবু বলছে, আবার সেই নেপালে ফিরে যাবে—আমি কিছু বুঝতে পারছি না!

রাজেন। ওকে যেতে দাও।

অমল। ওকে দেওয়ার মতো আর আমার কিছু নেই, রাজেন—আমি দেউলে পিটে গিয়েছি, একেবারে দেউলে।

রাজেন। ও না খেয়ে মরবে না—ওর ব্যাপারে আর নাইবা ভাবলে!

অমল। তাহলে আর আমি কি নিয়ে ভাববো?

রাজেন। তুমি নিজেকে বড় কষ্ট দাও। আরে ভাই, বোতলটা ভেঙে গেলে ছিপি জমিয়ে কোন ফল পাবে?

[বড়দাকে দেখা যায়, সঙ্গে ভ্যালিস ও ছাতা। ষাটোর্ধ্ব। সবকিছুতে প্রভুত্বের ছাপ, স্থির লক্ষ্য, সুদূর-ঘাটের জল খাওয়া মানুষ।]

অমল। আমার বড়ো ক্লান্ত লাগছে, দাদা!

রাজেন। খেলে যাও, ভালো ঘুম হবে—তুমি কি আমাকে দাদা বলে ডাকলে?

[বড়দা চারপাশ জরিপ করতে থাকে।]

অমল। ভারি আশ্চর্য—এক মুহূর্ত তোমাকে যেন বড়দার মতো লাগলো!

বড়দা। অমল, আমার কিন্তু হাতে সময় নেই।

[এরা তাস খেলে যায়, বড়দা চারপাশ লক্ষ্য করতে থাকে।]

রাজেন। সেই তারপর থেকে তোমার বড়দার আর কোনও খবর পাওনি?

অমল। পার্বতী বলেনি তোমাদের? দু-হপ্তা আগে আফ্রিকা থেকে চিঠি এসেছে—বড়দা...মারা গেছে।

রাজেন। তাই নাকি?

বড়দা। এই তাহলে তোমাদিগের কলিকাতার উপকণ্ঠ সন্তোষপুর?
রাজেন। তুমি কি ওদিক থেকে কোনও টাকা-কড়ি পাবে?
অমল। না-না, বড়দার সাত ছেলে। আমায় একটাই সুযোগ দিয়েছিলো ঐ মানুষটা—মাত্র একবার।
বড়দা। তোমরা সব কেমন আছো?
অমল। (জিতে তাসের পিট টেনে নেয়) ভালো—খুব ভালো।
রাজেন। (তাস দিতে থাকে) আজ যে খুব তাস পাচ্ছো!
বড়দা। আমাদের মা কি এখনও তোমার সঙ্গেই—
অমল। না, মা-তো অনেকদিন মারা গেছে...
রাজেন। কে?
বড়দা। আহা! ভেবেছিলাম বুড়ি-মাকে দেখবো একবার...
রাজেন। (ভড়কে গিয়ে) কে মারা গেছে—কে?
অমল। কে আবার মারা যাবে...কি আবোল-তাবোল বকছো!
বড়দা। আমায় কিন্তু মিড-নাইট ফ্লাইট ধরতে হবে—
অমল। এক মিনিট (নিজের ধন্দ কাটনোর জন্য) এই—এই...এটা আমার পিট।
রাজেন। আরে, আমি যে টেক্কা মারলাম—
অমল। খেলা বন্ধ—তুমি জোচ্চুরি করবে আর আমি বসে বসে...
বড়দা। তাহলে মা গত হয়েছেন কতোদিন হলো?
অমল। অনেকদিন...
রাজেন। তোমার লজ্জা পাওয়া উচিত—আমি কোনওদিন—
অমল। অনেকদিন! অনেকদিন ধরেই...তুমি তাসের 'ত' বোঝো না।
রাজেন। ঠিক আছে—এরপর আমি পাঁচটা টেক্কা-ওয়ালা তাস নিয়ে আসবো। (বেরিয়ে যায়)
অমল। আহাম্মক!
বড়দা। (কাছে এসে)..... তুমিও তো তাই।
অমল। (বড়দার হাত ধরে) বড়দা! তোমার অপেক্ষায় কতোদিন বসে আছি। এইবার বলো—বলো আমায়, কেমন করে করলে এতোসব।
বড়দা। ওঃ সে-তো এক মহাভারত রে...
পার্বতী। (ঢোকে—আগের মতো, হাতে কাপড়ের বালতি) আপনি—আপনি বড়দা না?
বড়দা। (কেতায়) কেমন আছো, বৌমা?
পার্বতী। কোথায় ছিলেন এতোদিন? আপনার ভাই তো সবসময় শুধু আপনার কথা...
অমল। (অধৈর্যে বড়দাকে টেনে নিয়ে) শুরুটা কেমন করে করলে তুমি, বড়দা?
বড়দা। আমি তো জানি না তোমার কি কতোটা মনে আছে...
অমল। তোমার চলে যাওয়ার দিনটা শুধু মনে আছে—ভোরবেলায়...আমার

তখন সাত পূর্ণ হয়নি...

বড়দা। ছ'বছর এগারো মাস সতেরো দিন...

অমল। এ্যাতো নিখুঁত মনে আছে তোমার!

বড়দা। তেইশ-টা কারবার আছে—সব হিসেব এইখানে থাকে, খাতায় নয়....হ্যাঁ, সেদিন ভোরবেলায় তোমার হাতে একগোছা ফুল দিয়েছিলাম....নিশ্চয়ই মনে নেই...

অমল। মনে আছে...তারপর তুমি খুব উঁচু চড়াই-এর রাস্তা ধরে উঠে গেলে...তারপর হঠাৎ কেমন মিলিয়ে গেলে... সেই তোমার সঙ্গে আমার শেষ দেখা। বাবাকে খুঁজে পেয়েছিলে?

বড়দা। হ্যাঁ, বাবাকে খুঁজতে গিয়ে হারিয়ে গেলাম— পেলাম কই। তখন ভূগোলের জ্ঞান ভালো ছিল না—চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা যাচ্ছিলাম—হঠাৎ দেখি পৌঁছে গেছি বার্মার জঙ্গলে—সেখান তাল-তাল সোনার মুখোমুখি—মুঠো-মুঠো হীরের মুখোমুখি—

অমল। দাঁড়াও, দাঁড়াও বড়দা—একমিনিট—বাবু...(বাবু এবং খুশি, এখন ছোট, ভেতরে ঢোকে) এই...এই হচ্ছে তোদের বড়োজ্যাঠা—বলো, বড়দা, বলো ওদের তোমার কথা...বাবার কথা...ওরা শুনুক, জানুক—পূর্বপুরুষদের কোন রক্ত বইছে ওদের ধমনীতে...

বড়দা। (ঘড়ি দেখে) আমার যে আর সময় নেই—

অমল। না না—একটু বসে যাও, শুনুক ওরা—**(চড়া উদ্দাম বাজনা)**

বড়দা। শোনো হে খোকারা—এই যে তোমাদের বাবা, তারও একজন বাবা ছিলেন—উদ্দাম প্রকৃতির মানুষ। তিনি যেমন বাঁশি বাজাতেন, তেমনি বাজাতে পারতেন নানান রকমের যন্ত্রপাতি, কতো কিছু তার ইয়াত্তা নেই। আর এসবের সঙ্গেই তাঁর ছিলো পাহাড়-নদী-সমুদ্র পেরিয়ে পৃথিবীটা দেখার নেশা...

অমল। লম্বা-চওড়া বিশাল বড়ো একটা গাছের মতো...তারই মধ্যে শান্ত দু'টি চোখ...

বড়দা। হ্যাঁ, আশ্চর্য মানুষ...

অমল। এবার তোমার কথা বলো—

বড়দা। সে তুলনায় আমি কিছুই করিনি—একবার শুধু সতেরো বছর বয়সে জঙ্গলের ভেতর ঢুকে পড়েছিলাম...আর একুশ বছর বয়সে যখন সেই অন্ধকারের থেকে বেরিয়ে এলাম—তখন ঈশ্বরের কৃপায় আমি সত্যি সত্যি বড়লোক—ব্যস্!

অমল। কি বলেছিলাম তোদের—একটু সাহস করলে আকাশটাও হাতের মুঠোয় ধরা যায়! আমি দাদা ওদেরকে সেইরকম ডানপিটে দুরন্ত হতে বলি—বলি সবার পছন্দসই হতে...

বড়দা। এই যে খোকাবাবু—শোনো দেখি এদিকে...কাছে এসো—এইবারে মারো এখানে (নিজের পেটটা দেখিয়ে)...জোরে...যত জোরে পারো...

বাবু। না-না, তা হয় না...

খুশি। চালা না, দাদা—বাঁদিক থেকে একটা লেফ্‌ট জ্যাব—

অমল। চালা না—দেখিয়ে দে বড়দাকে...

পার্বতী। কেন? ও মারামারি করবে কেন?

বাবু। ঠিক আছে...(ঘুঁষি পাকিয়ে শুরু করে)

বড়দা। (মহড়া নিতে নিতে) বা-বা-বাঃ...বা বা...

পার্বতী। এ-কি! তোমরা মারামারি করছো কেন?

বড়দা। বাঃ! এ-তো বেশ বাহাদুর ছোকরা! উম্‌ ওয়ান-টু-থ্রি—যাঃ ফিনিশ!

[মুহূর্তে বাবু মাটিতে, বড়দার ছাতার তীক্ষ্ণপ্রান্ত বাবুর দু'চোখের মাঝখানে]

পার্বতী। না—বাবু!

বাবু। মা-কালি!

বড়দা। (বাবুর হাঁটু চাপড়ে) শোনো হে খোকা! একটা কথা মনে রেখো—অজ্ঞাত-কুলশীলের সঙ্গে কখনও সোজা লড়তে নেই! তাহলে জঙ্গলেই ঘুরপাক খেতে হবে, বেরোতে পারবে না কোনওদিন! (পার্বতীকে কায়দা করে) তোমার সঙ্গে আলাপ হয়ে খুব ভালো লাগলো, বৌমা।

পার্বতী। (একই সঙ্গে ঠাণ্ডা ও ভীত) আপনি তো যাবেন—সাবধানে যাবেন!

বড়দা। তোমার কাজকর্ম...কি করো যেন তুমি?

অমল। বিক্রি...সেল্‌স্‌ম্যান।

বড়দা। ও হ্যাঁ...বেশ...(বিদায়ের ভঙ্গিতে হাত তোলে)

অমল। আর একটু দাঁড়াও বড়দা... তুমি দেখে যাও, ওরা সব কতো কিছু কাজ শিখেছে (বাচ্চাদের) এই যা তো—ঐ ফ্ল্যাট বাড়িগুলো হচ্ছে—ওখান থেকে খানিকটা বালি সিমেন্ট নিয়ে আয় তো... তুমি দ্যাখো, বড়দা!

বাবু। ইয়েস স্যার! খুশি, ডাবল মার্চ! (দু'জনে দৌড়ে চলে যায়)

অমল। ঐ সামনের রাস্তা থেকে একেবারে গেট পর্যন্ত একটা চওড়া ঢাল বানাচ্ছি... (রাজেন দৌড়ে ঢোকে)

রাজেন। শোনো, ঐ অ্যাপার্টমেন্ট হাউস থেকে যদি আবার চুরি করে ওরা—ওদের চৌকিদার কিন্তু পুলিশ ডাকবে বলেছে...

পার্বতী। (অমলকে) শোনো... লক্ষ্মীটি—তুমি ওদের বারণ করো—(বড়দা মজা পেয়ে হাসে)

অমল। জানো বড়দা, গত সপ্তাহে ওরা অন্তত একডজন দামী কাঠ নিয়ে এসেছিলো—

রাজেন। শোনো, যদি ঐ চৌকিদার...

অমল। আমি অবশ্য প্রচণ্ড বকেছি ওদের—তবুও যা তৈরি হচ্ছে না...একজোড়া হিম্মৎওয়ালা ছেলে।

রাজেন। অমলকান্তি, জেলখানাগুলোতেও কিন্তু ঐরকম হিম্মৎদার ছেলে গিজ-গিজ করছে!

বড়দা। (অমলের কাঁধে চড় মেরে হাসতে হাসতে রাজেনকে) আর এই শহরের শোয়ার মার্কেটগুলোতেও—তাই না?

রাহুল। (দৌড়ে ঢোকে) ঐ চৌকিদার বাবুকে তাড়া করেছে!

পার্বতী। ও কোথায়?...বাবু, বাবু! (বেরিয়ে যায়)

অমল। সবাই এমন করছো তোমরা...ও-কি কিছু চুরি করেছে নাকি!

রাজেন। তোমার মাথাটা একেবারে গেছে, অমল! এই ভাবে চললে...আমি পরে আসবো! (রাজেন, পেছন-পেছন রাহুল, চলে যায়)

বড়দা। অমলকান্তি, আমি এবার যাই—আমায় কাল সকালেই অরুণাচল পৌঁছতে হবে—

অমল। আর দু'টো দিন থেকে যাও না, বড়দা...তোমাকে যে আমার বড্ড দরকার...কি করে বোঝাবো...বাবা ছেলেবেলায় হারিয়ে গেলো—তুমিও তাই—তারপর থেকে এই বয়স অব্দি যা করেছি...সব একা একা.... বড্ড ভয় করে, বড়দা...ব্যবসা মন্দা... ছেলেদুটোর কি হবে জানি না...বুঝতে পারি না, ঠিক করছি না ভুল করছি... সেইজন্য খুব একা-একা লাগে...নিজেকে কেমন যেন অনাথ মনে হয় আমার...

বড়দা। অমল, আমার ফ্লাইট মিস হয়ে যাবে—

অমল। অন্তত একটা কথা বলে যাও—বাবু, খুশি—কেমন দেখলে ওদের?—ওরা পারবে?

বড়দা। নিশ্চয়ই পারবে—আলবৎ পারবে—দারুণ দারুণ তৈরি করেছো ওদের—খাঁটি মরদ! বাঘের বাচ্চা...

[দু'জনে এখন মঞ্চের দুই-প্রান্তে]

অমল। সত্যি! তুমি আমায় বাঁচালে...মাঝে-মধ্যেই থেকে থেকে সবকিছু গণ্ডগোল পাকিয়ে যায়—ভয় হয়। ঠিকমতো মানুষ করতে পারছি তো? বড়দা—ওদের কি-ভাবে মানুষ করবো...কিছু একটা পথ অন্তত বাতলে যাও!

বড়দা। (উদ্ধত, প্রতিটি কথা কেটে কেটে) অমল, তখন আমার বয়স সতেরো—আমি একটা গভীর জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়েছিলাম—আর যখন সেই অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এলাম, আমার বয়স একুশ।—ঈশ্বরের কৃপায় এখন আমি সত্যি সত্যি বড়লোক...(অন্ধকারে হারিয়ে যায়)।

অমল। দাদা—দাদাগো, আমি সেই শিক্ষাই ওদের দিতে চাই ...আমি ওদের বলেছি, ঢুকে পড় জঙ্গলে...তোরা জঙ্গলে ঢুকে পড়...আমি ঠিক করেছি—ঠিক করেছি আমি...

[বড়দা চলে গেছে, তবু তারই উদ্দেশে অমল কথা বলে। ইতিমধ্যে পার্বতী ভেতরে আসে। অমলের খোঁজে এধার ওধার তাকায়, অবশেষে খুঁজে পায় এবং তার উদ্দেশে বলে]

পার্বতী। কিগো কি হয়েছে তোমার?... বলো, কি হয়েছে?

অমল। আমি ঠিকই করেছিলাম, পার্বতী...একেবারে ঠিক...

পার্বতী। দুধটা খেয়েছো তুমি? (অমল উত্তর দিতে পারে না) রাত অনেক হলো—লক্ষ্মীটি, এবার চলো, শুতে চলো তুমি...

অমল। (আকাশের দিকে তাকিয়ে) এখানে একটা তারা দেখতে হলে ঘাড় মটকে যায়..

পার্বতী। চলো—শুতে যাবে না?

অমল। আচ্ছা, পার্বতী, দাদা যে একবার আফ্রিকা থেকে একটা হীরে-বসানো চেন এনে দিয়েছিলো আমাকে...

পার্বতী। সেটা তো আমরা বন্ধক দিয়েছি বারো তেরো বছর আগে—

অমল। কেন? বন্ধক দিলাম কেন?

পার্বতী। বাবু-কে কম্পিউটার কোর্স পড়াবার জন্য—

অমল। ও...আচ্ছা...তুমি শুয়ে পড়ো। আমি একটু পায়চারি করে আসি...

পার্বতী। এখন! এই এতো রাতে—কোথায় যাবে তুমি?

অমল। (বেরোতে থাকে) আমি ঠিক করেছিলাম। আমি ভুল করিনি...ঐ একখানা মানুষ বটে—ওর সঙ্গে কথা বললে...না না না—আমি কোনও ভুল করিনি...

পার্বতী। শোনো—এখন অনেক রাত...এতো রাতে বাইরে যেও না তুমি শোনো...

[অমল বেরিয়ে যাচ্ছে—এই সময় বাবু, পরনে পাজামা, ভেতরে আসে।]

বাবু। কি করতে গেলো এখন ঐ বাইরে?

পার্বতী। শ্ শ্ শ্!

বাবু। ওঃ ভগবান! কবে থেকে এই কাণ্ড শুরু হয়েছে, মা'ণি?

পার্বতী। চুপ কর শুনতে পাবে।

বাবু। পাগল হয়ে গেলো নাকি লোকটা?

পার্বতী। সকাল হলেই ঠিক হয়ে যাবে।

বাবু। আমাদের তো কিছু একটা করা উচিত!

পার্বতী। হ্যাঁ বাবা, কিছু একটা তোমার করা উচিত—কিন্তু কিছুই করার নেই—কাজেই ঘুমোতে যাও। (খুশি নেমে এসেছে—সে সিঁড়িতে বসে)

খুশি। আগে তো কোনওদিন এতো জোরে কথা বলতে শুনিনি!

পার্বতী। আর একটু নিয়মিত এ-বাড়িতে এসো—ঠিকই শুনতে পাবে।

[চেয়ারে বসে অমলের কোটের লাইনিং রিপু করে]

বাবু। তুমি চিঠি লিখে আমায় জানাও নি কেন, মা'ণি?

পার্বতী। গত তিনমাস তোমার যে কোনও ঠিকানা ছিল না বাবা!

বাবু। গত তিনমাস আমি...আমি...কিন্তু তোমার কথা যে আমি সবসময় ভাবি—সেটা তুমি জানো না। বন্ধু!

পার্বতী। জানি বন্ধু, জানি—কিন্তু ঐ মানুষটাও তো একটা চিরকুট আশা করে...

বাবু। আজকাল কি... সবসময় এরকম করে?

পার্বতী। তুই বাড়ি ফিরলেই—

বাবু। আমি বাড়ি ফিরলেই—

পার্বতী। তুই আসছিস শুনলে মানুষটা যেন খুশিতে ছটফট করে...তারপর যত দিন এগিয়ে আসে, কেমন কুঁকড়ে যায়, গুটিয়ে যায়...তারপর তুই এলেই, মুখোমুখি হলেই, কি হয় আমি জানি না—শুধু চিৎকার-চেঁচামেচি তর্ক আর ঝগড়া, মনে হয় তোরা যেন দু'জনে দু'জনকে ঘেন্না করিস... কেন, আমায় বলতো, কেন এমন করিস...

বাবু। (এড়িয়ে গিয়ে) আমি ঘেন্না করি না, মা'ণি।

পার্বতী। তবুও চৌকাঠে পা দিতে না দিতেই শুরু হয়ে যায় তোদের ঝগড়া—কেন?

বাবু। আমি জানি না কেন! আমি চেষ্টা তো করছি...কতো জায়গায় পাত্তা লাগাচ্ছি—

পার্বতী। ও বাবু, শুধু পাত্তা লাগিয়ে কি সারাটা জীবন কাটে?

বাবু। হাতের মুঠো থেকে কেমন পিছলে যাচ্ছে!—তোমার চুল...(মায়ের চুলে হাত দেয়) তোমার চুল কতো সাদা হয়ে গেছে!

পার্বতী। মাঝে কলপ দিতাম...আর কতোদিন ঢেকে রাখবো! সময় তো হলো, এবার বুঝে নাও—নয়তো একদিন 'মা-মা' বলে কড়া নাড়ছো—দেখবে কোনও অপরিচিত লোক দরজা খুলে দিচ্ছে।

বাবু। কি যা-তা বলছো, মা'ণি—এই সেদিন তোমার পঞ্চাশ পেরোলো—

পার্বতী। আর তোদের বাবা?

বাবু? (নিস্প্রাণ) হ্যাঁ, আমি বাবার কথাও বলছি—

পার্বতী। না, শুধু আমার জন্য এখানে এসো না। আমি ওকে ভালোবাসি। (ভয় দেখিয়ে— সে ভয়ের জোর শুধু চোখের জলে) ঐ মানুষটা এই পৃথিবীতে আমার কাছে সবচেয়ে দামী। কেউ যদি তাকে... ছোট করে, নিচু করে, অপমান করে— জেনে রাখো, তার সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক থাকতে পারে না। হয় তাকে বাবার প্রাপ্য সম্মান দেবে, নয়তো আর তুমি এ বাড়িতে আসবে না! আমি জানি, মানুষটার সঙ্গে বাস করা শক্ত—আমার চেয়ে বেশি কেউ সেকথা জানে না...কিন্তু—

অমল। (বাইরে থেকে এসে) হে হে বাবু রে...

বাবু। (বাবার মুখোমুখি হবার উদ্দেশ্যে উঠে দাঁড়ায়) কি পাগলামি করছে লোকটা—(খুশি ওকে থামায়)

পার্বতী। যাস না, তুই যাস না ওর কাছে!

বাবু। বাবার হয়ে সাফাই গাওয়াটা বন্ধ করবে! চিরটাকাল তোমায় যাঁতায় পিষেছে—একরত্তি সম্মান দিয়েছে কোনওদিন?

খুশি। বাবা মা-কে কোনওদিন অসম্মান করেনি—

বাবু। থাম তুই! কতটুকু জানিস এ-সবের?

খুশি। (দুর্বল) তাই বলে বাবাকে পাগল-ছাগল বলবি তুই?

বাবু। কোনও চরিত্র নেই লোকটার! বউ-ছেলের সামনে ভেতরের নোংরা

বমি করে উগরে দিচ্ছে! রাজেনকাকু কখনও এরকম করতো?

পার্বতী। তাহলে এবার থেকে ঐ রাজেনকাকুকেই বাবার সম্মানটা দিস! তাতো পারবি না—কিরে, পারবি? আমি বলিনি মানুষটা মহৎ...অমলকান্তি চৌধুরী অনেক টাকা কামায়নি...প্রাতঃস্মরণীয় মানুষ সে নয়! কিন্তু সেও একটা মানুষ!—মানুষের সম্মান তাকে দিতে হবে!— বে-ওয়ারিশ কুকুর সে নয় যে মরে গেলে তাকে খালের জলে ভাসিয়ে দিয়ে আসবো!—তুই...তুই ওকে পাগল বলিস!

বাবু। আমি কথাটা ও-ভাবে বলিনি—

পার্বতী। আমি জানি, অনেকেই মনে করে মানুষটার মাথার ঠিক নেই...কিন্তু কেন—সেটা তো কেউ ভাবে না!—মানুষটার দম ফুরিয়ে গেছে...নামী দামী লোকেদের মতো ছোট ছোট মানুষেরও দম ফুরিয়ে যায়! আজ ছত্রিশ বছর ধরে লোকটা এই কোম্পানিতে কাজ করছে—বিদেশ-বিভূঁয়ে জেলায় জেলায় ছুটে ছুটে মাল বিক্রি করছে, অচেনা অজানা জায়গায় কোম্পানিকে চিনিয়েছে...আর আজ এই বুড়ো বয়সে লোকটাকে ওরা মাইনেটা পর্যন্ত দেয় না...

খুশি। (অসম্মানিত) আমি তো এ সবের কিছুই জানি না, মা!

পার্বতী। তুমি তো জানতেও চাওনি, বাবা! এখন আর হাত-খরচের জন্য ওর কাছে যেতে হয় না—তাই কেমন আছে মানুষটা জানারও দরকার হয় না তোমার!

খুশি! কিন্তু আমি যে তোমায় টাকা দিলাম—

পার্বতী। হ্যাঁ, পুজোর সময়—ন'শো টাকা—নিজে রোজগার করো...জানো না সে কটা টাকায় কতোটা কি হয়! গত আড়াই মাস ধরে লোকটা মাইনে ছাড়া উঠতি সেল্সম্যানদের মতো শুধু কমিশনের ভরসায় কাজ করে যাচ্ছে।

বাবু! নেমকহারাম—শুয়োরের বাচ্চা!

পার্বতী। ওরা-কি সব তার ছেলেদের চাইতেও বেইমান? যখন বয়স অল্প ছিলো—নানান কোম্পানিতে কতো বন্ধু ছিলো—এক-একটা জেলা থেকেই কতো অর্ডার পেয়ে যেতো—তখন কোম্পানিতে ওর কতো খাতির ছিলো! এখন সেইসব বন্ধুরা মারা গেছে, নয়তো রিটায়ার করেছে—এখন হাঁপাতে হাঁপাতে এক গাল হেসে গিয়ে যখন দাঁড়ায়, জবাবে একটা লোক হাসে না পর্যন্ত...আগে গাদা গাদা মাল বিক্রি করতো—এখন স্যাম্পেলের বাক্সগুলো বয়ে বয়ে নিয়ে যায়, খুলে দেখায়, বন্ধ করে, আবার বয়ে বয়ে ফিরিয়ে আনে...আগে দৌড়ে বেড়াতো, এখন—কথা বলে। দিনের পর দিন যখন এক টুকরো মাল বেচতে পারে না, মাথার মধ্যে কি হয় মানুষটার? কেন কথা বলবে না লোকটা নিজের সঙ্গে? মাস গেলে লুকিয়ে লুকিয়ে রাজেন ঠাকুরপোর কাছ থেকে ধার করে এনে তিনহাজার টাকা আমার হাতে তুলে দিয়ে ভাব দেখায় এই ওর মাস-মাইনে! কতোদিন এভাবে

চালাতে পারে একটা মানুষ? কতো দিন? আর তুই বলিস লোকটার চরিত্র নেই। সেই মানুষটা যে জীবনে তোদের বই জানেনি—তাকে তোরা পাগল বলিস? তেষট্টি বছর বয়সে একটু সাহায্যের জন্য লোকটা এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে—কি দেখছে তখন?—এক সন্তান মেয়েদের নিয়ে ফূর্তি মারছে—

খুশি। মা'ণি।

পার্বতী। তাই, তাই তুমি সোনা! (বাবুকে) আর তুই—তুই-যে ওর বন্ধু ছিলি! প্রত্যেকবার ট্যুর থেকে ফিরে তোর মুখখানা একবার না দেখলে ও-যে কিছুতেই শান্ত হতো না—

বাবু। ঠিক আছে মা'ণি, আমি আমার ঘরে থাকবো, যা হোক কিছু জুটিয়ে নেবো, বাবার থেকে দূরে দূরে থাকবো—ব্যস?

পার্বতী। না। এখানে থাকবে আর সর্বক্ষণ দু'জনে লড়াই করবে—তা হবে না!

বাবু। মা'ণি! তুমি ভুলে যাচ্ছো—বাবা-ই কিন্তু এ-বাড়ি থেকে আমায় তাড়িয়ে দিয়েছিলো!

পার্বতী। বাবু! আমি আজও বুঝে পাই না তোর বাবা কেন এমন একটা কাণ্ড করে বসলো!

বাবু। ছেড়ে দাও না, মা'ণি—শুধু দোহাই তোমার, সব দোষ আমার ঘাড়ে চাপিও না! পুরো ব্যাপারটা আমার আর বাবার মধ্যে—আর আমি কিছু বলবো না। এখানে থেকেই কিছু একটা আমি করবো—রোজগারের অর্ধেক বাবাকে দিয়ে দেবো—তাতেই সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি শুতে যাচ্ছি—(সিঁড়ির দিকে এগোয়)

পার্বতী। সব ঠিক হবে নারে—সব ঠিক হবে না...

বাবু। (ঘুরে দাঁড়িয়ে) এই শহরটাকে ঘেন্না করি, তবু আমি এখানে থাকবো—আর কি চাও তোমরা আমার কাছ থেকে?

পার্বতী। বাবু, বাবু, ও মরতে বসেছে—।

বাবু। (বাবু স্তম্ভিত, দ্রুত ওর দিকে ঘোরে। স্বল্প বিরতি) মরতে বসেছে...মানে?

পার্বতী। ও বারবার আত্মহত্যার চেষ্টা করছে।

বাবু। (প্রচন্ড আতঙ্কে) এসব কি বলছো কি তুমি?

পার্বতী। মনে আছে তোর—ফেব্রুয়ারি মাসে চিঠি লিখেছিলাম—তোর বাবা আবার অ্যাকসিডেন্ট করেছে?

বাবু। তো?

পার্বতী। ইনসিওরেন্স ইনসপেক্টর এসেছিলো আমার কাছে—সে বললো, গত বছর যতোবার এ্যাকসিডেন্ট হয়েছিলো—তার একটাও আসলে অ্যাকসিডেন্ট ছিলো না!

খুশি। মিথ্যে কথা! ওরা ইনসিওরেন্সের লোকেরা সবসময় এইসব চালাকি করে!

পার্বতী। চালাকি নয়রে, ওরা খোঁজ করেছে—ওদের সাক্ষী আছে—এক মহিলা—

বাবু। (তীক্ষ্ণ কিন্তু সংযত) কোন মহিলা?
(একই সঙ্গে) সেই মহিলা...

পার্বতী। কি বললি?

বাবু। কিছু নয়—তুমি বলো।

পার্বতী। তুই কি বললি?

বাবু। কিচ্ছু বলিনি—বলেছিলাম 'কোন মহিলা'।

খুশি। সেই মহিলা কি বলেছে?

পার্বতী। সেই মহিলা হেঁটে যাচ্ছিলো ওখান দিয়ে— সে ইনসিওরেন্সের লোকেদের বলেছে, গাড়িটা খুব আস্তে যাচ্ছিলো, স্কিড-টিড কিছুই করেনি—গাড়িটা ব্রিজে ওঠার পর তোর বাবা ইচ্ছে করে রেলিঙে ধাক্কা মারে—নীচে জল খুব কম ছিলো, তাই বেঁচে গিয়েছে।

বাবু। হয়তো গাড়ি চালাতে চালাতে ঘুমিয়ে পড়েছিলো...

পার্বতী। আমি জানি...তা নয়...

বাবু। কেন—নয় কেন?

পার্বতী। (বলা কঠিন, তবুও) গত মাসে...একদিন আলো ফিউজ হয়ে গিয়েছিলো (চোখ মুছে)...আমি একটা তার খুঁজছিলাম—ভাঁড়ার ঘরের টুল-বক্সটার পেছনে...হঠাৎ একটা সাত আট ফুট লম্বা দড়ি—একদিকে ফাঁস—গড়িয়ে পড়লো—

খুশি। ক্ষ্যাপা—বদ্ধ উন্মাদ!

বাবু। তুমি... ওটা সরিয়ে ফেলেছো?

পার্বতী। আমার যে লজ্জা করে! কোন মুখে কথাটা বলবো তোর বাবাকে? প্রত্যেকদিন সকালে ওটা সরিয়ে ফেলি— তোর বাবা ফিরলেই তাড়াতাড়ি আবার ওটা রেখে দিয়ে আসি... তোর বাবা যদি জানতে পারে আমি জেনে ফেলেছি—সে যে ওর বড় অপমান হবে রে...বুঝে পাই না কি করবো!...ওরে বাবু, তোর কথা ভেবে ভেবে মানুষটা পাগল হতে বসেছে...অন্তর্যামী জানেন...ওর জীবন এখন তোর হাতের মুঠোয়—

বাবু। (পার্বতীর কপালে চুমু খায়) মা'ণি...ঠিক আছে, মা'ণি...আমি অন্যায় করেছি—পালিয়ে গেছি বারবার—আমি অন্যায় করেছি—এবার আমি এখানেই থাকবো... তোমার দিব্যি (হাঁটু গেড়ে, আত্ম তিরস্কারে)...আমি চেষ্টা করবো—

খুশি। চেষ্টা করলে তুই ঠিকই পারবি, দাদাভাই। মুস্কিল হচ্ছে, তুই যে কোনও কিছু পাত্তা দিস না।

বাবু। আমি জানি...আমি—

খুশি। সেই যে, হ্যারিস অ্যান্ড হ্যারিস-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর— তোর প্রশংসায় পাগল ছিল লোকটা—আর তুই, একদিন ওরই সামনে

লিফটে শিস্ দিতে শুরু করলি—

বাবু। তো কি হয়েছে—শিস্ দিতে আমার ভালো লাগে!

পার্বতী। ঠিক আছে—এই নিয়ে আর তর্ক বাধিও না!

খুশি। যেমন ধর—ভিজিটে বেরোনোর কথা—তুই কেটে খেলার মাঠে চলে গেলি!

বাবু। তুই নিজে ফাঁকি দিস না কাজে?

খুশি। হ্যাঁ, আট-ঘাট বেঁধে—তবে। যেখানেই বস ফোন করুক না, একটাই উত্তর পাবে, "খুশি চৌধুরী? এসেছিলো, এক্ষুণি বেরিয়ে গেলো।" কিছু মনে করিস না, দাদাভাই—ব্যবসার লাইনে সবাই ভাবে তোর মাথায় বেশ ছিট আছে!

বাবু। ব্যবসার লাইন ভাঁড়ে যাক! ওরা তো এতোবছর ধরে বাবাকে নিয়েও হাসাহাসি করেছে!

[অমল ভেতরে আসে। বিরতি। সবাই ওকে লক্ষ্য করে।]

অমল। (বাবুকে) তুই আর বড়ো হলি না, চিরকাল খোকাটি থেকে গেলি! রাহুলকে দেখেছিস কোনওদিন লিফটের ভেতরে শিস্ দিচ্ছে।

বাবু। (ঠাট্টায় সামলাবার চেষ্টা করে) না, কিন্তু তুমি তো দাও, বাপি!

অমল। আমি জীবনে কক্ষণও লিফটের ভেতর শিস্ দিইনি। আর হ্যাঁ—ঐ বেচাকেনার দুনিয়ায় কে বলে আমি ক্ষ্যাপা?

বাবু। আমি সে ভাবে বলিনি বাপি। প্লিজ!

পার্বতী। শোনো, ও এক্ষুণি বলছিলো—

অমল। ও কি বলছিলো আমি শুনেছি!

খুশি। বাপি, একটা কথা শোনো—

অমল। ওরা আমায় নিয়ে হাসাহাসি করে? যাও না একবার—ভকৎভাই স্টোর্স, ঘোষ ব্রাদার্স, সূরযমল এম্পোরিয়াম, স্টুয়ার্ট অ্যাণ্ড ম্যাকলিয়ড—এক শিলিগুড়ি শহরেই শুধু নামটা উচ্চারণ কোরো—অমলকান্তি চৌধুরী—দেখবে ভেল্কি-বাজিটা!

বাবু। ঠিক আছে, বাপি!

অমল। বোনেদী খাতির রে, বোনেদী খাতির...

বাবু। ঠিক আছে!

অমল। তুই—আমায় সবসময় অপমান করিস কেন?

বাবু। আমি কখন তোমাকে...(মা-কে) মা, আমি কোনও কিছু বলেছি?

পার্বতী। ও কিছু বলেনি...তুমি বিশ্বাস করো!

অমল। (যেতে যেতে) ভালো...বেশ...গুড নাইট!

পার্বতী। শুনছো—বাবু এক্ষুণি বলছিলো—

অমল। তোমার বড় ছেলেকে বোলো, যদি কাজকর্ম না থাকে, ওপরের ঘরের জানলা দুটো রঙ করে দিতে—

বাবু। কাল সকালে আমি—

খুশি। দাদাভাই বলছিলো কাল সকালে ও একবার পি. সি. সেনের সঙ্গে

দেখা করতে যাবে...

অমল। স্পোর্টস ইন্ডিয়ার মালিক পি. সি. সেন? ওর সঙ্গে কেন?

বাবু। (গোটানো, কিন্তু আন্তরিক চেষ্টায়) উনি একবার আমাকে বলেছিলেন, আমাকে সবরকম সাহায্য করবেন। শুনছি উনি ফিনান্স কর্পোরেশন না কি খুলেছেন—ভাবছিলাম, যদি একটা ব্যবসা-ট্যাবসা শুরু করা যায়...

পার্বতী। সে তো খুব ভালো হবে, না গো—বলো—

অমল। কথার মাঝে কথা বোলো না! (বাবুকে) কিসের ব্যবসা—খেলার সাজ-সরঞ্জাম?

বাবু। তা-ই ভাবছিলাম—ওগুলো তো আমি খানিকটা বুঝি—

অমল। বিনয় দ্যাখো ছেলের!—ওগুলো উনি খানিকটা বোঝেন! তা কতো দিচ্ছে ও তোকে?

বাবু। এখনও ভাবিনি—এখনও তো দেখাই করিনি আমি...

অমল। তাহলে এসব কি ফালতু বকছিস?

বাবু? (রাগতে শুরু করে) আমি শুধু বলেছি, ওঁর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি—আর তো কিছু বলিনি!

অমল। তা—আবার সেই গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল!

বাবু। (সিঁড়ির দিকে যেতে শুরু করে) ওঃ মা-কালি! আমি শুতে যাচ্ছি!

অমল। এ বাড়িতে বসে দিব্যি কেটো না!

বাবু। (ঘুরে) তুমি আবার কবে থেকে অতো শুদ্ধভাষী হয়ে উঠলে!

খুশি। (ওদের থামাবার চেষ্টায়) একমিনিট...একমিনিট...দাঁড়াও—।

অমল। আমার সঙ্গে ঐভাবে কথা বোলো না—

খুশি। দাদা—দাদাভাই, একমিনিট—আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে! তুই স্পোর্টস গুডসের ব্যবসাটা শুরু করার আগে আমরা কয়েকটা এগজিবিশন ক্রিকেট ম্যাচ অর্গানাইজ করবো...এখনকার বেস্ট ক্রিকেটারদের অনেকেই—অরুণলাল, সম্বরণ, হনুমন্ত, কপিল—এরা সব তো দাদার বন্ধু ছিলো—ওদের রিকোয়েস্ট করলে নিশ্চয়ই দু-তিনটে ম্যাচ খেলে দেবে—একদিকের ক্যাপ্টেন, সত্তর-এর কিশোর—কিংবদন্তী বাবুয়া চৌধুরী...অন্যদিকে তার সুযোগ্য ভাই—হোর্ডিঙে স্লোগান থাকবে "ইডেনে ক্রিকেট-লড়াই—দুই দিকে দুই ভাই"—আমাদের ব্যবসার একটা ফ্যান্টাসটিক পাবলিসিটি হয়ে যাবে। কেমন আইডিয়াটা—বল!

অমল। বাঃ বা বা—এতো একেবারে কোটি টাকার আইডিয়ারে!

বাবু। মাস খানেক ট্রেইনিং করলে এখনো দু-চারটে ছক্কা আমি মারতে পারবো!

পার্বতী। মনে হচ্ছে, আবার আমাদের সুদিন আসছে—

অমল। (পার্বতীকে) কথার মাঝখানে কথা বোলো না! (বাবুকে) শোনো, পি. সি. সেনের কাছে ঐ সব জিনস—টি-শার্ট পরে যেও না......আর

যথা-সম্ভব কম কথা বলবে—চুটকি -টুটকি...নয়!

বাবু। মিস্টার সেন আমায় খুব পছন্দ করতেন।

পার্বতী। উনি তোকে প্রচণ্ড ভালোবাসতেন, বাবু—

অমল। (পার্বতীকে) তুমি কি চুপ করবে? (বাবুকে) খুব সিরিয়াস মুখ করে ঢুকবি।

খুশি। আমিও কিছু টাকা জোগাড়ের চেষ্টা দেখছি।

অমল। (ওর কথার ওপরেই) আর মনে রাখিস, বড় চালে শুরু করলে তবেই বড় মাপে শেষ হয়। কতো চাইবি ভেবেছিস কিছু?

বাবু। মা-কালি! সেটা-তো ভাবিনি...

অমল। আঃ বাবু! কথায় কথায় বাচ্চাদের মতো মা-কালি মা-কালি! তিন-চার লাখ টাকা চাইতে গিয়ে কেউ মা-কালি বলে না!

বাবু। আমার মনে হচ্ছে লাখ দুই-ই যথেষ্ট—

অমল। ওরে, নজর ছোট করিস না! তুই বরাবরই অল্পে তুষ্ট! এক গাল হাসি নিয়ে ঢুকবি...দু'একটা চুটকি— গল্প বলতে পারিস—পরিবেশটা সহজ হবে। আসল কথা—ব্যক্তিত্ব...

পার্বতী। দেখো, সব ঠিক হয়ে যাবে...বাবুকে ঐ সেনসাহেব খুব আদর দিতেন—

অমল। তুমি কি আমায় বলতে দেবে!

বাবু। মা-কে তুমি কেন ধমকাচ্ছো, বাবা? কেন?

অমল। (রেগে) কথাটা আমি বলেছিলাম—নাকি?

বাবু। সর্বক্ষণ তুমি মায়ের ওপর চোপা করো—আমার ভালো লাগে না—বলে দিলাম!

অমল। কার ছাতের তলায় দাঁড়িয়ে কথা বলছিস তুই—এ্যাঁ?

পার্বতী। শোনো, লক্ষ্মীটি—একটা ছোট কথাকে কেন তুমি—

অমল। চোপ্! কথা কোয়ো না একদম! লাই দিয়ে দিয়ে সব মাথায় তুলেছে ছেলেদের—নির্বোধ মেয়েছেলে একটা...

বাবু। না! মাকে ধমকাবে না তুমি!

অমল। (হঠাৎ ঢিলে—পরাজিত, অনুতপ্ত) পি. সি. সেনকে আমার নমস্কার জানিও—হয়তো এখনও মনে আছে আমাকে...(বেরিয়ে যায়)

পার্বতী। (চাপা গলায়) আবার ফাটাফাটি করার এতোই দরকার ছিলো! একটু আশার কথা শুনলে কতো খুশি হয় মানুষটা—স্বচক্ষে দেখলি তো! যা—শুতে যাবার আগে অন্তত 'শুতে যাচ্ছি' কথাটা বাবাকে বলে আয়—নইলে সারারাত লোকটা ছটফট করবে, ঘুমোতে পারবে না! যা বাবা...

খুশি। দাদা, একটু কথা বলে আসি চল—ভালো লাগবে...

পার্বতী। লক্ষ্মী বাবা আমার—শুধু বলে আয় শুতে যাচ্ছিস...কতো অল্পে খুশি হয় লোকটা—যা বাবা, যা...(দরজার দিকে এগিয়ে যায়) তোমার পাজামা ব্র্যাকেটে ঝোলানো আছে—শুনছো! (বেরিয়ে যায়)

খুশি। আশ্চর্য মহিলা! মা-কে বানানোর পরেই ওদের ছাঁচটা নিশ্চয়ই ভেঙে গিয়েছিলো—নারে দাদাভাই!

বাবু। মাইনে বন্ধ করে শুধু কমিশন দিয়ে কাজ করাচ্ছে!

খুশি। দ্যাখ—সত্যিটা মেনে নেওয়াই ভালো—বাবা কোনওদিনই কিছু একটা হট্-শট্ সেল্সম্যান ছিলো না। তবে হ্যাঁ—মানুষটা ভালো!

বাবু। মা'র সব চুল পেকে গ্যালো! মা-কালি! কাল পি. সি. সেনকে নিশ্চয়ই পেড়ে ফেলবো! শোন খুশি, আমায় কিছু টাকা ধার দিতে পারিস? পোশাক-আশাকগুলো সব ধোতরা হয়ে গেছে!

খুশি। নো প্রবলেম। তোকে একটা ভালো জায়গায় নিয়ে যাবো—দারুণ স্টক। আর কাল সকালের জন্য আমার একটা সেট তোলা আছে—তোর ফিট হয়ে যাবে...চ', দাদাভাই, একবার বাবার কাছে যাই—নইলে মা আবার...

বাবু। লাখ দুয়েক পেয়ে গেলে, ভাইয়া—এবার আমি একটা খেল দেখিয়ে দেবো!

খুশি। এই তো—এই তো সেই স্ট্রেট ব্যাটে ছক্কা মারার আগের মুহূর্তের মুখটা বেরিয়ে আসছে—জিও জিও মহারাজ...(ওদের কথা হারিয়ে যাচ্ছে) লাথ মারো দুনিয়াকো—দুনিয়া তুমহারি হ্যায়...

[পার্বতীকে দেখা যাচ্ছে। বাথরুমে অদৃশ্য অমলের উদ্দেশে]

পার্বতী। কলের ওয়াশারটা বোধহয় আবার গেছে—সারাদিন টপ-টপ করে জল পড়ে যাচ্ছে...কিছু একটা করতে পারো—

অমল। (ভেতর থেকে) দু'দিন অন্তর নতুন জিনিস নিয়ে আসছি, দু'দিনের মধ্যেই সব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে! সব একেবারে আছড়ে পড়েছে একসঙ্গে...

পার্বতী। তোমার কি মনে হয়, ঐ সেনসাহেব আমাদের বাবুকে চিনতে পারবে?

অমল। (পরনে পাজামা, ভেতরে আসে) চিনতে পারবে না! তোমার কি হয়েছে—মাথাটা গেছে? বাবু স্পোর্ট্স-ইন্ডিয়ায় থেকে গেলে মিস্টার সেন এতোদিনে ওকে পার্টনার করে নিতো! দাঁড়াও না—একবার দেখাটা হোক দু'জনের....আজকালকার ছেলেদের এলেম তুমি জানো না—সব জিরো ক্যালিবার—আর আমাদের...

[বাবু ও খুশি ভেতরে আসে। সামান্য নিস্তব্ধতা]

অমল। (কথা থেমে যায়) শুনে খুব ভালো লাগলো!

খুশি। দাদাভাই তোমাকে গুড-নাইট করতে এসেছে...বস্!

অমল। তুই কিছু বলবি আমায়?

বাবু। বিশ্রাম করো বাপি—আমি শুতে যাচ্ছি।

অমল। (লোভ সামলানো যায় না) ও হ্যাঁ—কথা বলছিস, তো ধর—টেবল থেকে কিছু পড়ে গেলো—একটা খাম বা কোনও প্যাকেট—তুই কিন্তু সেটা তুলবি না—ওসবের জন্য ওদের অফিস-বয় আছে—

পার্বতী। কাল সকালে তাড়াতাড়ি উঠিস—আমি যা-হোক কিছু ভাতে-ভাত করে দেবো, একটু মুখে দিয়ে যাস। পেটে ভাতটা থাকলে শরীরটা—

অমল। তুমি কি আমাকে শেষ করতে দেবে? (বাবুকে) ওঁকে বলিস, তুই কাঠমাণ্ডুতে হোটেলের ব্যবসা করছিস...ঐ ট্যুরিস্ট গাইড টাইড না।

খুশি। তোমাকে একটা কথা বলবো মা'ণি—আমি কিন্তু এবার বিয়ে করবো।

পার্বতী। যাঃ ঘুমিয়ে পড় বাবা! (খুশি চলে যায়)

অমল। মনে আছে—সেই মোহনবাগান মাঠে জুনিয়র বেঙ্গল ট্রায়াল ম্যাচ...

পার্বতী। ঘুমিয়ে পড়ো এবার...

অমল। একটা গান করো না, ছুটকী! (**পার্বতী গুন-গুন শুরু করে**) ওদের টিম যখন মাঠে নামলো...আমাদের বাবু—যেন সবার মাথা ছাড়িয়ে—মনে আছে?

পার্বতী। মনে আছে—ধবধবে সাদা পোশাকে... যেন সাদা আগুনের শিখা...

[পেছনে আলো-আঁধারিতে **বাবুকে দেখা যায়। হাতে সিগারেট, একটা নির্দিষ্ট কোণে দাঁড়ায়—ওকে ঘিরে দুধ-সাদা আলোর বৃত্ত। সিগারেটে টান দিতে দিতে রাতের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকে।**]

অমল। যেন এক কিশোর দেবতা—সূর্যের সব আলো যেন ওরই গায়ে ঝরে পড়ছে! মনে আছে, মাঠের মাঝখান থেকে হঠাৎ আমার দিকে হাত নাড়লো...এদিকে আই.আই.টি, যাদবপুর ইউনিভার্সিটির খেলাধুলোর কর্তা-ব্যক্তিরা—আর আমি যাদের নেমন্তন্ন করেছিলাম—বড়ো-বড়ো কোম্পানির সব পারচেজ ম্যানেজার, সেল্স ম্যানেজারের দল—সবাই দেখছে... আমাকে আমার সন্তানকে...আর তারই সঙ্গে কয়েক হাজার ছেলেমেয়ের আকাশ ফাটানো চিৎকার ক্যাপ্টেন বাবুয়া...ক্যাপ্টেন বাবুয়া...পার্বতী, পার্বতী ও ছেলে আমার আকাশটাকে হাতের মুঠোয় ধরে ফেলবে.... ধুলো আর ধোঁয়া কি ঐ উজ্জ্বল নক্ষত্রকে ঢেকে দিতে পারে?

পার্বতী। (ভীরু গলায়) আমায় একটা কথা বলবে তুমি, লক্ষ্মীটি... তোমায় নিয়ে ওর কিসের এতো জ্বালা!

অমল। আর কথা বোলো না—আমি বড়ো ক্লান্ত!

পার্বতী। তুমি কি কলকাতায় বদলি করার জন্য শরদিন্দুকে বলবে?

অমল। কাল সকালে প্রথম কাজ—এবার সব ঠিক হয়ে যাবে...

[**বাবু হিটারের পেছনের তলা থেকে একটা ফাঁস-লাগানো দড়ি বার করে আনে। সে আতঙ্কিত—মুখ ঘুরিয়ে অমলের দিকে তাকায়—সেখান থেকে ভেসে আসছে পার্বতীর একঘেয়ে আর্ত-চিৎকারের মতো সুরের উচ্ছ্বাস।**]

অমল। (চাঁদের আলো দেখতে দেখতে) মা-কালি! দ্যাখো—পার্বতী ফ্ল্যাট বাড়িগুলোর ফাঁক দিয়ে চাঁদটা কেমন লুকোচুরি খেলছে!

[**বাবু হাতের মধ্যে রবারের টিউবটাকে গোল করে জড়িয়ে নেয় এবং দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে উঠে যায়।**]

।।পর্দা।।

দ্বিতীয় অঙ্ক

[আবহ উত্তাল উজ্জ্বল, খাদে নামে। অমলকান্তি, পরনে শার্ট, টেবিলে বসে আছে, হাতে কাপ।]

অমল। দারুণ—এই কমপ্লান...দু'কাপ খেলেই পেট ভর্তি!

পার্বতী। একটু ডিম করে দেবো?

অমল। না—না, তুমি দম নাও একটু।

পার্বতী। আজ তোমাকে অনেকটা ভালো লাগছে।

অমল। কতো মাস পরে দশটা পর্যন্ত একেবারে মড়ার মতো ঘুমিয়েছি! তোমার ছেলেরা ঠিকঠাক বেরিয়েছে?

পার্বতী। আটটার মধ্যে! দু'ভাই একসঙ্গে বেরোচ্ছে—এতো ভাল লাগছিলো বাবুকে—মনে হচ্ছিলো নতুন মানুষ! ঐ পি. সি. সেনের সঙ্গে দেখা করার জন্য যেন তর সইছিলো না বাবুর!

অমল। কেউ কেউ থাকে—চটপট দাঁড়াতে পারে না। কি পরে গেলো?

পার্বতী। ওর সেই নীল স্যুট-টা! ওটা পরে মনে হয় অনেক বড়ো কিছু করে ফেলতে পারে।

[অমলকান্তি টেব্‌ল্ ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। পার্বতী কোটটা মেলে ধরে।]

অমল। মা-কালি! আজ রাতে ফেরার সময় কিছু বীজ কিনে নিয়ে আসবো!

পার্বতী। খুব ভালো—কিন্তু ওখানে তো রোদ আসে না। কিছু ফলবে কি?

অমল। তুমি দ্যাখো না, পার্বতী। খেলা শেষ হওয়ার আগেই দূরে কোথাও একটা আস্তানা বানাবো—সব্জি ফলাবো, হাঁসটা-মুর্গিটা পুষবো...

পার্বতী। নিশ্চয়ই পারবে তুমি।

[অমলকান্তি কোট ছেড়ে এগোয়, পার্বতী সেই কোট মেলে এগোয়।]

অমল। তারপর দুই ছেলের বিয়ে হবে—ছুটিছাটায় চলে আসবে। সামনের দিকে ওদের জন্য ঘর তুলে নেবে...যন্ত্রপাতি সবই তো আছে আমার—শুধু কাঠ আর সিমেন্ট আর একটু মনের শান্তি!

পার্বতী। তোমার কোটের লাইনিং রিপু করে দিয়েছি।

অমল। কতো টাকা চাইবে বাবু বললো কিছু?

পার্বতী। মুখ ফুটে তো বলে না—দু-তিন লাখ চাইবে নিশ্চয়ই। তুমি আজ ঐ শরদিন্দুর সঙ্গে কথা বলবে তো?

অমল। নিশ্চয়ই—আজ আমি চাঁছাছোলা বলে দেবো—আর আমি ঐ জেলায় জেলায় ফিরি করে বেড়াতে পারবো না!

পার্বতী। আর শোনো, আজ কিন্তু কিছু টাকা অ্যাডভান্স চাইবে। ইনসিওরেন্সের

প্রিমিয়াম দিতে হবে। গ্রেস পিরিয়ড চলছে।

অমল। তার মানে তো—ষোলশ'...

পার্বতী। ষোলশ' ছেচল্লিশ টাকা। এদিকে আমার হাতও প্রায় খালি...

অমল। কেন—খালি কেন?

পার্বতী। গাড়ির পেছনেই তো কতো গেলো—

অমল। ঐ এক লজ্‌ঝর সেকেন্ড হ্যান্ড! মাসের মধ্যে সাতাশ দিন বসে থাকে!

পার্বতী। তারপর তোমার কালার টিভির শেষ কিস্তিটা ছিলো।

অমল। এই সেদিন তো পিকচার টিউবটা গেলো...

পার্বতী। আহা—পুরনো হয়েছে, না?

অমল। সারাটা জীবন—কোনওবার এমনটা হলো না, কিস্তি শোধ হবার পরেও মালটা ব্যবহার করা যায়!

পার্বতী। সব মিলিয়ে চার হাজার হলেই চলে যাবে। অবিশ্যি এর মধ্যে বাড়ি মর্টগেজের শেষ কিস্তিটাও ধরা আছে। বড়বাবু, এটা মিটিয়ে দিলে বাড়িটা একেবারে আমাদের হয়ে যাবে!

অমল। পুরো পঁচিশ বছর!

পার্বতী। যখন কেনা হলো, বাবুর তখন ন'বছর! কতো বড়ো একটা কাজ করলে তুমি!

অমল। কাঠ বালি সিমেন্ট কতো ঢেলেছি...আর কতো মাথার ঘাম—বাড়ির কোথাও একটা ফাটা-ফুটো পাবে না।

পার্বতী। কতো কাজে এলো...

অমল। কোন কাজে এলো! বাবুটা যদি সংসার করে এ-বাড়িতেই থাকতো। আচ্ছা দেরি হয়ে গেলো... আমি—

পার্বতী। ওহ্ ভুলেই গেছি—তোমায় তো আজ রাতে ওরা দু'ভাইয়ে বাইরে খাওয়াবে ঠিক করেছে!

অমল। মা-কালি...কার মাথায় এলো এই বুদ্ধি!

পার্বতী। বাবু বেরোবার আগে বলে গেলো, 'তোমার বড়োবাবুকে বোলো আজ সন্ধ্যে সাড়ে-সাতটায় সাউথ-এন্ড ক্লাবে ডিনারের নেমন্তন্ন!'

অমল। মা-কালি! সাংঘাতিক ব্যাপার! আজ আমি শরদিন্দুকে পেড়ে ফেলবো—ফিরবো যখন, এক পকেটে পাঁচ হাজার অ্যাডভান্স, অন্য পকেটে এই কলকাতায় পোস্টিঙের চিঠি—দেখে নিও।

পার্বতী। এই তো তোমার মতো কথা বড়োবাবু! এবার আমাদের সুদিন আসছে।

অমল। আসবেই! আমি চললাম—(আবার রওনা হয়)

পার্বতী। চশমা নিয়েছো? (রুমাল খুঁজতে থাকে)

অমল। (দেখে নেয়, ফিরে আসে) হ্যাঁ, নিয়েছি।

পার্বতী। (হাতে দিয়ে) এই তোমার রুমাল।

অমল। হ্যাঁ, রুমাল—

পার্বতী। তোমার স্যাকারিন—

অমল। হ্যাঁ আমার স্যাকারিন—

পার্বতী। মেট্রোর সিঁড়িগুলো বড্ড খাড়া কিন্তু—

[অমলের কোটের কলার ঠিক করতে গিয়ে পার্বতীর অন্য হাতে সেই পুরনো ঢাকাই শাড়ি দেখা যায়। অমলের দৃষ্টি পড়ে।]

অমল। আবার তোমার ঐ রিপু—আমি যতক্ষণ বাড়ি থাকি...ওগুলো বন্ধ রাখবে? আমার নার্ভাস লাগে...প্লিজ!

[পার্বতী দ্রুত লুকিয়ে ফেলে, অমলের পেছন পেছন যেতে থাকে।]

পার্বতী। তুমি কিন্তু ভুলো না—সাউথ-এন্ড ক্লাবে সন্ধ্যে সাড়ে-সাতটায়!

অমল। গাজর শালগম—এগুলো নিশ্চয়ই ফলবে!

পার্বতী। (হেসে) কতোবার তো চেষ্টা করলে!

অমল। হ্যাঁ। বিশ্রাম নিও।

পার্বতী। সাবধানে যেও।

[অমল অদৃশ্য। পার্বতী হাত নাড়ে। ফোন বাজে। সে দৌড়ে ফোন ধরে।]

পার্বতী। হ্যালো! কে—বাবু! ফোনটা পেয়ে খুব ভালো হলো...জানিস...হ্যাঁ, নিশ্চয়ই—এক্ষুণি তোর বাবাকে বললাম—ঠিক সন্ধ্যে সাড়ে-সাতটার মধ্যে...না, ভুলিনি... শোন, তোকে বলবার জন্য ছটফট করছিলো মনটা—সেই যে ফাঁস-লাগানো দড়িটা—আজ সকালে স্থির করেছিলাম, যা থাকে কপালে, দেবো আজ ওটাকে দূর করে... তো গিয়ে দেখি কি—ওটা সেখানে নেই! ভাব—তোর বাবা নিজেই ওটা ফেলে দিয়েছে! (ওপাশের কথা শোনে) কখন? আচ্ছা—তা'হলে তুই সরিয়ে রেখেছিস! কিচ্ছু না...আমি ভেবেছিলাম, তোর বাবা বুঝি নিজেই...না—না আর আমার কোনও দুশ্চিন্তা নেই। তোর বাবার চেহারা আজ সেই আগের মতো দেখলাম—সেই আগের মেজাজ। তোর পি. সি. সেনের সঙ্গে দেখা হয়েছে?...তা'লে ওখানেই অপেক্ষা কর। চেষ্টা করিস, তোকে দেখেই যেন সেন-সাহেব খুব খুশি হয়! বেশি ঘামিস না...রুমাল আছে তো? সন্ধ্যেবেলা তোর বাবাও হয়তো একটা সুখবর দেবে... হ্যাঁ, কলকাতায় কাজের ব্যাপারটা। তোরা কিন্তু মানুষটার সঙ্গে খুব ভালো ব্যবহার করবি...তুমি নিজে ওকে আদর করে বসাবে—হাসি-খুশি থাকবে...আমার রাজা ছেলে! চিরুনি আছে তো...ঠিক আছে...ছাড়ছি!

[ওর কথার শেষদিকে শরদিন্দু বয়স ৩৫-৩৬, একটা ছোট্ট চাকা লাগানো টেবিল নিয়ে ঢোকে। মঞ্চের পুরোভাগে সেই টেবিলের ওপর একটি যন্ত্র—সে-টি প্লাগে গোঁজার প্রস্তুতি নেয়। আলো ক্রমে পার্বতীর ওপর থেকে মুছে গিয়ে শরদিন্দুর ওপর প্রোজ্জ্বল। শরদিন্দু যন্ত্র নিয়ে মহা ব্যস্ত। তারই ফাঁকে অমলকান্তির প্রবেশ লক্ষ্য করে।]

অমল। ত্‌চ্‌ ত্‌চ্‌ ত্‌চ্‌।

শরদিন্দু। আরে মিঃ চৌধুরী, আসুন ভেতরে আসুন।

অমল। তোমার সঙ্গে একটু কথা ছিলো, শরদিন্দু...

শরদিন্দু। একমিনিট, প্লিজ—

অমল। ওটা কিগো শরদিন্দু?

শরদিন্দু। দেখেননি তো আগে! এটায় একই সঙ্গে টিভি, ভি.সি. আর, রেকর্ডার, ওয়্যারলেস, ওয়াকি টকি...আরও সব...বলতে পারেন, ফাইভ-ইন-ওয়ান! মজা কি জানেন—বাড়ির সঙ্গে কথা বলতে পারবো, আবার দেখতেও পাবো—ফ্যান্টাস্টিক!

অমল। কি করবে ওটা দিয়ে?

শরদিন্দু। একমিনিট—কাল রাতে সব রেকর্ডিং করেছি—শুনুন একবার! (একটি সুইচ টেপে। 'দেখা হ্যায় পহেলিবার সাজনকে আঁখোমে পেয়ার' শোনা যায়) আমার মেয়ে—সাত বছর বয়স—সুরজ্ঞানটা দেখেছেন? (অন্য সুইচ টেপে)

মেয়ের কণ্ঠস্বর। 'এবার তুমি বাপি!'

শরদিন্দুর কণ্ঠস্বর। 'না—না—এবার তোমার মা...'

অমল। এতো সত্যি...একটা দারুণ...

শরদিন্দু। এক মিনিট দাঁড়ান—আমার স্ত্রী...

স্ত্রীর কণ্ঠস্বর। 'আমি...আমি কি বলবো...'

শরদিন্দুর কণ্ঠস্বর। 'যাহোক কিছু—যন্ত্রটা ঘুরছে...'

স্ত্রীর কণ্ঠস্বর। 'হ্যাল্লো..অহ্ আমার লজ্জা করছে...'

অমল। শরদিন্দু, তোমার সঙ্গে আমার যে একটা কথা—

শরদিন্দু। শ্ শ্ শ্ এবার শুনুন, আমার ছেলে...

ছেলের কণ্ঠস্বর। 'অন্ধ্র প্রদেশের রাজধানী—হায়দ্রাবাদ। অরুণাচলের রাজধানী—ইটানগর। আন্দামানের রাজধানী—পোর্টব্লেয়ার। আসামের রাজধানী—দিসপুর। উত্তরপ্রদেশের রাজধানী—লক্ষ্ণৌ। উড়িষ্যার রাজধানী—ভুবনেশ্বর। জম্মু ও কাশ্মীরের রাজধানী—শ্রীনগর।

[চলতেই থাকে, চলতেই থাকে]

শরদিন্দু। (পাঁচ আঙুল দেখিয়ে) পাঁচ বছর বয়স, বুঝলেন—

অমল। ও বড়ো হয়ে নিশ্চয়ই টি ভি-র অ্যানাউন্সার হবে।...তোমার সঙ্গে একটা—

শরদিন্দু। ভাবুন, অ্যালফাবেটিকাল অর্ডারে বলে যাচ্ছে...(হঠাৎ যন্ত্রটা থামিয়ে) আরে দাঁড়ান, দাঁড়ান। আপনার তো এখন নদীয়া না মুর্শিদাবাদে থাকার কথা না?

অমল। সেই ব্যাপারেই দুয়েকটা কথা তোমায় বলতে চাইছি। শরদিন্দু, মিনিট খানেক সময় হবে? (চেয়ার টেনে নেয়।)

শরদিন্দু। আবার কিছু ঝামেলা পাকিয়েছেন নাকি?

অমল। এ্যাঁ—না-না...

শরদিন্দু। আপনি কাজের দিনে জেলা ছেড়ে...সমস্যাটা কি?

অমল। বলছি কি, শরদিন্দু, আমি প্রায় ঠিকই করে ফেলেছি—আমি তোমার ঐ জেলায়- জেলায় ঘুরে ঘুরে আর ফেরি করবো না।

শরদিন্দু। তাহলে, তাহলে কি করবেন?

অমল। তোমার মনে আছে—সেই তোমার বড়দিনের পার্টিতে—তুমি কথা দিয়েছিলে—এই শহরেই কোনও একটা ব্যবস্থা করে দেবে...

শরদিন্দু। এখানে—আমাদের কোম্পানিতে?

অমল। হ্যাঁ—তুমি বলেছিলে!

শরদিন্দু। ওহো—হ্যাঁ হ্যাঁ...মনে পড়েছে। কিন্তু মিঃ চৌধুরী—আমি তো তেমন কিছু ভেবে পেলাম না...

অমল। আমি তোমায় বলছি... ছেলেরা আমার লায়েক হয়ে গিয়েছে—মাস গেলে আমার ঐ হাজার তিনেক পেলেই চলে যাবে...

শরদিন্দু। হ্যাঁ হ্যাঁ—কিন্তু দেখুন...আমি—

অমল। তোমাকে আমি খোলখুলিই বলছি......আমি একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছি!

শরদিন্দু। হ্যাঁ, সেটা আমি বুঝতে পারছি...কিন্তু দেখুন, আপনি হচ্ছেন যাকে বলে রোডম্যান—আর আমাদের ব্যবসাতো আসলে ঐ জেলাগুলোতেই—সেইজন্যই কলকাতায় আমাদের সেলসম্যান হাতে গোনা—

অমল। ভগবান সাক্ষী, শরদিন্দু, কোনওদিন নিজের জন্য কারও কাছে হাত পাতিনি... সেই তোমার বাবা তোমায় কোলে নিয়ে অফিসে আসতেন—সেই তখন থেকে আমি এই কোম্পানিতে রয়েছি—

শরদিন্দু। সে-সব আমি জানি...কিন্তু—

অমল। এই তো— তোমার যেদিন জন্ম হলো, তোমার বাবা আমায় জিজ্ঞেস করলেন—'শরদিন্দু নামটা কেমন লাগছে, চৌধুরী?'

শরদিন্দু। সে-সবই আমি বুঝি মিঃ চৌধুরী—কিণ্ড এখানে আপনাকে দেবার মতো কোনও পোস্ট যে নেই...থাকলে আমি নিশ্চয়ই—

[শরদিন্দু লাইটার খোঁজে, অমল ওর হাতে তুলে দেয়। স্বল্প বিরতি।]

অমল। (রাগ বাড়ছে) শরদিন্দু, আড়াই হাজার পেলেই আমার সংসার চলে যাবে।

শরদিন্দু। এখানে কাজ থাকলে তবে তো—

অমল। দেখো, আমি মাল বেচতে পারি কি পারি না—সেটা নিয়ে তো কোনও সন্দেহ নেই!

শরদিন্দু। বাট বিজনেস ইজ বিজনেস...

অমল। (রেগে) হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, বিজনেস ইজ বিজনেস...তুমি শুধু একমিনিট আমার কথা শোনো—নইলে তুমি ঠিক বুঝবে না।...তখন আমার বয়স আঠারো উনিশ— সেলসের কাজে ঢুকে পড়েছি...প্রায়ই ভাবতাম...এই ফেরিওয়ালার কাজে কিছু ভবিষ্যৎ আছে—প্রায়ই ভাবতাম...দাদার সঙ্গে চলে যাবো—বার্মা, মালয়েশিয়া, আফ্রিকা...ভাগ্যের সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে একটা কিছু হয়ে যাবো...আমার বাবা—দাদা...আমাদের রক্তের মধ্যেই অ্যাডভেঞ্চার...নিজের হাতে ভাগ্য গড়ার একটা অদম্য ইচ্ছে...এমন সময় হঠাৎ চক্রধরপুরের

হোটেল রিপোজ-এ একজন সেল্‌সম্যানকে দেখলাম—সতীন্দ্র নারায়ণ সিংহ, তিয়াত্তর বছর বয়স, পরনে পাজামা পাঞ্জাবি, পায়ে সবুজ ভেলভেটের চটি—দু'বেলা লনে পায়চারি করতেন আর মাঝে মধ্যে রুমে গিয়ে ফোন করে লাখ লাখ টাকার মাল বিক্রি করে ফেলতেন। ভাবো একবার—

শরদিন্দু। (আদৌ উৎসাহ নেই) আচ্ছা, তাই বুঝি।

অমল। ভাবো—তিয়াত্তর বছর বয়স—সাতটা স্টেটে একষট্টিটা জেলায় ফোনে তাঁর গলা শুনে কতো লোক তাকে চিনতে পারছে—কতো ভালোবাসা কতো ইজ্জৎ দিচ্ছে! চোখের সামনে এই ঘটনা দেখে মনে হলো—ফেরিওয়ালাই বলো আর হকারই বলো, সেল্‌সম্যানের মতো ভালো প্রোফেশন আর কিছু নেই। আর জানো—ভদ্রলোক মারা গেলেন— সে এক ফেরিওয়ালার মৃত্যুই বটে। এই কলকাতার একটা হোটেলের ঘর থেকে ফোন করতে করতে ঢলে পড়লেন। তারপর কতোদিন যে ট্রেনে—দূর-পাল্লার বাসে কতো শত সেল্‌সম্যানের মুখে যেন আত্মীয় বিয়োগের ছাপ! (শরদিন্দু উঠে দাঁড়ায়, অমলের দিকে তাকায়ও না) সেসব দিনে এই কাজে ব্যক্তিত্ব ছিলো, সম্মান ছিলো, বন্ধুত্ব ছিলো—আর কৃতজ্ঞতা ছিলো। এখন সব চাঁছা-ছোলা—বন্ধুত্বের কোনও দাম নেই। আমার কথা বুঝছো তো? ওরা কেউ আর আমায় চিনতে পারে না!

শরদিন্দু। (সরে যেতে যেতে) সেইটাই তো মুস্কিল, মিঃ চৌধুরী!

অমল। মাসে দু'হাজার হলেই, ব্যস— তোমার বাবা আমাকে কথা দিয়েছিলেন—এইটুকুই আমার পক্ষে যথেষ্ট!

শরদিন্দু। (যেতে থাকে) আমাকে এখন লোকজনের সঙ্গে দেখা করতে হবে...

অমল। (ওকে থামায়) আমি তোমার বাবার সম্পর্কে কথা বলছি! এই টেবিলের ওপাশটায় দাঁড়িয়ে তিনি আমাকে কথা দিয়েছিলেন—আর তুমি বলছো, লোকজন অপেক্ষা করে আছে! চৌত্রিশ বছর এই কোম্পানির জন্য ঘাম ঝরিয়েছি—আজ আমার ইনসিওরেন্সের প্রিমিয়াম দেবার পয়সা নেই! মানুষগুলো সব বেওয়ারিশ ফল নয় যে শাঁসটা খেয়ে ছিবড়েটুকু ফেলে দেবে! (একটু দম নিয়ে) মন দিয়ে শোনো— তোমার বাবা—সেটা ছিল উনসত্তর সাল—সে'বছর রমরমা ব্যবসা করছি আমি—হপ্তায় গড়ে কমিশনই পাচ্ছি এগারশ' টাকা—

শরদিন্দু। না। শুনুন, আপনি কোনওদিন গড়ে অতো টাকা—

অমল। (দু'হাতে টেবিলে ঘুঁসি মেরে) উনসত্তর সালে প্রতি সপ্তাহে গড়ে আমি এগারশ' টাকা রোজগার করেছি! এবং তোমার বাবা একদিন এই টেবিলের সামনে—আমার কাঁধে হাত রেখে—

শরদিন্দু। (উঠে পড়ে) আমাকে মাপ করতে হবে, মিঃ চৌধুরী। আপনি নিজেকে একটু সামলে নিন...(বেরিয়ে যেতে যেতে) একটু পরে

আবাব আসবো আমি।

[শরদিন্দু চলে যাওয়ার পরে ওর চেয়ার আশ্চর্য তীব্র আলোয় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।]

অমল। 'আপনি নিজেকে সামলে নিন'... কেন?—কি বলেছি আমি ওকে? ওঃ! ভগবান! আমি ওকে ধমকাচ্ছিলাম! (হঠাৎ থেমে যায়, চেয়ারের ওপরের উজ্জ্বল আলোর বৃত্তের দিকে চেয়ে থাকে—তারপর নিজের চেয়ারটি নিয়ে এগিয়ে যায়) স্যর, স্যর, সেই সেবারে আমাকে কি বলেছিলেন—মনে পড়ছে না আপনার? সেই আমার কাঁধে হাত রাখলেন...তারপর, স্যর, আপনি...স্যর, স্যর, স্যর...

[যেমনি টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে বলতে থাকে, সেই অবস্থায় হাত লেগে হঠাৎ যন্ত্রটা চালু হয়ে যায়।]

ছেলের কণ্ঠস্বর। 'মধ্যপ্রদেশের রাজধানী—ভোপাল। মেঘালয়ের রাজধানী—মিজোরাম। মণিপুরের রাজধানী—ইম্‌ফল। নাগাল্যান্ডের রাজধানী— কোহিমা। উড়িষ্যার রাজধানী—ভুবনেশ্বর...**(চলতেই থাকে)**

অমল। শরদিন্দু—শরদিন্দু—শরদিন্দু—শরদিন্দু—

শরদিন্দু। (দৌড়ে আসে) কি হলো?

অমল। (যন্ত্রটির দিকে আঙুল দেখিয়ে) বন্ধ করো—ওটা বন্ধ করো...

শরদিন্দু। দেখুন—।

অমল। (আঙুল দিয়ে দু'চোখ চেপে ধরে) একটু জল খাবো—গলা শুকিয়ে যাচ্ছে...একটু জল—**(অমল বেরোতে থাকে, শরদিন্দু তাকে আটকায়)**

শরদিন্দু। (হাতে তার গোটাতে গোটাতে) মিঃ চৌধুরী, শুনুন—

অমল। আমি মুর্শিদাবাদ যাবো!

শরদিন্দু। মিঃ চৌধুরী, আপনি আর মুর্শিদাবাদ বা অন্য কোথাও যেতে পারবেন না।

অমল। কেন পারবো না?

শরদিন্দু। আমি চাই না, আপনি আর কোম্পানির হয়ে কোথাও যান।—কথাটা অনেকদিন ধরেই বলবো ভাবছিলাম।

অমল। শরদিন্দু, তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছো!

শরদিন্দু। আপনার একটা লম্বা বিশ্রাম দরকার!

অমল। শরদিন্দু, আমাকে রোজগার করতেই হবে!

শরদিন্দু। আপনার ছেলেরা তো সাবালক—তাদের বলুন, আপনি ক্লান্ত।

অমল। ছেলেরা দু-ভাইয়ে মিলে একটা বড়ো ব্যবসা শুরু করেছে...

শরদিন্দু। মিঃ চৌধুরী, এখন গাল-গল্পের সময় নয়!

অমল। বেশ—আমি সকালেই মুর্শিদাবাদ যাচ্ছি।

শরদিন্দু। না।

অমল। ছেলেদের রোজগারে আমি....আমি অথর্ব নই (শরদিন্দুর হাত ধরে)

শরদিন্দু, আমাকে যেতে দিতেই হবে মুর্শিদাবাদে!

শরদিন্দু। (কঠিন কিন্তু সংযত) বসুন পাঁচ মিনিট, তারপর বাড়ি যান। (চলে যেতে যেতে যন্ত্রটির কথা মনে পড়ে, ঘুরে এসে টেবিলসহ সব কিছু নিয়ে যায়) ওঃ এ সপ্তাহে যে কোনওদিন আপনার স্যাম্পল বক্সগুলো ফেরৎ দিয়ে যাবেন—দেখবেন অনেকটা হাল্কা লাগছে। একটু সামলে নিন—বাইরে লোকজন রয়েছে।

[টেবিলসহ শরদিন্দু বেরিয়ে যায়। অমল বে-দম। শূন্যে তাকিয়ে। দূর থেকে বড়দার আবহ সঙ্গীত কাছে আসে। বড়দা ঢোকে, হাতে ছাতা ও ভ্যালিস।]

অমল। বড়দা! তুমি কি করে পেরেছিলে! কোন মন্ত্রে?

বড়দা। কি চাই নিশ্চিত জানলে সময় তো লাগে না!

অমল। আমি যে কোনও থৈ পাচ্ছি না, বড়দা!

বড়দা। অমল, অরুণাচলে একটা পাইনের জঙ্গল কিনেছি—দায়িত্ব নিতে চাও?

অমল। একটা পুরো জঙ্গল—আমি আর ছেলেরা! পার্বতী, পার্বতী!

পার্বতী। (ভেতরে আসে, আগের মতো) ওঃ আপনি ফিরে এসেছেন।

অমল। পার্বতী, দাদা আমাকে অরুণাচলে যাবার প্রস্তাব দিচ্ছে!

পার্বতী। কেন?—এখানেই তো তুমি যথেষ্ট করছো!

বড়দা। (অমলকে) ঐ 'যথেষ্ট'-র মাপটা কি বলতে পারো?

পার্বতী। (একই সঙ্গে রাগ ও ভয়) 'যথেষ্ট' মানে এখানে এই মুহূর্তে সুখী হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট! (বড়দা হাসে। অমলকে) সব মানুষকেই গোটা দুনিয়াটা জয় করতে হবে? কতো লোক তোমায় পছন্দ করে, ছেলেরা তোমাকে ভালোবাসে, আর হয়তো একদিন (বড়দাকে)—এই তো...বুড়ো জগদিন্দু নারায়ণ ওকে বলেছেন, লেগে থাকলে ওকে একদিন পার্টনার করে নেবেন!

অমল। হ্যাঁ বড়দা—হয়তো এই কোম্পানিতেই আমি আমার ভবিষ্যৎ গড়ে নিতে পারবো!

বড়দা। হাতের মুঠোয় ধরতে পারছো সেই ভবিষ্যৎ?...আমায় যেতে হবে—

অমল। না বড়দা, তুমি ছেলেটাকে দেখো।

[বাবু ঢোকে, হাতে কিট-ব্যাগ, পরনে ক্রিকেট সোয়েটার। খুশির হাতে অন্যান্য খেলার সরঞ্জাম।]

অমল। ও পয়সা-ওলা ঘরের ছেলে নয়—তবুও যাদবপুর ইউনির্ভাসিটি, আরও দুটো জায়গা থেকে স্কলারশিপ নিয়ে ওকে সাধাসাধি করছে...এরপর তো শুধু আকাশটা ছোঁয়া বাকি...আসল কথা তো—কি তোমার যোগাযোগ আর তোমার মুখের হাসি! (বাবুকে) আর সেই জন্যই, আজ যখন মাঠে নামবে— তোমার ভাগ্য বদলে যাবে। হাজার হাজার লোক তোমাকে ভালোবেসে এসেছে—তারা তোমাকে দেখবে! (বড়দাকে) বড়দা, এরপর ও যেখানে যাবে, আপসে সব দরজা খুলে যাবে।—আমি বলছি তোমাকে!

বড়দা। আমি যাচ্ছি, অমলকান্তি।

অমল। তুমি বিশ্বাস করছো তো আমার কথা!

বড়দা। হাতের মুঠোটা খুলে দেখো—সত্যি কিছু আছে তো? (সে চলে গেছে)

[ছোট রাহুল দৌড়ে ঢোকে। বাচ্চাদের খুশির আবহ সঙ্গীত শোনা যায়।]

রাহুল। উপ্‌স্—ভাবছিলাম তোমরা বুঝি চলে গেলে!

অমল। এক্ষুণি বেরোবো—চলো সবাই, নেক্স্ট স্টপ মোহনবাগান গ্রাউন্ড। ব্যানারগুলো কোথায়? (নিজেই ছুটে ভেতরে যায়।)

পার্বতী। (বাবুকে) ফ্রেশ গেঞ্জি—আন্ডার-ওয়্যার নিয়েছো তো?

বাবু। **(গা গরম করতে-করতে)** দেরি হয়ে যাচ্ছে!

রাহুল। তুমি প্রমিস করেছিলে, বাবু—আমি ব্যাটগুলো নেবো তো!

খুশি। না—ব্যাটগুলো আমার হাতে থাকবে।

রাহুল। তাহলে আমি ক্লাব-হাউসে ঢুকবো কি করে?

পার্বতী। (নিজের যাত্রা-প্রস্তুতি নিতে নিতে) দে না বাবা, ওকে ব্যাটগুলো বইতে!

বাবু। (মহত্তম দানের মর্যাদায়) ওকে দিয়ে দে ব্যাটগুলো।

খুশি। **(রাহুলকে দিতে দিতে)** আমাদের গায়ে গায়ে থাকবি।

[অমলকান্তি ব্যানারগুলো নিয়ে দৌড়ে ঢোকে, ওদের দেয়।]

অমল। বাবু মাঠে নামলেই এগুলো দেখাবি। (রাহুল ও খুশি বেরিয়ে যায়) তুই তৈরি, বাবু!

বাবু। তৈরি, বাপি!

অমল। জানো তো কি করতে হবে?

বাবু। জানি, বাপি!

অমল। আজ খেলার শেষে তুমি জুনিয়র বেঙ্গল ক্রিকেট ক্যাপ্‌টেন।

বাবু। আমি পারবো বন্ধু, আমার প্রথম ছক্কাটা শুধু তোমার জন্য!

অমল। (বাবুকে কাঁধ ধরে নিয়ে যেতে থাকে—এমন সময় রাজেন, তার পরনে বারমুডা, ভেতরে ঢোকে। তাকে দেখে) চলো সবাই...তোমার জায়গা হবে না, রাজেন।

রাজেন। জায়গা— কোথায়?

অমল। গাড়িতে।

রাজেন। বেড়াতে যাচ্ছো! ভাবছিলাম দু'হাত ফিশ খেলবো!

অমল। ফিশ! আজ কি আছে জানো?

পার্বতী। উনি জানেন—তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন!

রাজেন। আমি সত্যিই জানি না, বৌঠান।

পার্বতী। আজ বাবুর খেলা আছে—মোহনবাগান মাঠে।

রাজেন। অমল, তুমি কি রেডিও-ফেডিও শোনো না?

অমল। কেন?

রাজেন। মোহনবাগান মাঠের গ্যালারিতে তো আগুন লেগে গেছে!

অমল। রসিকতাটা খুব ভদ্র হলো না, রাজেন!

রাজেন। অমল, চিরকাল তুমি খোকাটিই থেকে যাবে? (সবাই বেরিয়ে গেছে)।

অমল। আচ্ছা! আজ খেলার শেষে হাসি শুকিয়ে যাবে—সবাই ওকে জুনিয়র টাইগার পতৌদী বলে লাফাবে!

রাজেন। আচ্ছা! আই অ্যাম সরি! আচ্ছা, অমল, এই জুনিয়ার টাইগার—সেতো বেড়াল!

অমল। হাত তোলো—হাত তোলো, তুমি!

[রাজেন হাসতে হাসতে ঘাড় নাড়তে নাড়তে চলে যায়, তার পেছনে পেছন অমলকান্তি। আবহ সঙ্গীত যেন উদ্দাম ঠাট্টায় ফেটে পড়ে।]

অমল। নিজেকে কি ভাবো তুমি—খাঞ্জা খান?—পালপুরের হরিদাস? মূর্খ—গাধা—পাঁঠা! হাত তোলো!

[আলো অন্যত্র। রাজেনের অফিসের অ্যান্টি-চেম্বার। ট্র্যাফিকের শব্দ। পরিণত রাহুল দাঁড়িয়ে শিষ দিচ্ছে, তার পায়ের কাছে অ্যাটাচি এবং দু'টি টেনিস র্যাকেট]

অমল। **(বাইরে থেকে)** পালাচ্ছো কেন তুমি? যা বলার সামনা সামনি বলো। আজকের খেলাটা শেষ হতে দাও—দশ হাজার লোকের সামনে-ছক্কা—শুধু ছক্কা!

[রাহুল শান্ত আন্তরিক আত্মশক্তি সম্পন্ন যুবক। চেঁচামেচি শুনে টেবিল থেকে পা নামিয়ে বুঝতে চেষ্টা করে। সুভদ্রা, রাজেনের সেক্রেটারি, ঘরে ঢোকে]

সুভদ্রা। স্যর...

রাহুল। বাইরে অতো গোলমাল কিসের?

সুভদ্রা। মিঃ চৌধুরী—লিফ্‌ট থেকে নেমেই—

রাহুল। কার সঙ্গে তর্ক করছেন?

সুভদ্রা। সঙ্গে কেউ নেই স্যর। আমি আর ওঁকে সামলাতে পারি না—আপনার বাবাও খুব আপসেট হয়ে যান...আপনি একটু ওঁকে সামলাবেন?

অমল। (ঢুকে আসে) ছক্কা—সোজা সাইট-স্ক্রিনের ওপর দিয়ে সিক্সার...। আরে সুভদ্রা, কেমন আছো...

সুভদ্রা। ভালো...(দ্রুত চলে যায়)

রাহুল। কেমন আছো, অমলকাকু?

অমল। আরে দেখো দেখো—এযে রাহুল! (টেনিস র্যাকেট অমলের চোখে পড়ে) তুই এখানে কি করছিস!

রাহুল। বাবার সঙ্গে একটু দেখা করে গেলাম—একটু পরেই দিল্লি চলে যাচ্ছি।

অমল। তোর বাবা আছে?

রাহুল। হাঁ, অ্যাকাউন্‌টেন্টের সঙ্গে কথা বলছেন। তুমি বোসো।

অমল। (বসে) তো হঠাৎ দিল্লি যাচ্ছিস কি করতে?

রাহুল। ঐ—একটা কেসের ব্যাপারে একটু—
অমল। (র‍্যাকেট দেখিয়ে) ওখানে বুঝি টেনিস খেলবি তুই?
রাহুল। যে বন্ধুর কাছে উঠবো, তার একটা টেনিস কোর্ট আছে।
অমল। বলিস কিরে—খুব রইস লোক নিশ্চয়ই!
রাহুল। খুব ভালো লোক। বাবা বলছিলেন, বাবু নাকি কলকাতায় ফিরেছে?
অমল। (একগাল হেসে) হ্যাঁ—ওতো সেই নেপালে—বিশাল কারবার করছিলো। তো স্পোর্টস-ইন্ডিয়ার মালিক, পি. সি. সেন—উনি খুব করে চাইছেন বাবুকে নিজের ব্যবসায়ে... তো একেবারে ট্রাঙ্কল করে এখানে নিয়ে এসেছেন। একেবারে ব্ল্যাঙ্ক চেক। বিরাট কারবার... তোর নাকি শুনলাম একটা ছেলে হয়েছে?
রাহুল। হ্যাঁ, দ্বিতীয় পুত্র।
অমল। দ্বিতীয় পুত্র! বা বাঃ...
রাহুল। তুমি সেই আগের কোম্পানিতেই আছো?
অমল। (স্বল্প বিরতি) আমি...আমি তোর এই উন্নতি দেখে খুব খুশি হয়েছি...একজন ইয়াং ম্যান...যদি এইভাবে...বাবুরও খুব উন্নতি হবে... (আবেগে থরথর করে কেঁপে থেমে যায়।)
রাহুল। কি হয়েছে, কাকু—বলো!
অমল। তুই—তুই কি করে পারলি এতো সব! ও কেন বারবার হেরে গেলো?
রাহুল। সে তো আমি জানি না, কাকু।
অমল। তুই ওর ছেলেবেলার বন্ধু ছিলি...বল আমায়, কেন সতেরো বছর বয়সের পরে— কেন আর একটা কিছু ভালো ওর জীবনে ঘটলো না?
রাহুল। ও যে নিজেকে কোনও কিছুর জন্য তৈরি করেনি।
অমল। না, করেছিলো। ও অনেক কিছু করেছিলো...কিন্তু কিছুই তো হলো না!
রাহুল। (চশমা খুলে) কাকু, তুমি খোলাখুলি কথা বলতে চাও?
অমল। (উঠে রাহুলের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে) আমি তোর মতামতের খুব দাম দিই!
রাহুল। আমি তোমায় কি পরামর্শ দেবো! শুধু অনেকদিন... তোমাকে একটা প্রশ্ন করতে চেয়েছি...বাবুর ফাইনাল পরীক্ষার সময় যখন আমাদের অঙ্কের ভবতারণবাবু প্র্যাকটিকালি ওকে ফেল করিয়ে দিলেন—
অমল। ওহ্! ঐ শুয়োরের বাচ্চা ওর জীবনটা শেষ করে দিলো!
রাহুল। হ্যাঁ, কিন্তু তুমি কি বাবুকে স্পেশাল কোচিং নিয়ে সাপলিমেন্টারি পরীক্ষায় বসতে বারণ করেছিলে?
অমল। আমি! আমি ওকে ধমকে, পায়ে ধরে বলেছি—'যা, পরীক্ষাটা দে!'
রাহুল। তাহলে কেন জেদ ধরে রইলো, পরীক্ষা দেবে না?
অমল। কেন! কেন? সেই প্রশ্নটাই তো পনেরো বছর আমায় তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে... আমি... আমিই কি কোনও আঘাত দিলাম ওকে?...মনে

হয়, ওকে... ওকে যে আমি কিছুই দিতে পারলাম না!

রাহুল। নিজেকে এতো কষ্ট দিও না!

অমল। কেন হাল ছেড়ে দিলো?—বল, তুই তো ওর বন্ধু ছিলি!

রাহুল। কাকু, আমার মনে আছে—সেটা ছিলো জুন মাস, পরীক্ষার ফল বেরোবে, ভেতর থেকে জানা গেলো, ওর তিন নম্বর শর্ট। ট্যাবুলেটর হিসেবে ভবতারণবাবু ঐ-কটা নম্বর দিয়ে দিতে পারতেন—কিন্তু উনি কিছুতেই দেবেন না—

অমল। ঐ শুয়োরের বাচ্চা—!

রাহুল। না। তখনও বাবু ভেঙে পড়েনি—ও ঠিক করেছিলো স্পেশাল কোচিং নিয়ে আবার পরীক্ষায় বসবে—

অমল। (বিস্মিত) ও তাই ঠিক করেছিলো?

রাহুল। হ্যাঁ। কিন্তু তার পরেই বাবু হঠাৎ পাড়া থেকে উধাও হয়ে গেলো। ভেবেছিলাম, শিলিগুড়িতে তোমার কাছে গেছে। তখন কি তোমার সঙ্গে ওর এই নিয়ে কোনও কথা হয়েছিলো?

অমল। (নীরবতা, তার পরে বিতৃষ্ণা) হ্যাঁ—ও শিলিগুড়ি গিয়েছিলো। তাতে কি হলো?

রাহুল। কারণ—ও যখন ফিরে এলো...আজও আমি তারও উত্তর পাইনি... ওকে আমি খুব ভালোবাসতাম—তুমি জানো তো?...মাসখানেক পরে যেদিন ফিরে এলো...ওর সেই টি শার্ট—জুনিয়র বেঙ্গল লেখা যেটা ও দিন রাত পরে থাকতো—সেইটা আগুনে পোড়াতে লাগলো। কোনও প্রশ্নের উত্তর দেয় না—মারামারি শুরু হলো—আধঘণ্টা করে দু'জনে দু'জনকে ঘুষি মারছি আর দু'জনেই হাউ-হাউ করে কাঁদছি...হঠাৎ মনে হলো ও জীবনের মতো হাল ছেড়ে দিয়েছে!...শিলিগুড়িতে কি হয়েছিলো কাকু?

অমল। (রেগে) 'কি হয়েছিলো!'-মানে! কিচ্ছু হয়নি! সব দোষ আমার ঘাড়ে চাপাবে?

রাহুল। কাকু—তুমি উত্তেজিত হচ্ছো...

অমল। তাহলে বোলো না—'কি হয়েছিলো ওখানে?'—কি বলতে চাইছো যে...

[রাজেন ঢোকে, ঢিলে টাই, কলারের বোতাম খোলা, হাতে একটা টিন বা একটা বোতল।]

রাজেন। এই, তুই ট্রেনটা মিস্ করবি!

রাহুল। হ্যাঁ, আমি যাচ্ছি। (টিন বা বোতল নেয়) আসি কাকু। ও নিয়ে অতো ভেবো না। কাকু, কখনও কখনও সব কিছু ছেড়ে চলে যেতে হয়।

অমল। কিন্তু যদি কেউ ছাড়তে না পারে?

রাহুল। (কিছুক্ষণ চুপ) তখনই বোধহয় গণ্ডগোলটা বাধে! আসি কাকু!
[রাহুল চলে যায়।]

অমল। (আশীর্বাদ করে) আয় বাবা।

রাজেন। (অমলের কাঁধে হাত রেখে) সুপ্রিম কোর্টে কেস লড়তে যাচ্ছে!

অমল। সুপ্রিম কোর্ট! একবারও মুখ ফুটে বললো না।

রাজেন। (টাকা গুনতে গুনতে) বলার কি আছে—কাজটা তো করবে!

অমল। অথচ তুমি কোনওদিন ওকে কিচ্ছু করতে বলোনি!

রাজেন। আমি কোনওদিন কোনও কিছুতেই বিশেষ উৎসাহ দেখাইনি!...এই যে—তিন হাজার আছে...আমি যাই...

অমল। (বলা কঠিন, তবুও) রাজেন...ইয়ে...আমার ইনসিওরেন্সের প্রিমিয়াম বাকি পড়ে গেছে... ষোলশ' পঞ্চাশ টাকা...তুমি যদি—আমি ব্যাঙ্ক থেকে তুলে নিতে পারতাম...ঐ পার্বতী জেনে ফেলবে—

রাজেন। বোসো।

অমল। আমি কিন্তু প্রতিটি পাই-পয়সার হিসেব রাখছি—

রাজেন। শোনো—তোমার মাথায় কি ছাই-পাঁশ ঘুরছে! আমি তোমায় একটা চাকরি দিতে চাইলাম—তিন হাজার টাকা মাইনে— জেলায় জেলায় ঘুরতে হবে না—

অমল। আমার তো একটা চাকরি আছে!

রাজেন। তাহলে প্রতি মাসে তোমায় এখানে আসতে হয় কেন?

অমল। (উঠে পড়ে) বেশ...আমার আসাটা যদি পছন্দ না হয়...

রাজেন। চিরকাল তুমি খোকাটি-ই থেকে যাবে?

অমল। (প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত) মাথা-মোটা! আর একবার ঐ কথা বললে তোমার মুখ আমি ভেঙে দেবো! (লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত) গর্দভ—মাথা-মোটা...

রাজেন। (বিরতি) কতো চাই তোমার?—

অমল। রাজেন, একটু আগে আমার চাকরিটা গেছে!

রাজেন। শরদিন্দু তোমায় তাড়িয়ে দিলো?

অমল। ঐ ব্যাটা গাড়োল! ভাবতে পারো—আমি ওর নাম দিয়েছিলাম—নাম দিয়েছিলাম, 'শরদিন্দু'!

রাজেন। অমল, কবে তুমি বুঝবে, এ-সবের কোনও দাম নেই! তুমি ওর নাম দিয়েছিলে 'শরদিন্দু'— সেটা কি কোনও বিপণনযোগ্য বস্তু? এ-দুনিয়ায় শুধু তারই দাম যা বিক্রি করা যায়। অবাক কাণ্ড। নিজে সেলস্‌ম্যান হয়ে সে কথাটা বুঝতে পারো না!

অমল। আমি যে ভেবেছিলাম, যদি ব্যক্তিত্ব থাকে, যদি সবাই পছন্দ করে—

রাজেন। কেন সবাই তোমাকে পছন্দ করবে? জানো না, 'স্বর্ণের নাম সুন্দরী আর মাইনের নাম কার্তিক। শোনো, আমরা তো কেউই কাউকে বিশেষ পছন্দ করি না—তবুও আমি তোমায় একটা চাকরি দিচ্ছি কারণ...চুলোয় যাক কারণ...দিচ্ছি একটাই কারণ..বলো, কি বলতে চাও।

অমল। আমি—আমি তোমার চাকরি করতে পারবো না।—-কেন, আমায়

জিজ্ঞেস কোরো না!

রাজেন। সারাটা জীবন আমায় হিংসে করে গেলে—বোকাহাঁদা! এই যে তোমার ইনসিওরেন্সের টাকা। গিয়েই জমা দিও। (টাকা দেয়)

অমল। (উঠে যেতে যেতে) আশ্চর্য, না! সারা জীবন—কতো দৌড়লে, কতো অ্যাপয়েন্টমেন্ট, কতো বা বেঁচে আছো—অথচ কোনও মূল্য নেই?—তবে কি মরার পরে তোমার দাম পাবে?

রাজেন। অমল! মৃত্যুর পরে কোনও দাম... সে পায় না। (স্বল্প বিরতি) আমি কি বললাম শুনলে? অমল...

[অমলকান্তি নিথর দাঁড়িয়ে, স্বপ্ন-ময়]

অমল!

অমল। রাহুলের সঙ্গে দেখা হলে আমার হয়ে ক্ষমা চেয়ে নিও। বড়ো ভালো ছেলে রাহুল...ওরা সব ভালো—ওরা সবাই অনেক বড়ো হবে—সবাই! একদিন হয়তো ওরা সবাই মিলে টেনিস খেলবে। রাজেন, বাবু আজ স্পোর্টস-ইন্ডিয়ার পি. সি. সেনের সঙ্গে দেখা করতে গেছে।

রাজেন। গুড লাক!

অমল। (কান্নার সীমানায়) রাজেন! তুমিই আমার একমাত্র বন্ধু—কি আশ্চর্য, না! (বেরিয়ে যায়)

রাজেন। ঈশ্বর!

[রাজেন ওর দিকে তাকিয়ে থাকে, তারপর ওর পেছন পেছন চলে যায়। ব্ল্যাক আউট। চড়া আবহ সঙ্গীত। ধোঁয়াটে লালচে আলো। ওপর থেকে নেমে আসা লাল নীল নিওন সাইনে হোটেলের নাম। আজিজ, এক অল্পবয়স্ক ওয়েটার—হাতে টেবিল। তার পেছন পেছন খুশি ঢোকে]

আজিজ। (টেবিল রেখে) ঠিক আছে স্যর, আমি সামলে নিতে পারবো। (খুশির হাত থেকে চেয়ারগুলো নিয়ে সাজায়) এ-দিক টা স্যর, নিরিবিলি। যারা হৈ-চৈ পছন্দ করে—ঐ সামনের দিকে ভিড় করে। আপনি তো স্যর সে-রকমটা নন। আমার কথা বুঝলেন তো স্যর!

খুশি। তা হাল-চাল কেমন, আজিজ?

আজিজ। কুত্তার জীবন, স্যর!

খুশি। আজিজ, আমার দাদা ফিরে এসেছে।

আজিজ। ফিরে এসেছেন?—সেই কাঠমাণ্ডু নেপাল থেকে—নয় স্যর?

খুশি। হ্যাঁ—বিশাল কারবার। আমার বাবাও আসছেন।

আজিজ। বাবা-ও আসছেন, স্যর! ফ্যামিলি পার্টি?

খুশি। ঐ—আসলে দাদা গেছে একটা বিজনেসের ব্যাপারে কথা বলতে—ভাবছি, দু'ভাইয়ে মিলে—

আজিজ। বিজনেস, স্যর, ফ্যামিলির মধ্যে থাকাই ভালো—কারণ কি স্যার চুরি তো হবেই—এখানে ফ্যামিলিরই কেউ টাকাটা মারলো! কথাটা বুঝলেন তো, স্যর?

খুশি। শ্ শ্ শ্!

আজিজ। কি হলো, স্যর?

খুশি। আজিজ, আমি সামনে তাকিয়েছিঁ?

না, স্যর!

খুশি! ডান দিক বাঁ দিক দেখেছি?

না-তো, স্যর!

খুশি। খানদানি এক সাহিবা আসছেন—

আজিজ। আঃ! না, স্যর, আমি তো কোথাও...(হঠাৎ থেমে যায়, কারণ সামনেই এক সুসজ্জিতা তরুণীকে দেখতে পায়। সেই তরুণী পাশের টেবিলে বসে) আল্লা কসম। কি করে টের পেলেন, স্যর?

খুশি। রাডার ফিট করা আছে, আজিজ! (মেয়েটির দিকে তাকিয়ে) উ-উ-উ-উ...আজিজ!

আজিজ। স্যর!

খুশি। ওঁকে সার্ভ করো!

আজিজ। (মেয়েটির টেবিলে গিয়ে) আপনাকে মেনু দেব, ম্যাডাম?

মিস্ দাস। একজনের আসার কথা—

খুশি। তুমি ওঁকে...এক্স্‌কিউজ মি...ফ্রেঞ্চ কোলাবোরেশনে একটা নতুন সফ্‌ট ড্রিঙ্ক মার্কেট করছি আমরা...আপনি যদি ট্রাই করেন...তুমি ওঁকে একটা মঁ শেরি দাও।

মিস্ দাস। থ্যাঙ্কস্।

খুশি। মাই প্লেজার—কোম্পানির খরচা।

মিস্ দাস। বেশ মজা আপনার—খাওয়ার জিনিস বেচেন।

খুশি। ও-সবই এক—বেচা মানে বেচাই। ফ্রান্সে বলে, 'মঁ শেরি, আপনার ত্বকে যৌবনের আগুন জ্বালিয়ে দেয়।' এই দাদাভাই।

[বাবু আসে, খুশির পাশে বসে।]

বাবু। কিরে খুশি, দেরি করে ফেললাম?

খুশি। না না।...ইনি হচ্ছেন মিস উঁ—

[আজিজ পানীয় এনে মেয়েটিকে দেয়।]

মিস্ দাস। দাস, আই মিন—তরুলতা দাস।

খুশি। আর এই আমার দাদা।—বাবুয়া চৌধুরী, বেঙ্গল টিমের ওপেনিং ব্যাট্‌সম্যান।

মিস্ দাস। আপনার সঙ্গে আলাপ করে খুশি হলাম।

খুশি। উঁ হুঁ—আমার নাম খুশি...

মিস্ দাস। (প্রায় মুগ্ধ) তাই বুঝি! কি ভালো নাম, তাই না?

বাবু। বাবা আসবে না?

খুশি। একমিনিট। তোর মেয়েটাকে পছন্দ? ডাকলেই চলে আসবে।

বাবু। না না—যাঃ...(ঘুরে মেয়েটিকে দেখে)

খুশি। আমি বলছি তোকে! (মেয়েটিকে) ব্যস্ত নাকি, বন্ধু!

মিস্ দাস। হ্যাঁ, একটু কাজ ছিলো—তবে ফোন করে দেখতে পারি...

খুশি। প্লিজ, দ্যাখো বন্ধু। আর দ্যাখো না—যদি আর একজন বন্ধু পাও! আমার দাদা কিন্তু বিরাট খেলোয়াড়!

মিস্ দাস। আমি চেষ্টা করছি...(উঠে দাঁড়ায়)

খুশি। প্রাণপণ চেষ্টা, বন্ধু!

[মেয়েটি বেরিয়ে যায়। আজিজ মুগ্ধ। ঘাড় নাড়তে নাড়তে তার পেছন পেছন বেরিয়ে যায়।]

খুশি। কি লজ্জার কথা, না! অমন সুন্দর মেয়ে—অথচ...এই জন্যই আমি বিয়ে করতে পারলাম না! তোকে বলেছিলাম ডাকলেই চলে আসবে?

বাবু। (অদ্ভুত দিশাহারা) বন্ধ কর না এসব। আমি তোকে একটা কথা বলবো। বাবাকে কয়েকটা কথা বলতে চাই—তুই আমায় সাহায্য কর!

খুশি। কি কথা! পি. সি. সেনের সঙ্গে দেখা হলো?

বাবু। (যেন দম ফুরিয়ে গেছে) আজ আমি একটা ভয়ঙ্কর কাণ্ড করেছি...মা-কালি!

খুশি। তার মানে—ও তোর সঙ্গে দেখা করলো না?

বাবু। ছ-ঘণ্টা বসেছিলাম! সারাটা দিন! বারবার স্লিপ পাঠিয়েছি—

খুশি। ও তোকে চিনতে পারলো তো?

বাবু। (হাতের ইঙ্গিতে থামিয়ে) অবশেষে পাঁচটার সময় বেরিয়ে এলো—আমি কে... কোনওদিন আমায় চিনতো কিনা—মুখেও কোন ছাপ নেই! মনে হচ্ছিলো, সব ভেঙে চুরমার করে দিই!

খুশি। এগ্‌জিবিশন ম্যাচের আইডিয়াটা বললি না?

বাবু। পি. সি. সেন গট্‌গট্ করে চলে গেলো—পেছন পেছন ওর সেক্রেটারি—আমি তখন একা... কি যেন মাথায় ভর করলো...হঠাৎ দেখি, আমি ওর অফিস ঘরে—ঝকঝকে ঘর—আমি...খুশি...আমি পি. সি. সেনের টেবিল থেকে ওর সোনার ওয়াটারম্যান কলমটা তুলে নিলাম!

খুশি। সর্বনাশ! কেউ দেখেছে?

বাবু। তারপর দৌড়—এগারোটা তলা দৌড় দৌড় আর দৌড়!

খুশি। এই বুদ্ধুমি...কিসের জন্য এ রকম করলি?

বাবু। (যন্ত্রণায়) জানি না, শুধু মনে হচ্ছিলো—একটা কিছু ছিনিয়ে নিই!—খুশি, আমায় সাহায্য কর—আমি কথাটা বাবাকে বলবো!

খুশি। পাগল হলি তুই—কেন বলবি?

বাবু। বাবাকে বোঝাতেই হবে আমার মতো ফালতুকে কেউ ভরসা করে অতগুলো টাকা ধার দেবে না। বাবা ভাবে, আমি ওকে ঘেন্না করি—আর তাই ভেবে লোকটা শেষ হয়ে যাচ্ছে!

খুশি। সেইটাই তো কথা! বাবাকে বল পি. সি. সেন তোকে কাল লাঞ্চে ডেকেছে।

বাবু। কিন্তু এর জের তো চলতে থাকবে সারাজীবন!

খুশি। কিন্তু বাবা যে স্বপ্ন দেখতে পেলে খুশি হয়!

[অমলকান্তি ঢোকে।]

খুশি। হেলো, বস্!

অমল। মা-কালি! কত্দিন পরে এসব জায়গায় এলাম!

[আজিজ অমলকান্তির পেছন পেছন ঢোকে, তার জন্য চেয়ার রাখে।]

বাবু। (অপরাধীর মন নিয়ে অমলের কাছে যায়—যেন একজন পঙ্গুর কাছে যাচ্ছে) বসো বাপি। ঠাণ্ডা কিছু খাবে?

অমল। নিশ্চয়ই, বলে দাও।

বাবু। (আজিজকে) তিনটে লেহ্র পেপ্সি নিয়ে এসো। (বাবার হাত ধরে) বন্ধু, আজ আমার একটা অভিজ্ঞতা হলো। ভদ্রলোকের জন্য বেশ খানিকটা অপেক্ষা করতে হলো—

অমল। পি. সি. সেনের জন্য?

বাবু। হ্যাঁ—সত্যি বলতে সারাটা দিন। আর অপেক্ষা করতে করতে আমি যেন হঠাৎ অনেক সত্য অনেক ঘটনা স্পষ্ট দেখতে পেলাম। বাপি, কে বলেছিলো আমি স্পোর্টস-ইন্ডিয়ার সেলসম্যান ছিলাম?

অমল। তাই তো ছিলি তুই!

বাবু। না, আমি স্রেফ গোডাউন-ক্লার্ক ছিলাম।

অমল। কি যা-তা বকছিস?

বাবু। বাপি, আজ শুধু সত্য আর ঘটনা নিয়ে কথা হবে। আমি ওখানে গুদাম-বাবু ছিলাম।

অমল। (রেগে) বেশ, এবার আমার কথা শোনো—

বাবু। তুমি আমাকে শেষ করতে দিচ্ছো না কেন?

অমল। অতীতের কোনও গপ্পো কোনও কেচ্ছা আমায় শুনিও না। শরদিন্দু আজ আমায় তাড়িয়ে দিয়েছে!

বাবু। (অবিশ্বাস্য আঘাত) তোমাকে...পারলো!

অমল। আমায় তাড়িয়ে দিয়েছে—সেইজন্য এখন আমি চাইছি একটা ভালো খবর—কারণ, একজন মহিলা অপেক্ষা করে আছে—কারণ, সেই মহিলা সারাজীবন বড় কষ্ট পেয়েছে—আর কারণ, আমার ঝোলায় সত্য ঘটনা কিচ্ছু নেই, এমনকি একটা ছোট্ট গপ্পোও বাকি নেই। এবার বলো—কি বলার আছে?

[আজিজ পানীয় নিয়ে আসে। সে চলে না যাওয়া পর্যন্ত সবাই চুপ।]

অমল। সেন সাহেবের সঙ্গে দেখা হলো?

বাবু। ওঃ ভগবান—ও বাবা!

অমল। তার মানে তুই ওখানে যাসনি?

খুশি? নিশ্চয়ই—ও গেসলো ওখানে।

বাবু। তোমাকে কমিশনেও কাজ করতে দেবে না ওরা?

অমল। আমি বাদ! খাতির যত্ন করলো তোকে?

খুশি। দারুণ খাতির করেছে, বাপি!

অমল। তোকে দেখে বুকে জড়িয়ে ধরলো?
বাবু। মানে...উনি অনেকটা—
অমল। বড়ো মাপের মানুষ!
খুশি। বাপি, সেই এগ্‌জিবিশন ম্যাচের আইডিয়াটা দাদাভাই বলেছে ভদ্রলোককে—
অমল। কথার মাঝে কথা বলিস না! শুনে কি বললেন ভদ্রলোক?
বাবু। উনি বললেন...তুমি আমাকে বলতে দিচ্ছো না—
অমল। তুই ওঁর সঙ্গে দেখা করিসনি?
বাবু। আমি ওঁকে দেখেছি...
অমল। তুই নিশ্চয়ই ওঁকে অপমান করেছিস?
বাবু। (খুশিকে) এর সঙ্গে কথা বলা অসম্ভব!

[ট্রাম্পেটের একটা নোট কানে ধাক্কা মারে। বাড়ির সেই মিষ্টি আলো। রাতের আলো, স্বপ্নের আলো। ছোট রাহুল ঢোকে।]

রাহুল। কাকিমা, কাকিমা!
অমল। অঙ্কে ফেল না করলে তোমার চলছিলো না?
বাবু। কিসের অঙ্ক! এসব কি বলছো তুমি?
রাহুল। কাকিমা! কাকিমা!

[বাড়িতে পার্বতীকে দেখা যায়—সেই আগের মতো।]

অমল। অঙ্ক—অঙ্ক—অঙ্ক!
বাবু। শান্ত হও, বাপি!
রাহুল। কাকিমা!
অমল। সেদিন অঙ্কে ফেল না করলে আজ তোমার একটা গতি হয়ে যেতো।
বাবু। আমি বলছি তোমাকে কি ঘটেছিলো—এবং সব কথা তোমাকে শুনতে হবে—(খুশির বাধা উপেক্ষা করে) আমি ছ-ঘণ্টা অপেক্ষা করেছিলাম, বারবার স্লিপ পাঠিয়েছি—আমাকে ডাকেনি শেষ পর্যন্ত ভদ্রলোক...(বাবু বলে যায়, কিন্তু তার কথা শোনা যায় না। রেস্টুরেন্টের ওপর আলো কমে আসে)
রাহুল। বাবু অঙ্কে ফেল করেছে।
পার্বতী। না!
রাহুল। ভবতারণবাবু ওকে ফেল করিয়ে দিয়েছে!
পার্বতী। কিন্তু ওকে যে ইউনির্ভাসিটিতে পড়তেই হবে! বাবু, বাবু, বাবু!
রাহুল। ও চলে গেছে— শেয়ালদা স্টেশনে গেছে!
পার্বতী। শেয়ালদা স্টে...কিরে! ও কি শিলিগুড়ি চলে গেলো?
রাহুল। অমলকাকু কি এখন শিলিগুড়িতে?
পার্বতী। হয়তো তোর অমলকাকু ঐ ভবতারণবাবুকে বলে একটা কিছু... ছেলেটার কি হবেরে—আহা আহা...(বাড়ির আলো মুহূর্তে নিবে যায়।)
বাবু। (টেবিলে সোনার ফাউন্টেন পেন দেখিয়ে বলছে, এখন তার

কথা শোনা যাচ্ছে) এখানেই পি. সি. সেনের সঙ্গে আমার গল্পের ইতি, বুঝেছো! শুনছো আমার কথা?

অমল। (কিংতর্ব্যবিমূঢ়) সব দোষ আমার ঘাড়ে চাপিও না—আমি নয়, তুমি অঙ্কে ফেল করেছো! কিসের কলম?

খুশি। ওরকম একটা কলমের দাম কম করে—

অমল। তুই সেন সাহেবের কলম চুরি করেছিস?

খুশি। বাপি, দাদাভাই কলমটা দিয়ে ক্রস-ওয়ার্ড পাজ্‌ল—হঠাৎ পি. সি. সেনকে দেখে নার্ভাস হয়ে পকেটে—

অমল। ওঃ ভগবানরে!—ও বাবুরে।

বাবু। আমি ও রকমটা করতে চাইনি, বাবা।

অপারেটরের স্বর। গুড ইভ্‌নিঙ, হোটেল শিলিগুড়ি রিসেপশন...

অমল। (চিৎকার করে) আমি আমার রুমে নেই!

বাবু। বাবা! কি হয়েছে তোমার? (বাবু ও খুশি দু'জনেই উঠে দাঁড়ায়)

অপারেটরের স্বর। আপনি লাউঞ্জে বসুন—আমি মিঃ চৌধুরীর রুমে ফোন করে দেখছি—

অমল। আমি—আমি আমার রুমে নেই—বন্ধ করো এ-সব!

বাবু। (আতঙ্কিত—এক হাঁটুতে ভর দিয়ে অমলের সামনে বসে) বোসো তুমি, বোসো।

অমল। নাঃ তোর দ্বারা কিস্‌সু হবে না!

অপারেটরের স্বর। মিঃ চৌধুরীর রুমে ফোন বেজে যাচ্ছে... হোটেলেই কোথাও আছেন—আমি খুঁজতে লোক পাঠাচ্ছি—

অমল। (যেন ছুটে গিয়ে অপারেটরকে চুপ করাতে চায়) না—না—না!

বাবু। বাপি, সেন সাহেব আমার কথা শুনেছেন—ওঁর পার্টনারের সঙ্গে আমায় নিয়ে কথাও হয়েছে— উনি বললেন, শুধু টাকার অঙ্কটা নিয়ে একটু ভাবতে হবে...

অমল। তাহলে মেরে দিয়েছিস তুই!...হাতের মুঠোয় পেয়ে গেছিস—হাতের মুঠোয়?

বাবু। না না! কাল আমার ওর সঙ্গে লাঞ্চ খাওয়ার কথা—কিন্তু আমি যে ওখানে যেতে পারবো না! আমি অন্য কিছু একটা নিশ্চয়ই—

অমল। কেন যেতে পারবি না?

বাবু। বাবা ঐ কলমটা—

অমল। তুই ক্রস-ওয়ার্ড পাজ্‌ল করছিলি—বলবি অ্যাক্সিডেন্টালি—

বাবু। আগের বার ছ'টা ব্যাট নিয়েছিলাম—এবার বলবো, ভুল করে আপনার কলমটা আমার পকেটে—আমি ওঁর মুখোমুখি দাঁড়াতে পারবো না, বাবা!

অপারেটারের স্বর। মিস্টার চৌধুরী, আপনার গেস্ট লাউঞ্জে অপেক্ষা করেছেন—মিস্টার চৌধুরী!

অমল। তোর আর কোনও কিছুর আকাঙ্ক্ষা নেই!—তাইতো?

বাবু। ওভাবে নিয়ো না কথাটা—কেন তবে আমি পি. সি. সেনের কাছে গিয়েছিলাম?

অমল। হ্যাঁ—কেন গিয়েছিলি তাহলে?

বাবু। কেন গেছিলাম? নিজের দিকে তাকাও!

[বাইরে মহিলার হাসি]

অমল। বাবু, কাল তুমি ওখানে লাঞ্চে যাবে। নয়তো—

বাবু। আমার কোনও অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেই!

অমল। আমাকে ঘেন্না করিস তুই?

বাবু। ওঃ জ্বলে যাক সব!

অমল। (বাবুকে মারে, মেরে টেবিল থেকে সরে যায়) তুই... অকম্মা... আমায় ঘেন্না করিস তুই? অকম্মা!

মিস্ হাজরা/স্বর। অমল—কেউ দরজা ধাক্কাচ্ছে!

বাবু। আমি সত্যিই অকম্মা—তুমি কেন দেখতে পাও না?

খুশি। (ওদের থামায়, আলাদা করে দেয়) আরে এটা রেস্টুর‌্যান্ট...থামো দু'জনে থামো! (হঠাৎ মেয়েদের ঢুকতে দেখে) হেল্লো— বোসো তোমরা।

[বাইরে থেকে মহিলার হাসি শোনা যায়।]

মিস্ দাস। আয় বসি। ও রেখা!

মিস্ হাজরা/স্বর। অমল, তুমি কি উঠবে?

বাবু। (অমলকে উপেক্ষা করে) ওয়েলকাম, ওয়েলকাম! বসুন, কিছু খাবেন? উনি আমার বাবা। বোসো বাপি।

রেখা। বাবা! বাবাকে সঙ্গে নিয়ে এখানে—বেশ মজার লোক তো...

মিস্ হাজরা/স্বর। (বেশ জোর দিয়ে) অমল, দরজা খুলে দেখো না কে খট্ খট্ করছে!

[মহিলার কণ্ঠ যেন অমলকান্তিকে টেনে নিয়ে যায়—সে হতভম্ব।]

বাবু। আরে— কোথায় যাচ্ছো তুমি?

অমল। দরজাটা খুলতে হবে...

বাবু। দরজাটা?

অমল। টয়লেট...দরজা...দরজাটা কোথায়?

বাবু। (অমলকে এগিয়ে দিয়ে) সোজা ঐদিকে চলে যাও। (অমলকান্তি যেতে থাকে)

মিস হাজরা/স্বর। অমল—তুমি কি শুয়েই থাকবে না উঠবে? ওঠো, ওঠো-ও!

[অমলকান্তি বেরিয়ে যায়]

রেখা। বাবাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন—বেশ মজার লোক তো আপনারা!

মিস্ দাস। যাঃ উনি মোটেই আপনারা বাবা নন!

বাবু। (প্রজ্বলিত, ঘুরে দাঁড়ায়) শুনুন! উনি কে জানেন? একজন রাজা! ঘামে ভিজে যাওয়া রাজা! ছেলেদের জন্য মরতে পারে এমন রাজা! ছেলেদুটো রাজপুত্র হতে পারলো না,। তবুও উনি রাজা! আপন

রাজা!!

খুশি। তাহলে, মেয়েরা, কি প্রোগ্রাম? কোথায় যাবে বল?

বাবু। বাবার জন্য কিছু করবি না, ভাই?

খুশি। আমি!

বাবু। বুঝতে পারছি, তোর কিচ্ছু এসে যায় না! (পকেট থেকে ফাঁস লাগানো লম্বা দড়িটা বার করে টেবিলে রাখে) এই যে দ্যাখ—হীটারের নীচে লুকোনো ছিলো। শুধু দেখে যাবি তুই?

খুশি। বারে! বাড়ি ছেড়ে বারবার কে চলে যায়?

বাবু। হ্যাঁ। কিন্তু তুই ওকে বাঁচাতে পারিস—আমি যে পারি না! খুশি ওকে বাঁচা—আমায় বাঁচা—আর যে আমি ওর মুখের দিকে তাকাতে পারি না! (কান্নার আবেগে দ্রুত বেরিয়ে যায়)

খুশি। কোথায় যাচ্ছিস তুই?

মিস্ দাস। এতো খেপে গেলো কি নিয়ে?

খুশি। চলো, চলো, ধরে ফেলবো ওকে।

[মহিলার হাসি আর তারই সঙ্গে সঙ্গে—]

অমল। সাড়া দিও না—সাড়া দিও না!

রেখা। আপনার বাবাকে বলে যাবেন না?

খুশি। না—ও আমার বাবা নয়—এমনি একটা লোক। চলো—চলো, ওকে ধরতে হবে...আজিজ, আজিজ!

[ওরা বেরিয়ে যায়। আজিজ বাঁদিকে তাকায় এবং এই অশোভনতায় উত্তেজিত হয়ে—]

আজিজ। মিস্টার চৌধুরী! মিস্টার চৌধুরী! মিস্টার চৌধুরী! মিস্টার চৌধুরী!

[এরপর আজিজ একটা চেয়ার তুলে ঐদিকেই বেরিয়ে যায়। বাইরে দরজায় খট্‌খট্‌ শব্দ। সেই মহিলা হাসতে হাসতে ঢোকে। তার পরনে আল্‌গা-ফেলা শাড়ি। অমল জামার বোতম আঁটছে। উদগ্র জৈবিক বাজনা]

অমল। তোমার হাসিটা থামাবে?

মিস্ হাজরা। দরজাটা খুলে দেখো না—তখন থেকে খট্ খট্...

অমল। আমার সঙ্গে এখানে কে দেখা করতে আসবে?

মিস্ হাজরা। তুমি খুব স্বার্থপর—আর দুঃখী... সেইজন্যই তো তোমাকে এতো পছন্দ করি। তোমাকে এবার খোদ বড়-সাহেবের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো...এসো—মাঝরাতে আর জামায় বোতাম লাগাতে হবে না...(দরজায় আবার ধাক্কা) দরজাটা খুলে দেখবে না একবার?

অমল। কেউ ভুল দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে!

মিস্ হাজরা। তাহলে চলে যেতে বলো!

অমল। ঠিক আছে—তুমি বাথরুমে যাও... বেরিও না কিন্তু! এ-সব হোটেলের নিয়ম কানুন...কিছুতেই বেরিও না!

[আবার দরজায় ধাক্কার শব্দ। অমলকান্তি এগোয়। মহিলা বাঁদিক দিয়ে বেরিয়ে যায়। আলো অমলকান্তির ওপরে। সে ছোট বাবুর মুখোমুখি। বাবুর

হাতে স্যুটকেস, সে এগিয়ে আসে। আবহসঙ্গীত থেমে গেছে।]

বাবু। সাড়া দিচ্ছিলে না কেন?

অমল। বাবু! তুই...শিলিগুড়িতে কি করছিস?

বাবু। তুমি সাড়া দিচ্ছিলে না কেন? পাঁচ মিনিট ধরে দরজায় ধাক্কা দিচ্ছি—তার আগে লাউঞ্জ থেকে টেলিফোন করেছিলাম—

অমল। আমি বাথরুমে ছিলাম...বাড়িতে কিছু হয়েছে?

বাবু। বাবা, আমি অঙ্কে ফেল করেছি।

অমল। রাহুল হেল্প করলো না তোকে ?

বাবু। করেছিলো—তবুও তিন নম্বর শর্ট।

অমল। মাত্র তিনটে নম্বর দেবে না ওরা!

বাবু। অঙ্কের ভবতারণবাবু তো ট্যাবুলেটর...আমি পায়ে ধরেছিলাম...কিছুতেই—তুমি এতো সুন্দর কথা বলো—তুমি বললে উনি ঠিক নম্বর বদলে দেবেন...বাবা...

অমল। চল—আজ রাতেই ফিরে যাবো। তুই নিচে ক্যাশ কাউন্টারে গিয়ে বল আমি এক্ষুণি চেক-আউট করবো। যা জলদি—

বাবু। ইয়েস স্যর! ভবতারণবাবু আমার ওপর কেন খাপ্পা জানো, একদিন ক্লাসে ওর ক্যারিকেচার করেছিলাম—চোখ ট্যারা করে আধো-আধো স্বরে—উনি হঠাৎ ঢুকে পড়ে—

অমল। তাই! কি করেছিলি তুই!

বাবু। 'দ্য থোয়্যার রুত্ অভ্ থিক্তি ত্যু...'

[অমলকান্তির হাসির সঙ্গে বাইরের মহিলার হাসি মেশে।]

অমল। (ইতস্তত না করেই) জলদি নিচে যা। গিয়ে—

বাবু। ভেতরে কেউ আছে?

অমল। না—ও পাশের ঘরে...

[মহিলার হাসি বাইরে থেকে শোনা যায়।]

বাবু। কেউ তোমার বাথরুমে ঢুকেছে?

অমল। না, ও পাশের ঘরে—একটা পার্টি হচ্ছে...

মিস্ হাজরা। (হাসতে হাসতে ঢুকে আধো-আধো স্বরে) আসবো একটু? অমল, বাথ-টাবে কি-যেন একটা আছে—সেটা নড়াচড়া করছে...

[অমলকান্তি বাবুর দিকে তাকায়। বাবু হতভম্ব, আতঙ্কিত, মহিলার দিকে তাকিয়ে।]

অমল। আঃ আপনি বরং আপনার ঘরে চলে যান। ওঁর বাথরুমের ট্যাপটা...সারা ঘর ভেসে যাচ্ছিলো...তাই উনি আমার বাথরুমটা ব্যবহার করছিলেন—ওরা নিশ্চয়ই এতোক্ষণে সারিয়ে দিয়েছে... যান, চলে যান! (মহিলাকে ঠেলতে থাকে)

মিস্ হাজরা। (বাধা দিয়ে) বারে। জামা কাপড় পরতে হবে না—

অমল। বেরোন এখান থেকে! (হঠাৎ প্রাত্যহিক স্বরে) বাবু, মিস্ হাজরা এখানে একটা বড়ো কোম্পানির পারচেজে আছেন... ওঁর রুমের ট্যাপটা সারাচ্ছিলো—যান, আপনার রুমে চলে যান!

মিস্‌হাজরা। বাঃ এই লবি দিয়ে উলঙ্গ হয়ে যাবো নাকি!

অমল। (প্রায় ধাক্কা দিয়ে) এখান থেকে বেরোন আপনি!

[বাবু ধীরে ধীরে স্যুটকেসে বসে পড়ে, বাইরে বিতর্ক চলতে থাকে]

মিস্‌ হাজরা। আমার শাড়ি কোথায়? তুমি ঢাকাই শাড়ি আনবে, প্রমিস করেছিলে, অমল!

অমল। এখানে আমার সঙ্গে ঢাকাই শাড়ি নেই।

মিস্‌ হাজরা। আমি তোমার স্যুটকেসে দেখেছি—কি সুন্দর দু-টো-ওগুলো আমার চাই!

অমল। এই যে—এবার ভগবানের দোহাই, বেরোও তুমি!

মিস্‌ হাজরা। (শাড়ির প্যাকেট নিয়ে ঢোকে) হল ঘরে কেউ না থাকলে বাঁচি, নইলে একটা স্ক্যাণ্ডাল...গুন্নাইট!

[অমলকান্তির হাত থেকে কাপড় চোপড় ছিনিয়ে চলে যায়]

অমল। (স্বল্প বিরতি) চলো, এবার যাওয়া যাক। কাল সকালেই ভবতারণ বাবুকে...তুই আমার জামা কাপড়গুলো...কি হলো? (বাবু নড়ে না, তার চোখে অঝোর জল) ও পারচেজে কাজ করে। ও আমার খদ্দের—তুই কি ভাবছিস? ওকে মাল দেখাচ্ছিলাম...ওর বাথরুমটা জলে ভেসে যাচ্ছিলো—
ওরা সারাচ্ছিলো...(বিরতি)
ঠিক আছে, এবার চলো। আমি তোমায় অর্ডার দিচ্ছি—কান্না থামাও! (বাবুকে জড়িয়ে ধরে) শোন বাবা, বড়ো হলে তুই বুঝতে পারবি। কাল সকালে ভবতারণবাবুকে আমি বলবো।

বাবু। ছেড়ে দাও।

অমল। (বাবুর পাশে বসে) ভবতারণবাবু তোকে তিনটে নম্বর দিয়ে দেবেন—আমি বলবো—

বাবু। উনি তোমার কথা শুনবেন না!

অমল। শুনবেন। নইলে তুই ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হতে পারবি না!

বাবু। আমি ওখানে যাবো না!

অমল। ঠিক আছে, তুই স্পেশাল কোচিং নিয়ে—

বাবু। (কান্না আর বশে নেই) বাবা...

অমল। (কান্নার ছোঁয়ায়) ও আমার কেউ নয়রে, বাবু— বড়ো একা লাগছিলো...

বাবু। তুমি—তুমি ওকে মায়ের ঢাকাই শাড়ি দিয়ে দিলে! (কান্না হু-হু করে নামে . সে উঠে দাঁড়ায়)

অমল। (বাবুকে ধরে) আমি তোকে আদেশ দিয়েছি!

বাবু। ছুঁয়ো না আমাকে—তুমি...মিথ্যুক!

অমল। ক্ষমা চাও! এক্ষুণি ক্ষমা চাও!

বাবু। তুমি জোচ্চোর...তুমি জালি...তুমি ভণ্ড!

[বে-সামাল। হা-হা করে কাঁদতে কাঁদতে স্যুটকেস হাতে বাবু চলে যায়।

অমলকান্তি হাঁটু গাড়া অবস্থায় মেঝেয় বসে থাকে।]

অমল। আমি তোমাকে একটা অর্ডার দিয়েছি! বাবু, ফিরে এসো—নইলে আমি তোমায় চাবকাবো!

[আজিজ দ্রুত ঢুকে অমলকান্তির সামনে দাঁড়ায়]

আমি তোমাকে একটা অর্ডার দিয়েছি...

আজিজ। এই যে, সামলে নিন, সামলে নিন, চৌধুরী সাহেব! (অমলকান্তিকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করে) আপনার ছেলেরা...ঐ...লড়কিদের সঙ্গে চলে গেছেন—বলে গেছেন, বাড়িতে দেখা হবে!

[দ্বিতীয় ওয়েটার সামান্য দূর থেকে স-কৌতূহলে দেখে।]

অমল। কিন্তু আমাদের যে একসঙ্গে খাওয়া- দাওয়ার কথা ছিলো!

[আবহসঙ্গীত শোনা যায়—অমলকান্তির আবহ।]

আজিজ। আপনি পারবেন তো...(অমলকান্তির পোশাক ঝেড়ে দেয়)

অমল। হ্যাঁ...নিশ্চয়ই পারবো...এই যে—এই যে দশটা টাকা—

আজিজ। আপনার ছেলে দাম দিয়ে গেছেন, স্যর!

অমল। বড়ো ভালো ছেলে তুমি...এই যে আরও নাও—এই যে...(একটু থেমে) আচ্ছা..কাছে পিঠে কোনও নার্সারি বীজের দোকান আছে?

আজিজ। ঐ মোড়ে একটা আছে—কিন্তু খোলা থাকবে কি?

[যেমনি অমলকান্তি ঘোরে, আজিজ তার পকেটে টাকা ঢুকিয়ে দেয়।]

অমল। তাহলে বরং তাড়াতাড়ি...কিছু বীজ যোগাড় করতে হবে...নইলে জমিটা পড়ে থাকবে, আবাদ করা হবে না!

[অমলকান্তি দ্রুত বেরিয়ে যায়। আলো কমতে থাকে। আজিজ পেছন পেছন গিয়ে ওর চলে যাওয়া দেখতে থাকে। অপর ওয়েটারটি ওদের দিকে তাকিয়ে থাকে।]

আজিজ। এই—কি দেখছো তুমি?

[সেই ওয়েটার চেয়ার তুলে বেরিয়ে যায়। আজিজ টেবিলটা সরিয়ে নিয়ে যায় । এই অঞ্চলের আলো নিবে যায়। লম্বা বিরতি। বাঁশির সুর ভেসে আসে। অমলকান্তির ঘরে আলো। ঘর খালি। খুশি দোরগোড়ায়, তার পেছনে বাবু। খুশির হাতে গোলাপের তোড়া। সে ঢুকে মাকে খুঁজতে থাকে। এখানে ওখানে—খুঁজে না পেয়ে দূরের বাবুকে ভাব দেখায় কোথায় গেলো! হঠাৎ আবিষ্কার করে পাথর হয়ে পার্বতী বসে আছে, তার কোলে অমলকান্তির কোট। পার্বতী ভীতিকরভাবে উঠে দাঁড়ায়, খুশির দিকে এগোতে থাকে, খুশি পেছোতে থাকে।]

খুশি। আরে—এখানে কি করছো তুমি? (পেছোতে পেছোতে) বাপি কোথায়?

পার্বতী। (এগোতে এগোতে) কোথায় ছিলি তোরা?

খুশি। (হেসে ওড়ানোর চেষ্টায়) দু'টো মেয়ের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেলো...(মাকে দেয়) এই যে. ফুল এনেছি...

[পার্বতী ফুল মাটিতে ছুঁড়ে দেয়। সেগুলো বাবুর, যে ইতিমধ্যে ঘরের

ভেতরে, তার পায়ের কাছে পড়ে।]

পার্বতী। মানুষটা বাঁচুক মরুক, তাতে কিছু এসে যায় না তোদের?

বাবু। এখানে কেউ মারা যাচ্ছে না, বন্ধু!

পার্বতী। আমার চোখের সামনে থেকে চলে যা।

বাবু। আমি বড়োবাবুর সঙ্গে দেখা করবো। (সে এগোতে থাকে, পার্বতী তার পেছন পেছন যেতে থাকে)

পার্বতী। খাবার জন্য ডাকলি...তারপর ওকে ছেড়ে চলে গেলি...রাস্তার লোকের সঙ্গেও তো এই দুর্ব্যবহার কেউ করতে পারে না!

খুশি। কিন্তু বাবা তো আমাদের সঙ্গে বেশ ফূর্তিতে ছিলো—

পার্বতী। ফূর্তি! ফূর্তি তুমি করছিলে—তোমার ঐ রাস্তার বেশ্যাদের সঙ্গে। এখান থেকে বেরিয়ে যা—তোরা দু'জনেই...আর কোনওদিন ফিরে আসিস না। (ফুলের তোড়া তুলতে যায়, নিজেকে সংযত করে) ঐ জঞ্জালগুলো তুলে নাও। তোমরা আমার কলঙ্ক।

(খুশি নীরব প্রতিবাদে ঘুরে দাঁড়ায়। বাবু এগিয়ে আসে, নিচু হয়ে ফুল নেয়।]

মানুষের রক্ত শরীরে থাকলে কেউ পারে?—একটা লোককে রেস্টুরেন্টে ডেকে নিয়ে গিয়ে ফেলে পালিয়ে যেতে পারে?

বাবু। তিনি বুঝি তাই বলেছেন?

পার্বতী। বলার দরকার হয়নি। যখন ফিরলো—পা দুটো যেন পঙ্গু...মুখখানা অপমানে ঝলসে গেছে।

খুশি। কিন্তু মা'ণি—

বাবু। চুপ কর। [খুশি নীরবে ওপরে চলে যায়।]

পার্বতী। তুই—লোকটা বাঁচলো কি মরলো—খোঁজও নিসনি?

বাবু। নাঃ নিইনি! পাবলিক টয়লেটে বিড়বিড় করছিলো— সেই অবস্থায় ফেলে এসেছি!

পার্বতী। ওরে তুই মানুষ না, তুই জানোয়ার।

বাবু। (সম্পূর্ণ আত্মস্থ—ফুলগুলো বাস্কেটে ছুঁড়ে ফেলে দেয়) বসের সঙ্গে আমায় কথা বলতে হবে, মা'ণি—কোথায় তিনি?

(বাইরে থেকে মাটি খোঁড়ার শব্দ ভেসে আসে।)

পার্বতী। পায়ে পড়ি তোর—ওকে একা থাকতে দে!

বাবু। ওখানে—বাইরে কি করছে?

পার্বতী। বাগানে বীজ পুঁতছে।

বাবু। (শান্ত) এখন? ওঃ ভগবান।

[বাবু বাইরে যায়, পেছনে পেছনে পার্বতী। ওদের আলো মরে যায়, সামনের অঞ্চল নীল আলোয় আলোকিত হতে থাকে। সেই আলোয় অমলকান্তি ঢোকে, হাতে বীজের প্যাকেট, খুরপি ইত্যাদি, সে হাতের টর্চের আলোয় প্যাকেটের নির্দেশ পড়তে থাকে।]

অমল। গাজর—ছ'ইঞ্চি ফাঁক দিয়ে বসাতে হবে—লম্বা সারিতে বসবে—(মেপে নেয়) টোম্যাটো—দুটোর মধ্যে তিন ফুট করে জায়গা (ওর

কথার মধ্যে বড়দাকে দেখা যায়— সে অমলের কাছে এগিয়ে আসে। অমল বড়দাকে বলে) কি দারুণ প্ল্যান একখানা — সাংঘাতিক। দিনের শেষে জমার খাতায় কিছু থাকবে না—তাও কি হয়! না বড়দা,ঝট করে কিছু বোলো না! বুঝছো তো প্ল্যানটা? এক থোকে তিন লাখ টাকা। সব কিছু খতিয়ে দেখে তবে বলো...তুমি ছাড়া কে আমায় পরামর্শ দেবে?—আর ঐ মহিলা যে বড়ো কষ্ট পেয়েছে।

বড়দা। (ভাবতে ভাবতে) প্ল্যানটা কি ?

অমল। ইন্‌সিওর করা খামে একটা তিনলাখ টাকার চেক—বুঝছো তো বড়দা?

বড়দা। বোকা বনে যাবে—যদি ওরা পলিসি বাতিল করে দেয়।

অমল। কুলির মতো খেটে এতোগুলো বছর প্রিমিয়াম ওদের নাকের ডগায় ছুঁড়ে দিয়ে এসেছি—আর আজ ওরা আমার পাওনা মেটাবে না!

বড়দা। লোকে কাপুরুষ বলবে, অমল।

অমল। কাপুরুষ! জীবনভোর ফোন ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে প্রত্যেকবারই রঙ নাম্বার!—তাতেই বুঝি খুব পৌরুষ!

বড়দা। হ্যাঁ, সেটা একটা পয়েন্ট...আর তিন লক্ষ টাকা—হাতের মুঠোয় ধরার মতোই অঙ্ক।

অমল। (আশ্বস্ত-শক্তিমান, উঠে দাঁড়ায়) তাহলে! বলো, বড়দা সুন্দর নয় প্ল্যানটা?—প্রতিশ্রুতি নয়, অ্যাপয়েন্টমেন্ট নয়—কড়কড়ে তিন লাখ টাকা! বাবু ভাবে, আমি ফালতু— তাই আমাকে ঘেন্না করে। এবার দেখবে—শ্রাদ্ধবাসরে কতো লোক— দার্জিলিঙ, মালদা, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, ২৪-পরগণা থেকে—ওদিকে রাঁচি, গৌহাটি, ইম্ফল থেকে— শবযাত্রায় কতো লোক, কতো ভালোবাসা...এবার নিজের চোখে ছেলেটা শেষবারের মতো দেখবে—আমি কে!

বড়দা। ও তোমায় কাপুরুষ ভাববে।

অমল। না না! সে আমি সহ্য করবো না!

বড়দা। ও তোমাকে ঘেন্না করবে!

অমল। ওঃ বড়দা!... সেইসব দিনগুলোয় ও আমাকে কেমন ভালোবাসতো... কেন—আমি ওকে এমন একটা কিছু দিতে পারি না—যা পেয়ে আর আমাকে ঘেন্না করবে না!

বড়দা। আমাকে একটু ভাবতে দাও। (ঘড়ি দেখে) তোমার প্ল্যানটা ভালোই—শুধু দেখতে হবে যেন শেষ রক্ষা হয়।

[বড়দা পেছন দিকে দৃষ্টির বাইরে চলে যায়। বাবু এগিয়ে আসে।]

অমল। (হঠাৎ বাবুর উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওর মুখের দিকে তাকায়—বিভ্রান্ত, বীজের প্যাকেটগুলো তুলে নেয়) সেই বীজগুলো ছাই কোথায় গেলো...এই অন্ধকারে কিচ্ছু দেখার জো নেই!

বাবু। চারপাশের লোকজন দেখছে...

অমল। আমি ব্যস্ত—আমায় বিরক্ত কোরো না।

বাবু। (অমলকান্তির হাত থেকে খুরপিটা নিয়ে) বাপি, আমি চলে যাচ্ছি...আর ফিরবো না!

অমল। (নড়বার ক্ষমতা নেই) কাল সেন সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে যাবে না?

বাবু। আমার কোনও অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেই বাবা।

অমল। লোকটা তোমায় বুকে জড়িয়ে ধরলো—

বাবু। বাপি। আজ আমি নিজের সম্পর্কে একটা কিছু বুঝতে পেরেছি—তোমাকে বোঝাতে পারলাম না...কার দোষ—কেন—সেসব চুলোয় যাক (অমলকান্তির বাহু-মূল ধরে) এসো, সবটা চুকিয়ে ফেলি। চলো, ভেতরে গিয়ে মা'কে বলি কথাটা (আদর করে অমলকান্তিকে টেনে নিয়ে যেতে চেষ্টা করে)

অমল। (প্রচণ্ড অস্বস্তি) না না, আমি ওর সঙ্গে দেখা করতে চাই না!

বাবু। কেন? তোমার তো কোনও দোষ নেই—আমি আমি-ই একটা অকর্মা...জঞ্জাল। এবার ভেতরে এসো। (অমলকান্তি ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে) শুনছো, আমার কথা?

[অমলকান্তি হাত ছাড়িয়ে নিজেই চলে যায়, বাবু অনুসরণ করে।)

পার্বতী। তুমি বীজ পুঁতেছো? (অমল প্রতিক্রিয়াহীন]

বাবু। কেউ খোঁজ করলে বোল— তোমরা জানো না। ঠিক আছে? (অমলকান্তির কাছে গিয়ে) তুমি আমায় আশীর্বাদ করবে না...বন্ধু। বলো কিছু!

পার্বতী। ওর মাথায় হাতটা দাও!

অমল। (দগদগে আঘাত। বাবুর দিকে ঘুরে) কলমটার কথা উল্লেখ করার দরকার নেই, বুঝেছো!

বাবু। (মিষ্টি করে) উনি আমায় অ্যাপয়েনমেন্ট দেননি বাবা!

অমল। (তীব্র ভাবে ফেটে পড়ে) তোমাকে দু—হাতে ধরে উনি...?

বাবু। তুমি কি কখনো বুঝবে না...ঠিক আছে—যদি কোনওদিন লক্ষ্মীর ভাণ্ডার লুঠতে পারি, তোমাকে চেক পাঠিয়ে দেবো!

অমল। (পার্বতীকে) ঘেন্না-দেখেছো?

বাবু। মাথায় হাতটা দাও, বাবা।

অমল। না। (বাবু এক মুহূর্ত ওর দিকে তাকায়, হঠাৎ ঘুরে সিঁড়ির দিকে চলে যায়।) এই বাড়ি ছেড়ে চলে গেলে তোমার যেন অনন্ত নরকবাস হয়।

বাবু। (ঘুরে) আমার কাছ থেকে কি—কি চাও তুমি?

অমল। আমি চাই সর্বনাশের শেষ সীমায় পৌঁছে—কোন বস্তিতে কোন আঘাটায়—ধুঁকতে ধুঁকতেও যেন এই কথাটা তোমায় তাড়িয়ে বেড়ায়—শুধু ঘেন্না করে তুমি নিজের সর্বনাশ করেছো। আমায় যেন

দোষী কিছুতেই কোরো না! (খুশি নীচে নেমে সিঁড়ির শেষ ধাপে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করে।)

বাবু। আমি তোমাকে দোষ দিচ্ছি না!

অমল। তুমি আমার এইখানে ছুরি বসাতে চাইছো!

বাবু। ঠিক আছে ভণ্ড মহারাজ! তাহলে সব তাস খুলেই খেলা হবে। (ফাঁস লাগানো দড়িটা টেবিলে রাখে)

খুশি। পাগল হয়েছিস!

পার্বতী। বাবু! (ওটা নেবার জন্য এগোয়, বাবু আটকায়)

বাবু। ওখানে থাকুক—সরাবে না ওটা!

অমল। (ওদিকে না তাকিয়ে) ওটা-কি ওটা!

বাবু। তুমি খুব ভালো করেই জানো ওটা কি!

অমল। (খাঁচায় আটকা, পালাতে চেষ্টা করে) আমি ওটা কখনো দেখিনি।

বাবু। তুমি এটা দেখেছো। ইঁদুর এটা মুখে করে গ্যাস-হীটারের তলায় রেখে যায়নি! কি হবে এটা করে? শহীদ হবে? কেউ তোমার জন্য চোখের জল ফেলবে না!

পার্বতী। থামা এবার!

অমল। ঘেন্নাটা দেখেছো, তুমি!

বাবু। না, সত্যটা দেখতে হবে তোমায়! তুমি কি! এ বাড়িতে নাগাড়ে দশ মিনিট আমরা কোনও দিন সত্যি কথা বলিনি!

খুশি। আমরা কখনো মিথ্যে কথা বলিনি।

বাবু। তুই তো মিথ্যের সম্রাট! তুই এ্যাসিস্ট্যান্ট পারচেজ ম্যানেজার?—তুই তো আসলে পারচেজের এ্যাসিস্ট্যান্ট ক্লার্ক।

খুশি। বলতে গেলে তো আমিই—

বাবু। বলতে গেলে—তুমি গরম হাওয়ায় ভর্তি ফানুষ!...আমিও তাই...আমরা সবাই রঙীন ফানুষ! কিন্তু এবার আমি মাটিতে নামতে চাই...শুনছো তুমি? আমি এই-ই!

অমল। আমি জানি তুমি কি!

বাবু। তুমি জানো? জানো তুমি—কেন আমার তিনমাস কোন ঠিকানা ছিলো না?—শকরপুরাতে একটা স্কুটার চুরি করে আমি জেল খাটতে গিয়েছিলাম। মা'নি তোমার কান্না থামাও! (পার্বতী অপর দিকে ফিরে মুখ ঢেকে কাঁদে) তুমি জানো?—কলেজ ছাড়ার পর থেকে প্রত্যেকটা চাকরি আমি চুরির দায়ে খুইয়েছি?

অমল। এবং সেটা কার দোষ?

বাবু। কে আমার দিব্যি দিয়েছিলো—যেখানেই যাও, দু'দিনের মধ্যে হম্বি-তম্বি করে লাটের বাঁট হতে হবে?—বুঝে নাও কার দোষ!

অমল। তাহলে গলায় দড়ি দে। এতোই যদি ঘেন্না তোর-গলায় দড়ি দিয়ে মর!

বাবু। না, কেউ গলায় দড়ি দেবে না, অমলকান্তি চৌধুরী! আজ

এগারোতলা সিঁড়ি ভেঙেছি—হাতে একটা কলম। হঠাৎ থেমে গেলাম! শুনছো?—ঐ অফিস বিল্ডিঙের মাঝখানে—হঠাৎ জানলা দিয়ে আমি আকাশটা দেখতে পেলাম—আমার ভালোবাসার সবকিছু দেখতে পেলাম—লোকে কাজ করছে, বসে আছে, খাচ্ছে, গপ্পো করছে, সিগারেট ফুঁকছে—আমি কলমটার দিকে তাকালাম আর ভাবলাম—আমার হাতের মুঠোয় এটা কি-ই? যা আমি হতে চাই না, কেন আমি ভিখিরির মতো মরে যাচ্ছি তাই হবার চেষ্টায়? যখন আমি জানি ঐ বাইরে রয়েছে আমার প্রাণের দুনিয়া!

অমল। তোমার ঐ জীবনের দরজা খোলা রয়েছে!

বাবু। বাপি, আমি 'লে-লো বাবু ছে-আনা'—তুমিও তাই!

অমল। আমি 'লে-লো বাবু ছে-আনা' নই!—আমি অমলকান্তি চৌধুরী। আর তুমি বাবুয়া চৌধুরী।

বাবু। বাপি, তুমি লীডার নও! আমি হিরো নই! ছত্রিশ বছর গতরে খেটে হাজার হাজার লোকের মতো তুমিও দেউলে...চৌত্রিশ বছরের দামড়া আমি—আমার দর ঘণ্টায় সাড়ে সাত টাকা, মাসে আঠারো শো! বাপি, আর আমি কোনদিন প্রাইজ নিয়ে বাড়ি ফিরবো না—তুমিও আর দরজা গোড়ায় আমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থেকো না।

অমল। (সোজাসুজি বাবুকে) ঘেন্নায় প্রতিশোধের জ্বালায় তোর চোখ চকচক করছে রে—অকম্মা!

[বাবু খুশির হাত ছাড়িয়ে নেয়। অমলকান্তি ভয় পেয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে শুরু করে। কিন্তু বাবু তাকে ধরে ফেলে।]

বাবু। (রাগের উচ্চতম শিখরে) বাপি, আমি অকম্মা—আমি ফালতু, আমি কিচ্ছু না। বাপি, কেন তুমি বুঝতে পারো না—আমার মধ্যে আর ঘেন্না নেই?—আমি আমি—ই?—আমি যা আমি তাই?

[বাবুর রাগ ফুরিয়ে গেছে। সে ভেঙে পড়ে, ফোঁপাতে ফোঁপাতে ধরে অমলকান্তিকে। আর অমলকান্তি বাবুর মুখটার খোঁজে হাতড়াতে থাকে।]

অমল। (অবাক) তুই কি করছিস? তুই কি করছিস? (পার্বতীকে) ও কাঁদছে কেন?

বাবু। (কাঁদতে কাঁদতে ভাঙে) আমাকে চলে যেতে দাও—নইলে যে সাংঘাতিক একটা কিছু ঘটে যাবে! (নিজেকে সামলে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে শুরু করে) আমি সকালে চলে যাবো। শুইয়ে যাও—ওকে শুইয়ে দাও!

অমল। (লম্বা বিরতি। বিস্মিত, উদ্দীপ্ত) কি আশ্চর্য! বাবু—ও আমাকে পছন্দ করে!

পার্বতী। ও তোমাকে খুব ভালবাসে।

খুশি। চিরকালই বাসতো, বাপি!

অমল। ওঃ বাবু! (বড়ো বড়ো চোখে) ও কাঁদছিলো: আমার কাছে কাঁদছিলো! (ভালোবাসায় দম আটকে আসে, তাই চিৎকৃত

প্রতিশ্রুতি) ঐ ছেলে—ওর উন্নতি হবেই!

[আলোয় প্রকাশিত বড়দা—একটু দূরে।]

বড়দা। হ্যাঁ, তিনলাখ হাতে পেলে ও খুব উন্নতি করবে।

পার্বতী। (অমলকান্তির মনের গতি বুঝতে পেরে, সভয়ে সযত্নে) এবার শুতে এসো তুমি লক্ষ্মীটি। সব তো ঠিক হয়েই গেলো!

অমল। (বাড়ির বাইরে না গিয়ে বসে থাকা কঠিন) হ্যাঁ, আমরা ঘুমোবো চলো। খুশি, ঘুমোতে যা।

বড়দা। আর এটাও মানতে হবে, জঙ্গল থেকে হীরে ছিনিয়ে আনতে হিম্মৎ লাগে।

[শঙ্কার আভাস নিয়ে বড়দার কল্পলোকের বাজনা উঠে আসে।]

খুশি। (মা-র কপালে চুমু খায়) যাই, বাপি। (যেতে থাকে)

পার্বতী। ভালো হ'বাবা... তোরা দু'জনেই তো ভালো ছেলে। আর দিশা হারাসনে তোরা। (খুশি চলে যায়, অমলকান্তিকে) এসো তুমি।

অমল। একটু সামলে নিতে দাও, পার্বতী। একটু একা বসতে দেবে আমাকে?

পার্বতী। (প্রায় উচ্চারিত ভয়ে) তোমাকে...ওপরে চাই আমার...বড়বাবু।

অমল। (বুকে টেনে নিয়ে) একটু পরেই, ছুটকী। আমি এক্ষুনি ঘুমোতে পারবো না। তুমি যাও। (জড়িয়ে ধরে)

বড়দা। নাঃ এ কোন ফাঁপা প্রতিশ্রুতি নয়—মুঠোর ভেতরে কঠিন ঝকঝকে হীরের মতোই।

পার্বতী। আমার মনে হয়, এ ছাড়া আর কোন পথ ছিলো না।

বড়দা। একমাত্র পথ।

অমল। নিশ্চই—এটাই একমাত্র পথ। এবার সবকিছু একেবারে—তুমি যাও—পার্বতী শুতে যাও।

পার্বতী। এক্ষুনি এসো তুমি।

অমল। দু'মিনিট। (পার্বতী চলে যায়) আমাকে ভালোবাসে। চিরকালই বাসতো! বড়দা—এরজন্যে ও আমাকে পূজো করবে!

বড়দা। পথ অন্ধকার—কিন্তু হীরে-পান্নার আলোয় দিশা পেয়ে যাবে।

অমল। পকেটে তিনলাখ টাকা থাকলেও ও আবার রাহুলের চেয়ে এগিয়ে যাবে।

পার্বতী। (ভেতর থেকে) শুনছো-ওপরে এসো।

অমল। (সেই দিকে এগিয়ে) হ্যাঁ, হ্যাঁ, আসছি। খুব বুদ্ধি করেছি এটা—বুঝলে। বড়দা পর্যন্ত মেনে নিয়েছে। যেতে হবে যে, সোনা-বৌ-এবার যাই...বাই—বাই...(প্রায় নেচে নেচে বড়দার দিকে যায়)

বড়দা। না প্ল্যানটায় কোন ফাঁক নেই!

অমল। ওঃ যখন কাঁদছিলো—যদি ওর কপালে একটা চুমু খেতে পারতাম!

বড়দা। সময় হয়ে গেছে, অমলকান্তি।

অমল। বড়দা! আমি জানতাম—শেষ পর্যন্ত ঠিক মেরে দেবো—আমি আর বাবু!

বড়দা। (ঘড়ি দেখে) দেরি হয়ে যাচ্ছে—এবার নৌকো ছাড়বে...(ধীরে ধীরে অন্ধকারে মিশে যায়।)

অমল। (বাড়ির উদ্দেশ্যে—যেন বিদায় ভাষণ) এবার থেকে এমন একটা লম্বা ব্যাট হাতে নিও—যেখানেই বল যাক—ঠিক ছুঁয়ে দিতে পারবে—আর বলটা মারবে নিচু করে সপাটে (হঠাৎ দর্শকদের দিকে ঘুরে) নইলে কিন্তু...গ্যালারিতে নামী দামী সব দর্শক...প্রথম কাজটাই তো...(হঠাৎ অনুভব করে একা) বড়দা। এবার কোন পথে...(দ্রুত ঘোরে—যেন খুঁজছে) বড়দা। এবার কেমন করে...আমি...?

পার্বতী। (দূর থেকে) শুনছো...তুমি আসছো...?

অমল। (ভয়ের চাপা আর্তনাদ করে ওঠে—ঢেউয়ের মতো দুলতে থাকে—যেন পার্বতীকে চুপ করানোর চেষ্টায়) শ্ শ্ শ্। (ঘোরে, পথ খোঁজে। যেন ধ্বনি, কণ্ঠস্বর, মানুষের মুখ ওকে ভীড় আপ্লুত করে ফেলেছে—যেন সেই সবের দিকে ও ছুঁড়ে দিচ্ছে—) শ্ শ্। শ্ শ্! (হঠাৎ চড়া অথচ ক্ষীণ আবহ সঙ্গীত ওকে থামিয়ে দেয়। সেই সঙ্গীত তীব্রতায় যেন অসহ্য চিৎকার হয়ে ওঠে। চুপিসাড়ে পায়ের আঙ্গুলে ভর দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে ছুটে বেরিয়ে যায় অমলকান্তি) শ্ শ্ শ্ শ্ শ্!

[উত্তর মেলে না। পার্বতী অপেক্ষা করে। বাবু বিছানায় উঠে বসে। সে দাঁড়িয়ে শুনতে চেষ্টা করে।]

পার্বতী। শুনছো? (সত্যি ভয় পেয়ে) শুনছো—উত্তর দিচ্ছো না কেন? বড়োবাবু।

[একটা গাড়ি স্টার্ট দেবার আওয়াজ। মুহূর্তে প্রচণ্ড গতি। ভয়ঙ্কর গর্জনে সেই গাড়িটা দূরে যেতে থাকে।]

না..........!

বাবু। (দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে নামে) বাপি..........!

[গাড়িটা দ্রুত হারিয়ে যায়। আবহসঙ্গীত মাতালের মতো আছড়ে পড়ে। তার রেশে চেলোর একটি তার যেন হৃৎপিণ্ডের ধুকপুকানির ছন্দে বাজতে থাকে। বাবু ধীরে ঘরে ফিরে যায়। সে ও খুশি পোশাক পরে নেয়। বাবু বেরিয়ে যায়। আবার সুর শোক সঙ্গীতের বৈরাগ্যে মেশে। পর্দা নেমে আসে। সকলে যথাযোগ্য পোশাকে ভেতরে আসে। সবার চলাচল থেকে যায় যখন আমরা দেখি পার্বতী বৈধব্যের পোশাকে এসে দাঁড়ায়। ওরা সবাই পার্বতীর কাছাকাছি এসে থামে। পার্বতী একটি ছবির সামনে বসে একা।]

[শ্রাদ্ধিক গাথা।। অমলকান্তির একটি ছবি। তাতে মালা দেওয়া। পার্বতী সেই ছবির সামনে বসে। অন্যান্যরা পেছনে এখানে ওখানে।]

রাজেন। অনেক রাত হলো, বৌঠান। এবারে উঠুন।

বাবু। কি গো মা'ণি, একটু বিশ্রাম নেবে না?

রাজেন। শ্রাদ্ধ-ক্রিয়া ঠিকঠাকই গেলো...

পার্বতী। অতো লোক—যারা ওকে চিনতো কেউ এলো না কেন? হয়তো সবাই ওকেই দুষছে!

রাজেন। না না.....পৃথিবীটা খুব কঠিন—কে কাকে দোষ দেবে?

পার্বতী। আমি বুঝতে পারছি না—ঠিক এই সময়েই...কেন?...শুধু মাইনেটা পেলেই তো—

রাজেন। বাঁচতে গেলে মাইনে ছাড়া আরও কিছু লাগে!

বাবু। নিশির ডাকের মতো সব বাজে স্বপ্ন বাবাকে জীবনভোর তাড়িয়ে বেড়ালো।

খুশি। বাজে কথা বলিস না!

রাজেন। তোমরা বুঝবে না! একজন ফেরিওয়ালাকে স্বপ্ন দেখতেই হয়—নয়তো কোন মন্ত্রে সে আর সবাইকে স্বপ্ন দেখাবে?

বাবু। খুশি, তুই আমার সঙ্গে যাবি?

খুশি। নাঃ আমি এখানে এই শহরেই লড়ে যাবো!

বাবু। (সম্পূর্ণ হতাশ ভাবে খুশির দিকে তাকায়। তারপর মায়ের দিকে নিচু হয়ে) চলো, ওঠো মা'ণি।

পার্বতী। একটু পরেই যাচ্ছি। একমিনিট—একটু একা থাকতে দে!

[সবাই দূরে চলে যেতে থাকে। পার্বতী সুদৃঢ় সোজা বসে। বাঁশির সুর—বেশি দূরে নয়—পার্বতীর কথার তলায় বাজাতে থাকে।]

পার্বতী। আমায় সাহায্য করো, বড়বাবু....আমি যে কাঁদতে পারছি না। মনে হচ্ছে, বুঝি আবার তুমি ট্যুরে গেছো—মনে হচ্ছে, এই বুঝি তুমি ফিরবে! আমি কাঁদতে পারছি না। কেন অমন করলে....খুঁজছি,ভাবছি—উত্তর যে পাচ্ছি না কিছুতেই....! বাড়ির শেষ কিস্তিটাও আজ শোধ হয়ে গেলো...কাল থেকে এ-বাড়িতে আমি একা...(গলায় ফোঁপানির আভাস) মুক্তি হয়ে গেলো আমাদের...(বাবু ওর দিকে এগোতে থাকে) আমরা এখন ঝাড়া হাত-পা....আমরা একেবারে মুক্ত...

[বাবু হাত ধরে ওকে ওঠায়, দু-হাতে ধরে পেছন দিকে নিয়ে যেতে থাকে। রাজেন এবং রাহুল একসঙ্গে ওদের পেছন পেছন যায়, সব্বার পেছনে খুশি। ক্রমে অন্ধকার নামে। বাঁশির সেই সুরে মঞ্চের অন্ধকার পূর্ণ হয়ে ওঠে। আর তারই সঙ্গে ক্রমেই পেছনের অ্যাপার্টমেন্ট হাউসগুলো তাদের রক্তচক্ষু মেলে সব কিছুকে অধিকার করে ফেলে...।]

পর্দা

গোত্রহীন

মূল নাটক : আর্থার মিলার

মঞ্চ	॥	সঞ্চয়ন ঘোষ
আবহ	॥	পার্থপ্রতিম দেব
পোশাক	॥	স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত
শব্দ প্রক্ষেপণ	॥	হিমাংশু পাল
আলো	॥	জ্যোতি দত্ত
রূপসজ্জা	॥	সুমৌলীন্দ্র আচার্য
প্রযোজনা সহযোগ	॥	পরিমল মুখোপাধ্যায় দেবশঙ্কর হালদার
নির্দেশনা সহায়তা	॥	স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত গৌতম হালদার

প্রথম অঙ্ক

[পোর্ট এরিয়ায় কোনও এক রাস্তা। রাস্তা এবং কোনও টেনেমেন্ট বিল্ডিঙের ও একটি ফ্ল্যাটের সামনের অংশ। প্রধান অ্যাক্টিং এরিয়া সালেক আহমেদ খানের ফ্ল্যাটের বসার-খাবার ঘর। পরিচ্ছন্ন অনাড়ম্বর ঘরোয়া পরিবেশ। ঘরের সামনের দিকে একটা রকিং চেয়ার। তক্তাপোষ মতোন ঘরের কেন্দ্রে। অন্যান্য কিছু বসার আসবাব। একটি ছোট চেয়ার দেয়াল ঘেঁষে, তার ওপর টেপ রেকর্ডার। এই সেট সলিড নয়—স্কেলিটাল। পেছনের দেওয়ালে একটি দরজা শোবার ঘরের, অপরটি রান্নাঘরের—যে ঘর-দুটি কখনই দেখা যায় না।

মঞ্চের একেবারে সামনে ডানদিকে একটি ডেস্ক ও বসার জায়গা—এটি খোন্দকার, মহম্মদ হারুণের অফিস। মঞ্চের বাঁদিকে একটি টেলিফোন বুথ। নাটকের শেষ ভাগে একবার মাত্র ব্যবহার হয়। প্রযোজনার প্রয়োজনে এটি খোলা বা ঢাকা থাকবে।

এছাড়া অন্যান্য বসতি , জাহাজ-ঘাটার আভাস-ছড়ানো ছেটানো।

পর্দা খুললে দেখা যায় দুই জাহাজী লতিফ ও মতীন রাস্তার ওপরে বাড়ি ঘেঁষে পয়সার খেলা খেলছে। দূর থেকে মাঝেমধ্যে শোনা যায় জাহাজের ভোঁ।

খোন্দকার মহম্মদ হারুণ—উকিল—প্রবেশ করে। পঞ্চাশোর্ধ্ব, রসবোধ আছে, আছে ভাবনা-চিন্তার অভ্যাস। তাকে ঢুকতে দেখে জাহাজী দুজন অতি অল্প আদাব করে। হারুণ সাহেব মঞ্চ অতিক্রম করে নিজের অফিসে যায়, টুপি, জিনিসপত্র রাখতে থাকে, চুলে হাত চালায় । তারপর একটু দুষ্টু হাসি হেসে দর্শকদের উদ্দেশে]

হারুণ। আপনাদের বোঝার কথা না—এক্ষুণি একটা ছোট্ট মজা হল। আপনারা দ্যাখলেন কেমন অস্বস্তি নিয়া অরা আমারে আদাব করল? কারণ আমি পেশায় উকিল। (আর এই পোর্ট এরিয়ায় ডাক্তার-মৌলবী-মোক্তারদের সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়া মানেই—নির্ঘাৎ হাঁড়ি ফাটিবে। শুধু বিপদের সময় উকিল-চাচা মনে পড়ে, অন্যথায় ওরা চট করে কাছ ঘেঁষতে চায় না। আমার প্রায়ই মনে হয় ওদের এই কিপ্টার মতো আদাবের পিছনে লুকিয়ে আছে শয়ে শয়ে বছরের অবিশ্বাস।) উকিল মানেই আইন—আর বাংলাদেশে (অর্থাৎ সেই পূর্ববঙ্গের অনেক জায়গাতেই— যেখান থেকে ওদের বাপ-দাদারা

এসেছে—সেইখানে সেই মোগল-পাঠান-পোর্তুগিজ হার্মাদদের রাজত্ব শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও) আজও আইনরে কেউই বিশেষ ভালো চোখে দ্যাখে না।

আমার স্বভাব হল সর্বনাশ-ভাঙন লক্ষ্য করা। হয়তআমি নদীর দেশের লোক বাঙ্গাল বলে। আমি এদেশে এসেছি আমার বাইল্য কালে। সেই যখন বাঙ্গালরা এদেশ কাঁপাচ্ছে—খেলার মাঠের দাঙ্গায়, কলোনি বসানোয়, রক্তাক্ত তাগিদে, লিডারির লোভে নাইলে ক্যাডারির ত্যাগে —কথায় কথায় ছুরি কাটারি তরোয়াল টাঙ্গি কখনও বা চেম্বারও বাইরয়ে পড়ত। 'বাঙ্গাল' 'বিদেশী'—এইসব সম্ভাষণে বিদ্রূপে হঠাৎই রক্ত চড়ে যেত মাথায়! কিছু অন্যায়কারীর হাতে ন্যায়সঙ্গতভাবেই। কিছু লাশ পড়ে যেত। আইনের বিচার হত না, কিন্তু ন্যায়ের বিচার হত।) কিন্তু অখন এই ধান্দাল বিদেশীরা অনেক শান্ত অনেক সভ্য। এই পোর্টে সারা পূর্বভারতের খিদা মিটানোর জন্য অহরহ জাহাজ ঢোকে। সেই বিশাল যজ্ঞের নানান স্তরে আমরাও জড়িয়ে আছি। কিন্তু আমরা তো এখন সভ্য। —হিন্দুশাস্ত্রের বাণী 'অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ'' আমরা শিখে নিয়েছি। তাই পুরা জীবনের আকাঙ্ক্ষায় আর আমেরা নিজের বা অন্যের লাশ বাভি ধরি না। অর্ধেকটা নিয়াই সন্তুষ্ট থাকি। সেইটাই তো বুঝদারের হিসাব। (তাই আমি অখন আর ড্রয়ারে ছোরা-পিস্তল রাখি না—বড়জোর একটা বইয়ের পাতা কাটার ছুরি!.....যাক্ ওসব কথা!...)

আমার এই ওকালতির প্রেকটিস বড়ই নীরস; গদ্যময়। আমরা বন্ধু-বান্ধব বিবিও তাই কয়। আর আমার এই প্রতিবেশীদের জীবন বড়োই বিবর্ণ ম্লান। সত্য বলতে কাদের নিয়া জীবন কাটাইছি আমি?—জাহাজী খালাসী সেইলর-স্মগলার, দর্জি-কশাই-এক্কাওয়ালা ...তাদের বিবি আব্বা নানা নানী গুড়া-গুড়ি চ্যাঁ-ভ্যাঁ ...আর তাদের উচ্ছেদ, অ্যাক্সিডেন্ট, ক্ষতিপূরণ, ঘরের কাজিয়া—গরিব মানুষদের ছোট-খাটো সমস্যা।

তবুও কিছুদিন পরপর এ্যামন এ্যাক এ্যাকটা কেস এসে পড়ে—যখন সেই মক্কেলরা মাথা খুঁড়ে বোঝানোর চেষ্টা করে আসল ঘটনাটা কি (—তখন আমার এই অফিস ঘরের বদ্ধ বাতাসে হঠাৎ নোনা সমুদ্রের জোয়ার আসে, সবকিছু কেমন যেন টান-টান লাগে—হঠাৎই মনে হয়, সেই পার্বত্য চট্টগ্রামের শির-শিরা হাওয়ার মাঝে নয়ত হারুণ অল রশিদের দামাস্কাসে অন্য কোনও পোশাক -পরা, অন্য-ভাষার, অন্য-চেহারার অন্য কোনও মোক্তার এই একাই) তখন নালিশ শোনতে শোনতে (আমারই মতো ভেবেছিলো মনে হয় আমার), 'হা আল্লাহ্' কি করি আমি কি করি অখন!' (তারপর আমারই মতো অক্ষম দর্শকের মতো শুধু দেখেছিল ঘটনার রক্তাক্ত পরিণতি)।

[সালেক মঞ্চে এসেছে। চল্লিশোর্ধ্ব জাহাজী। সে লতিফ-মতীনের সঙ্গে খেলায় যোগ দেয়]

ওর নাম ছিল সালেক আহমেদ খান। এই ডকেই কাজ করত।

[হারুণ অন্ধকারে হারিয়ে যায়]

সালেক। **[নিজের বাড়ির দিকে যেতে শুরু করে। শাহীন রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে জানলা দিয়ে বাইরে তাকায়]**বাসাই যাই গিয়া দোস্তো।

লতিফ। কাইল কামে যাইতাছেন?

সালেক। হ, দুইদিনের কাজ বাকি আছে এই জাহাজে। আসিরে লতিফ।

[সালেক বাড়িতে ঢোকে। ভেতরের আলো জ্বলে ওঠে। শাহীন লতিফের উদ্দেশে হাত নাড়ে, সালেকের দিকে ঘোরে]

শাহীন। এসে গ্যাছো, জামাই !

সালেক। এ্যাতো সাইজা-গুইজা কোথায় যাইতাছ?

শাহীন। আজই দিল দর্জি—তোমার পছন্দ?

সালেক। তোমার চুলে ...কি করছো?

শাহীন। তোমার পছন্দ হয়েছে? ম্যাগাজিন দেখে অন্যরকম করেছি। তিনি এসে গ্যাছেন—বুইন!

সালেক। অতি সুন্দর! ঘোর দেখি, পিছনটা দেখি....তর মা যদি বেঁচে থাকতো— এই তরে দ্যাখলে চেনতেই পারতো না।

শাহীন। তোমার ভালো লেগেছে—কি?

সালেক। পটের বিবির মতো দ্যাখ্যয় তোমারে। কোথায় যাইতাছো?

শাহীন। **[সালেকের হাত ধরে]** দাঁড়াও, বুইন-মাসি আসুক—তোমাকে একটা কথা বলবো। এই যে, বোসো এখানে। **[চেয়ারের দিকে নিয়ে যেতে যেতে মঞ্চের বাইরের উদ্দেশ্যে]** জলদি করো না, বুইন— বুইন-মাসি ...কিগো !

সালেক। **[বসে]** কিছু হইছে নাকি ?

শাহীন। তোমরা জন্য একটু চা বানাই, কেমন?

সালেক। ঘটনাটা কি ? এইদিকে আসো—কও আমারে।

শাহীন। বুইন এলে তারপরে বলবো আমি। এই ড্রেসটায় কত খরচ পড়লো বলো তো!

সালেক। এইটা বড়ো আঁটো-সাটো লাগে...ঠিক না?

শাহীন। জামাই! This is the latest fashion...দেখো, রাস্তা দিয়ে যখন হেঁটে যাবো—

সালেক। শোনো, রাস্তা দিয়া যখন হাঁটো তুমি —বড়ো ঢলো ঢলো লাগে—

শাহীন। কেন?

সালেক। ভাইবো না আমি টিক-টিক করি—কিন্তু সত্যই কই—বড়ো পিছনে মুড়াইয়া হাঁটো তুমি!

শাহীন। আমি পেছন দুলিয়ে হাঁটি?

সালেক। শোনো, আমারে চটায়ো না, শাহীন—তুমি দোল দিয়া হাঁটো...আর

তোমার ঐ নতুন হাই হিল— খট্ খট্ খট্ খট্—রকের ছ্যামরারা য্যান্ ড্যাবড্যাব কইরা তোমারে গেলতে থাকে—

শাহীন। কিন্তু ঐ ছেলেগুলো তো যে কোনও মেয়ে দেখলেই গেলতে থাকে— তুমি জানো না!

সালেক। যে কোনও মেয়ে তুমি না !

শাহীন। তাহলে আমি কি করবো? তুমি চাও আমি—

সালেক। সুন্দর মুখে সুন্দর কথা কয়, সোনা—

শাহীন। কি করলে তুমি খুশি হবে আমি বুঝি না!

সালেক। শাহীন, তর মা নয়লার মরণকালে আমি জবান দিছিলাম—তুই আমার জিম্মা! তখনও তুই ছুট—এই সব কিছুর বুঝ নাই তর—য্যামন ধর—তুই জানলা থিকা বাইরে হাত নাড়াস!

শাহীন। আমি তো লতিফ ভাইকে হাত নাড়ছিলাম!

সালেক। শোনো—ঐ লতিফ ভাইয়ের সকল কিচ্ছা যদি তোমারে কইতে পারতাম —।

শাহীন। জামাই, একটা পুরুষের কথা বলতে পারো যার সম্পর্কে তোমার কোনও কেচ্ছা জানা নেই!

সালেক। শাহীন, আমার একটা উপকার করো—করবা? শাহীন তুমি এখন বড়ো মেয়ে হয়্যে যেতেছো—এখন নিজেরে একটু গুটায়্যা রাখতে হবে—বুঝে শুঝে মিল-মিশ করতে হবে, সোনা। [**ডাকে**] এই চিনি, কি করতাছো কি ঐখানে? [**শাহীনকে**] তর বুইন-মাসিরে ডাক্ খবর আছে।

শাহীন। কি?

সালেক। তার খালাতো ভাইয়েরা পৌঁছে গ্যাছে।

শাহীন। না! বুইন —Your khalato brothers!

জয়নাব। [**যাকে 'চিনি' বা 'চিন্তামণি' নামে ডাকা হয়, হাত মুছতে মুছতে ঢোকে**] কি ক তুই ?

শাহীন। Your khalato brothers পৌঁছে গ্যাছে।

জয়নাব। আইসা গ্যাছে—কোথায় তারা?

সালেক। তৌফিক মিঞা এট্টু আগে খবর দিয়া গ্যালো—ট্রলার বন্দরে ঢোকছে—

জয়নাব। [**ভীত-স্তম্ভিত বুকের কাছে হাত**] তারা...ঠিক...ঠিক আছে তো?

সালেক। তারা তো এখনতরি ট্রলারেই। ছাড়া পাইলে দশটা নাগাদ তৌফিক অগো নিয়াসবে এইখানে।

জয়নাব। [**বসে পড়েছে, দুর্বল কণ্ঠে**] কিন্তু ...জাহাজে ...আইলো ক্যান্ তারা?

সালেক। চিন্তামণি, বন্দরে অখ্যন কেন্দ্রের এস্পেশাল গার্ড অনুপ্রবেশ লইয়া ক্ষেলবই —এই অবস্থায় তারা বৈনাপোল বর্ডারের রিস্ক ন্যায় নাই, এই পোর্টে আসাটাই স্যাফ মনে করছে। আরে আরে কানতাছ কেন তুমি ?

জয়নাব। আমি...আমি এ্যাখনও বিশ্বাস পাই না...দ্যাখেন দেখি—এ্যাকখান নতুন বিছানার চাদর কেনবো ঠিক করছিলাম....নতুন গামছা কিনা হয় নাই...এ্যাকখান বদ্‌না...ঝুল ঝাড়ি নাই—কলি ফিরাই নাই...

সালেক। সেই পার্বত্য চট্টগ্রামের কোন্ এ্যাক গেরাম থিকা আসতেছে— এইডারেই তারা ভাববে কুন কুটিপতির প্যালেস—

জয়নাব। ট্যাঙ্ক-তোরঙ্গের ঢাকন বানানো হয় নাই...ভাবছিলাম এ্যাকখান টেবিল ক্লথ কেনবো— **[চিন্তিত দাঁড়িয়ে থাকে]**

শাহীন। **[ওপর তলা দেখিয়ে]** রাজিয়া চাচির কাছে চেয়ে দেখবো?

জয়নাব। আরে নারে—যা নোংরা আর কিপ্টা অরা। হায় আল্লা—অগো খাওনের কিছুতো করি নাই— **[রান্না ঘরের দিকে রওনা দেয়]**

সালেক। **[জয়নাবকে হাতে ধরে আটকায়]** অতো চিন্তা করো ক্যান্ তুমি?

জয়নাব। চিন্তা তো করি নাই—শুধু এট্টু নার্ভাস লাগে আমার...**[শাহীনকে]** শুটকি আছে কয়খান...

সালেক। অগো আশ্রয় দিতাছ—জানে বাঁচাইতেছো—তয় কিসের তুমি ঐ দস্তরখান আর ট্রাঙ্কের ঢাকোনের কথা চিন্তা করো?

জয়নাব। **[সোজা সালেকের চোখে চোখ রেখে]** আমি আপনার জইন্যই চিন্তা করি, কর্তা মিঞা—শুধু আপনারে লইয়াই—

সালেক। শোনো, অরা কোথায় শুবে সেইটা ঠিক আছে তো?

জয়নাব। আমি সেকথা চিঠিতে জানায় দিছি—তাদের মেঝেতে শুইতে হবে।

সালেক। চিন্তামণি, আমার আশঙ্কা, শ্যাষ-ম্যাষ আমরা মেঝেতে শোবো— আর তারা আমার খাটে মহাসুখে নিদ্রা যাবে!

জয়নাব। ঠিক আছে—আপনে থামেন তো কর্তা!

সালেক। যখনই তোমার কোনও দুঃস্থ জ্ঞাত-গুষ্টি আইলো—ব্যস, আমার বিছনা পড়লো মেঝের উপর !

জয়নাব। কবে আপনারে মেঝেতে শুইতে হইছে, কয়েন দেখি!

সালেক। ক্যান্—তোমার আব্বাজানেরা যখন—

জয়নাব। বারে! তাগো ঘর-দুয়ার সব পুইড়্যা ছাই হয়্যা গেছিলো—

সালেক। হ, কিন্তু তাগো ঘর কি দুই সপ্তাহ ধইর‍্যা ছাই হইতেছিলো নাকি?

জয়নাব। ঠিক আছে, আমি তাদের অন্য কোনওখানে যাইতে কয়্যা দেবো! **[রান্না ঘরের দিকে যেতে শুরু করে]**

সালেক। এট্টু খাড়াও, এট্টু খাড়াও জয়নাব। শাহীন, তর বুইন-মাসিকে চিন্তামণি ক্যান্ ডাকি জানিস? সক্কলডি মাইনষের জইন্য তার চিন্তা **[জয়নাবের হাত ছুঁয়ে]** তোমার মন এ্যাতো ছলছলায় কিসের লেইগ্যা?

জয়নাব। আমি জানি, কোনও ঝামেলা পাকলে, আপনে শ্যাষ-ম্যাষ আমাদেরই দোষ দিবেন!

সালেক। শোনো—সক্কলে যদি মুখখান সিলি কইর‍্যা রাখো তাহলে কোনও ঝামেলাই পাকাবে না! আর তারা তো এইখানের খাই-খরচা দিবে?

জয়নাব। সেইডা আমি তাদের জানাই দিচ্ছি।

সালেক। তয় আর কিসের চিন্তা? [ঘুরতে ঘুরতে] এইখানে আমার কতো বড়ো সম্মান! আইজ ভাইবতাছিলাম—ধরো, আমার আব্বাজান এই ইন্ডিয়ায় আসে নাই...আর আমি সেইখানে গেরামের আর পাঁচজন সমর্থ জোয়ানের মতো প্যাটে কিল দিয়া ঘুইরা ব্যাড়াই.. সেই অবস্থায় এইখানে যে মানুষটা আমারে দুই থাল ভাত দিবে, এ্যাকখান বিছনা দিবে—স্যায় তো ফরিস্তা—আমারে যে বাঁচাইলো ইজ্জৎটা হইলো তার...।

জয়নাব। [তার চোখে নিশ্চিত জল] দ্যাখছনি খুকি— এই মানুষটা ক্যামন! [হঠাৎ ঘুরে সালেকের পা ছোঁয়, তারপর হাত ধরে] আপনে... আপনে সত্যই ফরিশ্‌তা। আল্লা আপনার উপর নিশ্চয়ই দোয়া রাখবেন।

সালেক। [কৃতজ্ঞতা-রসিকতার হাসি হেসে] নিজের খাটে শুইতে পারলেই আমার যথেষ্ট !

জয়নাব। যারে খুকি, খাবারগুলান লইয়া আয়।

শাহীন। বুইন-মাসি, আমার কথাটা তাকে বলা হলো না!

জয়নাব। তাঁরে আগে খাইতে দে—তারপর কমু, দুইজনে মিল্যা কমু। সবকিছু আনবি। [শাহীনকে বার করে দেয়]

সালেক। [চেয়ারে বসে] কি, হইছেটা কি? —সে কোথায় যাইতাছে?

জয়নাব। কোথাও না। এ্যাকখান সুখবর আছে। কর্তা আপনে খুশি হইলে আমারও খুব খুশি—

সালেক। কি—হইছেটা কি কবা তো!

[শাহীন খাবার নিয়ে ঢোকে]

জয়নাব। এই মাইয়া এ্যাকখান কাজ পাইছে!

সালোক। [বিরতি। প্রথমে শাহীন, পরে জয়নাবের দিকে তাকায়] কিসের কাজ? তারে আগে ল্যাখাপাড়ি শ্যাষ করতে হবে।

শাহীন। জামাই, তুমি বিশ্বাস যাবে না—

সালেক। না, না, না। তোমারে আগে ল্যাখাপড়ি শ্যাষ করতে হবে। কিসের সেই কাজ? —কি কইতাছো তুমি? হঠাৎ আইজ তুমি—

শাহীন। কথাটা একটু শোনো—যা দারুণ চাকরি একখানা—

সালেক। কিছু দারুণ না! ল্যাখাপড়ি না করলে কোন্ পদের চাকরি পাবে তুমি? আর আমারে না জিগাইয়াই চাকরি নিলা ক্যান্?

জয়নাব। অখন তো সে জিগায় আপনারে! চাকরি তো সে লয় নাই অখনও—

শাহীন। এক মিনিট শোনো তুমি। আজ সকালে প্রিন্সিপাল আমাকে ডেকে পাঠালেন—

সালেক। হ—তয়?

শাহীন। উনি আমাকে বললেন—একটা কম্পানি থেকে একজন মহিলা চাইছে—এক্ষুণি চাইছে—গোড়াতে স্টেনোগ্রাফার ,পরে সেক্রেটারি

হয়ে যাওয়ার চান্স আছে— তো প্রিন্সিপাল বললেন, আমি তো ক্লাসের বেস্ট স্টুডেন্ট—

জয়নাব। শোনলেন আপনে, কর্তা!

সালেক। শোননের কি আছে? সেতো বেস্ট স্টুডেন্ট বটেই!

শাহীন। তো উনি বললেন, যদি আমি কাজটা করতে রাজি হই, তাহলে ক্লাস না করলেও আমায় পরীক্ষায় বসতে পারমিশন দেবেন—মানে, একটা বছর সেভ হয়ে গ্যালো।

সালেক। [অদ্ভুত নার্ভাস] কোথায় সেই চাকরি? কোম্পানিটা কিসের?

শাহীন। একটা খুব বড় পাইপের কম্পানি—ঐ কলিম স্ট্রিটে।

সালেক। কলিম স্ট্রিটে — কোনখানডায়?

শাহীন। ঐ নেভি-ইয়ার্ডের পাশে—

জয়নাব। মাস গ্যালে বেতন পাইবে তিনহাজার টাকার উপর—বোঝালেন, কর্তা!

সালেক। [খুব চমকে, শাহীনকে] তিন হাজার!

শাহীন। আপনার কিরা!

[বিরতি]

সালেক। এই পুরা বছরটা যে ল্যাখাপড়িতে ফাঁক পড়বে!

শাহীন। বেসিক্স্ সব কিছু আমাদের শিখিয়ে দিয়েছে—এখন শুধু প্র্যাকটিস...আর কাজ করলেই তো সবচেয়ে ভালো প্র্যাকটিস পাবো...

জয়নাব। কাজ করলেই তো সবচেয়ে ভালো প্রেক্টিস হয়—

সালেক। আমার কিন্তু অইন্য চিন্তা ছিলো!

শাহীন। কেন? এটাতো খুব নামী কম্পানি!

সালেক। সেই কাজের জায়গাটা আমার ভালো লাগতাছে না!

শাহীন। উনি বলেছেন—বাস স্টপ থেকে পঞ্চাশ গজের মধ্যেই অফিস।

সালেক। নেভি ইয়ার্ডের পাশে পঞ্চাশ গজের মইধ্যেই।

জয়নাব। হ, কিন্তু সেতো সর্বক্ষণ অফিসের মইধ্যেই কাম করবে।

সালেক। আরে অফিসের মইধ্যে কাম করবে সেইটা আমি জানি—কিন্তু তার জন্য এই কাজ আমি চাই নাই!

জয়নাব। শোনেন—এ্যাকদিন না এ্যাকদিন সেতো কাম-কাজ করবে নাকি?

সালেক। হ—যতো পাইপওয়ালার সঙ্গে কাজ করবে—আর সামনের রাস্তা দিয়া বেবাক সেইলর স্মাগলার ঘোরাঘুরি করবে.....তাইলে এ্যাতো ল্যাখাপড়ির কোন্ প্রয়োজন ছিলো?

শাহীন। কিন্তু জামাই—মাসে তিন হাজার টাকা—

সালেক। শোনো! আমি কি তোমার থিকা টাকা চাইছি? এ্যাতোদিন তোমার দ্যাখভাল করছি, আরও কিছুদিন করবো। দয়া কইর‍্যা আমার এ্যাট্টা উপকার করো—করবা? আমি চাই তুমি খানদানি লোকেদের সঙ্গে মেশবা—ভালো জায়গায় ভালো অফিসে কাম করবা। এ্যাকটাই কথা—যদি এইখান থিকা চইলে যেতে চাও, যাও। কিন্তু এ্যাক নরক

থিকা আর এ্যাক নরকে যেয়ো পইচো না।

[বিরতি। শাহীন চোখ নামিয়ে নেয়]

জয়নাব। যা খুকি, খাবারগুলান লইয়া আয়। [শাহীন বেরিয়ে যায়] আপনে আর একটু ভেইব্যে দ্যাখেন—কর্তা! ও চাকরি করতে চায়—পাগলের মতো চায়! এইটা এ্যাট্টা ফালতু কাম না! হয়তো পরে সে সত্যই সেক্রেটারির পোস্ট পায়্যা যাবে। সারা ক্লাশের থিকা শুধু অরে বাছছে—ভাবেন এ্যাকবার! [সালেক চুপ। লক্ষ্য টেবিলের ছেঁড়া ঢাকনার নক্সার দিকে] কিসের লাইগ্যা এ্যাতো চিন্তা করেন? বাড়ির সামনের স্টপে চাপবে সেইখানের স্টপে নামবে—এ্যাকমিনিট হাঁটলেই তার অফিস—

সালেক। [যেন অসুস্থ] সেই অঞ্চলটা আমি ভালো মতো চিনি—আমার পছন্দ না জায়গাটা।

জয়নাব। এই ডক অঞ্চলেই বড়ো হইছে—সে সামলাইতে পারবে... [সালেকের মুখ দুহাত দিয়ে নিজের দিকে ঘুরিয়ে নেয়]আমার দিকে অখন তাকান—আমার কথা শোনেন! সেই মাইয়া আর শিশু না—এই সত্যটা মাইন্যা নেন—তারে কন চাকরিটা নিতে। [সালেক মুখ ঘুরিয়ে নেয়] আপনে আমার কথা শোনতেছেন? [নিজের রাগ বাড়তে থাকে] আপনার মতিগতি আমি বুঝি না! অর বয়স অখন উনিশ। আপনে কি সারাজীবন তারে এই বাসার মইধ্যে বন্দী কইর‍্যা রাখতে চান?

সালেক। [অপমানিত] এইটা কোন্ ধরনের কথা কইলা তুমি!

জয়নাব। [সহানুভূতিশীল, কিন্তু দৃঢ়] সইত্যই আমি বুঝি না এই খেলা কবে শ্যাষ হবে! প্রথমে কইলেন—'হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করুক তবে তো...'—সে হায়ার সেকেন্ডারি শ্যাষ করলো...তারপরে কইলেন—'সে সেক্রেটারি পড়তে চায়—তয় পড়ুক না'...সেই সেক্রেটারি পড়া ধরেন শ্যাষই হইছে—তখন আর কিসের অপেক্ষা করেন আপনে?...সারা ক্লাশের থিকা তারে বাছছে—এইটা তার কতো বড়ো সম্মান!

[শাহীন খাবার নিয়ে ঘরে ঢোকে, নীরবে টেবিল সাজায়। সালেক এক মুহূর্ত তাকে লক্ষ্য করে, তারপর হাসিতে তার মুখ উদ্ভাসিত হয়, কিন্তু বোধহয় তার চোখে জল।]

সালেক। চুলের এই কায়দায় তরে আসমানের হুরী-পরীর মতো লাগে—তুমি হইলা পরী-টাইপ। [শাহীন না তাকিয়ে খাবার দিতে থাকে] তুমি চাকরি করতে চাও—এ্যাঁ—ও ফুলপরী?

শাহীন। [মৃদুকণ্ঠে] হ্যাঁ।

সালেক। [এত বছরের স্মৃতি ভিড় করে আসছে] ঠিক আছে, যাও—কাজ করতে যাও। [শাহীন সালেকের দিকে তাকায়, তারপর ছুটে তাকে জড়িয়ে ধরে]

এ্যায় এ্যায় শান্ত হ, শান্ত হ! [**শাহীনের মুখ দু'হাত দিয়ে দূরে নিয়ে গিয়ে দ্যাখ্যে**] এই ছেমড়ি—কান্দস কি'র লেইগ্যা? [**নিজের মন দ্রব— হেসে ওড়াতে চায়**]

শাহীন। [**নিজের জায়গায় বসে**] আমি শুধু... [**হঠাৎ উল্লাসে**] প্রথম মাইনের টাকায় আমি খুব বড়ো একটা ডিনার-সেট কিনবো...[**সবাই হাসছে**] হ্যাঁ, সত্যি বলছি... গোটা বাড়িটা নতুন করে সাজাবো—একটা কার্পেট কিনবো—

সালেক। আর তারপর এই বাসা ছাইড়্যা চল্যে যাবা তুমি!

শাহীন। না, জামাই—না!

সালেক। [**মৃদু হেসে**] কেন যাবা না? এইতো জীবন! তারপরে তুমি রবিবারে রবিবারে আসবা। তারেপর মাসে একবার, আর শ্যাষে—সির্ফ ইদের দিনে—ব্যস।

শাহীন। [**সালেককে, হাত ধরে, আশ্বাস দিতে**] না, ওরকম বোলে না!

সালেক। [**হাসছে, কিন্তু কোথাও যেন আহত**] আমি তরে শুধু এ্যাকটা কথা কই—কখনও কাউরে বিশ্বাস যাবি না।

জয়নাব। তাঁর কথা শুনিস না—য্যামন আছস ত্যামমডাই থাকিস তুই।

সালেক। [**হঠাৎ অদ্ভুত বিতৃষ্ণায়**] সারাডা জীবন এই চাইর দ্যায়ালের মইধ্যে কাটাইলো—তুমি এইসবের কি বোঝবা?

জয়নাব। সে মানুষ দ্যাখতে মিল-মিশ করতে ভালোবাসে—এইতে দোষটা কিসের?

সালেক। কারণ সকল মানুষই মানুষ হয় না। হুঁশিয়ার না থাকলে লোকে তারে কাঁচা চিবাইবে! [**শাহীনকে**] কথাডা মনে রাখিস—যতো কম বিশ্বাস করবি, ততো কম দুঃখ পাবি।

[**এবারে প্রথমে সালেক, পরে দু'জন প্রার্থনা করে, খেতে শুরু করে**]

শাহীন। প্রথম মাসেই আমি একটা কার্পেট কিনবো—কি বলো, বুইন মাসি!

জয়নাব। তুমি দিলে আমি নিশ্চই নিব। [**সালেককে**] আইজ সারাদিন মশল্লার সুবাস পাইছি—আপনাগো বন্দরে মশল্লার জাহাজ আইছে নাকি?

সালেক। হ, আইছে—জাহাজে কাম-করণের এই মজা—মশল্লা আসে, শুঁটকি আসে, কফি আসে—এ্যামন সুবাস ছাড়ে, মন ভাসে—টানা বিশ ঘণ্টা কাম করতে পারি... আনছি আইজ, গরম মশল্লা আনছি—ঐ থলিতে—

জয়নাব। সর্বনাশ! আবার আপনে জাহাজ থিকা জিনিস আনছেন!

সালেক। ক্যান্—কি হইছে?

জয়নাব। কি হইছে? সেইবার সেই ব্রাজিল না কোথাকার কফি আনছিলেন...

শাহীন। কি হয়েছিল সেবার?

জয়নাব। তর মনে নাই? আরে—ব্যাগ খুইল্যা দেখি ছুট-ছুট লাল রঙের পোকা থিক-থিক করত্যাছে...মারে মা...পলাইতে পথ পাই না!

সালেক। এইবারেও আছে—খুইল্যা দ্যাখো—মশল্লার সঙ্গে বার্মিজ মাকড়সা...

জয়নাব। থামেন, আপনি থামেন—

সালেক। কি সুন্দর দ্যাখতে—আটখান পাও দিয়া গুড়গুড় কইর‍্যা হাঁটে—গোল-গোল চোখে কি মিষ্টি তাকায়—আর থাইকা-থাইকা আনন্দে লালা ফ্যালে...

জয়নাব। আমি কিন্তু উইঠ্যা যাবো অখনি—

সালেক। বারে! শুরু করছিলো কে কথাডা!

জয়নাব। ঠিক আছে, বড়ো অন্যায় করছি...মাফি চাই আমি...কিন্তু আপনে থামেন!

[শাহীন,সালেক হাসে, খাওয়া চলে]

জয়নাব। সময় কতো হইলো ?

সালেক। সওয়া নয়টা।

[নীরবে খাওয়া চলে]

জয়নাব। তৌফিক অগো দশটায় সময় নিয়া আসবে?

সালেক। হ; মোটামুটি দশটা।

শাহীন। জামাই, যদি কেউ জিজ্ঞেস করে ওরা এইখানে থাকে কিনা! [সালেকের দৃষ্টিতে আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে] মানে, যদি কেউ জিজ্ঞেস করে?

সালেক। দ্যাখো, সোনা—তোমরা তো দেখি সব লটর-পটর কইর‍্যা ফ্যালতাছো!

শাহীন। না, আমি বলছিলাম—লোকেরা তো ওদের ঢুকতে বেরোতে দেখবেই—

সালেক। কে কারে ঢোকতে-বাইরইতে দ্যাখলো, তাইতে আমার কলাডা—তুমি কিছু দ্যাখো নাই, তুমি কিছু জানো না। কথাডা আমি তোমারেও কই চিন্তামণি!

জয়নাব। আমারে কইতে হবে না—আমি সব বুঝি।

সালেক। না, সব তুমি বোঝো না।

জয়নাব। তায় কতো-কতো বাংলাদেশী ইন্ডিয়ান বাস করতাছে। এ্যাতো ভয় পাওনের কি আছে?

সালেক। আমরা মোছলমান, ভয়টা সেখানেই। কই—দ্যাশ ভাগ হইতেই আমরা হইয়া গ্যালাম বিদেশী—আর যতো সাত গুষ্টির হিন্দুরা শুরু থিকা এইখানেই পয়দা হইছে! বোঝ না—কি উথাল-পাথাল সময়... ইমান সাহেব সেইদিন কইতাছিলেন...বি জে পি-রে আর বোধহয় ঠ্যাকানো যাবে না...আর তার অর্থ...আর চাইরপাশ— খোচরে ভর্তি—থানার খোচর, ইমিগ্রেশনের খোচর, বিজেপি-র খোচর—আর কেযে খোচর, তুমি ট্যারও পাবা না। তোমার আত্মীয় জিগরি দোস্ত—সেই হয়তো খোচর। [জয়নাবকে] সেই আসগরের মতোন। আসগরের কথাডা মনে আছে?

জয়নাব। হায় খোদা! মনে আবার নাই?

সালেক। অরে আসগরের কথাডা কও। [শাহীনকে] ভাবো আমি গ্যাস মারতাছি! [জয়নাবকে] কও তারে। [শাহীনকে] তুই তখন বাচ্চা। তর নানীর বাসার পাশে এ্যাকটা ফেমিলি ছিলো, ঐ ছোকরা— কতো বয়স হইবে?— ষোলো—

জয়নাব। ষোলো কি কন? চৌদ্দর বেশি কিছুতেই হবে না। তয় সেই সময় অখনেরই মতো অনুপ্রবেশ নিয়া মহা হৈচৈ হইতেছিলো—তয় এই আসগর থানায় গিয়া চুকলি খাইয়া আইলো!

শাহীন। ঐটুকু—বাচ্চা—চুকলি খেলো?

সালেক। নিজের চাচার এগেনেস্টে!

শাহীন। পাগল নাকি ছেলেটা?

সালেক। ছিলো না—ঐ ঘটনার পর হইয়া গেছিলো!

জয়নাব। সে কি কাণ্ড! আসগরের পাঁচ-ভাই আর বাপ-সক্কলে মিল্যা ছোকরারে নর্দমায় ঠাইস্যা ধইরা কিল-চড়-লাথি-আর থুথু.. মহল্লার সক্কলের এই বেইমানি দেইখ্যা সে-কি কান্দন!

শাহীন। ত্চ্ ত্চ্ ত্চ্... তারপর ছেলেটার কি হলো?

জয়নাব। পলাইছে। আমি তো তারে আর দেখি নাই। [সালেককে] আপনে দ্যাখছেন নাকি?

সালেক। আসগরেরে? ঐ ঘটনার পর সে আর মুখ দ্যাখাইতে পারে? [শাহীনকে] তুমি—তোমার হাজার টাকা যদি চুরি যায়—ফিরৎ পাইতে পারো—কিন্তু মুখ থিকা যদি এ্যাকবার জবান বাইরইয়া যায়— আর ফিরা পাবা না!

শাহীন। আমি কাউকে কিছু বলবো না, জামাই—তোমার কিরা!

জয়নাব। ভাবতাছি, মাত্র কয়খান শুটকি আছে, তারা যদি খাইয়া আসে— নষ্ট-ফ্যালা যাবে। বরং অপেক্ষা করি—রানতে আর কয় মিনিট লাগবে!

শাহীন। জামাই, জাহাজ থেকে নামার সময় যদি ওরা ধরা পড়ে যায় ?

সালেক। আপটু বটম কাপ্তান থিকা আমাগো তৌফিক পইর্যন্ত পয়সা খাওয়ানো আছে না!

জয়নাব। আল্লা করেন তারা য্যান্ এইখানে জলদি-জলদি কাম-কাজ পেয়ে যায়!

সালেক। আদম পাচারের যে চক্র আছে তারা নিজেদের হিসার গরমে নিজেরাই তাদের কাজ জুটায়্যা দেবে—

জয়নাব। ঐ দেশের থিকা এইখানে বেশিই পাইবে তো?

সালেক। আরে অনেক বেশি। [শাহীনকে] তাইলে.....ফুলপরী— সোমবার থিকা কামে যাইতাছো তুমি?

শাহীন। [অপ্রস্তুত] হ্যাঁ, তাই তো কথা!

[দু'জন মহিলা বসে—সালেক তাদের মুখোমুখি। প্রথমে জয়নাব হাসে, তারপর শাহীন। সালেকের ভিতরে যেন এক শিশুর তীব্র আবেগ—তারই

সঙ্গে পরিচিত এক ভয়—তার চোখে জল। এই স্বচ্ছ সৎ আবেগের মুখোমুখি দুই মহিলাই স্তব্ধ]

সালেক। [বিষণ্ণ হাসি, তারই সঙ্গে শাহীনের জন্য গর্ব] তাইলে? আল্লার কাছে তোমার নামে দোয়া মাঙি—তোমার ভালো হউক!

শাহীন। [উঠে দাঁড়ায়, হাসির চেষ্টা] তুমি এমন করে বলছো, যেন আমি হাজার মাইল দূরে কোথাও চলে যাচ্ছি!

সালেক। আমি জানি...সব হিসাব করছিলাম, এ্যাকটা হিসাব করি নাই!

শাহীন। কিসের হিসেব?

সালেক। তুই যে কোনও দিন বড়ো হয়্যে যাবি—সেইডা হিসাবে ছিলো না [নিজের উদ্দেশেই শব্দহীন হাসে। তারপর পকেট হাতড়ায়] আমার ঐ কুর্তার পকেটে... [রওনা দেয়।]

শাহীন। তুমি বোসো—আমি এনে দিচ্ছি।

[শাহীন দ্রুত বেরিয়ে যায়। অল্প বিরতি। সালেক জয়নাবের দিকে ঘোরে, জয়নাব তার দৃষ্টি এড়িয়ে যায়]

সালেক। আইজকাল লক্ষ্য করি, তুমি আমার প্রতি অপ্রসন্ন— কিসের লেইগ্যা?

জয়নাব। কে অপ্রসন্ন? [উঠে খাবার জায়গা সাফ করতে থাকে।] আমি অপ্রসন্ন হই নাই। [বাসন-পত্র তুলে সালেকের মুখোমুখি] ভাইব্যা দ্যাখবেন—অপ্রসন্নতা আপনার ভিতরেই ঘটছে। [রান্না ঘরে চলে যায়]

শাহীন। [বিড়ি-দেশলাই নিয়ে ভেতরে আসে, সালেককে বিড়ি ধরিয়ে দেয়, সালেক বিড়িতে টান দিলে শান্তভাবে বলে] আমাকে নিয়ে চিন্তা কোরো না, জামাই!

সালেক। তোর হাত পুড়্যে যাবে। [শাহীন শেষ মুহূর্তে ফুঁ দিয়ে দেশলাই নিবিয়ে দেয়] তুমি যাও—তোমার মাগিরে বাসন ধোওনে সাহায্য করো!

শাহীন। [দ্রুত টেবল লক্ষ্য করে, সবকিছু উধাও দেখে অনুতপ্ত] ওঃ...[রান্নাঘরের দিকে যেতে-যেতে] বুইন—আমি বাসন ধোবো....।

[সালেক একা রান্নাঘরের দিকে তাকিয়ে। ঘড়ি দেখে। ভালো চেয়ারটায় বসে। একরাশ ধোঁয়া ছাড়ে—সেই ধোঁয়ার কুণ্ডলীর দিকে তাকিয়ে থাকে। এই অঞ্চলের আলো নিবে যায়। মঞ্চের সামনের দিকে আলো। এই আলোর বৃত্তে খোন্দকার মহম্মদ হারুণ প্রবেশ করে]

হারুণ। এই কঠিন নিস্তরঙ্গ জীবনে যতোটা সততার প্রয়োজন, সেটুকু তার ছিলো। ডকে কাজ থাকলে সে কাজ পেতো। রোজগারের সবটুকুই সে বাড়ি নিয়া আসতো। এমনি করেই কাটতে ছিলো তার জীবন। সেই রাইত দশটা নাগাদ খাওয়া-দাওয়ার পরে ঐ বাড়িতে সেই জ্ঞাতি ভাইয়েরা এলো।

এনায়েৎ। [অতি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী, ৩২ বছরের চাষী, সন্দিগ্ধ, নম্র,

মৃদুভাষী] খোদায় আপনার ভালো করবেন!

তৌফিক। এখন আপনাদের নিজের জিম্মা। একটু হুঁশিয়ার থাকবেন, ব্যস। ঐ একতলাটা।

এনায়েৎ। বড়োই উপকার করলেন!

তৌফিক। কাল ডকে দেখা হবে। আপনারা কাজে যাবেন। [এনায়েৎ ঘাড় নাড়ে। তৌফিক রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলে যায়]

নীলু। ইন্ডিয়ায় এইটা আমাদের প্রথম বাসস্থান। তিনতলা বাড়ি— ভাবেন তো! চিঠিতে লেখছিলো তারা নাকি গরিব!

এনায়েৎ। শ্‌শ্‌! আয়।

[ওরা দরজার কাছে যায়। এনায়েৎ মৃদু করাঘাত করে। ঘরের আলো জ্বলে ওঠে সালেক দরজা খোলে। ওরা দু'জন ঘরে ঢোকে। নিজেদের টুপি খুলে নেয়। রান্নাঘর থেকে জয়নাব ও শাহীন আসে। রাস্তার আলো নিবে যায়]

সালেক। তুমিই...এনায়েৎ?

এনায়েৎ। জি, এনায়েৎ আলি মনু।

সালেক। [দু'হাত ধরে] আসো, ভিতরে আসো!

জয়নাব। এই যে—ব্যাগ দুইটা লন।

এনায়েৎ। [ঘাড় নাড়ে। জয়নাবের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ—তার কাছে যায়] আপনে আমার মামাতো বুইন? [আদাব করে]

জয়নাব। [টেবিলের অপর দিকে, প্রার্থনার ভঙ্গিতে বুকের কাছে হাত]আমি জয়নাব। তিনি সালেক আহমেদ খান—আমার খশম। [পরস্পরে আদাব] আর সে শাহীন—আমার মরা বুইন নয়লার মাইয়া। [দুই ভাই আদাব করে]

এনায়েৎ। আমার ভাই হেদায়েৎ আলি নীলু—সক্কলে নীলু ডাকে। [নীলু আদাব করে। এনায়েৎ সমন্ত্রমে সালেকের কাছে যায়।] আপনারে গোড়াতেই কইয়া রাখি, সালেক ভাই—আপনি যাইতে কইলেই আমরা চইলে যাবো।

সালেক। এইটা কি কথা—ছি ঃ [ব্যাগ তুলে নেয়]

এনায়েৎ। এই বাড়িতো দেখি খুব বড়ো না—তয় শিগগিরই হয়তো আমাগো নিজেদেরই একটা আস্তানা জুট্যে যেতে পারে!

সালেক। হইবে হইবে—সব ঠিক হয়্যা যাবে-...শাহীন, অগো খাইতে দিবি না কি?

শাহীন। আসুন, এইখানে বসুন। আমি খাবার নিয়ে আসি।

এনায়েৎ। [টেবিলের দিকে যেতে যেতে] জাহাজেই খানা খাইছি আমরা। [সালেককে] আল্লা আপনারে দোয়া করবেন।

জয়নাব। তয় চা কইরা আনো—আমরা সক্কলে চা খাবো। আসো—বসো তোমরা।

[নীলু এবং এনায়েৎ টেবলের পাশে বসে]

শাহীন। [বিপুল বিস্ময়ে] আপনি তো কালো...তাহলে তুমি এতো

ফর্সা...কেন নীলু?

নীলু। [হাসি প্রায় উপচে পড়ে] আমি তো জানি না—তয় লোকে কয়, কয়শো বছর আগে সাদা-চামড়া পোর্তুগিজেরা নাকি চট্টগ্রাম এ্যাটাক করছিলো ... তাই...[জয়নাব নীলুর চুল খেঁটে ঘ্রাণ নেয়। সকলে হাসে। সালেক ঢোকে]

শাহীন। [জয়নাবকে] ও সত্যি সত্যি সাহেবদের মতো ফর্সা!

সালেক। চায়ের কি হইলো?

শাহীন। [সম্বিত ফেরে] এক্ষুণি আনছি-[দ্রুত রান্নাঘরে চলে যায়]

সালেক। [দোলনা চেয়ারে বসে] যাত্রা ঠিক-ঠাক ছিলো?

এনায়েৎ। সমুদ্রে ঢেউ ছিলো খুবই—আমাগো অসুবিধা হয় নাই।

সালেক। এই বাড়ি চেনতে অসুবিধা হয় নাই?

এনায়েৎ। না, সেই লোকে এইখান তরি দিয়া গ্যাছে। ভালো লোক।

নীলু। [সালেককে] সে কয় কাইল মর্নিঙে কাজ শুরু হবে, তারে বিশ্বাস করা যায়?

সালেক। না। তয় যদ্দিন না, ওরা পারাপারির দলানি বুঝে পায়, তদ্দিন ঠিকই কাজ দিবে। [এনায়েৎকে] চট্টগ্রামে কখনো জাহাজ ঘাটায় কাম করছো নাকি?

এনায়েৎ। জাহাজঘাটায়? জি, নাতো।

নীলু। [নিজেদের জন্মস্থানের ক্ষুদ্রতায় হেসে] আমাগো সেইটা আধা-টাউন আধা-ভিলেজ—সেইখানে জাহাজ নাই, শুধু মাছ-ধরার বোট।

জয়নাব। তয় তোমরা কাম-কাজ কি করতা?

এনায়েৎ। যেইটা পাইতাম— যে-কোনও কাম।

নীলু। ধরেন, পাকা বাড়ি বানায়—কিম্বা এ্যাকখান ব্রিজ সারায়—তখন মনুভাই তো রাজমিস্ত্রির কাজ জানে আর আমি হয়্যা গেলাম জোগানদার। [হাসে] ফসলের টাইমে মাঠের কাজ...এনি জব!

এনায়েৎ। অবস্থা বড়ই খারাপ।

নীলু। সাংঘাতিক! স্টেশনের মাঠে খাড়ায় থাকি, কুত্তার চেল্লানি শুনি—আর ট্রেইনের জইন্য ওয়েট করি—

জয়নাব। ট্রেইনের জইন্য ওয়েট—ক্যান্ ট্রেইনে কি আছে?

নীলু। যদি সাহেব প্যাসেঞ্জার থাকে, যদি তোমার লাক ফেবার করে, তাহলে একটা-ট্যাক্সি ঠেইলা-ঠেইলা পাহাড়ের উপরের হোটেলে পোঁছাই দিলে কয়টা টাকা পাইতে পারো!

জয়নাব। তোমাগো ট্যাক্সি ঠ্যালতে হয় কেন্?

নীলু। আমাগো টাউনের সেইটাই তো স্পেশাল! আমাগো ঘোড়াগুলান ছাগলের থিকাও চিমসা। তাই পাহাড়ে ওঠাতে গ্যালে এক্কা জ-ট্যাক্সি ঠ্যালতে হয়। [হাসে] আমাগো টাউনে ঘোড়া ইহ ওনলি ফর শো।

শাহীন। কেন—ওখানে মোটর-ট্যাক্সি নেই?

আছে—এ্যাকখান। সেইটাও ঠেলি আমরা। [সবাই হাসে] আমাগো

টাউনে সবকিছুই পুশ করতে হয়।

জয়নাব। [**সালেককে**] ক্যামন বোঝেন আপনে—কর্তা!

সালেক। তোমার চিন্তাটা কি—এই দ্যাশেই থাকব না ফিরা্যা যাবা?

এনায়েৎ। [**চমকে**] ফিরা্যা যাবো?

সালেক। আরে! বিয়া-শাদি তো করছো নাকি?

এনায়েৎ। হ। তিনডা পোলা আছে আমার।

জয়নাব। তিনডা! আমি য্যানো শুনছিলাম এ্যাকটা!

এনায়েৎ। না, না, অখন তিনটা আমার—চাইর বছর, পাঁচবছর আর ছয় বছর।

জয়নাব। আহারে—দুধের ছাওয়াল! তোমারে না দেইখ্যা তারা নিশ্চয়ই কান্দে অখন!

এনায়েৎ। আমি কি করতে পারি? বড়োটার বুকে দোষ হইছে। আমার বিবি—নিজে না খাইয়া তাগো খাওয়ায়। সাচাই কই আপনাদের—আমি সেইখানে থাকলে তারা অকালে মইরে যাবে। হাওয়া খেয়্যে তো মানুষ বাঁচে না!

জয়নাব। হায় খোদা!... তয় তুমি কতো দিন এই দ্যাশো থাকতে চাও?

এনায়েৎ। ধরেন গিয়া চাইর, পাঁচ, ছয় বছর...

জয়নাব। আল্লার দোয়ায় বেশি-বেশি রোজগার করতে পারলে, তাড়াতাড়ি ফিরৎও যাইতে পারবা।

এনায়েৎ। তাই তো আশা। আমি জানি না...[**সালেককে**] শুনি এইখানেও নাকি অবস্থা ততো ভালো না!

সালেক। আরে ঐখান থিকা অনেক বেশিই পাবা!

নীলু। কতো বেশি? হরেক রকম ফিগার শুনি—আমরা খাটতে পারি—দিনে খাটবো, রাইতেও খাটবো—[**এনায়েতের হাত তোলা থেমে যায়**]

সালেক। [**ক্রমেই শুধু এনায়েতের উদ্দেশে**] নিশ্চয়ই কইরা কওন যায় না। ধরো লেঅফও আছে—তিন-চাইর সপ্তাহ বন্দরে জাহাজই আইলো না—

এনায়েৎ। তিন-চাইর সপ্তাহ্! আয় খোদা...

সালেক। তয় বারোমাসের হিসাবে গড়ে হপ্তায় সাত-আটশো কামাইবা।

এনায়েৎ। [**উঠে সালেকের কাছে যায়**] ইন্ডিয়ার টাকায়?

সালেক। অবশ্যই।

এনায়েৎ। [**একহাতে নীলুকে জড়িয়ে ধরে, দুজনেই হাসে**] জয়নাব বুইন, যদি আমরা এইখানে কয়েকমাস থাকতে পারতাম—

জয়নাব। কি কও তুমি মনু! এইখানে তোমরা যতোদিন ইচ্ছা থাকবা—

এনায়েৎ। কারণ তাইলে অগো কিছু বেশি টাকা পাঠাইতে পারবো!

জয়নাব। কইছিই তো, যতোদিন তোমাদের ইচ্ছা—জায়গা যথেষ্ট আছে—

এনায়েৎ। [**তার চোখ ভিজে আসছে**] আমার বিবি [**সালেককে**] আমার বিবি—তারে অবিলম্বে ধরেন দুই তিনশো পাঠাইতে চাই—

সালেক। কিছু টাকা তুমি সামনের সপ্তাহেই পাঠাইতে পারবা।

এনায়েৎ। [চোখে জল টলটল করছে] সালেক খান..[সালেকের হাত দু'টি ধরে]

সালেক। দ্যাখো কাণ্ড —আমি কি করছি —আমার পকেট থিকা তো কিছু যাইতাছে না...[শাহীনকে] চায়ের কি হইলো?

শাহীন। জল চাপিয়ে দিয়েছি। [নীলুকে] তুমিও বিয়ে করেছো? না।

নীলু। উইদাউট ওয়াইফ নো লাইফ! আমার রঙ ফরসা—মুখখানা সুন্দর ... কিন্তু পয়সা তো নাই। [হাসে]

জয়নাব। [নীলুকে] তুমিও এই দ্যাশে থাকতে চাও—চিরকালের মতো?

নীলু। আমি? হ, পার্মানেন্ট সিটিজেন হইয়া। তারপর অনেক পয়সা জমাইয়া দ্যাশে ফির‍্যা এ্যাকখান বড়ো মটর সাইকেল কেনবো। [হাসে। এনায়ৎ তাকে সাদরে ঝাঁকায়]

জয়নাব। চা লইয়া আসি আমি। [রান্নাঘরে চলে যায়]

সালেক। মটর সাইকেল দিয়া কি করবা তুমি?

এনায়েৎ। স্বপন দ্যাখো সে স্বপন দ্যাখে।

নীলু। ক্যান্? [সালেককে] আমি এ্যাকখান পার্সোনাল কুরিয়ার সার্ভিস খোলবো। ঐখানে পোস্টাল সার্ভিস ইজ ওনলি ফর শো—আর রিচ পিপল যারা, ঐসব হোটেলে আসে, সর্বক্ষণ খবরাখবর পাঠাইতে চায়...আর টেলিফোন—সে-ও ওনলি ফর শো...তয় আমি হোটেল কম্পাউন্ডে বুকে কুরিয়ার লিখ্যা আমার নীল মটর সাইকেল ভট্-ভট্ করতে থাকবো। একটুক্ষণের মইধ্যে আমারে মেসেজ খালি দিতে থাকবে!

এনায়েৎ। অবিআইত্ থাকলে এইসব স্বপনই দ্যাখে লোকে!

সালেক। বাসে চাইপ্যা এ্যাক্ক কাইরা ম্যাসেজ দ্যাওন যায় না?

[জয়নাব চা নিয়ে ঢোকে]

নীলু। আরে না—মেশিন! মেশিনডারই প্রয়োজন। ধরেন, গেটের কাছে এ্যাকখান মানুষ খাড়ায়্যা আছে—কয়, 'আমি মেসেঞ্জার'। ধরেন দিলেন তারে আপনার মেসেজ। সে ধুতির কাছা সামলাইতে-সামলাইতে রবাবের চপ্পল লটর-পটর করতে-করতে নিঃসাড়ে চইল্যা গ্যালো। সন্দেহ হইবে, 'এ লোক পৌঁছাবে তো?— পৌঁছালে ফিরে আসবে তো?' —'এ সত্য-সত্যই আমার মেসেজ পৌঁছায়ে দেবে তো?' কিন্তু ধরেন, এ্যাকখান নীল মটর সাইকেল ভট্‌ভটায়—লোকের তারে মনে ধরবে, ভাববে এই লোকটা রেসপনসিবল—এর এ্যাকটা অস্তিত্ব আছে—সগর্জন অস্তিত্ব—এ নিশ্চয়ই আমার মেসেজ পৌঁছায়ে দেবে!

[জয়নাবকে সাহায্য করে চা দিতে]

আমি অবশ্য গানও গাইতে পারি—আই এ্যাম এ সিঙ্গার!

সালেক। সেই রেডিও টি ভি-তে গান করে সেই সিঙ্গার?

নীলু। নিশ্চয়ই! এ্যাকবার হইছে কি জানেন— সেইখানকার সবচেয়ে বড়ো হোটেলের মোলায়েম আলি শানু—খুব বড়ো সিঙ্গার—অসুস্থ হয়্যা পড়লো—গলা দিয়া আওয়াজ বাইরয় না...তো যারা চিনে আমারে, কইলো ম্যানেজারেরে...ব্যস, আমি লাগায়ে দিলাম...পরপর ছয়খান গান—ভাটিয়ালি, সারি, জারি, ...এ্যাকখান ইংলিশ সঙও গাইছিলাম... আরে কি কমু আপনাগো ..শয় শয় টাকার নোট বৃষ্টির মতো পড়তাছে টেবিলে...কি এ্যাকখান রাইত! সেই রাইতের কামাইতে ছয়মাস আমরা খাইছি-পরছি—কি কন্ ভাইজান— ঠিক কিনা ?

এনায়েৎ। [একটু সন্দিগ্ধ বিলম্বিত ঘাড় নেড়ে] দুই মাস।

[সালেক হেসে ওঠে]

জয়নাব। তয় তুমি সেই হোটেলেই এ্যাকখান গাওনের চাকরি নিলে পারবা!

নীলু। না , তার তো গলা ঠিক হইয়্যা গ্যালো না —বড় গাওয়াইয়া — ভয়েসে খুব তেজ আছে। [জয়নাব আদরে হাসে]

এনায়েৎ। [জয়নাবকে বিষণ্ণভাবে] বড় জোর চেঁচাইতেছিলো—খুবই চেঁচাইছিলো!

নীলু। ক্যানো—চেঁচানোটা হল কিসে ?

এনায়েৎ। বড়ই চিচ্‌কার। সেই হোটেলে বাব—কে বেশিরভাগই সাহেব আসে তো—তারা আবার বেশি চিচ্‌কার পচ্ছন্দ করে না।

নীলু। [শাহীনকে] আমি চিচ্‌কার করছি এই কথাটা কেউ কোনোদিন আমারে কয় নাই!

এনায়েৎ। আমি কই। খুবই চিচ্‌কার করছিলা। [জয়নাবকে] যখনই গলা ছাড়ছে— আমি বুঝছি আইজ সে চ্যাঁচাইবে!

নীলু। তাইলে অতো শয় শয় টাকা দিলো ক্যান্?—প্রাইজ দিলো ক্যান্?

এনায়েৎ। তার সাহস দেইখ্যা টাকা দিছে। সাহেবেরা সাহস খুব পছন্দ করে। কিন্তু তাইর জইন্য ঐ চিচ্‌কার তারা দুইবার শোনবে না!

নীলু। [এনায়েৎকে এড়িয়ে বাকিদের] আমি কোনোদিন শুনি নাই কেউ কইছে আমি শাউট করছিলাম!

শাহীন। [উঠে দাঁড়িয়ে] তুমি S.D. Barman-এর গান গাইতে জানো? র‍্যাপ কাকে বলে জানো ?

নীলু। হ। আমি তো র‍্যাপ গাইতে পারি। তোমাদের বাংলা যে র‍্যাপ গায় আমি জানি।

শাহীন। তুমি ইংরেজি র‍্যাপ কিছু জানো ?

নীলু। আমি আইজ টি জানি—আই ক্যান সিন 'আইস্ আইস্ বেবি'—

শাহীন। জানো ওটা? গাওনা গাওনা তুমি !

[নীলু মাথার ইঙ্গিতে দাদার অনুমতি নিয়ে—বিদেশী গাইয়ের ভঙ্গি নিয়ে]

সালেক। [সালেক মঞ্চের পেছন দিকে চলে গিয়েছিলো ইতিমধ্যে]— হঠাৎ অয় অয় অয় ছোকরা—থামো থামো—থামো—এ্যাক মিনিট!

শাহীন। [মুগ্ধ] ওকে শেষ করতে দাও—কি ভালো গাইছে...

সালেক। এ-ছোকরা—তুমি কি আইজ রাইতেই হাজতে যাইতে চাও? এ্যাঁ!

এনায়েৎ। [উঠে দাঁড়ায়] না! না!

সালেক। [গোটা বাড়ি দেখিয়ে] কোনোদিন কেউ গান করে না— সেই বাড়িতে আইজ মইধ্য-রাত্রে হঠাৎ এ্যাক সিঙ্গার আইস্যা উপস্থিত। বোঝছো আমার কথাডা— কি কই?

এনায়েৎ। হ, হ, তুমি চুপ করবা ! নীলু!

সালেক। [উত্তেজিত] এই অঞ্চলের চাইর পাশ সব খোচরে ভর্তি— আমার কথাডা বোঝলা, এনায়েৎ মিঞা !

এনায়েৎ। হ, অ চুপ করবে। তুমি চুপ থাকবা!

সালেক। [উঠে দাঁড়িয়েছে। ইস্পাত-কঠিন মুখ—একটু হাসির আভাস, শাহীনকে] এ্যাতো রাত্রে ঘরের মইধ্যে তুমি হাই হিল পরছো ক্যান্ শ্রীদেবী?

শাহীন। আমি ভেবেছিলাম আজ রাত্রে তো—

সালেক। আমার এ্যাকটা উপকার করো—করবা? অক্ষুণি যাও...

[শাহীন— সর্বসমক্ষে অপ্রস্তুত, কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ—শোবার ঘরে চলে যায়। জয়নাব তার যাওয়া লক্ষ্য করে। উঠে যেতে-যেতে ঠাণ্ডা-দৃষ্টিতে সালেকের দিকে তাকায়। কিছু না বলে টেবলের কাছে গিয়ে কেত্‌লি থেকে চা ঢালে]

সালেক। [মূলত এনায়েৎকে, কিন্তু জয়নাবকেও—হাসার চেষ্টা পেয়ে— বলে] সব এ্যাক্‌ট্রেস হইতে চায় এইখানে।

নীলু। [সে-তো খুশিরই কথা] আমাগো বাংলাদ্যাশেও—সব মাইয়ার!

[শাহীন রবারের চটি পরে ফিরে এসে টেবলের কাছে যায়। নীলু একটা চায়ের কাপ তুলে ধরে। সালেক— কিছু একটা সন্দেহ নিয়ে—নীলুকে মাপছে]

সালেক। আইচ্ছা, তাই বুঝি !

নীলু। ইয়েস! [শাহীনকে] দেখিয়ে এসপেশিয়ালি, যদি তাঁরা এইরকম সুন্দরী হন!

শাহীন। তোমাকে চিনি দেব আর ?

নীলু। ইয়েস, আই লাভ সুগার ভেরি মাচ্ !

[সালেক এখন ঘরের সামনের দিকে। —শাহীন নীলুকে লক্ষ্য করছে—তার মুখে কোনো বিপন্ন ঝড়ের আভাস। এই ঘর অন্ধকারে মরে যায়।
সামনের ডানদিকে হারুণ সাহেবের ওপর আলো এসে পড়ে]

হারুণ। ভবিষ্যতের গর্ভে কোন্ ভবিতইব্য লেখা আছে— কেইবা জানতে পারে? সালেক আহমেদ খান সাধারণ এক মানুষ।
ট্রাজেডির নায়কদের মতো তার জীবনেও যে কোন 'নিয়তি' থাকতে পারে, সে ভাবতেও পারে নাই। সাধারণ এক মানুষ— কাজ করে, পরিবার প্রতিপালন করে, আড্ডা মারে, খায়, বুড়ো হয়, তারপর সে মরে যায়।

সপ্তাহের পর সপ্তাহ্ কাটতে লাগলো। সে দেখতে পেলো, তার ভবিষ্যৎ অচেনা— সেখানে বিপদ ঘনাচ্ছে—কিছুতেই সেই বিপদ কাটে না!

[হারুণ সাহেবের আলো মুছে যায়। সালেকের ওপর আলো। সে বাড়ির দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে। জয়নাব রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসে। সালেককে দেখতে পায়, মৃদু হাসে। সালেক মুখ ঘুরিয়ে নেয়]

সালেক। আটটা বেজে গ্যাছে।

জয়নাব। প্যারামাউন্টের ছবিগুলান তো লম্বাই হয়।

সালেক। অঞ্চলের সক্কলডি সিনেমা-হল তাদের চষা হয়ে গ্যাছে! সেই ছোকরা চাইরপাশে ঘুইর‍্যা-ঘুইর‍্যা য্যানো বিজ্ঞাপন দেতেছে—আমি মুসলমান, ইললিগাল আইছি—আমারে ধরো !

জয়নাব। সেইটা তো তার চিন্তা, আপনার কি আসে যায়? তারে যদি অরা ধরে, ধরবে, ফুরায় গ্যালো! আসেন, বাড়ির ভিতরে আসেন।

সালেক। তো সেই মাইয়ার সেক্রেটারি-পড়োনের কি হইলো?

জয়নাব। নিজের থিকাই আবার শুরু করবে। অখন সে উত্তেজিত হয়্যা আছে—সেইটা বোঝেন না কর্তা!

সালেক। শাহীন কি কিছু কইছে তোমারে?

জয়নাব। **[প্রসঙ্গে যখন উঠেই পড়েছে, সালেকের কাছে এসে]** আপনার কি হইছে কি? এই পোলাডা তো ভালই।

সালেক। এই পোলাডা ভালোই ! তারে দ্যাখলেই আমার সারা শরীর গুলায়...

জয়নাব। **[মৃদু হেসে]** ছাড়ান দ্যান, কর্তা— আপনে তারে হিংসা করেন!

সালেক। আরে মিঞা ! আমার সম্পর্কে তোমার দেখি খুবই উচ্চ ধারণা!

জয়নাব। আপনার মতি-গতি বুঝি না আমি ! কি এ্যামন খারাপ পোলাডা?

সালেক। সেই ছোকরার সঙ্গে আমাগো শাহীনের বিয়া হবে?

জয়নাব। অসুবিধা কি ? ভালো ছেলে, সোন্দর দ্যাখতে, অসুরের মতো খাটতে পারে —

সালেক। সে জাহাজের ডেকে গান করে—

জয়নাব। আপনার কথা বুঝি না ... সে গান করে তাইতে—

সালেক। কইলাম তো—ডেকের উপর আচানক খাড়ায় পড়লো— গলগল কইরা গান আর তারই সঙ্গে নৃত্য ! সক্কলে তারে নাম দিছে "চিটা গাঙের মেমসাহেব" ... কিম্ভূত এ্যাকখান জীব—

জয়নাব। নিহাত ছেলেমানুষ— এ্যাখনতরি শান-সহবৎ শেখে নাই—

সালেক। চুল কি রাখছে —য্যান্ যাত্রাদলের সখী !

জয়নাব। সেইটা তো ফিল-হালের ফ্যাশন... আপনে কি পাগল হইলেন নাকি! **[চেষ্টা করে সালেককে মুখোমুখি দাঁড় করাতে।]**

সালেক। **[মুখ ঘুরিয়ে নিতে-নিতে]** এইতে পাগল হওনের কি হইলো ? সেই ছোকরার তরিকা আমার পছন্দ হয় না !

জয়নাব। আচ্ছা, কয়েন তো—অধিক ফর্সা লম্বা চুল মানুষ আপনে দ্যাখেন

নাই? ধরেন আমাগো সাহেব-মজিদ...

সালেক। **[যেন প্রায় জিতে গেছে, এইভাবে ঘুরে]** হ, কিন্তু সেই সাহেব-মজিদ রোজ-দিন ডেকের উপর নৃত্য-সহকারে সঙ্গীত করে কি?

জয়নাব। গেরাম থিকা আইছে—প্রাণে ফূর্তি আছে—

সালেক। গেরাম থিকা এনায়েতও আইছে— সে-তো সঙ্গীত-নৃত্য করে না। হাঁটে চলে, কাম করে— পুরুষের মতো !

[সরে যায়। জয়নাব বোঝে তার ভেতরে কোনো বিষ জমা হচ্ছে]

সাচাই কই— তোমার মতি-গতি দেইখা তাজুব হয়ে যেতেছি আমি, চিন্তামণি!

জয়নাব। **[কাছে গিয়ে স্থির লক্ষ্য]** শোনেন—আপনে কিন্তু এই নিয়া তার লাগে কোনো ঝামেলা কইরেন না।

সালেক। ঝামেলা তো কিছু করি নাই! কিন্তু তাইর অর্থ এই না আমি চুপ-চাপ শুধু দেইখ্যে যাবো! সেই মালের জইন্য আমি ঐ মাইয়ারে বড়ো করি নাই! আর তোমারেও আমি সাবাশ দিই—আমি বইস্যা বইস্যা ভাবি কখন তোমার টনক নড়বে....আর তুমি—কোনোই চিন্তা নাই —সবই দেখি সুন্দর বাসো!

জয়নাব। না, সবকিছুই আমি সুন্দর বাসি না!

সালেক। না—?

জয়নাব। না—আমার অন্যকিছু চিন্তাও আছে!

সালেক। **[ইতিমধ্যেই কিছু দুর্বল]** হ? কি সেইডা?

জয়নাব। হ। আপনি কি চান সেই কথাটা আমি কই আপনারে ?

সালেক। **[ভেতরে-ভেতরে পেছোতে শুরু করেছে]** ক্যান্? তোমার আবার কিসের চিন্তা ?

জয়নাব। কয়েন তো কর্তা—আমি আবার কবে সত্য-সত্য আপনার বিবি হবো?

সালেক। আমার শরীর-মেজাজ ভালো না। ওরা আমার থিকা...আমার গোলমাল লাগত্যাছে!

জয়নাব। প্রায় তিনমাসের উপর আপনার শরীর-মেজাজ ভালো না—অরা তো আইছে মাত্র কয় সপ্তাহ!

সালেক। এই নিয়া আমি অখন কথা কইতে চাই না !

জয়নাব। কি হইছে কি আপনার ? আপনে আর আমারে পছন্দ করেন না?

সালেক। এইসব কি কও তুমি? আমি তোমারে পছন্দ করি না ! কইলাম তো আমার শরীর-মেজাজ ভালো না—ব্যস!

জয়নাব। আমারে বলেন, আমি কি কিছু অন্যায় করছি? আমার লগে কথা কন!

সালেক। **[চুপ, চেষ্টা করে, বলতে পারে না, তারপর]** পারবো না আমি, এই নিয়া কথা কইতে আমি পারবো না! **[জয়নাব একটু দাঁড়িয়ে থাকে। সালেকের দৃষ্টি অন্য দিকে। জয়নাব বাড়ির ভেতরে যেতে চায়]**

আমি...আমি ঠিক হয়ে যাবো, চিন্তামণি—শুধু সর্বক্ষণ আমারে টিক-টিক কইরো না। আমি ঐ মাইয়ার বিষয়ে বড়ো চিন্তিত আছি !

জয়নাব। সেই মাইয়ার আঠারো পার হইয়া উনিশ। ছাড়নের সময় তো হইছে।

সালেক। সেই ছোকরা অরে নাকে দড়ি দিয়া ঘুরাইতেছে—

জয়নাব। নাক তো তার,ঘোরত্যাছে তো সে....আপনি কি চল্লিশ বছর পইর্যন্ত সেই মাইয়ার নজরদারি করবেন ? এইসব আপনি ছাড়ান দ্যান, কর্তা —আমার কথা শোনতেছেন—আসেন, ঘরের ভিতরে আসেন—

সালেক। এক্টু পাইচারি কইর‍্যা আসি....এক্ষুণি ফেরবো—

জয়নাব। আপনে রাস্তায় খাড়ায়্যা থাকলে তারা কি তাড়াতাড়ি ফেরবে ? ভালো দ্যাখায় না এইটা, কর্তা মিঞা—

সালেক। আমি অখনই আসতাছি—তুমি যাও।

[সালেক অন্যদিকে চলে যায়। জয়নাব বাড়িতে ঢুকে পড়ে। সালেক চারপাশ দেখতে থাকে, লক্ষ্য করে লতিফ ও মতীন আসছে, সে বাড়ির দেওয়াল ঘেঁষে বসে।]

লতিফ। নেভি-ইয়ার্ডে বক্সিং ম্যাচ আছে— যাইবেন নাকি ?

সালেক। বড়ো ক্লান্ত লাগে। অখনই ঘুমামু।

লতিফ। আপনার ডুব-জাহাজ দুইখান ক্যামন আছে?

সালেক। ভালোই আছে তারা ।

লতিফ। এই যে দুইটা প্রাণেরে বাঁচাইলেন লোকে আপনারে সাবাশ দিতাছে।

সালেক। আমার পকেট থিকা কিছু তো যাইতাছে না।

মতীন। বড়ো ভাইডা সাংঘাতিক—এ্যাকখান ষাঁড়। সেদিন দেখি, মাল ভর্তি এ্যাকাই একটা পুরা জাহাজ লোড করতে পারে।

সালেক। হ, সেই ব্যাটা খুবই যণ্ডা—অর বাপে শুনছি, কুস্তিগীর ছিলো। দ্যাখাই যায় সেইডা—পুরা হাবসী!

মতীন। [**দাঁত বার করে**] ঐ সাহেব ছ্যামরা অবশ্য—[**ফিক করে হাসে**] এ্যামন সব চুটকি ছাড়ে [লতিফও হাসতে শুরু করে]

সালেক। [**অস্বস্তির হাসি**] হ—মজা করে খুব ছোকরা—

মতীন। মজা না...কি এ্যাট্টা য্যানো করে ..বোঝছো তো...

সালেক। হ, আমি জানি—তয় এ্যাখনও তো পোলাপান—বোঝছো না?

মতীন। [**হাসি প্রায় হিস্টিরিয়ার পর্যায়ে**] অর দিকে তাকাইলেই সক্কলের দিল খুশ...[**লতিফ হাসে**] ও আইস্যা খাড়াইলো সেইদিন ...সক্কলে হাসতে হাসতে পাগল ...[**লতিফ এবং ও দু'জনেই হাসিতে ফেটে পড়ে**]

সালেক। ক্যান্ ? কি করত্যাছিল ?

মতীন। বুঝাইতে পারবো না...কি যে কয় মনে রাখা যায় না ...কিন্তু এ্যামন কায়দা মারে...এ্যামন এ্যাকখান তাকাইবে ...কাতাকুতু লাইগ্যা যাবে...হাসন ছাড়া উপায় নাই...

সালেক। [**বিপন্ন**] হ, রঙ্গ করে খুব!

মতীন। হ [বেদম]
লতিফ। তাইলে, দ্যাখা হবে সালেক ভাই।
সালেক। আরে! সামলাইয়া লও!
লতিফ। হ, যাই।
মতীন। ইচ্ছা করলে আইসেন—নেভি-ইয়ার্ডে।

[হাসতে-হাসতে যাবার সময় নীলু এবং শাহীনের মুখোমুখি—নীলুকে দেখেই ওদের হাসি বেড়ে যায়। হাসির কারণ না জেনেই নীলু যোগ দেয়। লতিফ ও মতীন বেরিয়ে যায়। সালেক বাড়িতে ঢুকতে যায়। দরজার মুখে শাহীন সালেককে আটকায়]

শাহীন। জামাই—যা একটা ফিল্ম দেখলাম না! কি হাসির!
সালেক। [ওকে দেখে না হেসে পারে না] কোথায় গেছিলি তুই?
শাহীন। প্যারামাউন্ট হলে... সেই দু'জন ছিলো জানো তো.....সেই—
সালেক। সেই ওয়াটগঞ্জের প্যারামাউন্টে ?
শাহীন। [নীলুর সামনে—তাই একটু রেগে] হ্যাঁ, ওয়াটগঞ্জ-প্যারামাউন্টে—আমি তো বলেইছিলাম তোমায় সিনেমা যাচ্ছি!
সালেক। [পিছিয়ে যায়] আরে! আমি তো জিগাইতেছি! [নীলুকে] সেই অঞ্চলে লুচ্চা-লফঙ্গার ভিড়—শাহীনের সেইখানে নায়্যা যাওয়াটা আমার পছন্দ না।
নীলু। আমার এ্যাকদিন চৌরঙ্গী যাবার ইচ্ছা—পিকচারে দেখছি, অনেক লাইট—
সালেক। [ধৈর্য ভাঙছে] আমি অর লগে এ্যাক মিনিট কথা কইতে চাই!
নীলু। জামাই-মেশো, আমরা তে সির্ফ রাস্তা দিয়া এট্টু ঘুরি—সে আমাদের সব চিনায়...
শাহীন। চৌরঙ্গী দেখবার জন্য পাগল—জানো তো জামাই?
নীলু। [আত্মীয়তার চেষ্টায়] ভাইসাব, আমরা চৌরঙ্গী এরিয়্যা গ্যালে ক্ষতি কি?
সালেক। শোনো, আমার তারে কিছু কওনের আছে—
নীলু। আমি...আমি নদীর ধারে এট্টু হাঁইট্যা আসি—ভালো ঘুম হবে।
[রাস্তায় একদিকে দিয়ে বেরিয়ে যায়]
শাহীন। তুমি ওর সঙ্গে কথা বলো না কেন, জামাই ? ও তোমাকে কতো আদর দেয়—
সালেক। আমিও তো তরে আদর দিই—তুই আমার লগে কথা কস না ক্যান্?
[হাসার চেষ্টা করে]
শাহীন। আমি তোমার সঙ্গে বলি না ! [ওর বাহুতে আঘাত করে] কি বলছো কি তুমি?
সালেক। তরে আর দ্যাখতেই পাই না। ঘরে ফিরি—তুই কোথায় কোথায় পলাইয়া বেড়াস!
শাহীন। আসলে ও যে সব কিছু দেখতে চায়...তুমি আমার ওপর রাগ করেছো?

সালেক। না। তুই যান্ দৌড়াস আর দৌড়াস...মনে হয়, আমার কথা আর পৌঁছায় না তর কানে—

শাহীন। [কাছে গিয়ে] জামাই, কি হয়েছে কি ? তুমি ওকে পছন্দ করো না?

সালেক। [স্বল্প বিরতি] তর পছন্দ অরে, শাহীন?

শাহীন। [মাথা নিচু করে] হ্যাঁ। [সালেকের হাসি নিবে যায়। — যেন দিশাহারা শিশু। শাহীন হাসছে, কিন্তু প্রত্যাঘাতের আশাঙ্কায় টান-টান] কেন তুমি ওকে অপছন্দ করো? ও তোমাকে মনে মনে কতো আদর দ্যায়!

সালেক। [ঘুরে যায়] ও আমারে আদর দ্যায় না, শাহীন!

শাহীন। ও দ্যায়। ও তোমাকে বাবার মতো দ্যাখে।

সালেক। [ওর দিকে ঘুরে] শাহীন!

শাহীন। কি জামাই?

সালেক। তুই অরে বিয়া করবি?

শাহীন। আমি জানি না...আমরা তো শুধু ক'দিন একসঙ্গে ঘুরেছি—ব্যস ....কেন তুমি ওকে সহ্য করতে পারো না.....জামাই, আমায় বলো ...লক্ষ্মীটি—কেন?

সালেক। অ তরে ইজ্জৎ দেয় না।

শাহীন। কেন?

সালেক। তর বাবা-মা নাই—কিন্তু সে কি আমার অনুমতি চাইছে কখনো?

শাহীন। ও ভেবেছিলো তুমি কিছু মনে করবে না।

সালেক। ও জানে আমি মনে করবো—কিন্তু তাইতে অর কিছু যায় আসে না!

শাহীন। না, জামাই—ওকে তুমি ভুল বুঝছো। ও আমাকে তোমাকে খুবই ইজ্জত দেয়—

সালেক। তরে না—তর হাতে যে একখান পাসপোর্ট আছে, ও তারে ইজ্জৎ দেয়—

শাহীন। পাসপোর্ট ?

সালেক। হ, তাই। অ তরে বিয়া করতে চায় যাতে সে লিগালি ইন্ডিয়ার সিটিজেন হইতে পারে।

শাহীন। [ধাঁধা এবং কষ্ট] না-না, জামাই—আমার তা মনে হয় না!

সালেক। তুমি আমারে কান্দাইবা ! এইটা এ্যাট্টা কাম-কাজের লোকের ধরন! প্রথম উপার্জন কইর‍্যাই সে একখান চকমইক্যা জ্যাকেট কেনছে, গাদা-গাদা ক্যাসেট কেনছে, এ্যাকখান ছুঁচলি জোতা কেনছে—ঐ দিকে তার ভাতিজারা যক্ষ্মায় মরে। তার মাথার মইধ্যে চৌরঙ্গীর আলো ঝলমলায়— সে হেরাফেরি করে! অরে তুই বিয়া করবি ? বিয়ার পরে আবার তারে দ্যাখতে পাবি যেদিন সে তরে তালাক দিতে আসবে!

শাহীন। জামাই, ওতো কোনোদিন আমাকে এইসব পাসপোর্টের কথা বলেনি!

সালেক। তুই ভাবিস তরে জানান দিয়া এইসব করবে?

শাহীন। আমি এইসব বিশ্বাস করি না ।

সালেক। শাহীন, আমার কথা শোন !

শাহীন। আমি এইসব কথা শুনতে চাই না !

সালেক। শাহীন!

শাহীন। ও আমাকে ভালোবাসে!

সালেক। এই কথা উচ্চারণও করিস না, শাহীন—খোদার কিরা—

শাহীন। [উদভ্রান্ত—সালেক এইসব কথায় তার বুকে গভীর দাগ ফেলেছে] আমি এই কথা বিশ্বাস করি না! [দৌড়ে বাড়ির দিকে যায়]

সালেক। [তার পেছনে যেতে যেতে] অরে—এইসব বাংলাদেশী প্যাঁচ—বোঝে-সোঝে না, সরল এ্যাট্টা মাইয়া পাইলে তারে পাকড়াও করে—কইরা তারা—

শাহীন। [হাঁপাতে হাঁপাতে] আমি বিশ্বাস করি না! জাহান্নামের দোহাই, চুপ করেন আপনি!

[শাহীন ভেতরে চলে যায়, সালেক 'শাহীন' আর্তনাদ করে পেছনে-পেছনে যায়। আলো জ্বলে ওঠে। জয়নাব দাঁড়িয়ে, শাহীনকে ছেড়ে, সালেকের দিকে তাকায়। স্ত্রীর উপস্থিতিতে সালেক, ব্যক্তিত্ব-লুপ্ত—অসহায়, শাহীনকে দেখায়।]

সালেক। তুমি অরে বুঝাইয়া কওনা ক্যান্?

জয়নাব। [এই খোলা আবেগের প্রকাশে একই সঙ্গে ক্রুদ্ধ এবং শঙ্কিত] আপনে তার পিছা ছাড়েন না ক্যানো?

সালেক। চিন্তামণি—ঐ ছোকরা লোক ভালো না !

জয়নাব। [হঠাৎ একই সঙ্গে তার ক্রোধ ও ভয়ের প্রকাশ ঘটে] আপনে অরে নিজের মতো এ্যাকা বাঁচতে দিবেন নাকি আপনে আমারে পাগল কইর‍্যা ছাড়বেন?

[সালেক ঘোরে, নিজের সম্ভ্রম ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে। কিন্তু কোন এক অপরাধবোধে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে ঘরের দিকে রওনা দেয়]

জয়নাব। শোন শাহীন। [শাহীন ব্যক্তিত্বহীন তার দিকে ঘোরে] তুমি নিজেরে নিয়া কি করতে চাও?

শাহীন। আমি জানি না। বুইন মাসি

জয়নাব। 'জানি না' এইকথা কইয়্যে না—আর তুমি ছোট মাইয়া না! নিজেদের নিয়া তুমি কি করতে চাও?

শাহীন। ও তো আমার কথা শুনছে না!

জয়নাব। আমি বুঝি না ঘটনাটা কি ঘটত্যাছে— সেতো তোমার আব্বা না, শাহীন!

শাহীন। [নিজের চাপা ইস্‌পাসাকে যুক্তিতে সাজানোর চেষ্টা করছে]

তাহলে কি করবো আমি—ওর মুখে থুতু দেবো?

জয়নাব। শোনো, তুমি বিয়া করতে চাও না সারাজীবন কুমারী থাকতে চাও? কিসের লেইগ্যা তোমার এ্যাতো চিন্তা?

শাহীন। **[মৃদু কাঁপছে]** আমি জানি না বুইন মাসি। তিনি যদি কোনো বিষয়ে অমত করেন—আমার মন বলে সেটা অন্যায়।

জয়নাব। **[নতুন শঙ্কা কিছুতেই ছাড়ছে না]** বসো, সোনা। আমি তোমারে কিছু কইতে চাই—এইখানে বসো। আইজ পর্যন্ত তোমার জইন্য সে কোনো মানুষেরে পছন্দ করছে কি?

শাহীন। কিন্তু তিনি যে বলছেন নীলু শুধু পাসপোর্ট বাগানোর জন্য এ-সব করছে!

জয়নাব। কি যে তিনি কন তার কোনো হুঁশ আছে তার? যদি তোমার জইন্য কোনো যোবরাজও মালা নিয়া আসে, তাঁর এই মন বদল হইবে না—সেকথা জানো না তুমি?

শাহীন। হ্যাঁ, বোধহয় জানি।

জয়নাব। তয়—এইটার অর্থ কি —আমারে কও?

শাহীন। **[জয়নাবের দিকে মুখ ঘুরিয়ে]** কি?

জয়নাব। এর অর্থ—তোমারে এ্যাখন স্বাধীন হইতে হবে। — নিজের মন নিজেরে ঠিক করতে হবে। তারে বোঝাতেই হবে আর তোমার উপর জোর খাটানোর অধিকার তাঁর নাই।

শাহীন। কিন্তু উনি যে ভাবেন এখনও আমি একটা ছোট মেয়ে।

জয়নাব। কারণ তুমি নিজেই যে ভাবো তুমি এ্যাকখান ছোট মেইয়ে—আমি পঞ্চাশবার তোমারে কইছি এই চলন-বলন ঠিক না ...তুমি এ্যাখনও সির্ফ এ্যাকখান শায়া পইরা তার সামনে ঘোরো—

শাহীন। সেটা আমি ভুলে গিয়েছিলাম।

জয়নাব। কিম্বা ধরো সে দাড়ি কামাইতেছে, বাথরুমে, আন্ডারপ্যান্ট পইরা সেইখানে গিয়া তুমি কথা শুরু করলা—

শাহীন। সে কখন করেছি আমি?

জয়নাব। আইজ সকালেই করছো তুমি।

শাহীন। সে-তো হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গিয়েছিলে—তাই আমি...

জয়নাব। আমি জানি সেইটা—কিন্তু তুমি কচি মেইয়ের ব্যবহার করলে তিনিও তোমারে কচি মেইয়েই ভাববেন। যামন, তিনি ঘরে ফেরলেন, তুমি লাফাইয়া তারে জড়ায়ে ধরো—য্যানো তোমার দশ বছর বয়স!

শাহীন। কিন্তু আমার যে ওকে দেখলেই খুশি লাগে, বুইন...

জয়নাব। কিযে তুমি করবা সেইটা তো আমি কয়্যা দেব না!

শাহীন। না, না বুইন! তুমি নিশ্চয়ই বলবে আমাকে। সব গুলিয়ে যাচ্ছে আমার...ওর মুখখানা ম্লান দেখলে এ্যাতো কষ্ট লাগে—

জয়নাব। শাহীন! এ্যাতোই যদি তোমার লাগে, তাইলে শ্যাষ পর্যন্ত এই বাড়িতে আবিআইত বুড়ি হইয়াই তোমর জীবন শ্যাষ হবে!

শাহীন। না!

জয়নাব। গ্যালো বছর দুই-তিনবার তোমারে এই কথাটা কইতে চেষ্টা করছি। এ্যাখন যখন দ্যাখলাম তুমি বাইরে যাইতেছো—কাজে যোগ দিবা ঠিক করছো—আমি খুশিই হইছিলাম। এইবার তুমি স্বাধীন হবে, মনে জোর পাবে—দ্যাখো, এ্যাট্টা পরিবারে সব্বলে সকলরে ভালোবাসবে —সেইটা ভালো কথা। কিন্তু তুমি এ্যাখন পুরাপুরি এ্যাকজন মাইয়া মানুষ—এ্যাকজন পুরুষের সঙ্গে এ্যাকই বাড়িতে বাস করতাছো—কাজেই এ্যাখন তোমার উচিত বুঝশুঝ নিয়া চলা। বোঝছো?

শাহীন। হ্যাঁ, তাই করবো আমি—আমি মনে রাখবো এখন থেকে।

জয়নাব। এই কথাটা আমি তাঁরেও কইয়া দিছি।

শাহীন। [দ্রুত] কি?

জয়নাব। কইছি তারে, এইবার তোমারে মুক্তি দিতে হবে। কিন্তু শুধু এ্যাকা আমিই যদি এইকথা কইতে থাকি—তিনি ভাববেন, আমি বড়ো খচখচ করি—হয়তো ভাবলেন, আমি হিংসায় জ্বলতাছি—

শাহীন। [অবাক] তিনি বলেছেন তুমি আমায় হিংসে করো?

জয়নাব। না। আজ কন নাই—কাইল কইতে পারেন। [হাত বাড়িয়ে শাহীনের হাত নিজের হাতের মধ্যে নেয়। কষ্ট নিয়েও হাসে] তুমি কি ভাবো, সোনা—আমি তোমারে হিংসা করি?

শাহীন। না, এই কথাটা তো....কখনও আমার মাথায় আসেনি!

জয়নাব। [বিষণ্ণ হেসে] এই কথাটা আগেই তোমার মাথায় আসা উচিত ছিল। না—আমি তোমারে হিংসা করি না। আমাদের সব কিছু ঠিক হয়্যা যাবে। দাঙ্গা-কাজিয়া করার দরকার নাই—শুধু তারে বোঝতে দাও তুমি এ্যাখন পুরাপুরি মাইয়া মানুষ—ব্যস। তোমার জইন্য সুন্দর এ্যাকজন অপেক্ষা কইরে আছে—সময় আইছে—এ্যাখন শুধু বিদায় লবা! — ঠিক আছে?

শাহীন। [এই ভবিষ্যতের সম্ভাবনা তাকে আশ্চর্য নাড়া দেয়] ঠিক আছে যদি আমি পারি—

জয়নাব। তোমারে পারতেই হবে,—সোনা!

শাহীন। [এই দাবির শক্তি হঠাৎ বোধগম্য হয়। কেমন ভয়ার্ত হয়ে ঘুরে দাঁড়ায়। সে এখন কান্নার ঢলের সীমানায়।—যেন এতোদিনের পরিচিত জগৎ তার চোখেরই সামনে চুরমার হয়ে যাচ্ছে] ঠিক আছে!

[ওদের ওপরের আলো মরে যায়। জ্বলে ওঠে হারুণ সাহেবের ওপর — তিনি তাঁর ডেস্কের পেছনের চেয়ারে বসে আছেন]

হারুণ। ঠিক এই সময়েই সে প্রথম আমার কাছে আসে। (কয়েকবছর আগে আমি ওর বাবার হয়ে একটা কেস লড়েছিলাম—এ্যাকসিডেন্ট কেস। ওদের পরিবারের সঙ্গে আমার খানিকটা উপর-উপর পরিচয়ও

ছিলো। সেইদিন যখন ও আমার দরজায় এসে দাঁড়ালো, তখনও আমার মনে পড়ে — **[রাস্তায় ডানদিক থেকে সালেক প্রবেশ করে]** ওর চোখদুটো সুড়ঙ্গের গভীর, কোথায় যেন দৃষ্টি প্রথমেই মনে হয়েছিলো, ও কোনো অপরাধ করে এসেছে। **[সালেক সামনে বসে, হাতে টুপি, দৃষ্টি যেন কোন্ সুদূরে]**

কিন্তু একটু পরেই বুঝলাম কোনো এক তীব্র বাসনা ওর শরীরে বাসা বেঁধেছে—অচেনা কিছু যেন ওরে ভর করেছে।

[হারুণ থামে, ডেস্কের দিকে তাকায়, তারপর, যেন কথা চলছিলো, সালেককে বলে]

বোঝতেছি না আমি কি করতে পারি। এর ভিতরে আইনের কোনো স্থান আছে কি?

সালেক। সেইটা তো আপনারেই জিগাই আমি!

হারুণ। কারণ—এ্যাকটা মাইয়া কোনো বিদেশীর প্র্যামে পড়লে—তাতে বে-আইনি কিছু তো ঘটে না।

সালেক। হ—কিন্তু এ-সবের উদ্দেশ্য যদি শুধু এ্যাকটাই হয় কিভাবে আমি সিটিজেন হবো?

হারুণ। প্রথমত, সেই কথা তুমি নিশ্চিত জানো না।

সালেক। অর মনের ভিতরে কি আছে, আমি জানি, হারুণ সাব!

হারুণ। সালেক মিঞা, যদি সেইটা তুমি প্রমাণ করতেও পারো—

সালেক। এ্যাক মিনিট শোনবেন কথাডা! আইনের কথাই আমি কই...কথাডা আমারে গুছাইয়া নিতে দ্যান—এ্যাকটা মানুষ—ইল্‌লিগাল আইছে এই দ্যাশে সুবুদ্ধির কাজ কি?—যা রোজগার করবে, সব জমাইয়া রাখবে? ঠিক?

হারুণ। ঠিক আছে—

সালেক। সে শুধুই উড়ায়-পুড়ায়। ক্যাসেট কেনে, জুতা কেনে, জ্যাকেট কেনে। তার কোনো চিন্তাই নাই। — যেন সে এইখানে ছিলো, এইখানেই থাকবে—

হারুণ। তো তাতে কি হইলো?

সালেক। ঠিক আছে। **[দৃষ্টি প্রথমে হারুণের ওপর, পরে মেঝেতে নিবদ্ধ]** আপনারে বিশ্বাসে এ্যাট্টা গোপন কথা কইতে পারি?

হারুণ। নিশ্চয়ই।

সালেক। মানে এই কথাটা তো ঘরের বাইরে যাবে না। কারো সম্পর্কে এ্যাখন এ্যাট্টা কথা কওয়া তো...আমার বিবিরেও ঠিক এই কথাডা আমি কই নাই...

হারুণ। কথাডা কি?

সালেক। **[গভীর শ্বাস নেয়, তারপর হারুণের পেছনে তাকায়]** এই ছোকরা...ঠিক স্বাভাবিক না...

হারুণ। বুঝি না কথাডা!

সালেক। [চেয়ারে স্থান বদলায়] এই ছোকরা বিচ্ছিরি ... সাহেবদের মতোন ফর্সা... বোঝলেন কথাডা?

হারুণ। না।

সালেক। ঐ যে কয় 'ফুলের ঘায় মূর্ছা যায়'—পুরুষের দম নাই তার—

হারুণ। হ, কিন্তু তার থিকা তো কিছু প্রমাণ হয় না!

সালেক। এ্যাকমিনিট—আমি কথাডা কই...সে সঙ্গীত করে—সেইটা ঠিক আছে—কিন্তু আচানক এ্যামন এ্যাকখান স্বর লাগায় আপনার চমক লাগবে—

হারুণ। হ, ভাটিয়ালিতে উঁচা স্বর লাগে—

সালেক। ভাটিয়ালিতে উঁচা স্বরে লাগে আমি জানি! সেইডা কথা না। ...ধরেন ঘরে ফেরলেন—গান হইতেছে—ভাবলেন, বুঝি কোনো মাইয়া গান করে—ঘুইরা দ্যাখলেন গান গায় সেই ছোকরা!

হারুণ। হ, কিন্তু সেইটা তো কোনো—

সালেক। এ্যাকমিনিট খাড়ান—আমি কথাগুলান গুছাইতে চেষ্টা পাই ...দুইদিন আগে আমার শালীর মাইয়া এ্যাকখান কুর্তা বাইর করছে— সেইটা তারে ফিট করে না... তো এই ছোকরা কাইট্যা সিলি কইর‌্যা দুই মিনিটে এ্যাকখান নতুন পোশাক বানায়ে ফ্যাললো...
যখন এইটা সে করতাছিলো, দ্যাখলে আপনি তাজুব হইয়া ভাবতেন সে কি এ্যাট্টা ফরিশ্‌তা? নাকি এ্যাট্টা বাচ্চা ? নাকি সে এ্যাক মাইয়া মানুষ..

হারুণ। শুন, শুন —

সালেক। ঐ ছোকরারে দ্যাখলেই সক্কলে হাসাহাসি করে—আমার লজ্জা লাগে—সবাই তারে নাম দিছে, 'আইস বেবি' 'চিটাগাঙের মেমসাহেব' —সক্কলে হাসে, কিন্তু কারণডা কয় না। তারা জানে এই ছোকরা আমার জ্ঞাতি, তাই কেউ কারণডা কয় না— কিন্তু আমি তো বু ঝিক্যান তারা হাসাহাসি করে। যখন ভাবি, এই ছোকরা সেই মাইয়ার গায়ে হাত দিবে, তারে আদর করবে—আমার সারা শরীর, হারুণ সাব, গুলায় গুলায় ওঠে কারণ ঐ মাইয়ারে মানুষ করবার জইন্য আমি বড়ো কষ্ট করছি—আর আইজ সেই ছোকরা আমারই ঘরে অতিথ হইয়্যা—

হারুণ। দ্যাখো, সালেক মিঞা, আমারও ছেলে-মেয়ে আছে— তোমার কথা আমি বুঝি—কিন্তু আইন এই বিষয়ে অইত্যন্ত সুনির্দিষ্ট—আইন—

সালেক। [স্পষ্ট অসম্মানিত] সেই ছোকরা অস্বাভাবিক—সে বিয়া করবে—অথচ আইন তারে কিছু—

হারুণ। কিচ্ছু করণীয় নাই।

সালেক। কিচ্ছু না?

হারুণ। এ্যাক্কেবারে কিচ্ছু না!... শুধু এ্যাকটা আইনগত প্রশ্ন আছে এর মইধ্যে—

সালেক। কি ?

হারুণ। যে প্রকারে সে ইন্ডিয়ায় ঢোকছে...কিন্তু তুমি তো সেইটা নিয়া কিছু করতে চাও না....নাকি তুমি চাও?

সালেক। আপনি কইতেছেন...

হারুণ। হ। তারা তো ইললিগাল আইছে এই দ্যাশে—যদি থানায় নয়তো ইমিগ্রেশনে কেউ রিপোর্ট করে —

সালেক। হায় খোদা! না না না না...আমি সেইসব কিছু ভাবি নাই...আমি...

হারুণ। তাইলে? — এইবার আমি এট্টু কই ! না—এইবার আমার কথা শোনতে হবে। **[বিরতি]** খোদায়, কেন জানি, হঠাৎ হঠাৎ মাইনষের মাথায় গোলমাল পাকাইয়া দ্যান। প্রইত্যেক মানুষ কাউরে ভালোবাসে—বিবিরে, নয়তো বাচ্চারে, নয়তো আরও কারে—কিন্তু কখনও কখনও সেই ভালোবাসা তার সীমা ছাড়ায়্যা যায়। তখন সেইটা যে দিকে গতি ন্যায়, সেইটা হওয়া উচিত না! বোঝলা কথাডা? এ্যাকটা মানুষ হাড় কালি কইর‌্যা বাচ্চারে বড়ো করে—হয়তো সে তার মাইয়া, নয় ভাতিজা কিম্বা তার বুইনঝি—বছর পার হয়—সেই ভালোবাসা বাড়তে থাকে, আরও তীব্র হইতে থাকে... বুঝতাছো—কি কই আমি?

সালেক। কি কইতাছেন আপনি? সেই মাইয়ার মঙ্গল চিন্তার অধিকার আমার নাই?

হারুণ। আছে। কিন্তু সব কিছুরই শ্যাষও আছো। তুমি তুমি তোমার কাম করছো—এ্যাখন এইটা জীবন—আল্লার দোয়া চাও, তারে চল্যে যেতে দাও ! **[বিরতি]** যা কই করবা তুমি ? শুইন্যা রাখো— আইনের কোনোই এক্তিয়ার নাই!

সালেক। যদি সে হিজড়া প্রকৃতির হয়—যদি সে—

হারুণ। তোমার কিছু করণের নাই।

সালেক। **[উঠে দাঁড়ায়]** তাইলে... ঠিক আছে, ধইন্যবাদ।

হারুণ। তুমি কি করবা তাহইলে ?

সালেক। **[অসহায় , ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে]** আমি কি করতে পারি? আমি তো পাগোল-ছাগোল— আবোদা! এ্যাকজন আবোদার কি শক্তি আছে? কুত্তার মতো হাঁপাইতে হাঁপাইতেদিনে বিশ ঘন্টা কাম করছি—যাতে এ্যাকটা নপুংসক আইস্যা তারে লইয়া যাইতে পারে! এইতো করছি আমি সারাজীবন খুবেই দুঃসময়ে—ঐ ডকে যখন এ্যাকখানও জাহাজ আসতো না—তখনও ভিক্ষার হাত পাতি নাই—খড়ের নৌকা চাইলের নৌকায় গাদাবোটে কুলিগিরি করছি...কারণ আমি এ্যাকখান জবান দিছিলাম....নিজের মুখের খাবার তারে খাওয়াইছি—নিজের বিবিরে আধপ্যাটা রাইখ্যা দিছি...দিনের পর দিন প্যাটে ক্ষুধা লইয়া শহরের গলি-গলিতে ঘাটে ঘাটে ঘুরছি পাগলের মতো [ধীরে ধীরে ভাঙতে থাকে] আর আইজ আমারে

নিজের ঘরে বইস্যা দ্যাখতে হবে সেই ছোকরা—কুত্তার বাচ্চা এ্যাক হিজড়া.... কোথা থিকা আইছিলো সে—আমার ঘরে তারে শুইতে দিছি, নিজের চাদরখান তার গায়ে জড়ায় দিছি—আর তারই সুযোগ নিয়া সেই ছোকরা তার ঐ নোংরা হাত দিয়া আমার মাইয়াডারে... চোরের মতো ...আ-আ-আ—

হারুণ। **[উঠে দাঁড়ায়]** কিন্তু সালেক মিঞা, সে আর শিশু না, সে এ্যাখন—পুরা এ্যাক মাইয়া মানুষ—

সালেক। আমার থিকা সে চুরাইতেছে....

হারুণ। সেই মাইয়া তারে বিয়া করতে চায়... সে তো তোমারে বিয়া করতে পারবে না?

সালেক। **[ফেটে পড়ে]** সে আমারে বিয়া করবে? — কি কি আল-ফাল বকতাছেন আপনি!

হারুণ। আমার পরামর্শ আমি দিলাম, সালেক মিঞা—ব্যস, ফুরায়্যা গ্যালো কথা।

সালেক। **[নিজেকে সংহত করে]** ঠিক আছে, ধইন্যবাদ—অনেক ধইন্যবাদ আপনারে! শুধু ...কি কই ...বুকের ভিতর য্যানো আছাড়ি-পিছাড়ি করে—আপনি বুঝেন? আমি—

হারুণ। আমি বুঝি। মন থিকা ফ্যালায়্যা দাও এই চিন্তা—পরবা—না তুমি?

সালেক। আমি ... **[ভয়-কান্না উঠে আসছে—অসহায় ভঙ্গিতে]** পরে আপনার সঙ্গে দ্যাখা করবো। **[রাস্তার ডানদিক দিয়ে বেরিয়ে যায়]**

হারুণ। **[আবার ডেস্কে বসে]** এক একটা সময় আসে—যখন ইচ্ছা করে চিৎকার করে বলি, 'বিপদ বিপদ'! কিন্তু কি বিপদ—কারে বোঝাবো—কেমনে বোঝাবো? আমি তখনই সেই মুহূর্তেই বুঝেছিলাম, গল্প শ্যাষ অঙ্কে পৌঁছে গ্যাছে। না বোঝার মতো জটিল রহস্য কিছু তো ছিলো না। এট্টার পর এট্টা ধাপ—আমি স্পষ্ট দেখতে পাইছিলাম— যেন অন্ধকারে কেউ হেঁটে যাচ্ছে সেই দরজার দিকে—! মানুষটার কি পরিণতি হবে আমি জানতাম। তারপর কতোদিন সন্ধ্যায় এই অফিসে বসে নিজেরে প্রশ্ন করেছি : আমি এট্টা বুদ্ধিমান লোক—তবু এরে থামানোর ক্ষমতা কেন নাই আমার? এমনকি এই অঞ্চলেরই এক অতি-বৃদ্ধার কাছে গিয়েওছিলাম ! বহুদর্শী ভূয়োদর্শী সেই বুড়ি—সব কিছু শুনে শুধু মাথা নেড়ে সে বললো 'তাইর জইন্য আল্লার দোয়া মাঙো....' আর তাই আমি এখানেই অপেক্ষা করতে লাগলাম!

[হারুণের আলো নিবে যায়। ঘরের আলো জ্বলে ওঠে। সবাই রাত্রের খাওয়া শেষ করছে । জয়নাব ও শাহীন টেবল খালি করছে]

শাহীন। ওরা কোথায় গিয়েছিলো জানো?

জয়নাব। কোথায় ?

শাহীন। একবার ওরা বার্মা চলে গিয়েছিলো মাছ ধরার বোটে।

[জয়নাব থালা ইত্যাদি নিয়ে রান্না ঘরে চলে যায়]

সালেক। **[এনায়েৎ]** ঐ সব বোটে কাজের জইন্য পয়সা দ্যায়?

[জয়নাব ও নীলু সবকিছু একত্রিত করে]

এনায়েৎ। যথেষ্ট মাছ পাইলে ভালোই পয়সা দেয়।

নীলু। আমাগো বোট ছিলো না। কোনো বোটে কেউ অসুখে পড়লে তবেই আমাদের নিতো।

জয়নাব। জানো এনায়েৎ—বড়ো আশ্চর্য লাগে....সাগর ভর্তি মাছ—তবুও তোমরা উপাস দিয়া মরো!

এনায়েৎ। ভটভটি নৌকা লাগে, বড়ো জাল লাগে, পয়সা লাগে...

সালেক। সমুদ্রের মাছ ঝাঁকে ঘোরে—মাইলের পর মাইল চইল্যা যায়—

জয়নাব। আমি ভাবতাম শুধু পাড়েই থাকে বুঝি মাছ! **[বেরিয়ে যায় রান্না ঘরে]**

শাহীন। যেমন আমি ভাবতাম, শুধু বাজারেই বুঝি কমলালেবু পাওয়া যায়—লেবু যে গাছেই ফলে ভাবিনি আগে!

সালেক। শুনি কমলালেবু নাকি আইজকাল রঙ করে!

এনায়েৎ। **[চিঠি পড়ছিলো]** রঙ করে?

সালেক। হ, গাছে নাকি কমলা সবুজ হয়!

এনায়েৎ। না—সেইখানে কমলা কমলাই হয়।

নীলু। পাতিলেবু গ্রীন হয়।

সালেক। **[মধ্যস্থতায় বিরূপ]** এইখানকার দোকানে বাজারে আমরা পাতিলেবু গ্রীনই দেখি—আমি কমলালেবুর কথা জিগাই — পাতিলেবুর কথা জানতে চাই নাই আমি!

জয়নাব। **[বসে প্রসঙ্গ পাল্টাতে চায়]** তোমার বিবি ঠিক ঠিক টাকা পাইতেছে তো, এনায়েৎ?

এনায়েৎ। হ, জয়নাব বুইন। সে পোলাডারে হেকিমের দাওয়াই খাওয়ায়।

জয়নাব। বাঃ, তয় তোমার মন শান্ত হইছে এ্যাখন?

এনায়েৎ। হ, হ, .. কিন্তু মনডা ক্যামন ক্যামন করে!

জয়নাব। জানো, কিছু মানুষেরে জানি—এই দেশে আইস্যা ভাবছে— এট্টু টাকা জমাই, আর এট্টু দেইখ্যা লই—পনেরো বিশ বছরেও ঘরে ফেরা হয় নাই... তোমার য্যানো, আল্লা করেন, সেইকরম না হয়!

এনায়েৎ। আমি জানি—আমাগো টাউনেই কয়টা ফেলিমি আছে—অখনতরি বাপেরে দ্যাখেই নাই...আমি দ্যাশে যামু— তিনবছর চাইর বছর পাঁচবছরের মইধ্যেই যামু।

জয়নাব। তুমি কিন্তু টাকা এট্টু কম পাঠাইলে পারো—সহজেই পায়্যা গ্যালে খরচের হাত হয়ে যায়।

এনায়েৎ। না, না। সে পয়সা বাঁচায়.....আমি সবটাই পাঠায়্যা দিই তারে। সেই বিবিও বড়ো এ্যাকা বোধ করে। **[সলজ্জ হাসে]**

জয়নাব। লক্ষ্মী মাইয়া নিশ্চয়ই। সোন্দর দ্যাখতে ? নিশ্চয়ই সুন্দর !

এনায়েৎ। [প্রচণ্ড লজ্জা পায়] জী, না, তয় খুবই বুঝদার।

নীলু। ইয়েস, ভাবীজান ইজ ভেরি ক্লেভার!

সালেক। কিছু কিছু লোক দ্যাশে ফিৱ্যা নিশ্চয়ই খুবই চমকায়!

এনায়েৎ। চমকায়—ক্যান্ ?

সালেক। [হেসে] আসার সময় বাচ্চা ছিলো দুইটা—ধরো দ্যাশে ফিৱ্যা দ্যাখলো চাইরটা!

এনায়েৎ। না-না ! সেই মাইয়ারা অপেক্ষা করে ....অধিকাংশেই —অধিকাংশেই ... সেইরকমডা বেশি ঘটে না —

নীলু। আমাগো টাউনে এই বিষয়ে খুব স্ট্রিক্ট—অতো সস্তা না—

সালেক। [ওঠে, পায়চারি করে] না— এইখানেও ততো সস্তা না ! অনেক চ্যাংড়ায় ভাবে, এইখানেও বিশেষ ঢাকাঢুকি নাই—তাই মাইয়ারা বুঝি বড়োই মাগ্না—বোঝছো, কি কই ?

নীলু। না মানে আমি তো সবসময়ই রেসপেক্ট দিয়া চলি—

সালেক। তুমি নিজের টাউনে গুরুজনের অনুমতি ছাড়া কোনো মাইয়ার হাতে টান দিয়া হাঁটা দিতে পারতা? —না! [এনায়েৎকে] তুমি বোঝছো এনায়েৎ— কি কই ? এই বিষয়ে দুই দ্যাশে তফাৎ নাই।

এনায়েৎ। [সন্তর্পণে] হ।

জয়নাব। আরে কর্তা, সে-তো ঠিক তারে টান দিয়্যা হাঁটা দ্যায় নাই, দিছে কি?

সালেক। জানি —কিন্তু কারো কারো এই বিষয়ে কোনো হুঁশই থাকে না।

নীলু। আমি তো তারে রেসপেক্ট দিই, জামাই ...আমি কিছু অন্যায় করছি কি?

সালেক। শোনো ছোকরা—আমি তার বাপ না—আমি তো কেবল মেসো।

জয়নাব। তাহলে মেসোর মতোই থাইকেন আপনি—সেইরকমই থাকে।

এনায়েৎ। না, জয়নাব বুইন। সে অন্যায় করলে তারে কওয়াই উচিত [সালেককে] ও কি কিছু অন্যায় করছে কি ?

সালেক। দ্যাখো এনায়েৎ, ঐ মাইয়া আগে কোনোদিন রাইত-বিরাইত ঘরের বাইরে থাকতো না।

এনায়েৎ। [নীলুকে] তুমি এ্যাখন থিকা জলদি-জলদি ঘরে ফিরবা।

জয়নাব। শাহীন, তুই তো কইছিলি সিনেমা দেরিতে ভাঙবে— বাস নাই?

শাহীন। হ্যাঁ।

জয়নাব। তয় সেই কথাটা তর মেসোরে কইয়া দে! [সালেককে] সেই সিনেমা দেরিতে শ্যাষ হইছিলো।

সালেক। তুমি এ্যাখন থিকা তাড়াতাড়ি ফিরবা!

নীলু। [অপ্রস্তুত] ঠিক আছে, নিশ্চয়ই। [সালেককে] কিন্তু সালেক ভাই, আমি তো সর্বক্ষণ ঘরে বইস্যা থাকতে পারি না!

সালেক। দ্যাখো ছোকরা, দিন-রাইত ঘোরাঘুরি করলে তোমারই বিপদ।

[জয়নাবকে] ধরো, বাইরের কালে কোন এ্যাক্সিডেন্টে পড়লো—
[এনায়েৎকে] তখন নিজের কি পরিচয় সে দিবে?

জয়নাব। দিনের কালেও এ্যাক্সিডেন্ট ঘটতে পারে—তখনও তো পরিচয় দিতে পারতে।

সালেক। **[গলায় রাগ, সামলাতে চেষ্টা করে]** সে যদি কাম-কাজের জইন্যই আইসা থাকে, তয় সেইটাই মন দিয়া করুক! আর যদি ফুর্তি মারণের জন্য আসে —এনায়েৎ, আমি তো জানতাম তোমরা রোজগার করতে আইছো এই দ্যাশে —নিজের জইন্য, পরিবারের জইন্য—

এনায়েৎ। হ ঠিকই । আমি আপনার কাছে মাফি চাই, সালেক ভাই।

সালেক। সেইটাই কইতেছিলাম। **[খবরের কাগজে মন দেয়]**

[সামান্য বিরতি। শাহীন উঠে টেপ-রেকে পল্লী-গীতি চালিয়ে দেয়। তার ভেতরে বিদ্রোহ]

শাহীন। তুমি যে আমাকে এই নাচটা শেখাবে বলেছিলে! **[সালেক পাথর]**

নীলু। **[সালেকের প্রতি সম্ভ্রমে]** না—আমি—আমার ক্লান্ত লাগে।

জয়নাব। আহা, শেখাও না অরে নাচটা—নীলু!

শাহীন। আঃ শেখাও না নীলু .....এই গানটায় কেমন সুন্দর দোল আছে ....এসো!

[শাহীন নীলুর হাত ধরে, নীলু অপ্রতিভ শক্ত—উঠে দাঁড়ায়। সে জানে সালেকের দৃষ্টি তার পিঠে বিঁধছে। তবুও শেষ পর্যন্ত নাচ শেখানো শুরু হয়। জয়নাব আবহাওয়া স্বাভাবিকে ফেরানোর চেষ্টা করে]

জয়নাব। ঐ মাছের বোটে ঘোরতে নিশ্চয়ই খুবই মন লাগে। কতো দ্যাশ কতো কিছু দ্যাখা যায় ....
[এনায়েৎকে] আইচ্ছা। মাইয়া মানুষদের তো নৌকায় লয় না —নিশ্চয়ই ন্যায় না?

এনায়েৎ। না—নৌকাতে ন্যায় না....বড়ো পরিশ্রমের কাজ।

জয়নাব। নৌকার মইধ্যেই কি রান্ধন-বাড়ানের ব্যবস্থা থাকে ?

এনায়েৎ। জী। নৌকার ট্রিপে খাওন-দাওন খুবেই ভালো হয়। আর নীলু সঙ্গে থাকলে তো কথাই নাই—সক্কলের ভুঁড়ি মোটা হইয়্যা যায় !

জয়নাব। কও কি। সে রান্তে পারে?

এনায়েৎ। সে খুবই ভালো রান্ধে—ভাত-ডাইল মাছের ঝোল ঝাল অম্বল—আরও কতো কি!

সালেক। **[কাগজ নামিয়ে রাখে]** আইচ্ছা ! বা বাঃ **[নীলুকে]** সে সঙ্গীত করে, নৃত্য করে, আবার রন্ধনও করে... **[নীলু সকৃতজ্ঞ হাসে]**

জয়নাব। ভালোই তো—ভালোই । কিছু না কিছু কইরা খাইতে পারবে!

শাহীন। রান্নার কাজে অনেক পয়সা। ঐ যে যাদের হোটেলে শেফ বলে—তাদের কতো টাকা মাইনে ! **[নাচ চলে]**

সালেক। **[জয়নাবকে]** ছোকরার নসীব খুবই ভালো। **[একটু বিরতি। মুখ ঘুরিয়ে নেয়, আবার ঘুরে]** সেই জইন্যই এই ডক এরিয়ায় অরে

মানায় না।

[ওদের নাচ থেমে যায়, নীলু টেপ-রেকর্ডার থামিয়ে দেয়] আমারেই ধরো—আমি এইসব কিছুই পারি না, তাই আমার যথাযোগ্য স্থান এই ডকে। আর যদি আমি নৃত্য পারতাম, সঙ্গীত পারতাম, সিলাইতে পারতাম, রান্ধতে পারতাম—তয় আমি এই ডকের নরকে বন্দী থাকতাম না—[নিজের অজান্তে হাতের কাগজ মুড়তে-পাকাতে থাকে। সবাই তাকে লক্ষ্য করছে। সে বুঝতে পারে, তার গোপন সবকিছু প্রকাশ পেয়ে যাচ্ছে, কিন্তু সামলাতে পারে না।] তাইলে আমি অন্য কোথাও চলে যেতাম—হয়তো বড়ো কোনো ড্রেসের দোকানে 'মাস্টার' হয়ে যেতাম! [কাগজ সে দু'টুকরো করে ফেলেছে। হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়, প্যান্ট টেনে ঠিক-ঠাক করে, তারপর বড়ো-বড়ো পায়ে এনায়েতের কাছে যায়] এই শনিবারের রাত্তিরে বক্সিং ম্যাচ আছে—যাবা নাকি তুমি ? বক্সিং দ্যাখছো কোনোদিন?

এনায়েৎ। [অস্বস্তি] সিনেমায় দেখছি এ্যাকবার দুইবার।

সালেক। [নীলুর কাছে যায়] তোমার টিকিটের দাম আমি দিব। যাইবা নাকি পোর্তুগীজ হার্মাদ?

নীলু। আমি তো যাইতেই চাই!

শাহীন। [খুশি এবং নার্ভাস-সালেকের কাছে গিয়ে] আমি একটু চা বানাই, কেমন?

সালেক। নিশ্চয়ই কড়া করবা আর মিষ্ট দিবা! [শাহীন ধাঁধায়, মৃদু হেসে চলে যায়। সালেক মুষ্টিবদ্ধ হাত তালুতে ঘষতে-ঘষতে, লম্বা পা ফেলে এনায়েতের কাছে যায়] তুমি কোনোদিন বক্সিং করছো?

এনায়েৎ। না, কোনোদিনই না।

সালেক। [নীলুকে] তুমি নিশ্চয়ই বক্সিং করছো?—এ্যাঁ ?

নীলু। না।

সালেক। আসো—আমি শিখামু তোমারে।

জয়নাব। সে বক্সিং শিখতে যাবে কোন কাজে?

সালেক। কওন তো যায় না—কে কখন তারে চোরাগোপ্তা মারে। আসো, তোমারে কয়খান কায়দা শিখাই।

জয়নাব। যা, নীলু, যা—তিনি খুবই ভালো বক্সিং লড়তেন। ভালোই শিখাইবেন তরে।

নীলু। [অস্বস্তি] আমি তো জানি না ঠিক কেমন কইরা...[সালেকের সামনে দাঁড়ায়]

সালেক। হাত দুইখান এইরকম তুইলা ধরো ....এই... এই... খুব ভালো হইছে! এইবারে বাঁ হাতটা উঁচায়ে রাক্ক কারণ এইটা দিয়া সক্কল খেলার শুরু—এই [সালেক নিজের বাঁ হাত দ্রুত নীলুর মুখের কাছে নিয়ে যায়] এইবার তুমি কি করবা?—ঠ্যাকাইবা [নীলু ওর বাঁ

হাতের ঘুষি কাটিয়ে নেয়] অয় সাংঘাতিক! [নীলু হাসে] এইবার তুমি আমারে—

আমি আপনারে মারতে চাই না, সালেক ভাই।

সালেক। দয়া কইরো না আমারে—আসো, মারো-মারো—[নীলু তাকে জ্যাব করে, অন্য সবাই হাসে] এ্যাই এ্যাই—আবার...আমার চাবালিজা নিশান কইরা— [নীলু আগের তুলনায় আত্মবিশ্বাসী]—সাব্বাস! সাব্বাস।

জয়নাব। [এনায়েৎকে] সে-তো ব্যাশ ভালোই লড়ে!

সালেক। [নীলুর উল্টোদিকে চলে যায়] পান্চ্ লাগাও— তুমি আমারে ছুঁতেও পারবা না! [হঠাৎ নীলুর ঘুষি সালেকের চোয়াল ছুঁয়ে যায়] বাহ্‌রে বাহাদুর! এইবার আমি তোমারে মারবো—শাহীন রান্নাঘর থেকে আসে

শাহীন। ওরা—একি করছে ওরা? [লড়াই চলে]

জয়নাব। [এ লড়াই তার কাছে বন্ধুত্বের] তিনি অরে বক্সিং শিখান। এই ছোকরা খুবেই কায়দা করে!

সালেক। মুকদ্দরের সিকন্দর। দ্যাখো—কেমন ছল্‌বল্ করে! [নীলু হঠাৎ ঘুষি জমায়] অয় অয় অয় অয় ! এইবারে হুঁশিয়ার—আমি আসতাছি হার্মাদ—! [বাঁ হাত পিছিয়ে ধোঁকা ডানহাত দিয়ে ঘুষি জমায়। নীলু অল্প টলে যায় তাতে। এনায়েৎ উঠে দাঁড়ায়]

শাহীন। [নীলুর কাছে ছুটে যায়] জামাই!

সালেক। না !আমি তো তারে আঘাত করি নাই! করছি কি?—এ্যায় ছোকরা? [নিজের মুঠো দিয়ে ওর মুখ ঘষতে থাকে]

নীলু। [তার চোখ উজ্জ্বল, মুখে হাসি] না-না তিনি আমারে মারেন নাই। অমি এট্টু চমকাইয়া গেছিলাম!

জয়নাব। [সালেককে টেনে দোলনা চেয়ারে বসায়] ব্যস, ক্ষান্ত দ্যান কর্তা— অনেক হইছে। সেই ছেলে ভালোই শিখছে, এইটা স্বীকার করেন!

সালেক। [তালুতে বদ্ধ মুষ্টি ঘষতে-ঘষতে]—নিশ্চয়ই, সে ভালোই শেখবে ....এনায়েৎ মিএগা, আমি তারে আবার শিখামু।

[এনায়েৎ সন্তর্পণে সন্দেহে তাকায়। নীলু শাহীনের কাছে যায়]

নীলু। ডান্স হবে নাকি আবার?

[নীলু টেপ-রেকর্ডারে পল্লী-গীতি বাজায়, শাহীনের হাত ধরে। নাচ চলে—ঘনিষ্ঠ। সালেক চিন্তিত, চেয়ারে বসে। এমন সময় এনায়েৎ একটা চেয়ার নিয়ে সালেকের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়, চেয়ারের দিকে তাকিয়ে থাকে। সালেক ও জয়নাব তাকে লক্ষ্য করে।]

এনায়েৎ। আপনে এই চেয়ারখান উঠাইতে পারেন?

সালেক। বোঝালাম না কথাডা !

এনায়েৎ। এইখান থিকা। [এক-হাটুঁ তে ভর দিয়ে বসে। একহাত পেছনে,

অন্য হাতে চেয়ারের একটি পায়া নিজের দিকে ধরে, কিন্তু তোলে না]

সালেক। এইটা না পারার কি আছে?

[চেয়ারের কাছে এসে হাঁটু গেড়ে একটা পায়া ধরে—ইঞ্চিখানেক তোলার পরেই চেয়ারটা পড়ে যায়]

আরি—এইটা কৌশলের কাম —আগে তো জানতাম না! [আবার চেষ্টা করে, আবার বিফল হয়] সেইটা আসলে এ্যাঙ্গেলে আছে—সেইর জইন্যই। তাই না?

এনায়েৎ। এই যে—!

[সে হাঁটু গেড়ে বসে, পায়াটা ধরে এবং বিপুল শ্রমে চেয়ারটা উঁচুতে আরও উঁচুতে তুলতে থাকে। এখন দু'পায়ে দাঁড়িয়ে। নীলু এবং শাহীন নাচ থামিয়ে দিয়েছে। এখন সেই হাতের চেয়ার এনায়েতের মাথার ওপরে। এনায়েৎ এখন সালেকের মুখোমুখি—তার ঘাড় শক্ত, চোখে-চোয়ালে চাপা উত্তেজনা—উত্তোলিত সেই চেয়ার যেন তার অস্ত্র। তার চোখের তীব্র উজ্জ্বল সতর্কবাণী ধীরে জয়ের হাসিতে রূপান্তরিত হয়। আর এইসব গ্রহণ করতে করতে একসময় সালেকের মুখের হাসি হঠাৎ নিবে যায়—এমন সময়]

পর্দা পড়ে

দ্বিতীয় অঙ্ক

[মহম্মদ হারুণের ডেস্কে আলো জ্বলে ওঠে]

হারুণ। সে বছর ইদের ঠিক দু'দিন আগে একটা জাহাজে স্কচ হুইস্কির ক্রেট খালাস হচ্ছিল—হঠাৎ পিছলে একটা ক্রেট নিচের জালে পড়ে যায়। ইদের ঠিক আগে এই-রকম হাত-পিছলে যাবার ঘটনা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

সেদিন আবহাওয়া পরিষ্কার ছিল। সেই মানুষটির বিবি সেদিন ইদের কেনা-কাটা করতে বেরিয়েছিল। এনায়েৎ তখনও কাজে। নীলু সেদিন কোনো কাজ পায়নি। শাহীন পরে আমাকে বলেছিল, এর আগে কোনোদিন সে আর নীলু বাড়িটা এমন ফাঁকা পায়নি।

[ঘরে শাহীনের ওপরে আলো জ্বলে ওঠে। সে টেবলে কাপড়ের ওপর একটা নক্সা তৈরি করছে, নীলু তাকে লক্ষ্য করছে]

শহীন। তোমার খিদে পেয়েছে?

নীলু। ফুডে আমার ইন্টারেস্ট নাই। [বিরতি] আমার কাছে এখন প্রায় পাঁচহাজার টাকা আছে—শাহীন!

শাহীন। শুনেছি কথাটা।

নীলু। এই নিয়া তুমি আর ডিসকাস করতে চাও না?

শাহীন। কথা বলতে কি অসুবিধে?

নীলু। শাহীন, তোমার এ্যাতো ওয়ারি কিসের?

শাহীন। একটা কথা জানতে ইচ্ছে করছিলো —বলবো?

নীলু। সকল কথার উত্তর আমার চোখেই ছিলো শাহীন, কিন্তু আর আমার দিকে তাকাও না। কি যেন গোপন করো তুমি! [শাহীন তাকায়, কিন্তু গোটানো] প্রশ্নটা কি?

শাহীন। নীলু, যদি আমি চট্টগ্রামে থাকতে চাই?

নীলু। [প্রস্তাবের অবাস্তবতায় হাসে] টাকাওয়ালা কোনো পাত্র পাইছো নাকি সেইখানে?

শাহীন। না। তুমি আমিই থাকবো।

নীলু। কবে—কখন?

শাহীন। ধরো...আমাদের বিয়ের পর!

নীলু। চিরদিনের মতো?

শাহীন। হ্যাঁ।

নীলু। [দোলনা চেয়ারের দিকে যায়] তুমি মস্করা করতাছো?

শাহীন। না, সিরিয়াসলিই বলছি।

নীলু। চাকরি—ব্যবসা—টাকা—কিছুই নাই—এই অবস্থায় তোমারে লইয়া

যদি যাই সেখানে, টাউনের সক্কলে আমারে পাগলা-গারদে পুইরা দিবে।

শাহীন। তবুও আমার বিশ্বাস সেখানে আমরা অনেক আনন্দে থাকবো।

নীলু। আনন্দে থাকবা! খাবা কি?

শাহীন। তুমি গান গেয়ে রোজগার করতে পারো। ধরো—ঢাকায় গিয়ে...

নীলু। ঢাকা! ঢাকায় সিঙ্গাররা গিজ-গিজ করে।

শাহীন। ঠিক আছে, তাহলে আমিই কাজ করবো।

নীলু। কোথায় পাবা কাজ?

শাহীন। আল্লার কিরা! কোত্থাও কোনো কাজ নেই?

নীলু। সেইখানে কিছু নাই। নাথিং নাথিং নাথিং! এ কি কও তুমি? এই নিরাপদ আশ্রয় থিকা উপরায়্যা নিয়া তোমারে ফ্যালবো সেই দারিদ্রের মইধ্যে! সুন্দর মুখের লোভে এই কাজ করলে আমার পাপ হবে না? সেখানে আমার ভাইয়ের বাচ্চারা ক্ষুধায় কান্দলে অরা তাদের টেংরি-সিদ্ধ জল খাওয়ায়! তুমি বিশ্বাস যাও না আমার কথা!

শাহীন। [মৃদুস্বরে] এখানে আমি জামাইকে ভয় পাই।

[স্বল্প বিরতি]

নীলু। [আরও কাছে যায়] এইখানে থাকবো না আমরা। এ্যাকবারে সিটিজেন হইয়া গ্যালে অন্যত্র কাজ করবো, আরও ভালো কাজ করবো—হয়তো নিজেদের বাড়ি হবে এ্যাকখান—

শাহীন। [নিজেকে কঠিন করে] একটা কথা বলো, নীলু—যদি শেষ পর্যন্ত ওদেশে গিয়েই থাকতে হয়, তাও তুমি আমাকে বিয়ে করবে?

নীলু। কোয়েশচেনটা কি তোমার না তাঁর?

শাহীন। আমার—আমার সত্যি জানা দরকার।

নীলু। নিঃস্ব পপার হইয়া সেই দেশে থাকবো আমরা?

শাহীন। হ্যাঁ।

নীলু। না। [বিস্মিত শাহীন বড়ো-বড়ো চোখে তাকায়] না!

শাহীন। তুমি রাজি না?

নীলু। না। তোমারে বিয়া করার লোভে তোমারে আমি চট্টগ্রামে নিয়ে যাব না! [সক্রোধে ঘুরতে থাকে] তারে কইয়া দিও—তুমিও শুইনা রাখো—আমি ভিক্ষুক না!—আর তুমিও ভিখারির ঘষা আধুলি না!

শাহীন। রেগে যেও না তুমি!

নীলু। রাগ! মাথাটা ফাটতেছে আমার! [কাছে যায়] ভাবো কি আমারে—হাভ্যাইত্যা? আমার ভাইজান ভাতের চিন্তায় পাগল—আমি না! তুমি ভাবো—যারে ভালোবাসি না, তারেও বিয়া করবো শুধু ইন্ডিয়ার সিটিজেন হওয়ার লালসে? এই শহরের জইন্য এ্যাতোই লালস! এ কি ইন্দ্রপুরী? তুমি ভাবো সেখানে উঁচা বাড়ি নাই?—জাতীয় পতাকা নাই? মটর গাড়ি নাই? শুধু সাধারণ সৎ মানুষের জইন্য কাজ নাই সেখানে। এই দেশে এ্যাখনও কাজ আছে—শুধু কাজের

জইন্যই এইখানে থাকতে চাই আমি—কাজ! শাহীন, এই অপমান তুমি আমারে করতে পারলা?

শাহীন। ও'কথা বলতে চাইনি আমি—

নীলু। এই মুখখান দ্যাখলে আমার কইলজা থেমে যায়...কিসে তুমি তারে এত ভয় পাও?

শাহীন। [কান্নার সীমায়] আমি জানি না! উনি উনি আমাকে বড় আদর দিতেন! এখন সর্বক্ষণ খচখচ করেন—কিন্তু সেটা ওর কথা নয়...আমি..আমি যদি ওর কষ্টের কারণ হই—আমার যে বড়ো লজ্জা করবে! আমি যে চিরকাল ভেবেছি—আমার যেদিন বিয়ে হবে— উনি হৈ-হৈ করবেন... হাসতে হাসতে আশীর্বাদ করবেন,....চোখে জল নিয়ে আমায় বিদায় দেবেন—আর আজ সর্বক্ষণ কি খারাপ খারাপ কথা—কি দুর্বহার... [কাঁদছে] মানুষটাকে আমি যে বড়ো পছন্দ করি,..নীলু, এ আমি আর সহ্য করতে পারছি না......

নীলু। শাহীন, এই শাহীন...

শাহীন। ভালোবাসি নীলু...আমি তোমাকে ভালোবাসি!

নীলু। তাইলে কিসের ভয় তোমার? তিনি কি তোমারে পিট্টি দিবেন?

শাহীন। এই বাড়িতে সারাটা জীবন কাটিয়েছি.....তাঁর আদরে বড়ো হয়েছি— আর আজ হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে মানুষটাকে বলবো আমার জীবনে কোনো স্থান নেই তাঁর?

নীলু। আমি জানি, কিন্তু—

শাহীন। জানো না— তোমরা কেউ জানো না—আমি তো সত্যি সত্যি বাচ্চা না....মাসি বলে, তুমি এ্যাখন বড়ো'—'পরিপূর্ণ নারী'—

নীলু। হ্যাঁ—

শাহীন। তাহলে বুইন-মাসি নিজে কেন 'পরিপূর্ণ নারী' হয়ে ওঠে না? সর্বক্ষণ আঘাত না দিয়ে তাঁকে খুশি রাখার চেষ্টা করে না কেন?.... একশো গজ্ দূর থেকে আমি বুঝতে পারি ওঁর মন খারাপ...ওঁর খিদে পেলে আমি টের পাই...কিছু বলার আগে আমি আমি ওঁর নেশার বিড়ি নিয়ে আসি...আমি বুঝতে পারি কখন ওঁর কোমরে ব্যথা হচ্ছে...আমি ওঁকে জানি—বুঝি....হঠাৎ সেই সব ভুলে আমাকে ভাব দেখাতে হবে তিনি আমার অপরিচিত মানুষ! কেন?—কেন— আমি সত্যিই জানি না!

নীলু। শাহীন—এ্যাকটা ছোট পাখি, এই হাতের মুঠায় তারে আমি আশ্রয় দিছি...আজ সে ডানা মেলে উড়ে যেতে চায়....কিন্তু আমি তারে এই মুঠার মধ্যে বন্দী করে রাখবো?—কারণ আমি তারে ভালোবাসি? না— তারে তুমি হেট করবে না—কিন্তু ছেড়ে চলে তো যেতেই হবে তোমারে? শাহীন.....

শাহীন। [নরম গলায়] আমাকে ধরো!

নীলু। [নিজের বুকে আঁকড়ে ধরে] ওরে সাধের পাখি...আমার অচিন

পাখি...

শাহীন। আমাকে শেখাও! [কাঁদছে] কিছু জানি না, আমি....শিখিয়ে নাও আমাকে... নীলু আমাকে ধরো!

নীলু। এইখানে আইন হাত কেউ নাই ...আসো...আসো... [শাহীনকে ধরে শোবার ঘরে নিয়ে যেতে থাকে] আর কাইন্দো না তুমি, কইন্যা...

[রাস্তায় আলো জ্বলে ওঠে। একটু পরেই সালেককে দেখা যায়— সে টলছে, সিঁড়ি দিয়ে ওঠে, ঘরে ঢোকে, চারাপাশে তাকিয়ে দেখে। এক পকেট থেকে বোতল বার করে, টেবলে রাখে—অন্য পকেট থেকে আর একটা, তৃতীয় পকেট থেকে আরও একটা বোতল। টেবলের ওপরে রাখা নক্সা লক্ষ্য করে, কাছে গিয়ে সেটি ছোঁয়। তারপর মঞ্চের পেছনদিকে ঘোরে।]

সালেক। চিন্তামণি! [রান্নাঘরের খোলা দরজায় উঁকি দেয়] চিন্তামণি! চিন্তামণি!

শাহীন। [শোবার ঘর থেকে ওর সামনেই পোশাক ঠিক করতে করতে] তুমি আজ তাড়াতাড়ি ফিরেছো।

সালেক। ঈদ আসতাছে—কাজে ফাঁকি দিলাম। [নক্সাটা দেখিয়ে] নীলু তার জন্য পোশাক বানাইতেছে?

শাহীন। না, আমিই একটা ব্লাউজ বানাচ্ছি।

[নীলু শোবার ঘর থেকে আসে। সালেক তাকে দেখে অপ্রত্যাশিতের ঝটকা তার শরীরে ইলেক্‌ট্রিক শক দেয়]

নীলু। [বুঝে নিতে চায়] জয়নাব বুইন তাঁর মায়ের জইন্য প্রেজেন্ট খরিদ করতে গ্যাছেন।

[বিরতি]

সালেক। গুছায়্যা নাও। তোমার জিনিস-পত্র নিয়া এখানথিকা বাইরইয়া যাও [শাহীন সঙ্গে সঙ্গে শোবার ঘরের দিকে যেতে থাকে। সালেক তার হাত ধরে ফেলে] তুমি কোথায় যাইতেছো?

শাহীন। [ভয়ে কাঁপছে] আমার.. এখান থেকে চলে যাওয়াই ভালো....

সালেক। না। তুমি কোথাও যাবে না। যেতে হবে তারে!

শাহীন। এখানে আমি আর থাকতে পারবো না। [নিজের হাত ছাড়িয়ে নেয়। আবার শোবার ঘরের দিকে যেতে যেতে] আমার খুব খারাপ লাগছে, মেসো—[হঠাৎ সালেকের চোখের জল লক্ষ্য করে] কেঁদো না, জামাই.....আমি কাছেই কোথাও থাকবো...তোমার সঙ্গে দেখা করবো....কিন্তু এখানে আর আমি থাকতে পারবো না... [ভেতরের ফোঁপানি বাইরের প্রশান্তি ভেঙে দেয়] তুমি তো জানো— আমি পারবো না? [সালেকের কাছে গিয়ে] আমাকে আশীর্বাদ করো! [নিজের হাত দু'টি প্রার্থনার ভঙ্গিতে জড়ো করে।] ওঃ জামাই—ওরকম করো না তুমি!

সালেক। তুমি কোথাও যাবা না!

শাহীন। জামাই, আমি বড়ো হয়ে গেছি...আমি আর ছোট মেয়ে না [সালেক

হঠাৎ তাকে কাছে টেনে নেয়। শাহীন ছাড়ানোর চেষ্টা করে। সালেক তার গালে কপালে চুমো খায়]

নীলু। কইরেন না! [সালেকের হাত ধরে টান দেয়] থামান এইটা! তার ইজ্জতে খেয়াল রাখেন আপনি!

সালেক। [পাক খেয়ে নীলুর দিকে ঘোরে] তুমি কিছু চাইতাছো?

নীলু। হ, সে আমার বিবি হবে—সেইটাই আমার চাওয়া....আমার....

সালেক। কিন্তু তুমি কি হবা?

নীলু। আপনারে দ্যাখায়ে দেবো। আমি কি হবো!

শাহীন। ওঁর সঙ্গে তর্ক কোরো না। বাইরে অপেক্ষা করো!

সালেক। দ্যাখাও আমারে তুমি কি হবা। আসো—দ্যাখাও!

নীলু। [রাগে তার চোখে জল ফাটছে] এই কথা কইয়েন না আমারে।

[নীলু ঝাঁপ দেয় সালেকের দিকে। সালেক মুহূর্তে হাত মুচড়ে তাকে আটকে ফেলে। হাসতে থাকে। হঠাৎ নীলুর কপালে-গালে বিসদৃশ চুমু খায়]

শাহীন। জামাই! মেসো! ছেড়ে দাও! আমি খুন করে ফেলবো তোমাকে! ছেড়ে দাও ওকে—[শাহীন সালেকের মুখ আঁচড়াতে থাকে। সালেক নীলুকে ছেড়ে দেয়। ঐখানেই দাঁড়িয়ে—তার চোখ দিয়ে দরদর করে জল পড়ছে—তারই মধ্যে নীলুর উদ্দেশে হাসতে থাকে। শাহীন প্রচণ্ড আতঙ্কে তাঁকে দেখছে। নীলু কঠিন, দাঁড়িয়ে। দু'টি পুরুষ দু'টি জন্তু—যেন পরস্পরের গায়ে দাঁত বসিয়েছে—লড়াই থেমে আছে, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি—দু'জনেই অন্যের আক্রমণের অপেক্ষায়]

সালেক। [শাহীনকে] দ্যাখলা তো তুমি! [নীলুকে] কাইল পর্যন্ত সময় দিলাম এইখান থিকা চইল্যা যাবা—এ্যাকা। শোনলা কথাডা—এ্যাকা!

শাহীন। আমি ওর সঙ্গে যাচ্ছি, জামাই। [নীলুর দিকে যেতে থাকে]

সালেক। ঐ কিম্ভূতটার লগে?...না-না—

[শাহীন দাঁড়ায়, প্রচণ্ড আতঙ্কিত। সালেক বসে। এখনও দম নেওয়ার জন্য মাঝে-মাঝে থামছে। নীলু-শহীন দুজনেই তাকে দেখছে]

সালেক। [ধীরে ধীরে টেবলের ওপর ঝুঁকে পড়ছে] আমারে পাগল করিস না, শাহীন! আর তুমি—তোমার চলন সামলাও, ডুবুরি। আইনে কয়, তোমারে জলের ভিতরে ঠাইস্যা ধরা উচিত—কিন্তু আমি তোমারে কৃপা করি! [টলতে টলতে দরজার দিকে যায়, মুখ কিন্তু সর্বক্ষণ নীলুর দিকে ফেরানো]

শুধু এইখান থিকে চইল্যে যাও....আর ঐ নপুংসকের হাত দিয়া আবার যদি সেই মাইয়ারে ছোঁও— তোমার হাত আমি ভেইঙে দেবো!

[সালেক ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। আলো নিবে যায়। অন্য আলো জ্বলে—খোন্দকার মহম্মদ হারুণের ওপর]

হারুন। ওর সঙ্গে এবার আমার দেখা হয়েছিল ঈদের দু'দিন পরে। সাধারণত ছ'টার মধ্যে আমি চেম্বার থেকে বাড়ি ফিরে যাই। কিন্তু সেদিন

আমি জানলা দিয়ে আকাশের গায়ে আঁকা মাস্তুলগুলোর দিকে তাকিয়েছিলাম অনেকক্ষণ। যখন দেখলাম, সে দরজা দিয়ে ঢুকছে—তখনই বুঝতে পারলাম, আমি কিসের অপেক্ষায় ছিলাম। যদি ভাবেন কোনো স্বপ্নের বর্ণনা দিচ্ছি, তাহলে বলবো—তা-ই মনে হচ্ছিলো আমার! মনে হচ্ছিলো যেন আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছি—যেন সব শক্তি হারিয়ে যাচ্ছে আমার। **[সালেক ঢোকে, টুপি খুলে চেয়ারে বসে, চিন্তিত, বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে]**
শোনার বেশি দেখছিলাম—ওর চোখ দুটো। সেইদিন। সত্যি বলতে, কথাবার্তা যা হয়েছিলো—বেশিরভাগই আমার মনে নেই। কিন্তু—যখন ও আমার দিকে তাকালো মনে হলো ঘরটা যেন হঠাৎ অন্ধকার হয়ে গেল—থেকে-থেকেই ইচ্ছে করছিলো পুলিশ ডাকি—কিন্তু কিছু তো ঘটেনি! ঘটনা কিছুই ঘটেনি!

[কথা কেটে দিয়ে ডেস্কের দিকে তাকায়। তারপর সালেককে বলে]
তাইলে, মোদ্দা কথা—সে চলে যাবে না?

সালেক। আমার বিবি উপরে এ্যাকখান ঘর ভাড়া নেওয়ার কথা কইতেছিলো। তিন তলার বুড়ির এ্যাকখান ঘর খালি আছে।

হারুণ। এনায়েৎ কি কয়?

সালেক। সে চুপ-চাপ—এনায়েৎ বেশি কথা কয় না।

হারুণ। আমার আনতাজ—তারা এনায়েৎরে ঘটনার কথা কিছু কয় নাই। না কি কইছে?

সালেক। আমি জানি না।

হারুণ। তোমার বিবি কি কয়?

সালেক। **[এই প্রসঙ্গ অপছন্দ]** বাড়ির কেউই বিশেষ কথাবর্তা কবে না। তাইলে—এবিষয়ে কি কন?

হারুণ। কিন্তু প্রমাণ তো কিছু হয় নাই! আমার তো মনে হয়—তুমি সেই ছেলেরে পিছ-মোড়া কইর‍্যা রাখছিলা—তোমার থিকা সে দুর্বল, তাই নিজেরে ছাড়াইতে পারে নাই।

সালেক। মনে ঘিন্না ওঠলে সে ঠিকই ছাড়াইতে পারতো। এ্যাকখান ছোট্ট ইন্দুর—হাতের মুঠায় ধরেন—সেও আপনারে মরণ-বাঁচন লড়াই দিবে.....কিন্তু সেই ছোকরা—আমার সঙ্গে কোনো লড়াই দিলো না। আমি জানি, হারুণ সাব, সেই ছোকরা অস্বাভাবিক!

হারুণ। তয় তুমি, এ্যামন এ্যাট্টা কাণ্ড করলা ক্যান, সালেক মিঞা। আমি চাইছিলাম এই মেয়েও নিজের চোখে দেখুক—দেইখ্যা বুঝুক যে সেই ছোকরা অস্বাভাবিক! ঐ ছেলের সঙ্গে অর বিয়া—আয় খোদা! অর মা কবরের ভিতরে ছটফটাইয়া ওঠবে...**[নিজেকে সামলিয়ে নেয়]** তাইলে—কন আমারে কি করবো আমি অখন?

হারুণ। সেই মাইয়া স্পষ্ট কইছে সে তারে বিয়া করবে?

সালেক। কইছে। তাইলে আমি কি করবো? **[সামান্য বিরতি]**

হারুণ। এইটা আমার শেষ কথা—গ্রহণ-বর্জন তোমার বিচার। নীতির বিচারে আইনের বিচারেও সেই মেয়েও সম্পূর্ণ স্বাধীন। তুমি এইটা বন্ধ করতে পারো না।

সালেক। **[রাগ বাড়ে]** আপনি কি শোনেন নাই আমি কি কইছি?

হারুণ। [আগের চেয়ে কঠিন] শুনছি তোমার কথা—এইবার আমার জবাব শোনো। শুধু কথার কথা না—আমি তোমারে ওয়ার্নিং দিতেছি—বুইঝা লও, কথাটা!

আইন হইলো প্রকৃতির মতো.... যেইটা ঘটা উচিত, যার মইধ্যে ন্যায় আছে—আইন তারেই কথায় রূপ দেয়। যখন অস্বাভাবিক কিছু ঘটে—স্বভাবের লঙ্ঘন ঘটে, তখন সেই আইনটা অন্যায় হইয়া ওঠে। এইখানে অস্বাভাবিক কিছু নাই। তোমার ক্ষুদ্র ইচ্ছা দিয়া যদি তারে বাঁধতে চেষ্টা করো—বন্যার জলের মতো স্বভাব তোমারে ভাসাইয়া নিয়া যাবে....। তারে যাইতে দাও, তারে আশীর্বাদ করো। **[মঞ্চের অপর প্রান্তে ধীরে ধীরে একটি টেলিফোন বুথ উদ্‌ভাসিত হতে থাকে হাল্কা-নরম নীল-নির্জন আলোয়। সালেক উঠে দাঁড়ায়, তার চোয়াল কঠিন]** এ্যাকদিন এ্যাকদিন কেউ এ্যাকজন তার জইন্য আসতোই—আইজ নাইলে কাইল।

[সালেক যাওয়ার জন্য ঘোরে। হারুণ নতুন এক আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত]

সারা পৃথিবী তোমার দুষমন হয়্যে যাবে, সালেক! যারা তোমার মন বুঝে, তারাও মুখ ঘুরায়্যা নেবে! এ্যামনকি যারা এই এ্যাকই কষ্ট পায়, তারাও তোমারে ঘিন্না করবে!

[সালেক চলে যায়]

এই চিন্তা তোমার মাথাত্থিকা ফালায়্যা দাও, সালেক! সালেক! সালেক! **[অন্ধকারে আর্ত-ডাক হারিয়ে যায়]**

[সালেক চলে গেছে। টেলিফোন বুথ এখন সম্পূর্ণ আলোকিত। হারুণের আলো মৃত। সালেক এখন টেলিফোন বুথের ভেতরে]

সালেক। থানার ফোন নম্বরটা বলেন তো।...ধইন্যবাদ। **[ডায়াল করে]** নমস্কার... এ্যাকটা রিপোর্ট করার আছে। বে-আইনি অনুপ্রবেশকারী—দুইজন...হ্যাঁ—ঠিক-ঠিকই—৪৩ নম্বর পুরানা মসজিদ স্ট্রিট—নিচের তলা...এ্যাঁ? **[অসুবিধায় পড়ছে]** আমি...অঞ্চলেরই লোক।... সেই জন্যই....এ্যাঁ? **[স্পষ্টতই তাকে কেউ জেরা করছে। ধীরে রিসিভার নামিয়ে রাখে। ফোন বুথ থেকে বাইরে এলে তার সঙ্গে লতিফ ও মতীনের দেখা হয়—তারা রাস্তার অপর দিক থেকে আসছে]**

লতিফ। বক্সিং ম্যাচে যাবা নাকি, সালেক ভাই?

সালেক। না, বাসায় যেইতে হবে।

লতিফ। ঠিক আছে। আমরা যাই।

সালেক। কাইল দ্যাখা হবে।

[ওরা অপর দিকে চলে যায়। সালেক ওদের চলে যাওয়া লক্ষ্য করে। বাড়ির আলো জ্বলে ওঠে। জয়নাব সেখানে ঈদের সাজ-সজ্জা খুলে নিচ্ছে, বাক্সে ভরে রাখছে]

সালেক। আর সব কোথায়? **[জয়নাব নিরুত্তর]** আমি জিগাই সক্কলে কোথায়?

জয়নাব। **[সালেকের দিকে তাকায়। এই ব্যাপারে সে ক্লান্ত, ভীতও]** আমি ঠিক করছি তারা উপরে রাজিয়া চাচীর ঐখানে থাকবে।

সালেক। ...সেইখানে তাদের বন্দোবস্ত হইয়া গেছে?

জয়নাব। হ।

সালেক। শাহীন কোথায়? সেও কি উপরে?

জয়নাব। বালিশের ওয়াড়গুলান আনতে গ্যাছে মাত্র।

সালেক। সে য্যানো তাদের সঙ্গে মিল-মিশ না করে!

জয়নাব। দ্যাখেন—এইসব আমার আর সহ্য হইতেছে না!

সালেক। ঠিক আছে, ঠিক আছে—ক্ষান্ত দ্যাও।

জয়নাব। এই বিষয়ে আর কিছু কইবেন না আমারে—বোঝছেন? আর এ্যাকটা কথাও না!

সালেক। অতো মেজাজ করো কিসের লেইগ্যা? এইখানে তাদের কে আনছিলো?

জয়নাব। বড়ো পাপ করছি আমি! অগো আশ্রয় দিবার আগে কবরে যাওয়া উচিত ছিলো আমার...কবরের ভিতরে বেশি শান্তি পাইতাম আমি!

সালেক। কবরে যেতে হবে না, শুধু মনে রেইখো কে তাদের আনছিলো এইখানে—তাইলেই হবে! **[অশান্ত ঘুরতে থাকে]** এইখানে আমারও কিছু অধিকার আছে। এইখান আমার বাসা, তাগো না।

জয়নাব। আমার থিকা কি চান আপনি? তারা বাসা ছাইড়া দিছে—অখন আর কি চান?

সালেক। আমার হক্কের ইজ্জৎ চাই আমি!

জয়নাব। আমি তাদের সরাইয়া দিচ্ছি...এর বেশি আর কি করবো আমি? আপনার বাসা ফিব্যা পাইছেন—আপনার ইজ্জৎও ফিরৎ পাইছেন না!

সালেক। **[ঠোঁট কামড়ায়, ঘুরতে থাকে]** জয়নাব, তোমার কথা কওনের ধরন আমার পছন্দ হয় না!

জয়নাব। আপনার ইচ্ছা-মাফিক কামই তো করছি আমি!

সালেক। আমার পছন্দ হয় না—য্যামন তরিকায় কথা কও তুমি—য্যামন ভাবে তাকাও তুমি! এইটা আমার বাসা—সেই মেয়ে আমার 'জিম্মা'!

জয়নাব। তারই জইন্য সেই ছেলের সঙ্গে ঐ কাণ্ডটা করছেন বুঝি!

সালেক। কোন কাণ্ড করছি আমি?

জয়নাব। সেই মাইয়ার সম্মুখে ঐ ছেলের সঙ্গে যে ব্যবহার আপনি করছেন...আপনি ঠিকই জানেন আমি কি কইতাছি! এ্যায়

খোদা...আতঙ্কে সেই মাইয়া সর্বক্ষণ কাঁপে...ঘুমাইতে পারে না তো! এইটাই তার প্রতি 'জিম্মদারের' ব্যবহার?

সালেক। [**শান্ত**] জয়নাব, ঐ ছোকরা অ-স্বাভাবিক। [**জয়নাব নিরুত্তর**] আমি কি কই শোনলা তুমি?

জয়নাব। এই বিষয়ে আমার কিছু কওয়ার নাই, শোনারও নাই! [**নিজের কাজ শুরু করে**]

সালেক। [**তাকে গোছানোয় সাহায্য করে**] তোমার সঙ্গে এ্যাকদিন আমারে এ্যাকটা হ্যাস্ত-ন্যাস্ত করতে হবে, [**জয়নাব**]

জয়নাব। আমার সঙ্গে আর কিসের হ্যাস্ত-ন্যাস্ত! সবকিছু তো এ্যাখন ঠিকই হয়্যা গ্যালো—এইবারে জীবন আবার আগের মতোই চলবে।

সালেক। আমারে আমার ইজ্জৎ দিতে হবে। জয়নাব, তুমি জানো আমি কি কইত্যাছি!

জয়নাব। কি?

সালেক। [**সবশেষে নিজের সিদ্ধান্তে কঠিন হয় সে**] আমার বিছানায় আমি কি করবো কিনা করবো— সেই বিষয়ে.. আমি চাই না তুমি কোনো কথা—

জয়নাব। সেই বিষয়ে আমি কবে আবার কি কইছি?

সালেক। কইছো, কইছো—আমি আবোদা না! যা আমার ইচ্ছা আমি করবো—যাতে অনিচ্ছা আমি করবো না!

জয়নাব। ঠিক আছে। [**বিরতি**]

সালেক। তুমি তো এ্যামন ছিলা না, জয়নাব! তুমি যে অন্যরকম ছিলা!

জয়নাব। আল্লায় জানেন, আমি এ্যাকইরকম আছি।

সালেক। আগে তুমি সর্বক্ষণ আমারে ছ্যারতা না। গত এ্যাক-দুই বছর—ঘরে ফিরি, ভয় করে কখোন কিসে আমারে টাক মারবে—পাখির মতোন ছটফটাই কখোন য্যানো এ্যাকখান তীর বেঁধবে!

জয়নাব। ঠিক আছে, ঠিক আছে।

সালেক। 'ঠিক-আছে' 'ঠিক আছে' কইয়ো না আমারে! বিবি তার খসমেরে বিশ্বাস যাবে না?—যদি কই সেই ছোকরা 'অস্বাভাবিক', সেই সত্যটা মানবে না? আর তুমি কও আমি মাইয়ার বিয়া দিতে চাই না! তয় নিজের কোমর ভাইঙ্গা তারে সেক্রেটারি পড়াইছি কোন্ কম্মে?—যাতে সে ভালো জায়গায় যাইতে পারে সেইটা চাই নাই আমি? বিয়া দিতে চাই না সেই জন্যই চাই নাই আমি? জন্যই নিজের হাড় কালি করে? ভাবে কি আমারে—আবোদা? পাগোল?

জয়নাব। কিন্তু সেতো সেই ছেলেরেই পছন্দ করে!

সালেক। চিন্তামণি, সে এ্যাখনও ছোট—পছন্দ-অপছন্দের বুঝ আছে তার?

জয়নাব। কিন্তু আপনেই তো তারে ছোট কইর‍্যা রাখছেন—বাইরইতে দ্যান নাই—সর্বক্ষণ পুতু-পুতু আগলায়্যা রাখছেন... আমি কি হাজারবার আপনারে কই নাই!

[বিরতি]

সালেক। ঠিক আছে। এ্যাখন থিকা বাইরে যাউক সে।

জয়নাব। এ্যাখন যে আর বাইরইতে চায় না। বড়ো দেরি হয়্যা গ্যাছে, কর্তা!

[বিরতি]

সালেক। যদি আমি তারে কই, 'এ্যাখন তুমি স্বাধীন'...যদি আমি...

জয়নাব। কর্তা—তারা সামনের সপ্তাহেই বিয়া করতাছে।

সালেক। **[যেন ধাক্কা খেয়ে ঘোরে]** সে কইছে কথাডা?

জয়নাব। আমার পরামর্শ শোনেন, কর্তা—তার কাছে যান, তারে দোয়া করেন—

সালেক। সামনের সপ্তাহেই—এ্যাতো জলদি কিসের?

জয়নাব। নীলু যদি ধরা পড়ে—এই তার চিন্তা। এতে সে সিটিজেন হয়ে যাবে। সে তারে ভালোবাসে। **[সালেক ওঠে, অস্থির ঘুরে বেড়ায়]** আপনে মিষ্ট কথায় তারে আশীর্বাদ দ্যান, কর্তা। সেই মেয়্যে আপনারে আপন বাসে, আমি জানি—সে আপনারে ত্যাগ করতে চায় না। **[সালেক মেঝের দিতে তাকিয়ে আছে]** কন না তারে আপনি তার বিয়াতে যাইবেন?

সালেক। সে কইছে তোমারে কথাডা?

জয়নাব। আমি জানি সে তাই চায়। প্রসন্ন মনে বিদায় তো দিতে হয়! এ্যাঁ? আমি জানি জীবনটা তার কুসুম-শইয্যা হবে না! তবুও সূত্রপাতটা তো আনন্দের হউক! আমি জানি, মনের গভীরে সে আপনারে বড়োই ভালোবাসে। কর্তা **[সালেক তার দু'চোখ টিপে ধরে]** কি করেন! কানতেছেন আপনি? **[জয়নাব তার কাছে গিয়ে মুখটা তুলে ধরে]** যান না—একবার গিয়া কন না তারে—'আমি তার দুঃখ দিতে চাই নাই?' **[সিঁড়িতে দেখা যায় শাহীন নামছে]** ঐ যে—সে নিচে আসতেছে! আসেন কর্তা, মিটায়্যা লন!

সালেক। **[আকাস্মিকতায় ঘুরতে থাকে]** না, পারবো না—অর সঙ্গে কথা কইতে পারবো না!

জয়নাব। কর্তা—একটা সুযোগ দ্যান! এইটা তার বিয়া—জীবনের কতো বড়ো ঘটনা—

সালেক। আমি আসত্যাছি—এট্টু হাঁইট্যা আসি।

[নিজের কুর্তা নেওয়ার জন্য মঞ্চের পেছন দিকে যায়। শাহীন ঢুকে শোবার ঘরের দিকে যেতে থাকে]

জয়নাব। কর্তা—যাইয়েন না, এট্টু খাড়ান! **[বড়ো আদরে সালেকের হাত ধরে]** শাহীন—তাঁরে ক, কথাটা ক, সোনা!

সালেক। ঠিক আছে, আমি এট্টু—**[খেতে শুরু করে, জয়নাব তাকে আটকায়]**

জয়নাব। না, সে আপনারে জিগাইতে চায়।...কথা শোন্—ক তারে, শাহীন!

শাহীন। আমরা বিয়ে করছি, জামাই। তুমি যদি আসতে চাও—সামনের

শনিবারে বিয়ে।

[বিরতি]

সালেক। ঠিক আছে...আমি ওর ভালোই চাইছিলাম...

[শাহীন আবার রওনা দেয়]

সালেক। শাহীন! [শাহীন ওর দিকে ঘোরে] অখনই তোর বুইন মাসিরে কইতেছিলাম... তরে হয়তো বেশি বাইন্ধা রাখছিলাম...মানে তুই যদি বাইরে যাইতে চাস...মানে তর তো এ্যাকটা চাকরি হইছে...এ্যাখন কতো লোকের সঙ্গে ম্যালা-মেশা হবে...হয়তো তোর পছন্দ বদলায়্যা যাবে... তোরা তো দুইজনেই এ্যাখনও ছোট—এ্যাতো জলদির কি আছে...হয়তো দুই-চাইর মাসেই তর মন বদলায়ে যাবে—

শাহীন। না, আমি মনস্থির করে ফেলেছি।

সালেক। কিন্তু তুই তো আর কোনো পুরুষ চেনস নাই—ক্যামনে মন ঠিক করবি নিজের?

শাহীন। কারণ আমি ঠিক করেছি। আর কাউকে আমি চাই না।

সালেক। কিন্তু ধর্—সে যদি ধরা পইড়্যা যায়?

শাহীন। সেই জন্যই তো তাড়াতাড়ি করতে চাই। বিয়ে হয়ে গেলেই ও লিগাল হয়ে যাবে। আমায় মাপ কোরো, জামাই। [জয়নাবকে] অন্য যে দু'জন আছে, ওদের জন্য দুটো বালিশের ওয়াড় নেব?

জয়নাব। লইয়া যা। শুধু—রাজিয়া চাচিরে মনে করাইয়া দিস এইগুলা তার না। [শাহীন শোবার ঘরে চলে যায়]

সালেক। সেই বুড়ির অন্য ভাড়াইট্যা আছে নাকি?

জয়নাব। হ, দুইজন আছে—কয়দিন হইলো আইছে ওপার থিকা।

সালেক। ওপার থিকা?

জয়নাব। হ, নোয়াখালি থিকা। মাংস ব্যাচে তারিক আলি—তার ভাতিজা। এনায়েৎ আর নীলুর বন্দোবস্ত করতে গেছিলাম উপরে—তখনই শোনলাম কথাডা।

[বালিশের ওয়াড় হাতে শাহীন ঢোকে, বেরোনোর দরজার দিকে যায়] ভালোই হইছে—তারা নিজেগো মইধ্যে গপ্প-সপ্প করবে।

সালেক। শাহীন! [সে দরজার কাছে থামে। দু'জনকেই বলে সালেক] তোমাগো মাথায় কি ক্যারা ঢোকছে? এই দুইজনরে দুইটা ইললিগালের সঙ্গে রাখছো?

শাহীন। কেন—কি হয়েছে?

সালেক। [ভয় এবং রাগ বাড়ছে] কি হইছে? জানলা ক্যামনে তাদের পিছনে খোচর লাগছে কিনা! তাদের গন্ধে গন্ধে যদি আসে, মনু আর নীলুও ধরা পড়ে যাবে না! এ্যাক্ষণি অগো বাইরে কোথাও পাঠায়্যা দাও!

শাহীন। কিন্তু ওরা তো সেই কবে থেকে এখানে আছে—

সালেক। ঐ তারেক আলি গরুর মাংস ব্যাচে—বি. জি. পি-র কাউন্সিলর ভজন তেওয়ারি তারে থ্রেট করছে—সে কয় গরুর মাংস বেচার

জইন্য তারেকরে এই অঞ্চল থিকা তাড়াইবেই—সেই হয়তো এই সুযোগে তারেকের ঐ দুই ভাতিজার পিছনে পুলিশ লাগাইবে—

শাহীন। আমি তাদের কোথায় পাঠাবো?

সালেক। যেইখানে পারো! নীলুর থিকা কয়দিন দূরে থাকলে সেইটা কি সহ্য হবে না তোমার!

শাহীন। দেখি, যদি কাল রাতে—

সালেক। কাইল না—আইজ, এ্যাক্ষণি! অইন্য পরিবারের লগে জড়াইতে গেলা ক্যান্? তারেক আলির মেজাজ জানো না? তার ভাতিজারা ধরা পড়লে সক্কলে আমার দোষ দিবে—

[দু'জন লোক বাইরে—তারা এই বাড়ির দরজার সামনে থামে]

শাহীন। আজ রাতে কোথায় জায়গা পাবো আমি?

সালেক। তর্ক থামাইয়া যা কই জলদি জলদি করবা?..... বিশ্বাস যাও না আমি তোমার ভালো চাইতে পারি! ওর ভালো ছাড়া খারাপ কোনোদিন কিছু করছি আমি? আর আইজ আমার লগে কথা কস য্যানো আমি তোর দুষমন! য্যানো আমি—**[দরজায় করাঘাত। সালেক দ্রুত ঘাড় ঘোরায়। সবাই পাথর। সালেক ওপরতলা দেখিয়ে ফিসফিস করে বলে]** পিছনের লোহার সিঁড়ি দিয়া উপরে যা। পিছনের পাঁচিল টপকাইয়া অগো চাইর জনেরেই পলাইতে ক! **[শাহীন কিছু বোঝে না, দাঁড়িয়েই থাকে]**

প্রথম অফিসার। পুলিশ। দরজা খুলুন!

সালেক। যা—জলদি যা! **[বিপদ বুঝতে পেরে শাহীন আতঙ্কে তাকিয়ে থাকে]** আরে—তাকাইয়া দ্যাখস কি?

প্রথম অফিসার। দরজা খুলুন!

সালেক। দরজায় খট-খট করে কে ওখানে?

প্রথম অফিসার। পুলিশ! দরজা খুলুন!

[সালেক ঘোরে, জয়নাবের দিকে তাকায়, তারপর শাহীনের দিকে। শাহীন ফুঁসছে। ফোঁপাচ্ছে—শোবার ঘরে চলে যায়। দরজায় আবার আওয়াজ]

সালেক। ঠিক আছে, ঠিক আছে...আসত্যাছি। **[দরজা খুলে দেয়। অফিসার দু'জন ঢোকে]** এ্যাতো রাত্রে এইসব কি—

প্রথম অফিসার। তারা কোথায়?

[দ্বিতীয় অফিসার ঘরের চারপাশ দেখে রান্নাঘরে চলে যায়]

সালেক। কারা-কোথায়?

প্রথম অফিসার। ঠিক আছে—অনেক হয়েছে—কোথায় তারা? **[দ্রুত শোবার ঘরে ঢুকে যায়]**

সালেক। কারা? আমাদের এইখানে তো কেউ নাই। **[জয়নাবের দিকে তাকায়, সে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। ভয়ঙ্কর উত্তেজনায় জয়নাবের দিকে যায়]** তোমার কি হইছে?

[প্রথম অফিসার ফিরে এসে রান্নাঘরে উঁকি দেয়]

প্রথম অফিসার। তেওয়ারিজি?

[অফিসার রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসে]

দ্বিতীয় অফিসার। তাহলে বোধহয় অন্য কোনো ফ্ল্যাটে—

প্রথম অফিসার। ওপরে আরও দুটো ফ্লোর আছে। আমি সিঁড়ি দিয়ে যাচ্ছি—আপনি পেছনে একটা লোহার সিঁড়ি আছে, সেইটা দিয়ে উঠে যান। আমি পেছন দিকের দরজা খুলে দেব আপনাকে। পুরোনো সিঁড়ি — সাবধানে উঠবেন।

দ্বিতীয় অফিসার। ঠিক আছে, চৌধুরী।

প্রথম অফিসার। [সিঁড়ির দিকে যেতে যেতে] এ বাড়ির নম্বর তো ৪৩—তাই না?

সালেক। হ্যাঁ, নাম্বার তো ঠিকই আছে...

[দ্বিতীয় অফিসার রান্নাঘরে চলে যায়। সালেক জয়নাবের দিকে ঘোরে—তার আতঙ্ক জয়নাবের কাছে স্পষ্ট]

জয়নাব। [ভয়ে দুর্বল] অয় খোদা! কর্তা মিএগা!

সালেক। তোমার, তোমার কি হইলোটা কি?

জয়নাব। [দু'হাতে মুখ চেপে] আয় খোদা! হায় আল্লা!

সালেক। কি কইতাছো?—তুমি আমারে দোষী ঠাওরাও!

জয়নাব। [পালাতে চায়—পরিবর্তে শেষ পর্যন্ত সালেকের দিকেই ঘোরে] হায় খোদা! এ তুমি কি করলা?

[অনেকগুলো পায়ের শব্দে সালেক ঘুরে তাকায় । সিঁড়ি দিয়ে প্রথম অফিসার নামছে, সঙ্গে এনায়েৎ, পেছনে নীলু এবং শাহীন এবং দু'জন নতুন অনুপ্রবেশকারী। তাদের পেছনে দ্বিতীয় অফিসার। জয়নাব তাদের দিকে ছুটে যায়]

শাহীন। [ল্যাণ্ডিভে শাহীন প্রথম অফিসারের সঙ্গে প্রায় হাতাহাতি করে] ওদের নিয়ে কি করবেন আপনারা? ওরা সবাই ওপরের ভাড়াটে— ওরা ডকে কাজ করে!

জয়নাব। [প্রথম অফিসারকে] অফিসার সাহেব, তাদের থিকা কি চান আপনেরা—তারা কার কোন্ ক্ষতি করছে, কন আমারে......

শাহীন। [নীলুকে দেখিয়ে] ওরা বিদেশী নয়। ওর—ওর জন্ম বেলুড়ে!

প্রথম অফিসার। রাস্তা ছাড়ুন—

শাহীন। কি বলছেন কি? একটা গৃহস্থ বাড়িতে এমনি করে ঢুকে হঠাৎ—

প্রথম অফিসার। ঠিক আছে, উত্তেজিত হবেন না। [নীলুকে] বেলুড়ে কোন্ রাস্তায় জন্ম আপনার?

শাহীন। কোন্ রাস্তায় জন্ম মানে...আপনি বলতে পারবেন কোন্ রাস্তায় আপনার জন্ম হয়েছিলো?

প্রথম অফিসার। নিশ্চয়ই। উত্তর কলকাতায়—আর.জি.কর হাসপাতালে— বেলগাছিয়া স্ট্রিটে। চলো, এবার যাওয়া যাক্।

শাহীন। [নীলুকে ছিনিয়ে নিয়ে] না, কিছুতেই না—এখান থেকে বেরিয়ে যান!

প্রথম অফিসার। দ্যাখো মেয়ে, কোনো গণ্ডগোল না থাকলে কালকেই ছাড়া পেয়ে যাবে। কিন্তু যদি বে—আইনি এ-দেশে ঢুকে থাকে—তাহলে ফিরে যেতে হবে। ইচ্ছে করলে উকিল দিতে পারেন আপনারা—যদিও আমার ধারণা সে পয়সা আপনাদের জলেই যাবে।
তেওয়ারিজি, চলুন—ভ্যানে তুলুন ওদের......হঠ্ যাইয়ে, হঠ্ যাইয়ে সব লোগ—চলুন!

[সকলে যেতে শুরু করে। হঠাৎ এনায়েৎ পেছিয়ে পড়ে]

জয়নাব। খোদার কসম—তারা কার পাকা ধানে মই দিছে?—কি চান তাদের থিকা? এইটা বোঝেন না—তারা সেইখানে না খাইয়া মরে! এনায়েৎ...মনু...

[হঠাৎ দল-ছুট এনায়েৎ ঘরে ঢুকে পড়ে—সে সালেকের মুখোমুখি। জয়নাব এবং প্রথম অফিসার দৌড়ে আসে। কিন্তু তার আগেই এনায়েৎ সালেকের মুখে থুতু দিয়ে দিয়েছে। ওদিকে শাহীন চাতাল বেয়ে দৌড়ে নীলুর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে।]

সালেক। [জন্তুর মতো এনায়েতের দিকে লাফ দেয়] অয়রে মাদারচোদ্—

প্রথম অফিসার। [প্রথম অফিসার দ্রুত সালেককে ধাক্কা দিয়ে এনায়েতের থেকে বিচ্ছিন্ন করে] থামাও—থামাও এসব!

সালেক। [প্রথম অফিসারের ঘাড়ের ওপর দিয়ে] এ্যার বদলা আমি নিব-কুত্তার বাচ্চা, খানকির পুত!

প্রথম অফিসার! [সালেককে ঝাঁকানি দেয়] এইখানে থাকবেন। আপনি বাইরে আসবেন না! ওকে ছোঁবেন না—বুঝলেন, মিঞা!

[এক মুহূর্ত চুপচাপ। এনায়েৎকে হাতে ধরে নিয়ে যেতে-যেতে প্রথম অফিসার বুঝিয়ে দেবার মতো করে একবার সালেকের দিকে তাকায়। ওরা দু'জন প্রায় বাইরে, এমন সময়]

সালেক। এই কথাটা আমি বিস্মরণ যাবো না—এনায়েৎ—

[প্রথম অফিসার এবং এনায়েৎ নেবে যায়। রাস্তার এক কোণে একজন বি. জে. পি লিডার, দু'একজন সাকরেদ-সহ। রাস্তাতেই বাড়ির সামনে লতিফ, মতীন, দু'একজন প্রতিবেশী এবং মাংস বিক্রেতা তারেক আলি। জমায়েত বাড়ছে। তারেক আলি নতুন দু'জন অনুপ্রবেশকারীর কাছে গিয়ে মাথার ঘ্রাণ নেয়; তার স্ত্রী ওদের হাত ধরে। সালেক এনায়েতের উদ্দেশে চিৎকার করতে করতে বেরিয়ে আসে—জয়নাব তাকে আটকাতে চেষ্টা করছে]

সালেক। যা কিছু করছিলাম—এই তার দাম দিলা! এনায়েৎ— তোমারে মাফি চাইতে হবে—এনায়েৎ!

প্রথম অফিসার। [এনায়েৎ-সহ এখনও দরজার মুখে] ঠিক আছে—! এই যে, দিদি—ওদের যেতে দিন। আরে ভাই, ভ্যানে তোলো ওদের!

শাহীন। [সে অবশ, বলতে গেলে নীলুই তাকে বাইরের দিকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে] ওর জন্ম বেলুড়ে.....ওর কাছ থেকে কি চান আপনারা?

প্রথম অফিসার। রাস্তা ছাড়ুন, দিদি—সরুন, সরুন, সরুন—অনেক হয়েছে!

[দ্বিতীয় অফিসার নতুন দু'জনকে নিয়ে চলে গেছে। প্রথম অফিসার শাহীনের সঙ্গে কথা বলায় ব্যস্ত—সেই সুযোগে এনায়েৎ নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সালেককে চিহ্নিত করে]

এনায়েৎ। সেই লোকটারে আমি কাঠগড়ায় দাঁড় করাই!

[সালেক জয়নাবকে ঝটকা দিয়ে সরিয়ে চাতালের দিকে ছোটে]

প্রথম অফিসার। [সালেককে ধরে রাস্তার বাঁদিকে টেনে নিয়ে যেতে থাকে] আসুন, আসুন—এই দিকে আসুন! আসুন!

এনায়েৎ। [তাকে টানতে-টানতে নিয়ে যাচ্ছে, এই অবস্থায়] সেই লোকটা বেইমান! সেই বেইমান আমার তিনটা পোলারে খুন করছে! সেই বেইমান আমার বাচ্চাদের মুখের ভাত ছিনায় নিছে!

[এনায়েৎকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সমবেত ভিড় এবার সালেকের দিকে ফেরে]

সালেক। [তারেক আলি এবং তার স্ত্রীকে] সে উন্মাদ। ছয়মাস আমি তাদের প্যাটের ভাইয়ের মতো রাখছিলাম!

[তারেক আলি স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিতে-দিতে বেরিয়ে যায়]

সালেক। [ওদের পেছন-পেছন যেতে যেতে] আল্লার কসম! আমি নিজের বিছ্না খান তাদের ছাইড়্যা দিছিলাম।

[সস্ত্রীক তারেক আলি চলে গেছে। সালেক এবার রাস্তার ডানদিকে লতিফ এবং মতীনের উদ্দেশে এগোয়]

সালেক। লতিফ! লতি-ই-ফ!

[লতিফ সামান্য ঘোরে কি ঘোরে না, তারপর মতীনের সঙ্গে ডানদিকে বেরিয়ে যায়। এখন শুধু জয়নাব দাঁড়িয়ে আছে। শূন্য-দৃষ্টি। শাহীন মঞ্চের বাইরে থেকে ফেরে]

সালেক। [এখনও লতিফ-মতীনের উদ্দেশে] অরে সেই কথাটা ফিরাইয়া নিতে হবে! অরে মাফি চাইতে হবে—নইলে অরে আমি খুন করবো। অরে খুন করবো! [বলতে-বলতে বেরিয়ে যায়]

[সমান্য বিরতি। আলো জ্বললে দেখা যায়—হাজতের সংলগ্ন রিসেপশন রুম—সেখানে এনায়েৎ বসে আছে, দাঁড়িয়ে আছে হারুণ, শাহীন এবং নীলু]

হারুণ। আমি কিন্তু তোমার উত্তর পাই নাই এ্যাখনও!

নীলু। এনায়েৎ ভাই কোনোদিন কখনো মার-দাঙ্গা করে নাই।

হারুণ। শুনানির আগে পর্যন্ত তোমারে জামিনে খালাস করতে পারি—কিন্তু সেইটা আমি করবো না যতক্ষণ না তুমি আমারে বচন দিতেছো! তুমি ইমানদার মানুষ—তোমার মুখের কথাতেই আমি বিশ্বাস করবো। কও—কি কবা?

এনায়েৎ। আমাগো দ্যাখা হইলে এ্যাতোক্ষণে তার লাশ পইড়া যেতো, সে আর বাঁইচা থাকতো না।

হারুণ। ঠিক আছে। নীলু, তুমি আসো আমার সঙ্গে।

নীলু। না, সাহেব। দয়া করেন সাহেব! ভাইজান, মানুষটারে প্রমিস করেন

আপনে! পায়ে ধরি—আপনে এইখানে থাকবেন, আর আমি সেইখানে বিয়া করবো? [এনায়েৎ নিরুত্তর]

শাহীন। [হাঁটু গেঁড়ে বসে] এনায়েৎ ভাই, আপনি সাংঘাতিক কিছু করে বসলে...উনি আপনার বেলের ব্যবস্থা করতে পারবেন না। মেসোর চিন্তা ছেড়ে দিন—মহল্লার সবাই তাকে ছি-ছি করছে—সবাই দেখেছে—আপনি তার মুখে থুতু দিয়েছেন—যথেষ্ট শাস্তি তার হয়েছে—আপনি থাকবেন না—আমাদের বিয়ে হবে? বেল পেলে ঐ একদিন অন্তত কাজ করতে পারতেন...

এনায়েৎ। আমার কোনোই আশা নাই?

হারুণ। না, এনায়েৎ। তোমারে ফিরে যেতে হবে—ঐ শুনানি সির্ফ এ্যাট্টা নিয়ম-রক্ষা।

এনায়েৎ। নীলু?—তার সুযোগ আছে এখনও?

হারুণ। হ, কেস উঠার আগে বিয়া হয়্যা গ্যালে সে এদেশে থাকতে পারবে। বিবির জন্ম এই দ্যাশে হইলে সেই পারমিশান পাওয়া যায়।

এনায়েৎ। [নীলুর দিকে তাকায়] তাইলে পুরাপুরি জলে যায় নাই! [তার বাড়ানো হাত নীলু নিজের দু'হাতে নেয়]

নীলু। ভাইজান, মানুষটারে প্রমিস করেন।

এনায়েৎ। কি কবো আমি তারে? তিনি জানেন, এইটা ইমানদারের কথা না!

হারুণ। 'কারুরে খুন করবো না' এই কথা দিলে ইমান নষ্ট হয় না!

এনায়েৎ। [সোজা হারুণের দিকে তাকিয়ে] 'হয় না?'

হারুণ। না, হয় না।

এনায়েৎ। [নতুন ভাবনায়] তাইলে এইসব মানুষেরে কি করে লোকে?

হারুণ। কিছু না। যদি আইন মানে—সে বেঁচে থাকে। ব্যস।

এনায়েৎ। [উঠে হারুনের মুখোমুখি দাঁড়ায়] আইন! সকল আইনই কি কিতাবে লেখা থাকে?

হারুণ। হ, কেতাবেই থাকে। আর কোনো আইন নাই।

এনায়েৎ। [রাগ বাড়ছে] সে আমার মায়ের প্যাটের ভাইরে নিচু করছে—আমার বাচ্চাদের প্যাটের ভাত মারছে—আমার কাজের অপমান করছে! আমি এইখানে কাম করতে আইছিলাম—ফাৎরামি করতে আসি নাই!

হারুণ। আমি জানি, এনায়েৎ—

এনায়েৎ। এই পাপের সাজা কোন্ আইনে হবে, সাহেব?

হারুণ। কোনো আইনই নাই।

এনায়েৎ। এই দ্যাশের—এই বড়ো শহরের তরিকা বুঝি না আমি।

হারুণ। তাইলে? আমার কথা যদি শোনো, মইধ্যে পাঁচ-ছয় সপ্তাহ কামও করতে পারবা। নইলে হাজতেই থাকতে হবে।

এনায়েৎ। [চোখ নামিয়ে প্রচণ্ড লজ্জায়] ঠিক আছে।

[স্বল্প বিরতি]

হারুণ। তুমি কিন্তু কথা দিলা—তুমি তারে ছোঁবা না!

এনায়েৎ। [তার দৃষ্টি কোন সুদূরে ফেরানো] হয়তো সে আমার কাছে মাফি চাইতে পারে।

হারুণ। [এনায়েতের একটা হাত ধরে] মানুষ দেবতা না, এনায়েৎ। শুনত্যাছো? বিচার করতে পারেন এ্যাকমাত্র আল্লা তালাহ্!

এনায়েৎ। ঠিক আছে।

হারুণ। [মাথা ঝাঁকিয়ে, এখনও অস্বস্তিতে] শাহীন, নীলু, এনায়েৎ— আমরা এ্যাখন যাবো।

শাহীন। আমি মাসির কাছে যাচ্ছি—মসজিদে দেখা হবে। [সে দ্রুত বেরিয়ে যায়]

[এনায়েৎ উঠে দাঁড়ায়। নীলু হঠাৎ তাকে জড়িয়ে ধরে। এনায়েৎ তার পিঠে হাত বোলায়। নীলু শহীনের পেছনে চলে যায়। হারুণ এখন এনায়েতের মুখোমুখি]

হারুণ। কেবলমাত্র আল্লা তালাহ্, এনায়েৎ।

[এনায়েৎ ঘোরে, বেরিয়ে যায়। হারুণ প্রায় শোভাযাত্রার ভঙ্গিতে হেঁটে চলে যায় মঞ্চ ছেড়ে। আলো নিবে যায়। বাড়িতে আলো। সালেক একা— দোলনা-চেয়াবে—ছোট-ছোট ঝাঁকুনিতে দুলছে। বিরতি।

এবার জয়নাব শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। তার পরণে সেরা পোশাক। মাথায় ওড়না]

জয়নাব। [সভয়ে] আমি এ্যাকঘন্টার মইধ্যেই ফিরে আসবো। ঠিক আছে, কর্তা?

সালেক। [শান্ত, প্রায় অস্ফুটে—যেন কেউ নিংড়ে নিয়েছো] কি — আমি কি এ্যাতোক্ষণ নিজের লগেই কথা কইতেছিলাম?

জয়নাব। কর্তা মশাই...আল্লার কিরা...আইজ তার বিয়া!

সালেক। কি কইলাম শোনো নাই? যদি ঐ চৌকাঠ পার হইয়া সেই বিয়াতে যাও—তুমি আর ফিরা্যা আসবা না, জয়নাব!

জয়নাব। এ্যাতো বড়ো সাজা কিসের লেইগ্যা—কি চান আপনে, কর্তা?

সালেক। আমি আমার হক্কের ইজ্জৎ ফিরৎ চাই। কথাডা কোনোদিন শোনো নাই? হায়রে আমার বিবি!

শাহীন। [শোবার ঘর থেকে আসে] তিনটে বেজে গেছে। সেই কাজি কিন্তু অপেক্ষা করে থাকবে না।

জয়নাব। কর্তা—আইজ সেই মাইয়ার বিয়া—তার নিজের পরিবারের কেউ সেখানে থাকবে না। নিজের জইন্য কিছু চাই নাই আমি...আমার সেই মরা বুইনের জইন্য আমারে যাইতে দ্যান—আমি সেই বুইনের জইন্য যাইতাছি।

সালেক। [যেন আহত] নতুন কিছু আর করার নাই। সে এইখানে আসবে। আমার কাছে মাফি চাবে—নইলে এই বাড়ির কেউ সে বিয়াতে যাবে না। হয় তুমি আমার দিকে, নয় তাদের দিকে—কথা শ্যাষ!

শাহীন। [হঠাৎ] নিজেরে কোন্ প্যাদের লাট মনে করো তুমি?

জয়নাব। শ্ শ্ শ্ শ্!

শাহীন। তোমার কাউকে কোনো কথা বলার হক নেই! যতোদিন বেঁচে আছো—ততদিন—কাউকে না!

জয়নাব। চুপ যা—চুপ যা, শাহীন! [শাহীনের দিকে ঘোরে]

শাহীন। তুমি আমার সঙ্গে আসবে!

জয়নাব। পারি না রে শাহীন—আমি যে সেইটা পারি না!

শাহীন। এর কথা বসে-বসে শুনছো তুমি! এ্যাকটা চুকলিখোর—চুহা!

জয়নাব। [শাহীনকে ধরে] শাহীন এই কথা কওনের সাহস হয় তোর?

শাহীন। [নিজেকে ছাড়িয়ে] কিসের ভয় করো তুমি? ইঁদুর একটা— ওর জায়গা নর্দমায়?

জয়নাব। থামা থামারে—জিভ খসে যাবে যে তোর অকৃতজ্ঞ—

শাহীন। [কাঁদতে কাঁদতে] ঘুমন্ত মানুষকে কামড়ায় লোকটা—ওর স্থান আস্তাকুঁড়ে.....

[ভয় হয় সালেক বুঝি টেবলটাই ছুঁড়বে শাহীনের গায়ে]

জয়নাব। না, কর্তা না! [শাহীনকে] তাই যদি হয় তাইলে আমাদের সক্কলেরই স্থান নর্দমায় আস্তাকুঁড়ে! আমারও—তোরও রে ছেমড়ি, তোরও। যা কিছু ঘটছে—এর দায় আমাগো সক্কলের—সেই কথাড়া কখখনো ভুলিস না, শাহীন! [এবার শাহীনের কাছে যায়] যাও এবার তুমি। তোমার রিয়ার লগ্ন বইয়া যায়, শাহীন। আমি এই ঘরেই থাকবো। আল্লা তালাহ্ নিশ্চয়ই তোমারে ভালো রাখবেন—তোমার পোলাপানদের নিশ্চয়ই দোয়া করবেন! [নীলু আসে]

নীলু। সালেক ভাই!

সালেক। এই ঘরে আসছো তুমি কার পারমিশানে? বাইরইয়া যাও!

নীলু। সালেক ভাই, ভাইজান এইখানে আসতেছে। [বিরতি। আতঙ্কে জয়নাবের হাত উঠে যায়] সে মসজিদে নামাজ পড়তাছে। বোঝতেছেন তো আপনে? [বিরতি। নীলু আরও ভেতরে আসে] শাহীন, আমাদের এইখানে না থাকাটাই ভালো... আমার সঙ্গে আসো।

শাহীন। জামাই, তুমি চলে যাও—পায়ে পড়ি!

জয়নাব। কর্তা।...চলেন, আমরা কোথাও এ্যাট্টা চইলে যাই। [সালেক নিশ্চল] আমি চাই না, তার সঙ্গে আপনার দ্যাখা হউক...

সালেক। অমি—আমি কোথায় যাবো? এইটা আমার বাসা!

জয়নাব। [আর্তনাদ করে ওঠে] এইটায় কার কি লাভ কর্তা? সে অখন উন্মাদ—কি যে ঘটতে পারে আপনে কি জানেন?—কার কোন্ মঙ্গল হবে এইতে? কন তো আমারে—এনায়েতের লগে আপনার কিসের দুষমনি? আপনে তো সর্বদাই তারে পছন্দ করতেন কর্তা!

সালেক। এনায়েৎ আমার দুষমনি করে নাই? সারা মহল্লার সামনে আমারে সে বেইমান ডাকে নাই?—আমি তার বাচ্চাগো-জল্লাদ—কয় নাই?

কোথায় ছিলা তুমি তখন?

নীলু। **[হঠাৎ সালেকের সামনে এসে দাঁড়ায়]** সব আমার দোষ, সালেক ভাই। আমি মাফি চাই। আপনার পারমিশান লই নাই—বড়ো অন্যায় করছি। আমি আপনার হাতে ধরি। **[সালেকের হাত ধরতে যায়, সালেক ঝটকা মেরে সারিয়ে নেয়]**

জয়নাব। কর্তা—সে আপনার কাছে মাফ চাইতেছে!

নীলু। আল্লা হয়তো জানেন, ক্যানো সেইদিন আপনে আমারে অমন ইনসাল্ট করছিলেন...কিম্বা হয়তো আমারে আপনে ইনসাল্ট করতে চানও নাই...সব দোষ আমার—

জয়নাব। অর কথা বিশ্বাস করেন কর্তা—এট্টু শোনেন আপনে!

নীলু। এ্যামনও হইতে পারে—ভাইজান আসলে যদি আমরা কই, আমাদের মইধ্যে আর বিবাদ নাই...তাইলে হয়তো ভাইজান আর—

খালেক। এইবারে, শোনো তুমি—

শাহীন। জামাই, একটা সুযোগ দাও ওকে!

জয়নাব। কি চান আপনে? কর্তা, কি চান?

সালেক। নাম—ইজ্জৎ—ইমান। সে না—সে-তো এ্যাকখান হিজড়া। এনায়েৎ আমার সু-নাম কাইড়া নিচ্ছে! **[নীলুকে]** তুমি-ছোকরা, যাও—দৌড়াইয়া তারে গিয়া কও—ভাই-বেরাদরদের সামনে আমার সুনাম তারে ফিরায়্যা দিতে হবে। তা'নাইলে আমাদের বোঝাপড়া হবে। **[নিজের প্যান্ট ঠিক করতে করতে]** আসো—কোথায় সে? আমারে নিয়া চলো তার কাছে।

জয়নাব। কর্তা, আমার কথা শোনেন—

সালেক। অনেক শুনছি আমি! চলো, আমরা যাবো!

জয়নাব। রক্ত ছাড়া খুনাখুনি ছাড়া হবে না? সে তোমারে হাতে পায়ে ধরলো—সেইটা কিছুই না!

সালেক। ও কি করলো তাইতে কারো কিছু যায় আসে না [নীলুকে] চলো!

জয়নাব। **[সিঁড়ির পথ আটকে রাখে]** কিসে কিসে তবে আসবে যাবে—কর্তা, কে কে আপনার নাম ফিরায়ে দিতে পারে? কয়েন আমারে—ঐ খোলা রাস্তার মাঝে সকলের সামনে ঐ এনায়েৎ যদি আপনার পায়ে চুমা খায়, যদি আপনার পায়ে মাথাও ঠোকে— সে আপনারে কিছুই কি দিতে পারবে? কর্তা, আপনি তো সেইটার ভিখারি না!

সালেক। আমারে বিরক্ত কইরো না!

জয়নাব। আপনে তো অন্যকিছুর ভিখারি! কর্তা, সেই মাইয়ারে আপনে কোনোদিন পাইবেন না!

শাহীন। **[আতঙ্কে]** বু-ই-ই-ন!

সালেক। **[চমকে, ভয়ে, হাতের মুঠো পাকিয়ে]** জয় না-আ-ব!

জয়নাব। **[আর্ত চিৎকারে কেঁদে]** সত্য কথায় হারাম নাই গো কর্তা—রক্তপাতেই হারাম! ভালোবাসি—তাই আমি আপনারে সত্য কই!

সেই মাইয়ারে চিরকালের মতো বিদায় দ্যান!

সালেক। **[যন্ত্রণায় চিৎকার করে]** এই ভাবো তুমি আমারে?—এই চিন্তা করি আমি—তাই ভাবো তুমি? **[দুই মুঠোয় মাথা চেপে ধরে—যেন মাথা ফেটে যাবে যে কোনো মুহূর্তে]**

এনায়েৎ। **[দরজার কাছ থেকে ডাকে]** সালেক আহ্‌মেদ খান!

[সালেক ক্ষিপ্র গতিতে ঘোরে। সকলে মুহূর্তের জন্য পাথর। বাইরে লোক জমতে শুরু করে]

সালেক। **[যেন চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়]** হ, এনায়েৎ! সালেক আহমেদ খান! সালেক আহমেদ খান! সালেক আহমেদ খান! **[চাতাল হয়ে বাড়ির বাইরে আসে। নীলু পাশ কাটিয়ে বাইরে যায় দৌড়ে—এনায়েতের দিকে]**

নীলু। না, ভাইজান—পায়ে ধরি! জামাই, পায়ে ধরি—ওর তিনটা বাচ্চা—পুরা ফেমিলি ধ্বংস হয়ে যাবে!

জয়নাব। ঘরের ভিতরে যান! ঘরের ভিতরে যান, কর্তা!

সালেক। **[ক্রমেই লোকেদের উদ্দেশে]** হইতে পারে, সে আমার কাছে মাফি চাইতে আইছে। কি এনায়েৎ? মহল্লার সক্কলের সামনে আমারে যা কইছো তারই জইন্য?

[সে নিজেকে উত্তেজিত করছে। মাঝে-মাঝে হাসির ঝলক। চোখ তার হন্তারকের। আশ্চর্য আয়াসে নিজের আঙুল মটকাচ্ছে সে]

সে জানে কথাডা মিথ্যা। এইটা উচিত?—এ্যাট্টা মানুষের বদনামি করা? আমি—এই মানুষটা—আমি তার মাথায় ছাত দিছি, নিজের গেরাস তার মুখে তুইল্যা দিচ্ছি? কোরাণে তো সেইটাই কয়। জীবনে চিনি নাই যে মানুষেরে...আমার ঘরের মেজেতে পাও রাইখ্যা সিটিজেন হবার লোভে কচি ম্যাইয়াডারে ফুসল্যয়্যা লয়? এইটা এ্যাট্টা পরিবার ছিলো না?—এইটা কি রাণ্ডিখানা ছিলো?—আমারে জিগাইলাও না? আর বদলিতে আমিই এ্যাখন কাঠগড়ায়? **[এনায়েৎকে সোজাসুজি]** মহল্লার সকলের সামনে আমার নামে গু করো! আমারে থুতু ছিটাও! আমার নাম খোয়া গ্যাছে! **[সন্তর্পণে এনায়েতের দিকে এগোতে থাকে]** নামখান ফিরৎ দাও আমারে—ব্যস—তারপরে চলো—দুইজনে যাবো শাদির দাওয়াতে!

শাহীন। জামাই, জামাই—করো না কেরো না!

জয়নাব। আমার কথা শোনেন, আমার কথা শোনেন! কর্তা—কর্তা!

সালেক। না। সাচ্চা-ঝুটার তাফাৎ এনায়েৎ জানে। লোকেদেরে কও এনায়েৎ তুমি মিথ্যা কইছো। **[নিজের হাত ছাড়িয়ে দেয়। এনায়েৎও নিজের হাত মেলে ধরে]** আসো মিথ্যাবাদী—তুমি তো জানো তুমি কি করছো!

[সালেক এনায়েতের দিকে ঝাঁপায়। ভিড়ের ভেতর থেকে একটা চাপা চিৎকার উঠে আসে। এনায়েৎ সালেকের ঘাড়ে আঘাত করে]

এনায়েৎ। জানোয়ার! হাঁটু গাইড়া বস্—আমার সামনে বস্! [এই আঘাতে সালেক পাড়ে যায়। এনায়েৎ পা তুলেছে—যেন তাকে থেঁৎলে দেবে—ঠিক তখনই সালেকের হাতেছুরি ঝলসে ওঠে। এনায়েৎ দু'পা পিছিয়ে যায়। লতিফ সালেকের দিকে দৌড়ে আসে]

লতিফ। আল্লার কসম, সালেক মিঞা! [সালেক ছুরি ওঠায়, লতিফ থেমে পেছিয়ে যায়]

সালেক। এনায়েৎ, তুমি আমারে বদনাম দিছো। কইয়া দাও—স্বীকার যাও এইবার!

এনায়েৎ। জানোয়া—র! [সালেক ছুরি নিয়ে লাফ দেয়। এনায়েৎ ওর হাতটা ধরে ছুরির ডগা ওরই পেটের দিকে নিয়ে যায় এবং পেটে চেপে ধরে। ইতিমধ্যে মহিলারা, লতিফ ও মতীন ওদের আলাদা করে দিয়েছে। সালেক—ছুরি এখনও তারই হাতে, অংশত পেটে—এনায়েতের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে। মহিলা দু'জন এক মুহূর্ত তাকে ধরে থাকে, তারপর বার-বার তার নাম ধরে ডাকতে থাকে]

শাহীন। জামাই, তোমার কোনো ক্ষতি আমি চাইনি!

সালেক। তাইলে-ক্যান্...ওঃ চিনি

জয়নাব। হ, এই যে কর্তা—আমি চিনি...এইতো আমি কর্তা আপনার চিন্তামণি... দ্যাখেন আমারে...এই তো আমি...

সালেক। চিনি...আমার চিন্তামণি!

[জয়নাবের কোলে সে মৃত। নিজের শরীর দিয়ে সে সালেককে ঢেকে নেয়। এই ভিড়ের মধ্যেই ছিল হারুণ। সে দর্শকদের দিকে ঘোরে। সব আলো মরে গেছে। শুধু শেষ আভায় দেখা যাচ্ছে তাকে। আর পেছনে শোনা যাচ্ছে মহিলাদের কান্না এবং প্রার্থনার ধ্বনি]

হারুণ। আজকাল আমরা অর্ধেকটা পেলেই খুশি মানি, প্রয়োজনে বাকি অর্ধেক ছেড়ে দিই। কিন্তু যা সত্য—সে'তো পাক পবিত্র।
এবং যদিও জানি কতো বড়ো অন্যায় সে করেছিলো, কতো অর্থহীন তার এই মৃত্যু—তবুও যখনই তার কথা স্মরণে আসে, আমি কাঁপি।
অবাক হয়ে ভাবি, বিকৃতি কি করে এত পবিত্র এত সরল হতে পারে! সেই জন্যই হয়তো আমার আর পাঁচজন বুঝদার মক্কেলের চেয়ে চিরকালই চুপি চুপি ওকে আমি বেশি ভালোবাসবো।
তবু—আমিও তো দুনিয়াদারির ব্যাপারী—তাই অর্ধেকটা পেয়ে গেলেই খুশি মেনে যাই। সেটাই তো বুদ্ধিমানের কাজ—তাই না?
আর তাই ওর জন্য আমি শোক করি—একটু ভয়ে ভয়ে—চুপিচুপি!

পর্দা

সমকালীন দৃষ্টিভঙ্গীতে
রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত'র নাটক

নাটক থেকে নাটকে পুনর্গ্রহণ: শেষ সাক্ষাৎকার

সলিল বন্দ্যোপাধ্যায়

কোনো বিদেশী নাটকের রূপান্তর যখন করা হয় সেই কাজটি মূলত তিন রকমভাবে হতে পারে। প্রথমত, পুরো খোলনলচেটাই বদলে দেয়া যেতে পারে—অর্থাৎ কাহিনী-কাঠামো বা মূল ভাবটিকে অবলম্বন করে লেখা যেতে পারে একটা নতুন নাটক। দ্বিতীয়ত, উৎস-নাটকের কিছু কিছু রেখে দিয়ে বাকিটা বদলে নিয়ে লিখে ফেলা যেতে পারে একটা প্রায় নতুন নাটক। তৃতীয়ত যেটা হতে পারে তা হল মূল নাটকটির ভাষান্তর করে-নামধাম ইত্যাদি কিছু কিছু বহিরঙ্গের বদল করে নেয়া। এর কোনটা ভাল কোনটা মন্দ তেমন বিচারের মধ্যে যাওয়াটা অর্থহীন। যেক্ষেত্রে যেটা উপযুক্ত সেক্ষেত্রে সেটাই শ্রেয়। আমার আগ্রহ অন্যত্র।

ভাষাতাত্ত্বিকেরা বলেন 'ভাষা' হলো আদতে একটি socio-cultural function। অর্থাৎ, আর আর সব সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্রিয়ার মতই ভাষাও এমন একটি সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্রিয়া যা দিয়ে আমি নিজেকে যেমন আমার সমাজের—আমার সংস্কৃতির অন্যান্যদের একজন বলে বুঝতে পারি—চিনতে পারি তারাও তেমনি আমাকে তাদেরই একজন বলে বুঝতে পারেন—চিনতে পারেন। কেননা, আমার সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনের বহুপার্শ্বিকতা ও বহুস্তরিকতা প্রকাশ পায় আমার ভাষার মাধ্যমে। ভাষার সঙ্গে সমাজ-সংস্কৃতির সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গি-অচ্ছেদ্য। কিন্তু, সমাজ বা সংস্কৃতি কোনোটাই অপরিবর্তনীয় বা স্থানু নয়। দুই-ই পরিবর্তনশীল। সেই পরিবর্তনের ধারা-প্রকৃতি জটিল। ভাষাও সদাই পরিবর্তনশীল। তবু কিন্তু সমাজ-সংস্কৃতির সঙ্গে ভাষার সম্পর্কের কোনো হেরফের ঘটে না-গাঁটছড়া যেমন তেমনই থাকে।

তাই কি একটা সংশয় চালু আছে যে কোনো ভাষা আদৌ অনুবাদযোগ্য কি না? বা, উৎস-ভাষা না লক্ষ্য-ভাষা কোনটির প্রতি সম্পূর্ণ অনুগত থাকা উচিত অনুবাদকের সেই প্রশ্নে দ্বিধাবিভক্ত পণ্ডিতসমাজ? অর্থাৎ, কোনো একরকম অনুবাদ যদি বা সম্ভব তবু উৎস এবং লক্ষ্য দুই ভাষার প্রতি সমান সুবিচার করা সম্ভব নয় কখনোই—এমনই মনোভাব পণ্ডিতদের। আবার দেরিদা 'লেখক'-এই বিশ্বাস করেন না, ফলে অনুবাদ নিয়ে এত মাথা ঘামানোটাই তাঁর কাছে অর্থহীন। গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক এই অতি সম্প্রতি বলেছেন, 'আমি জানি, সংস্কৃতি কখনও অনুবাদ করা যায় না। কিন্তু বোঝার চেষ্টা করা যায়।'

অনুবাদ করতেই হয়। অনুবাদ করাও হয়।

কবিতা কিম্বা গল্প উপন্যাস বা প্রবন্ধ অনুবাদের বেলায় কী ঘটে সেই বিষয়ে কোনো কথা বলবার অধিকার আমার নেই, কেননা কোনো কাজ আমি কখনো করিনি। যদিও,

অনুবাদে কবিতা, গল্প-উপন্যাস পড়েছি—পড়ি। দীক্ষিত পাঠক নই। অনুবাদ-সাহিত্যের শৌখিন পাঠক হিসেবে মনে হয় কবিতা, গল্প-উপন্যাস, প্রবন্ধ ইত্যাদি অনুবাদের বেলায় মূল লেখার শৈলীর দিকটি সম্বন্ধে সচেতন থাকাটা খুবই জরুরী, বিশেষত কবিতা অনুবাদের ক্ষেত্রে, নইলে মূল লেখা এবং লেখক-উভয়েরই-প্রতি অন্যায় ঘটে যেতে পারে। উপন্যাস-গল্প-প্রবন্ধ লিখিত হয় পঠিত হবার জন্য। কবিতাও তাই। কিন্তু কবিতা যেহেতু নীরবে যেমন পঠিত হতে পারে তেমনই আবার হতে পারে তার উচ্চারিত-পাঠ বা আবৃত্তি সেহেতু লক্ষ্য-ভাষায় অনূদিত হবার কালে অনুবাদকের ওপর বর্তায় একটি বাড়তি দায়। শব্দের ধ্বনিগত দিকটি তাকে খেয়াল রাখতে হয়। তাই বলে নীরব-পঠনের বেলায় ধ্বনির দিকটিকে উপেক্ষা করা যেতে পারে এমন কথা আদপেই বলতে চাইছি না আমি। যাইহোক, দেরিদার অভিমত সত্ত্বেও এবং গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাকের সঙ্গে সহমত হয়েও, সাহিত্যের এই সব genre -এর বেলায় অনুবাদকের আনুগত্যের প্রশ্নটির গুরুত্ব বোধহয় খানিক মেনেই নিতে হয়। উৎস-ভাষা এবং লক্ষ্য-ভাষা—দুয়ের প্রতি আনুগত্য-রক্ষার মধ্যে একটা সমঝোতা করেই হয়তো চলতে হয় অনুবাদককে।

কিন্তু, নাটক অনুবাদের বেলায়?

বিশেষত, একজন নাট্যশিল্পী নিজে যখন কোনো বিদেশী নাটক অনুবাদ করেন—তখন? একজন নাট্যশিল্পী নানা কারণেই কোনো একটি বিদেশী নাটক বেছে নিতে পারেন অনুবাদের জন্য। হয়তো বিষয়টি তাঁর ভালো লেগেছে বলে, কিম্বা নাটকটির কাহিনীর অথবা structure-এর জন্য, বা একটি বিশেষ কোনো চরিত্রেরই জন্য। এমনও হতে পারে যে তিনি নিজে বা আর কেউ অভিনয় করবেন বলে নয়, নিজের ভালোলাগার তাগিদেই নাটকটি অনুবাদ করবার সময় একটা সচেতনতা কিন্তু তাঁর থাকেই যেন নাটকের সংলাপগুলি শুধু পঠিত হবে না, উচ্চারিতও হবে—কথাগুলো বলা হবে।

নাটক লেখার বেলায় এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত।

যে-ভাষা পড়ে-বুঝবার ভাষান্তরের দায় সেক্ষেত্রে যেমন, তার থেকে একেবারে ভিন্ন গোত্রের দায় কিন্তু শুনে-বুঝবার ভাষা ভাষান্তরের ক্ষেত্রে। ভাষা-এই socio cultural function-টিই—এক্ষেত্রে একেবারে স্বতন্ত্র। ভাষা ব্যতীত আমরা ভাবতে পারিনা-ভাষাতেই ভাবি আমরা, তাই ভাবকে যখন ভাষায় আঁটতে পারি না তখন তাকে বলি অনির্বচনীয়। অথচ, সেই অনির্বচনীয়কে 'বচনীয়' করে তুলতে চাই আমরা। সাহিত্য-লিখিত সাহিত্য—আমাদের সেই তাগিদটা মেটায়। কিন্তু, লিখে নয় মুখে বলেও তো মনকে প্রকাশ করতে চাই আমরা। সেই তাগিদটা মেটাবার দায় নাটকের সংলাপের। নাটকের ভাষা তাই মনের ভাষা থেকে মুখের ভাষা, sublimity থেকে profanity, পর্যন্ত ব্যপ্ত। অথচ, সম্পূর্ণ স্বাভাবিক- as if real এক construct। যেখানে চিরন্তনতা এসে অনায়াসে মিলতে পারে দৈনন্দিনতার সঙ্গে। সব নাটকের বেলাতেই কি এই চারিত্র্য সত্য? না, তা নয়। কিন্তু, এই চারিত্র্য দিয়েই চিনে নেয়া যায় রাশি রাশি অ-নাটক থেকে সত্যিকারের নাটককে। এখন যদিও সমার্থক হয়ে গিয়েছে, তবু এক সময় এই গোত্রভেদ বোঝাবার জন্য ইংরেজিতে dramatist আর playwright বলে দুটো আলাদা শব্দ ব্যবহার হতো।

যাইহোক, একজন নাট্যশিল্পী যখন কোনো বিদেশী নাটক ভাষান্তরিত করেন তখন তাঁর প্রথম বা/এবং প্রধান যে দায় তা কি গল্প-উপন্যাস বা প্রবন্ধ বা কবিতা অনুবাদকের

দায়ের সমগোত্রীয়? না। কখনোই নয়।

লিখিত সাহিত্য-কর্ম হলো একজন স্রষ্টার সঙ্গে একজন ভোক্তার দেয়া এবং নেয়ার সম্পর্ক, এবং ভোক্তা এক্ষেত্রে যতবার খুশি ততবার ফিরে ফিরে যেতে পারেন উপভোগ্যের কাছে। বারবার করে পড়তে পারেন লেখাটি। একটানা পড়তে পারেন, পারেন ধীরে ধীরে একটু একটু করে অনেকদিন ধরে পড়তে। একক ভোক্তা নিজেই এক্ষেত্রে নির্দ্ধারণ করেন তার ভোগের ধরণ। কিন্তু, নাটকের বেলায় তো তা নয়,—যদি অবশ্য আমরা মেনে নিই যে মঞ্চায়িত না-হওয়া পর্যন্ত পূর্ণতা পায় না কোনো নাটকই—এই অভিমত তর্কাতীতভাবে সত্য। তাহলে ব্যাপারটা যা দাঁড়ায় তা হলো: নাট্য সৃজন যতক্ষণ চলে ভোক্তার উপভোগও প্রায় ততক্ষণই চলে বা ক্ষেত্রবিশেষে তার পরেও চলে সেই প্রক্রিয়া, এই সৃজন ও পরিগ্রহণ—দুইই একটি নির্দিষ্ট সময় ধরে একটি নির্দিষ্ট স্থানে চলে, এক্ষেত্রে ভোক্তাও যেমন একই কালে-একই পরিসরে অনেক, স্রষ্টাও তেমনি একজন নন অনেকে। নাটক যিনি লেখেন তিনি তাদেরই একজন। খুবই গুরুত্বপূর্ণ বটে তবু তাঁর ভূমিকা সহ-স্রষ্টার । এই যে মূল পার্থক্য লিখিত সাহিত্য-কর্ম এবং নাট্যকর্মের মধ্যে, সেই পার্থক্য দ্বারাই রচিত হয়ে যায় লিখিত-সাহিত্য অনুবাদকের প্রধান দায়ের সঙ্গে নাটকের অনুবাদকের প্রথম এবং প্রধান দায়ের ভিন্নতার। একজন নাট্যশিল্পী বা একজন সমর্থ নাটককার যখন অনুবাদ কর্মে নিজেকে নিয়োজিত করেন তখন তিনি জানেন সেই বিদেশী নাটকটি যেখানে-যেভাবে তার স্ব-দেশ এবং স্ব-কালের পক্ষে প্রাসঙ্গিক, সেই প্রাসঙ্গিকতা তার সমস্ত তাৎপর্য সমেত ধরা পড়া চাই-ই চাই নানা রুচির নানা বয়সের নানা মানসিকতার একঘর ভর্তি মানুষের কাছে প্রত্যেকটি অভিনয়ের সন্ধ্যাতেহ। তাই, এক্ষেত্রে তিনি প্রথমত একজন নাটককার (এবং হয়তো নাট্যকারও) এবং দ্বিতীয়ত ও শেষত একজন অনুবাদক।

'শেষ সাক্ষাৎকার' হলো আদতে Viadlen Dozortsev-এর মূল নাটকের ইংরেজি অনুবাদ 'The Last Appointment'-বাংলা অনুবাদ। এই ইংরেজি অনুবাদটি মূল রুশী নাটক থেকে কোথায় কেমন ভাবে কতখানি সরে গিয়েছে সেই আলোচনায় প্রবিষ্ট হবার যোগ্যতা আমার নেই। আমার আগ্রহ-কোন তাগিদে এবং কেমন করে ইংরেজি থেকে বাংলায় ও রাশিয়া থেকে ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে বিষয়টির পূর্ণগ্রহণ ঘটিয়েছেন এই অভিজ্ঞ-সমর্থ নাট্যশিল্পী—রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত যাঁর নাম।

গোড়াতেই যদিও বলে রাখা হয়েছে-'...ঘটনাস্থল ভারতবর্ষের কোন রাজ্যের—ধরা যাক পশ্চিমবঙ্গের'। তবু, নাটকটি পড়ে মনে হয় অনুবাদক পশ্চিমবঙ্গের কথা মাথায় রেখেই বেছে নিয়েছেন এই নাটকটি। কেননা, কম্যুনিস্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী একটি পার্টি (বামপন্থী মনোভাবাপন্ন অন্য আরও কিছু রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জোট বেঁধে) সরকার গড়ে অনেককাল যাবৎ ক্ষমতায় টিঁকে আছে এবং থাকতে থাকতে ক্রমে আদর্শ থেকে বিচ্যুত হচ্ছে এমনটা ভারতবর্ষের অন্য কোনো রাজ্যে নয়, সত্য হলে হতে পারে একমাত্র পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রেই। এই সমান্তরালতার জন্যই এই রুশী নাটকটির প্রাসঙ্গিকতার প্রত্যক্ষতা পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে যতোখানি ভারতবর্ষের আর কোথাও ততোটা হবার নয়। যদিও, রাষ্ট্রশাসনের দায়িত্ব যাদের হাতে তাদের এবং তাদের অনুচরদের নীতিহীনতা বা দুর্নীতির প্রশ্নটির প্রাসঙ্গিকতা অবশ্যই সর্বভারতীয়। অতএব, 'শেষ সাক্ষাৎকার' নাটকটির ক্ষেত্রে অনুবাদকের প্রথম এবং প্রধান দায় হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে সমাজ ও সময়-সচেতন এক দায়িত্বশীল নাট্যশিল্পীর একটি তাগিদকে, যে-তাগিদের বশবর্তী হয়ে

একটি রাজনৈতিক সমান্তরালতার ইঙ্গিত রচনার মাধ্যমে তিনি যেন উচ্চারণ করতে চাইছেন এক সতর্কবাণী।

তাঁর এই তাগিদটিকে বুঝে নেবার জন্য একবার নজর বুলিয়ে নেয়া যাক এই অনুবাদ-কর্মটির দিকে। ইংরেজি-অনুবাদে আছে Man-নামে চিহ্নিত চরিত্রটি উপমন্ত্রীর ব্যক্তিগত-সচিব Yermakov-কে বলে, '...you know, people always think when a pope is alive that there's no one else like him. But the minute he dies another man takes his place who seems better than the last one ! It always creates problem when a leader is gone, but it induces new talent...'।

যা বলতে চাইছেন তা বলবার জন্য সোভিয়েৎ রাশিয়ার এই নাটককারকে ' pope' শব্দটি ব্যবহার করে সামান্য একটু আড়াল তুলে রাখতে হয়েছিল। আবার একটু পরোক্ষ শ্লেষ করাও সম্ভব হয়েছিল ধর্ম-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তুলনাটুকুর আভাস রচনা করে। কেননা, রাশিয়া সমেত সমস্ত সাম্যবাদী য়ুরোপীয় রাষ্টগুলিতে একধরনের gerontocracy চলছিলো তখন। আমৃত্যু নেতা থেকে যাওয়াটাই ছিলো চল। নেতা- cult- এর চর্চা থেকে মুক্ত নয় এই দেশেরও রাজনীতি। বাংলায় অনুবাদের সময় 'pope'-এর প্রসঙ্গ বাদ পড়ে গিয়েছে, থেকেছে শুধু শেষ বাক্যটি—'...জানেন, সমাজের যে কোন ক্ষেত্রে একজন নেতা সরে গেলে কিছু সমস্যার সৃষ্টি হয়, কিন্তু নতুন ব্যক্তিত্বের বিকাশ শুরু হয় ঐ একই সঙ্গে।'

আরও একটু দেখা যাক।

স্বাস্থ্যমন্ত্রকের উপমন্ত্রী, যিনি নিজে একজন বিখ্যাত শল্য চিকিৎসক, Man কে জিজ্ঞাসা করেন আগে কখনো তাদের দুজনের দেখা হয়েছে কিনা। কথায় কথায় ওঠে শল্য চিকিৎসকের ফটোর কথা, যে ফটোটি টাঙানো আছে কার্ডিওলজি সেন্টারে কনফারেন্স্ রুমের বাইরে।

Kazmin (seriously) : would you have passed by if you saw your portrait were crooked? What would you have done?

মানুষ। জানিনা: (হঠাৎ ভাবেন) আমি আদৌ ছবিটা ঝোলাতাম না। কেন? আমি তো ফিল্মস্টার নই। তাছাড়া মানুষ বদলে যায়...আর সবসময় যে ভালোর দিকেই বদলায় তাও তো নয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে একটা লোকের কত কি ঘটতে পারে। অনেক দোষ জন্মাতে পারে, একেবারে নষ্ট হয়ে যেতে পারে...তখন কি করা? ছবিটা নামিয়ে নেওয়া। হ্যাঁ, মানুষ মরে যাওয়ার পরে অবশ্য অন্য কথা। তখন ঠিকই আছে। কে যে কী সময় ঠিক বলে দেয়।

ব্যক্তি-cult চর্চার বিরুদ্ধে এক আন্তরিক ও যুক্তিপূর্ণ অভিমতের প্রকাশ।

নাটকের শেষের দিকে পৌঁছিয়ে বক্তব্য সব আড়াল-আবডাল খসিয়ে দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। **Yermakov** বলে:'**you don't understand one thing. There is the law of big numbers...Incidentally, the most democratic approach is to do what's in the interest of the majority...**'

এই কথার উত্তরে Man এবারে সরাসরি লেনিনের কথা তোলেন। এবং সেই কথারই

জের টেনে বলেন:

মানুষ : সেই মানুষটি তাঁর নিজের স্বাস্থ্যকে অবহেলা করেছিলেন। (উঠে দাঁড়ান) কিন্তু আপনারা অন্যের স্বাস্থ্য নয়, জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছিলেন। আন্দাজ করতে পারেন আপনার বিষয়ে লেনিন কি সিদ্ধান্ত নিতেন? আমার মনে হয় না ঐ দশটি ডুবন্ত মানুষের—কূট-কচালে উদাহরণ দিয়ে আপনারা পার পেয়ে যেতেন। (ধীরে ধীরে) একটা মানুষ চোখের সামনে ডুবছে; তখন লাইফবোট কিম্বা ডুবুরীর সংখ্যা বাড়ানোর চিন্তা অপরাধ, পাপ—ঐ লোকটাকে তখন বাঁচাতে হবে। যতগুলো মানুষকে পারেন বাঁচান; সেই প্রচেষ্টায় যতটা পারেন শক্তি ব্যয় করুন। যেমন ডঃ চ্যাটার্জী করেছিলেন। আপনাদের ঐ বিশাল জনগণের জন্য কাজ করার কোন অধিকার নেই কারণ একটা মানুষের জীবনের কানাকড়ি দাম আপনারা দেন না। আপনার ঐ নীতিশাস্ত্রের একেবারে মাঝখানটাতেই বিরাট একটা গর্ত রয়েছে। (হাত দিয়ে দ্যাখান) আমি আপনাকে বিশ্বাস করি না। সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বার্থের কথা আপনারা ভাবতে পারেন না—ওটা শুধু একটা অজুহাত (গলা চড়ান) আপনার ঐ সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বার্থ—ওরকম কিছু সত্যি নেই, যা আছে তা শুধু নির্লজ্জ সুবিধাবাদ আর আমলাতন্ত্রের উল্লাস। (বুকসেল্ফের কাছে যান; যাতে লেনিন রচনাবলী সাজানো রয়েছে) আপনার জাতের লোকদের লেনিন দুমাইল দূর থেকে চিনে নিতে পারতেন। (বুক সেলফের কাঁচের পাল্লা খোলার চেষ্টা করেন।) লেনিনের চিঠি টেলিগ্রাম এগুলো পড়েছেন? আপনার ধরণটা কিছু নতুন নয়, চৌধুরী সাহেব। সর্বকালে সব দেশে আপনার মত লোক বারবার এসেছে। (আবার বুক সেলফ্ খোলার চেষ্টা করেন) যে লোকগুলোর শিরদাঁড়া আপনারা চিরকালের মত ভেঙ্গে দিয়েছেন—আপনাদের প্রগতির ঐ সুললিত কাব্য তাদের কানে কঠিন গদ্যের মতোই শুনিয়েছে—(বুক সেলফ্কিছুতেই খুলতে পারেন না।) ব্যাপারটা কি? আপনারা কি পাল্লাগুলো কোনদিন খোলেনও নি? (পাগলের মত চেষ্টা করেন) কোন মূঢ় অহংকারে (সমস্ত শক্তি দিয়ে চেষ্টা করেন) সব ঘরে এইগুলো...(ধৈর্যচ্যুতি ঘটে) হঠাৎ সেলফ্ের ওপর থেকে একটা ছোট পেপার ওয়েট তুলে তাই দিয়ে বুক সেলফ্ের কাঁচ ভেঙ্গে ফেলেন। কিছুক্ষণ হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। ওটি রাখেন এবং ঘুরে দাঁড়ান, দৃষ্টি উদভ্রান্ত।)—একটু বাতাস লাগুক...(ফ্রেম থেকে টুকরো কাঁচগুলো বার করতে থাকেন)

অনুবাদকের দায় এইবারে স্পষ্ট। এক্ষেত্রে ভাষান্তরের বেলায় যে-আনুগত্য প্রবলভাবে সক্রিয় তা হলো দর্শকের প্রতি এক দায়বদ্ধ নাট্যশিল্পীর আনুগত্য।

তথাপি, এক সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্রিয়া থেকে অপর এক সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্রিয়ায় পুনর্গ্রহণের অর্থাৎ অনুবাদের যাবতীয় অসুবিধেগুলো থেকেই যায়। সেই সব প্রায় অনতিক্রম বাধার মুখোমুখি হতেই হয়। সেই মোকাবিলায় 'Police Woman' হয়েছে 'পুলিশ সার্জেন্ট', 'People's control' হয়েছে ' সিবিআই/সরকারী কমিশন/পার্টির কনট্রোল কমিশন', 'State Prize' হয়েছে 'পদ্মবিভূষণ'। কিন্তু 'raincoat' হয়েছে 'বর্ষাতি', ছাতা নয়। 'A chair that's warmed is...is better' বাংলায় প্রায় অর্থহীন হয়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে 'পরিচিত চেয়ারে বসাই... বোধহয় নিরাপদ...'। চেষ্টা করে বুঝে নিতে হচ্ছে এমনও অনুবাদ আছে:

মানুষ : (চৌধুরীকে) আপনি কোনদিন পোস্ট অফিসে চাকরি করেছেন?

ডঃ চৌধুরী : কেন?

মানুষ : আপনি সবকিছু কেমন সুন্দর মোড়কে সাজিয়ে ফেলতে পারেন।

পোস্ট-অফিসের বদলে বিজ্ঞাপন-সংস্থায় বললেই তাৎপর্যটা নিমেষে ধরে ফেলা যেত। অনুবাদ প্রবল অস্বস্তিকর হয়ে উঠতে পারতো নিচের অংশে :

Man : ...He played schubert every morning, as if he was washing his hands with the music (pretends to be playing the piano), as if he was trying to keep his fingernails clean...

মানুষ :... রোজ সকালে উনি সেতারে টোড়ি-রামকেলি-ভৈরবী রাগ বাজাতেন, যেন মার্গসঙ্গীতের স্রোতস্বিনী ধারায় উনি হাত ধুতেন। (সেতার বাজানোর ভঙ্গি করেন) যেন সেতারের তার দিয়ে নখের ময়লা পরিষ্কার করতেন...

'সংস্কৃতি অনুবাদের' অসুবিধেটিকে কুশলী অনুবাদক এড়িয়ে গেলেন বাদ্যযন্ত্রটি বদলে দিয়ে এবং একটি যতিচিহ্নের স্থানবদল ঘটিয়ে। ইংরেজিতে বন্ধনীর মধ্যে মঞ্চনির্দেশ আছে 'pretends to be palying the piano' আর তারপরে আছে একটি comma চিহ্ন- বাংলায় 'উনি হাত ধুতেন'-এর পরে দাঁড়ি চিহ্ন বসিয়ে বন্ধনীর মধ্যে মঞ্চনির্দেশ দেয়া হলো 'সেতার বাজানোর ভঙ্গি করেন'। ফলে, পিয়ানো বাজানোর সময় মণিবন্ধ থেকে ভেঙে দুই হাতের পাতা এবং আঙ্গুলগুলির ব্যবহারের যে-ছবিটা finger-bowl এ আলতো করে আঙ্গুল ডুবিয়ে হাত ধোওয়ার ছবির সঙ্গে মিলে যাবার কথা, সেই মিলিয়ে দেয়াটাই তিনি ঘটালেন হাতের আঙ্গুলের সেতারের তার বেয়ে কেবলই ওপর নিচ করবার ছবির সাহায্যে সেতারের তার দিয়ে আঙ্গুলের নখ পরিষ্কার করবার চেষ্টার ছবি তৈরী করে।

কিন্তু, ভাষান্তরের এইসব চুলচেরা বিচার নিয়ে আরও বিশদ হবার মতো পরিসর নেই। থাকলে, আগ্রহোদ্দীপক আরও কিছু প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করা যেতো।

আমাদের গৌরবময় নাট্য-প্রযোজনার ইতিহাসে 'শেষ সাক্ষাৎকার' একটি উজ্জ্বল সংযোজন। বহুদিন ধরে বহু মানুষ এই প্রযোজনা দেখে ভাবিত হয়েছেন-মুগ্ধ হয়েছেন এবং সেটাই এক সংস্কৃতির নাটক থেকে অন্য এক সংস্কৃতির নাটকে পুনর্গ্রহণের শেষ বিচার।

"গোত্রহীন"
"A view from the Bridge" -এর নিয়তি নির্দিষ্ট সার্থক পরিণতি

কুন্তল মুখোপাধ্যায়

আর্থার মিলারের ১৯৫৫ সালে লেখা "এ্যা ভিউ ফ্রম দি ব্রিজ" (A view from the Bridge) নাটকের রূপান্তর "গোত্রহীন"। ১৯৮৩ সালে টেনেসি উইলিয়ামস্-এর মৃত্যুর পর আর্থার মিলার (জন্ম ১৯১৫) আমেরিকান থিয়েটারের সবচাইতে বেশি আলোচিত এবং উল্লেখযোগ্য নাট্যকার রূপে পরিগণিত হন। একজন সাধারণ শ্রমিক শ্রেণীর মানুষের জীবনের বিয়োগান্ত পরিণতিই নাটকের মূল উপজীব্য। আইনবহির্ভূত অনুপ্রবেশকারী এবং Rodolpho'র উপস্থিতি বিষয়ে সম্প্রদায়ের নীরবতা রক্ষার বিধিভঙ্গের দায়ে নাট্যকার মুখ্য চরিত্র Eddie-র মৃত্যুর করুণ পরিণতির গল্প নিয়ে এই নাট্যকাহিনী গড়ে উঠেছে। এর আগে মিলার তাঁর "Death of a salesman" নাটকে Realism এবং Expressionism-এর মধ্যে এক অদ্ভুত মেলবন্ধন ঘটিয়েছিলেন। কিন্তু এই নাটকে তিনি প্রথম একজন Narmalon-কে ব্যবহার করে একধরণের নৈব্যক্তিক ধাঁচে দর্শকের কাছে কাহিনী ও বিষয়বস্তুর সমস্যাকে সরাসরি হাজির করলেন। লক্ষণীয়, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তও "ফেরিওয়ালার মৃত্যুর" "Death of a salesman" উপর আবার আর্থার মিলারকেই বেছে নিলেন তাঁর দলের নাট্যপ্রযোজনার জন্য, রূপান্তর ঘটালেন "A view from The Bridge" — "গোত্রহীন"। ইংরেজী জানা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালির নাট্যচর্চায় বেশিরভাগ সময়েই ব্রিটিশ, ফরাসী, স্প্যানিশ, ও জার্মান নাট্যকাররা সমাদৃত হয়েছেন আমেরিকান নাট্যকারদের মধ্যে ইউজিন ওনিল ছাড়া সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়েছেন আর্থার মিলার। All my sons অবলম্বনে 'জ্যেষ্ঠপুত্র, "The Prince" অবলম্বনে নিলাম-নীলাম, "Death of a Salesman""জনৈকের মৃত্যু" ও "ফেরিওয়ালর মৃত্যু" এবং "A view form the Bridge" অবলম্বনে "গোত্রহীন"। আর্থার মিলারকেই কেন বারবার বেছে নিয়েছেন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী বাঙালি নাট্যশিল্পীরা? আর্থার মিলারের নাটকগুলির মধ্যে এমন কী নাট্যগুণ আছে, যা আকর্ষণ করেছে অসীম চক্রবর্তী, তরুণ মুখোপাধ্যায়, অসিত মুখোপাধ্যায় ও রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তকে! পাশ্চাত্য জগতে, বিশেষ করে আমেরিকায় ত্রিশের দশকের মন্দা এক ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল সাহিত্য নাটক ও শিল্পকর্মে। বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সংকটে জড়িয়ে পড়েছিল ধনতান্ত্রিক আমেরিকা। ইতিহাস অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে মূলত চাহিদার অতিরিক্ত উপাদানই এই অর্থনৈতিক সংকটের কারণ ছিল।

অবিক্রিত শিল্প ও কৃষিজাত পণ্য গুদামজাত হয়ে পড়ায় ও মাত্রাতিরিক্ত উৎপাদন হওয়ায় বিক্রেতা ও ব্যবসায়ীর কাছে পণ্য সঞ্চিত হতে থাকে। ঘটে অর্থনৈতিক মন্দা। সংকটের মূল কারণ ভোগ্যপণ্য কেনার ক্ষমতার অভাব। বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলে, জানা যায় যে পণ্য উৎপাদন যেখানে লাভের জন্য হয়, সেখানে ক্রেতা উপযুক্ত লাভের ভিত্তিতে মূল্য দিতে অপারগ হলে পণ্য বিক্রি হয় না। ফলে বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও উন্নতির মূলে উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও এবং মানুষের চাহিদা ও প্রয়োজন থাকলেও "লাভ ও লোভ" পণ্যবিক্রয়ের মূল্য নির্ধারণ করে এবং সেই মূল্য ক্রেতার ক্রয়ক্ষমতা থেকে অধিক হলে পণ্য বিক্রি হয় না। ১৯২৯ সালে এই পরিস্থিতি চরম আর্থিক সংকটের সৃষ্টি করেছিল। কলকারখানার দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই আর্থিক সংকটের অভিজ্ঞতার নিরিখে তৈরি হয়েছে আর্থার মিলারের ন্যাট্যমন। ১৯৪৭-এ "All my sons" ১৯৪৯-এ "Death of a salesman" এবং ১৯৫৫-এ "A view from the Bridge"; ১৯৬৮ "The Prince" প্রত্যেকটি নাটকেই কোনও না কোনওভাবে এই আর্থিক সংকট ছায়াপাত করেছে। ব্যক্তি মানুষের কীভাবে সামাজিক-অর্থনৈতিক সমস্যার সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে পড়ে, সমষ্টির সংকট কীভাবে ব্যক্তির একান্ত ব্যক্তিগত সংকট, তার মানবিক কল্যাণের অনুঘটক রূপে উদ্ভূত হয়, এই প্রেক্ষাপটেই রচিত হয়েছে আর্থার মিলারের আলোচ্য নাটকগুলি। সুতরাং বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিক বস্তুবাদী দর্শনের সঙ্গে সমধিক পরিচিত পঞ্চাশ-ষাটের দশকে বেড়ে ওঠা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালি নাট্যশিল্পীর মননে আর্থার মিলার যে গভীরভাবে রেখাপাত করবেন, তাতে আর আশ্চর্য কী? "A view from the Bridge" নাটকের প্রকৃতি বর্ণনায় আর্থার মিলারের মনন ও চিন্তনের ব্যাখ্যায় বিদেশি সমালোচকরা বলেছিলেন, (গোত্রহীন) নাটকে সালেক আহমেদ খান (মূল নাটকের Eddie), শাহীন (Catherine), জয়নাব (Betrrice) এবং এনায়েৎ আলি মনু (Manco)ও হেদায়েৎ আলি নীলু (Rodolpho)র ব্যক্তিগত পাপ অপবাধবোধ, মানসিক বিকলন এবং খিদিরপুর পোর্ট এরিয়ার সামাজিক অবক্ষয়ের পরিবেশ একে অপরের পরিপূরক হয়ে উঠেছে। বাস্তব উপস্থাপিত হয়েছে জীবন্ত বাস্তবের প্রেক্ষাপটে। নাট্যপাঠে বা নাট্যদর্শনে গোত্রহীনকে কখনোই তাই বাস্তবোর্ধ্ব মনে হয় না। পোর্ট এরিয়ায় কোনও এক রাস্তা এবং কোনও টে ন্যান্ট বিল্ডিঙের একটি ফ্ল্যাটের সামনের অংশে নাটক শুরু হয়। মঞ্চসজ্জার বিবরণে এক জাহাজীর বসার ঘর এবং জাহাজঘাটার আভাস ছড়ানো-ছেটানো। নাটকে প্রথমে কথা বলেন গ্রন্থকার মহম্মদ হারুণ-উকীল (Albieni), পঞ্চাশোর্ধ্ব রসবোধ আছে, অল্পে ভাবনা-চিন্তার অভ্যাস। রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তর সৃষ্ট খোন্দকার মহম্মদ হারুণ বা আর্থার মিলারের Albieni অনেকটা এলিজাবেথিয়ান নাটকের "Solitory"র কায়দায় নাটকের প্রেক্ষাপট বর্ণনা শুরু করে। ক্রমে ক্রমে সালেক আহমেদ্ খানের বসার খাবার ঘরে সালেক -শাহীন-জয়নাবের কথাবার্তায় তাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও সামাজিক পরিবেশ-পরিস্থিতির সঙ্গে আমরা পরিচিত হয়ে উঠি সালেক-শাহীন-জয়নাবের জীবনের আর্থিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক দারিদ্রের সর্বভুক সম্পর্কের আর একটি দিক উন্মোচিত হয়। তৌফিকের (Tony) সাথে যখনই মনু (Manco) এবং নীলু (Rodolpho) বেআইনি ভাবে বাংলাদেশ থেকে সালেক-খানের বাড়িতে প্রবেশ করে। সালেক-শাহীন-জয়নাবের আপাত কঠিন নিস্তরঙ্গ জীবনে মনু এবং নীলু সমুদ্রের উদাসীন গভীরতা ও উদ্দামতায়

ভরা এক অজানা কৌতূহলী দিগন্তের দিশা উন্মোচন করে। জাহাজী জীবনের অভিজ্ঞতা যে সালেক তার বিবি জয়নাব ও কন্যাসমা শাহীনকে বলে, "সকল মানুষই মানুষ হয় না" "হুঁশিয়ার না থাকলে লোকে তারে কাঁচা চিবাইবে" সেই হুঁশিয়ারির বিপজ্জনক জোরেই না কী অন্য এক গভীর মনোবিকলনের ফলে ক্রমশই মাঝ সমুদ্রের দূরে-দূরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা জাহাজের মতো সম্পর্ক তৈরি হয় সালেক-শাহীন-জয়নাবের মধ্যে। পারস্পরিক বিশ্বাসের ভিতে ফাটল ধরে। ট্র্যাজেডির নায়কের মতো সালেক আহমেদ খানের জীবনে "নিয়তি" এসে হাজির হয়। নীলুর আপাত উচ্ছৃঙ্খল জীবনচর্চা, শাহীনের সঙ্গে তার মেলা-মেশা, নীলুর চারিত্রিক লঘু বৈশিষ্ট্য সালেককে ক্রমশই সন্দিগ্ধ করে তোলে। সালেক নীলুকে বুঝতে পারে না। নীলুর আচার-আচরণে সালেকের মনে দ্বন্দ্ব জাগে। নীলু কি "ফরিস্‌তা? নাকি এ্যাট্টা বাচ্চা? নাকি সে এ্যাক মাইয়া মানুষ," শাহীনের সঙ্গে তার মেলা-মেশা প্রস্তাবিত শাদী বন্ধ করতে সে আইনের সাহায্য চায়। হারুণ বলে, আইন দিয়ে শাহীন-নীলুর সম্পর্ক বন্ধ করা যাবে না। তবে মনু বা নীলু বেআইনিভাবে ভারতে প্রবেশ করায় সালেক ইমিগ্রেশনে রিপোর্ট করলে, নীলুকে শাহীনের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া যায়। সম্প্রদায়ের সাথে, আপন আত্মীয়ের সাথে বেইমানি; সততা ও বিশ্বাসের প্রতি আস্থা হারানোর ভয়ে সালেক প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে—"হায় খোদা! না না না...আমি সেইসব কিছু ভাবি নাই"।

আপাত সরল বিশ্বাসের প্রতিমূর্তি সালেক মুহূর্মুহু ভেতর ও বাইরের চাপে ক্রমশই দিশাহারা হয়ে পড়ে। শাহীন যখন নীলুকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত জানায়, তখন একধরনের "Loss of Possession"-এর তাড়নায় সালেক ইমিগ্রেশন অফিসে মনু আর নীলুর বেআইনি অনুপ্রবেশের ঘটনা জানিয়ে দেয়। জয়নাব বা শাহীনের মনু-নীলুকে বাঁচানোর চেষ্টা সত্ত্বেও ইমিগ্রেশন অফিসের লোকেরা ওদের ধরে নিয়ে যায়। একটা নাটকীয় পরিস্থিতি তৈরি হয়। হঠাৎ দলছুট এনায়েৎ ঘরে ঢুকে পড়ে। সে সালেকের মুখোমুখি। জয়নাব এবং প্রথম অফিসার দৌড়ে আসে। কিন্তু তার আগেই এনায়েৎ সালেকের মুখে থুতু দিয়ে দিয়েছে। ওদিকে শাহীন চাতাল বেয়ে দৌড়ে নীলুর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মানব সম্পর্কের এক জটিল-ভয়াবহ অথচ প্রেমময় রূপ ফুটে ওঠে এই নাট্যমুহূর্তে। উকিল হারুণের মধ্যস্থতায় শাহীন-নীলু বিয়ে করবে, এবং বিয়ে করলে নীলু ভারতীয় নাগরিক হয়ে যাবে। এই শর্তে নীলু-মনুর জামিন হয়। নীলু-শাহীনের বিয়ের পূর্ব মুহূর্তে এই বিয়েতে সালেকের অনুমতি চায় জয়নাব। সালেক তখনও গোঁ ধরে বসে থাকে মনুকে তার কাছে ক্ষমা চেয়ে তার ইমান ফিরিয়ে দিতে হবে। জয়নাব অতর্কিতে (অসতর্ক) সালেকের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলে সালেক আসলে শাহীনকে কামনা করে, তাই নীলু-শাহীনের বিয়েতে বুঝি তার আপত্তি। আতঙ্কে-যন্ত্রণায় সালেক চিৎকার করে ওঠে। তার এত সাধের সংসারে বিশ্বাসের ভিতটা চুরমার হয়ে যায়। নিজের মাথা চেপে ধরে সালেক নিঃশব্দে (সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতার লাইনের মতো "সরল বিশ্বাস তুমি হারিয়ে যেও না") অনুচ্চারিত ভাষায় অন্তরের ব্যথায় গুমরে ওঠে। এমন সময় নিয়তি নির্দিষ্টভাবে সেখানে হাজির হয় মনু। ক্রোধে অন্ধ সালেক ঝাঁপিয়ে পড়ে মনুর ওপর। কিন্তু মনুর হাতেই তার মৃত্যু হয়। নাটকের শেষে হারুণের কথায় যেন এক দার্শনিকের জীবন-বোধে প্রকাশিত হয়—"বিবৃতি কি করে এত পবিত্র এত সরল হতে পারে।" গোটা নাটকের মধ্যেই আর্থার মিলারের "Perversely pune" একটা ছবি আঁকতে চেয়েছেন,

রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত এবং তার থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হননি। "গোত্রহীন" নাটকের বিশিষ্টতা এখানেই। যেসব পাঠক আর্থার মিলারের "A view from the Bridge" পড়েছেন "গোত্রহীন" নাট্যপাঠের সময় তাঁদের মূল নাট্যের বাংলা পাঠ বলেই মনে হবে। বাংলাদেশ-ভারতবর্ষের আরও বিশেষভাবে খিদিরপুর পোর্ট অঞ্চলের পরিবেশ-প্রেক্ষাপটটির অনন্যতা ছাড়া মূল নাট্যভাবনার কোনও ব্যতিক্রম ঘটেনি "গোত্রহীনে"। আর্থার মিলারের জীবনবোধ, অর্থনৈতিক মন্দা বা বিপর্যয়ের সময়েই তাঁর বেড়ে ওঠা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, তাঁর জাতিসত্ত্বাগত ঐতিহ্য, নৈতিকতা ও সামাজিক সম্পর্কের জটিলতার বদ্ধ ব্যক্তিকে নিয়ে, সেই ব্যক্তির সংকট নিয়ে নাট্যরচনায় তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছে। তাঁর নাটকের Eddie ভালোয় মন্দয়, সাদা-কালোয় একটি সম্পূর্ণ মানুষ। সমালোচকদের ভাষায়, "A view from the Bridge presents" Common men" as Protagonists, but each is "common" only in socio-economic sense, man each in conceived in psychological depth." Eddie বা সালেক হয়ত সনাতনী ট্র্যাজিক হিরোর মতো "high degree" থেকে উদ্ভূত নয়। হয়ত তাদের আপাত সামাজিক মর্যাদা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে, কিন্তু এইসব সাধারণ মানুষের জীবনের ট্র্যাজেডির করুণ পরিণতি কি সত্যিই সৃষ্টি হয় না। রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত অবিভাজিত কমিউনিস্ট পার্টির কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সম্পাদক ছিলেন। বাঙালি জীবনে বাস্তুহারা-উদ্বাস্তু সমস্যা তাঁর পরিচিত। কলকাতার নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের দৈনন্দিন জীবনের কলহ-দ্বন্দ্ব-প্রেম-প্রীতির মধ্যেই তিনি বড় হয়ে উঠেছেন। ৭০-এর দশকের নকশাল মুক্তিসংগ্রাম এবং মুক্তি-যুদ্ধ-এর অভিজ্ঞতায় অভিজ্ঞ তিনি। সাম্প্রতিক অতীতের অবক্ষয় থেকে আজ পর্যন্ত বাংলাদেশী অনুপ্রবেশের হাল-হকিকৎ সবই তাঁর জানা। ধনতন্ত্রের অবক্ষয়জাত নিম্ন মধ্যবিত্তের জীবন সমস্যা, জীবনবোধ, জীবন-মৃত্যুর মাঝখানেও" "কান্না-হাসির দোলদোলা" "তাঁর রক্তমজ্জায় মিশে রয়েছে। আর্থার মিলারের "A view form the Bridge"-এর সার্থক বাংলা রূপান্তর রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তের কলমে বিচ্ছুরিত হওয়াটাই বুঝিবা তাই নিয়তি নির্দিষ্ট সার্থক পরিণতি।

ফেরিওয়ালা'র রূপকার

দেবাশিস রায় চৌধুরী

রূপান্তর ও প্রযোজনা নিয়ে স্বল্পবিস্তর মতামত প্রকাশ করার আগে যে কথাটা আমার বিশেষভাবে বলা প্রয়োজন তা হল, আমি সেইসব সৌভাগ্যবানদের মধ্যে একজন যারা জীবনে তাঁর ছাত্র হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম। আমার প্রিয় মাস্টারমশাই রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত। জীবনের সর্বক্ষেত্রে এমন অনায়াস বিচরণ—আমি খুব কম মানুষের মধ্যে দেখেছি। শুনেছি শৈশবে ভাল ক্রিকেট খেলোয়াড় ছিলেন শুধু তাই নয়, খেলার সমস্ত ক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন স্বয়ং সম্পূর্ণ, তেমনি থিয়েটারে এসেও হেন বিভাগ নেই যা তিনি জানেন না। যদিও খুব সাদামাটা উদাহরণ মনে পড়ছে আমার, তবু আমার কাছে এ এক শিক্ষা। একদিন আকাদেমীতে থিয়েটার দেখে শেষে দেখা করতে এসেছেন গ্রীণরুমে, সে সময়টা সম্ভবতঃ গরমকাল। বললেন—পাখাটা চললে ভাল হয়। ব্যাস, সবার গালে হাত, কে ঘন্টিটা বাঁধবে অর্থাৎ দায়িত্বটা নেবে। তেমন বুঝতে পারলেন তিনি, বলে দিলেন কোন সুইজে হাত দিলে পাখা চলতে শুরু করবে। সেদিন আকাদেমীতে দীর্ঘদিন অভিনয়ের অভিজ্ঞতায় অহংকারী মানুষগুলোর লজ্জিত হওয়া ছাড়া কোন উপায় ছিল না। তখন মনে হয়েছিল, জীবনে এইভাবেই শিক্ষানবিস হতে হয়। একবার গুসকরায় তাঁর সঙ্গে রাত্রিযাপনের সুযোগ ঘটেছিল, সেবার নান্দীকারের গুসকরায় 'খড়ির গণ্ডি' নাটকের অভিনয় আর সকালে এক প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ডের এক সভায় বক্তৃতা দেওয়ার কথা তাঁর। সে সময়ে আবার নান্দীকারে তার নতুন প্রযোজনা বার্টোল্ট ব্রেখটের 'ব্যতিক্রম' নাটকটির প্রস্তুতি চলছে। রাত্তিরে খাওয়া দাওয়া সেরে বললেন—স্ক্রীপ্টটা পড়ো, আমি কম্পোজিশানগুলো ভাবতে থাকি। বেশ অনেক রাত পর্যন্ত কাজটা চলল, সকালে উঠে বক্তৃতা এবং সন্ধেবেলায় অভিনয়, সর্বত্রই সহজ, সাবলীল—এক প্রাজ্ঞ মানুষের ভূমিকায়। আমার জীবনে এও এক অভিজ্ঞতা।

এবার নাটকের কথায় আসি

"I still feel........kind of temporary about myself." He is a little boat woking for a harbour. Do not there expressions of personal helplessness and sympathetic understanding underline our common experiences at perticular points at time, we look before and after, and pine for what is not: we also live in the past clouded by dreams and haunted by nightmares, our salesmanship loses its edge with time and this despite

inner reintance, tells us that our value in the market has fallen. We realise it, but cannot accept it early."

উদ্ধৃতিটি নতুন দিল্লীতে নান্দীকার প্রযোজিত 'ফেরিওয়ালার মৃত্যু' নাটকের অভিনয়ের সমালোচনার অংশ বিশেষ (The statesmen, New Delhi 28.4.2000)

আর্থার মিলারের ডেথ অফ এ সেলসম্যান নাটকের রূপান্তরিত প্রযোজনা 'ফেরিওয়ালার মৃত্যু'— এমনই এক উপস্থাপনা যা দেখার জন্য থিয়েটারপ্রেমী দর্শককে অপেক্ষা করতে হয় অনেকদিন। প্রযোজক নান্দীকার, রূপান্তর ও নির্দেশনা রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত। নাটকের প্রাথমিক পর্বে অবশ্য দেবাশিস মজুমদার রূপান্তরের কাজটি করেন, নিজের মতো করে, নাটকটিকে সাজানোর প্রক্রিয়ার খোল-নলচে বদলে যায় তাঁর হাতে। যদিও তিনি স্বীকার করেছেন—নাটকটির বর্তমান রূপটি আমার, যার ভিত্তি দেবাশিস-এর করে দেওয়া; তার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। 'ফেরিওয়ালার মৃত্যু' প্রথম অভিনয়ের সময়ে আমাদের নাট্যচর্চায় আশার বীজ বপনের ছবি নাট্যের, পরিণতিতে আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম। তা সত্ত্বেও আর্থার মিলার-এর নাটক নিয়েও কাজ হয়েছে এবং হচ্ছিল ও — যাঁর রচনায় আমরা কেমন যেন সময়ের অন্ধকারকে পাথরের মত চেপে বসতে দেখি। কেন না, মিলার বিশ্বাস করতেন— by an act of will man can and has changed the world. । রূপান্তরের কাজেও রুদ্রপ্রসাদ মিলারের প্রতি সশ্রদ্ধ থেকেই সাম্প্রতিক প্রেক্ষাপটে তার উপস্থাপনা করেছিলেন।

১৯৪৯ সালে ডেথ অফ আ সেলসম্যান (প্রথমে আর্থার মিলার নাটকটির নাম দিয়েছিলেন দ্য ইনসাইড অফ হিজ হেড') নাটকটি প্রকাশিত হয় এবং ঐ বছরেই আমেরিকার গ্রুপ অ্যাক্টররা এলিয়া কাজানের নির্দেশনায় নাটকটি মঞ্চস্থ করে সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন। এমনকি এর বেশ কয়েক বছর পরে লন্ডনে যখন নেপথ্য কর্মীদের কর্ম বিরতি চলছে ন্যাশনাল থিয়েটারে, সেইসময়ে বিশিষ্ট নির্দেশক 'পিটার হল' নাটকটির অভিনয়ের আয়োজন করে থিয়েটারে দর্শকদের আবার থিয়েটারমুখী করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আমাদের বাংলা থিয়েটারে ও ১৯৬৫ সালে যেমন সাধন মৈত্রের রূপান্তর ও অসীম চক্রবর্তীর নির্দেশনায় এই নাটকটি অভিনীত হয় যার নাম 'জনৈকের মৃত্যু'— খুবই জনপ্রিয় প্রযোজনা, তেমনি রূপ ও অরূপ নামে একটি সংস্থা এই নাটকটির অভিনয় করেন।

তারপর ১৯৯৩—তে নান্দীকার নাটকটির প্রযোজনা করেন। একেবারে অন্য উপস্থাপনা, এমন কি রুদ্রপ্রসাদের মৌলিক নির্মাণধর্মিতায় অতীতের প্রযোজনাগুলি নিয়ে ভাবার কোন সুযোগই ঘটে না।

আর্থার মিলারের সেলস্‌ম্যান এখানে কলকাতারই এক ফেরিওয়ালা। এ নাটকে অমলকান্তি কি ফেরি করে তা জানা যায় না, তবে বোঝা যায় তার স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তবের কোথাও একটা দূরত্ব বাড়তেই থাকে। অমলকান্তি তার নিজের স্ত্রী এবং সন্তানদের অবিশ্বাসী চোখের সামনে অন্ধকার থেকে উঠে আবার ব্যর্থ চেষ্টা করে। অমলকান্তি জানে না ফেরিওয়ালার স্বপ্ন দেখাতে হয়, দেখতে নেই। অমলকান্তি কংক্রীটের জঙ্গলে বীজ বুনতে চাইত কেবলই । এই প্রতিযোগী বাজারে অমলকান্তি তাই না-বিকোনো লোকসানের ফসল। অমলকান্তি আহাম্মকের মতো এখনও রোদ্দুর হতে চায়।

সত্যজিৎ রায় এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন নতুন ছবি করতে ইচ্ছুক পরিচালকদের

অবশ্যই বিভুতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় পড়া উচিত—যাঁরা বিভুতিভূষণ পড়েছেন তাঁরা নিশ্চয়ই একথার যথার্থতা খুঁজে পাবেন। তেমনি একটা কথা মানতেই হবে অভিনেতা, নির্দেশক যখন নাটককার বা অনুবাদক হবেন তখন সেই অনুবাদ, রূপান্তর বা তাঁর নাটকও একেবারে ভিন্নরূপে রচিত হবে যা নাটকে নতুন অভিনেতা ও পরিচালকের কাছে হবে এক নতুন পাঠ—যা তাঁকে শুধু অনুপ্রাণিত করবে না, করবে সমৃদ্ধ।

নাটকটির শুরুর কয়েকটি লাইন ব্যবহার করার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না।

।। **প্রথম অঙ্ক**।।

হাল্কা বাঁশির সুর...মিষ্টি সুন্দর। যে সুরে ঘাস, গাছ দিগন্তের অনুষঙ্গ। পর্দা ওঠে।...

বাড়ির তিনদিক ঘিরে রয়েছে ঢাউস এ্যাপার্টমেন্ট হাউসের ঝাঁক। যেন খাঁচায় আটকে ফেলেছে সেলস্‌ম্যানের বাড়িটাকে। তিনপাশে রক্তিম আলোর আভা। শুধু এ বাড়িতেই আকাশের আলো-সামনের দিক থেকে আসা।...

আবার অমলকান্তির স্ত্রী পার্বতী কেমন—পার্বতী, অমলের স্ত্রী—যেখানেই থাকুক, সামান্যতম শব্দেও স্বামীর উপস্থিতি টের পায়। স্বামীর প্রতি তার অনুভব, স্বামীর সহজাত অব্যবস্থচিত্ততা, তার মেজাজ, তার ছোট ছোট নির্দয়তা, তার স্বপ্নের বিশালত্ব—এসবই পার্বতীর কাছে অমলের গভীরতম অস্থির তীব্রতার চিহ্নস্বরূপ। এই তীব্র আকাঙ্খা তাকে নাড়া দেয়, সহানুভবী করে, কিন্তু চরিত্রগত কারণে এগুলি অস্পর্শিত অনুচ্চারিত থেকে যায়।

আমরা দেখতে পাচ্ছি একই সঙ্গে আবহ, মঞ্চ, আলো এবং চরিত্রের ব্যাখ্যা। এতো তেমন মানুষের পক্ষেই সম্ভব যাঁর এই সমস্ত বিভাগেই অনায়াস বিচরণ।

নাটকটি ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে যেমন অভিনীত হয়েছে তেমনি নান্দীকার আয়োজিত দশম জাতীয় নাট্যমেলায়। কিছুদিন বিশ্বরূপা মঞ্চেও পেশাদারভাবে অভিনীত হয়েছে, নাটকটি শিরোমণি পুরস্কারের সম্মানও পেয়েছে। খালেদ চৌধুরীর মঞ্চসজ্জা, তাপস সেনের পরিকল্পনায় আশোক প্রামাণিকের আলো ও স্বাতীলেখা সেনগুপ্তের আবহ প্রয়োজনাটিতে অন্য মাত্রা এনে দিয়েছে। নিঃসন্দেহে ' ফেরিওয়ালার মৃত্যু' এক ব্যাতিক্রমী রচনা ও উপস্থাপনা।

র‍্যামপার্ট থেকে

তীর্থঙ্কর চন্দ

[নাট্যশিক্ষার্থী হিসাবে যে সব নাটক ও নাট্যপ্রযোজনা বহু পাঠে এবং দর্শনে কখনই প্রাচীন বলে মনে হয় না, তেমন গোটা দুই-তিনের মধ্যে 'ফুটবল' একটি। প্রচুর বিদেশী নাটক সম্পর্কে যথোচিত বিস্তার না থাকায় মূল নাটকের একটি তুলনামূলক আলোচনা আলোচকের ক্ষমতার বাইরে। তাহলে দায়িত্ব না নেওয়ার প্রশ্ন ওঠাই স্বাভাবিক। কিন্তু পাঠ এবং প্রযোজনা প্রদর্শনের সময় যে আনন্দ মিশ্রিত বেদনা ভেতরে জেগে ওঠে তাতেই সম্ভবত একটা প্রমাণ হয় যে পাঠক (এবং দর্শক)-এর কাছে এই শিল্পকর্মটি কতটা জায়গা জুড়ে রয়েছে। সেই অনুভূতি-স্থান থেকে সাহস সঞ্চয় করেই কিছু কথা বলা।]

কোনো প্রযোজনা দেখার পর তার টেকস্ট নিয়ে আলোচনা যথেষ্ট কঠিন বলেই মনে হয়। উপস্থাপনার সময় টেক্স্টের সর্বাঙ্গ জুড়ে থাকে নানা চিত্রময়তা নানা বর্ণ ধ্বনির সমাবেশ। নাটক পাঠের সময় সেই সুসজ্জিত রূপ বারবার সামনে এসে দাঁড়ায়। প্রভাবিত করে। তখন সেই লিখিত বাণীর নিরাভরন রূপানুসন্ধান বিপথগামী হয়ে পড়ে প্রতি মুহূর্তে। আর সেই প্রযোজনা যদি 'ফুটবল' এর মতো এমন একটি অসামান্য নাট্যঘটনা হয়, যার মোহমুগ্ধতার সামনে নিস্পৃহ থাকা, জানি না, কতখানি ঋষিত্ব দাবি করে।

গোড়াতেই একটি কথা বলা আবশ্যক। সীমিত ক্ষমতায় নাটকই এখানে আলোচ্য হিসাবে ধরে নেওয়া হবে, নাট্য নয়। যদিও প্রসঙ্গক্রমে প্রযোজনার কথা দু-একবার এসে যাবে কিন্তু তা-ও ঐ নাটক আলোচনারই সাহায্য হিসাবে এবং খুবই সংক্ষিপ্ত হবে তার অনুপ্রবেশ। টেক্স্ট হিসাবে বহুরূপী পত্রিকায় প্রকাশিত নাটকটিই বিবেচিত এবং প্রযোজনা সম্পর্কেও প্রথম দিককার ১৯৭৭-৭৮ সালের মঞ্চায়নই উল্লেখ করা হয়েছে বলে ধরে নেবেন। নান্দীকার 'ফুটবল'নাটক মঞ্চস্থ করেন মোট তিনবার ১৯৭৭, ১৯৮৬ এবং ২০০১ সালে। বলা বাহুল্য, প্রত্যেকবারের প্রযোজনাতেই ভেতরের কাঠামো ঠিক রেখে উপরের রং মাটি পাল্টেছে সঙ্গত কারনেই—রূপসজ্জা হয়েছে ভিন্নতর। আমরা কিন্তু আলোচনায় ঐ অগ্রবর্ত্তী বাহিনীরই অনুসারী।

১৯৬৭ সালে পিটার টার্সন যখন ব্রিটেনের ন্যাশনাল ইয়ুথ থিয়েটারের জন্য ফুটবলকে কেন্দ্র করে একটি নাটক লেখার 'কমিশন' পান, তখন শুধু ব্রিটেন নয়, সমস্ত, পৃথিবী জুড়েই চলছিল ছাত্র-যুবদের আন্দোলন(১)। বিশেষত, আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম ও চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব বিশ্বের যুব-ছাত্র সমাজকে মাতিয়ে রেখেছিল। সেই উম্মাদনা-ব্যাখ্যা আজ যে-রূপই পাক না কেন, তখন তাকে অস্বীকার করার ক্ষমতা

খুব কম মানুষেরই ছিল। লন্ডনের বুকেও দেখা দিয়েছিল আমেরিকার ভিয়েৎনাম আগ্রসনের বিরুদ্ধে বিশাল মিছিল। সামনে ছিলেন যুব -ছাত্ররাই। 'ফুটবল' উন্মাদনা ব্রিটেনের সুপ্রাচীন সংস্কৃতি কিন্তু তখন ঐ উন্মাদনা প্রায় চূড়ান্ত জায়গায় চলে গিয়েছিল। বলা ভালো, নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তৈরি করা হয় 'স্ট্রিট কর্ণার গ্যাং'।(২) এইসব পরিপ্রেক্ষিত অত্যন্ত গোপনে নিহিত রেখে টার্সন লিখলেন 'Zigger Zagger' - যে নাটকে বারবারই প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে উচ্চারিত হবে, যুবসমাজের সম্মুখবর্তী এক বিরাট শূণ্যতার সংবাদ। — ' মিথ্যা ধর্মচরদের মতো বয়স তাদের হয়নি, অধর্মের বিবেকদংশনও নেই। কোনো সম্বল বা কোনো মূলধন তাদের নেই, কেবল, তারুণ্য ও যৌবনের দুরন্ত কর্মশক্তির সম্বল ছাড়া—'(৩)।

নানা বিচিত্র প্রয়াসে রাষ্ট্রিয় ব্যবস্থায় মুদ্রাস্ফীতির কারণ তৈরি করে যারা, এই তরুণ-যুবকদের সামনে তারাই হাজির করে বিবিধ উপায়ে বুঁদ হয়ে থাকার প্রভূত সম্ভার। তৈরি করা হয় এক 'অনুসমাজ' -যারা অত্যন্ত 'রেজিমেন্টেড'। দলচর। অথচ এর বাইরে তারা ভীরু, পলায়নী মানসিকতা সম্পন্ন কুঁকড়ে থাকা কিছু মানুষ। Zigger Zagger- এর Harry যার প্রতিনিধি। নাট্যটি সেইসময় 'takes London to strom'. বিবিসি থেকে প্রচারিত হয় নাট্যটি, হল্যান্ড এবং জার্মানীর উৎসবে গ্রেট ব্রিটেনের প্রতিনিধিত্ব করে এই নাট্য। শুধু 'সামাজিক দুঃখ দুর্দশা মোচনের, বঞ্চনা আর শোষণের এক অসামান্য মঞ্চ দালিল-ই নয়, নিপীড়িতের তথাকথিত জয় প্রদর্শন না করেই নাটক এবং নাট্য—দুই-ই এমন মাত্রা স্পর্শ করতে পেরেছিল—যার ফলে মাত্র একদশকেই লন্ডন থেকে কলকাতার মঞ্চে তার ঢেউ এসে আছড়ে পড়ে। টার্সনের নাটক সম্পর্কে যেমন বলা হয়,'— Terson's plays...acknowledge the importance of popular elements that include the communal and earthy and can still find in them a real poetry and irony...'(৪)। বিষয়কে মৃত্তিকাস্থিত রেখে আকাশচারী হওয়ার সংগীতময় রূপটি বাংলা রূপান্তরে কতটা প্রতিধ্বনিত —এই দেশীয় বাস্তবতায়—সেটাই আলোচ্য এখন।

আরো একটি বিষয় বলা প্রয়োজন। টার্সন তাঁর এই নাটক রচনাবৃত্তির আগে দশটি বছর শিক্ষকতা কর্মে নিযুক্ত ছিলেন। অনুমান করা সহজ, বড় হয়ে ওঠা শিশু কিশোরদের মনে একটা ধ্বস্ত সমাজব্যবস্থার প্রতিফলন, ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাদের সরব-নীরব মুখরতা এবং অন্যদিকে, সমস্ত সামাজিক অন্যায় অনাচারের প্রতি নীরব থেকে সৎ হতে, সমাজমনস্ক হতে শিক্ষকদের ফাঁপা উপদেশের বাহুল্যও লক্ষ করেছেন পিটার টার্সন। তাঁর এই দর্শন অত্যন্ত সঠিক অর্থেই সহানুভূতিহীন নয় — প্রত্যেকটি চরিত্রের অপরাধ এবং অসহায়তা স্পষ্ট তাঁর কাছে । কোনো চটজলদি রিফর্মেশন নয়, ব্যবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন না ঘটলে যে সমস্ত উপদেশই জলবিম্বসম একথা নাটককার বুঝতেন এবং নাটকে তারই প্রাধান্য দিয়েছেন তবে সেটা পন্ডিতমশাই-এর ধারাভাষ্য পাঠ নয়, তার মধ্যে থাকতো 'real poetry and irony -'। প্রসঙ্গত বলা যায়, ১৯৭৭ সালের কোলকাতায় যেসব নাটক প্রযোজিত হচ্ছিল তার কোনোটাতে সমালোচকরা দেখতে পাচ্ছিলেন, 'melodrama of bloodied corpses'; কোথাও বা 'heavy satire' এর প্রাবল্য, কখনও নাটকে ব্যবহৃত হয়েছে 'tedious little lecture' কিন্তু 'ফুটবল' নাটক....takes the edge of grimness. He (Rudraprasad) avoids

the obvious... এই প্রশংসাবাণী যে পক্ষান্তরে মূল নাটককার পিটার টার্মস -এর প্রতিই বর্ষিত, বলা বাহুল্য।

**

"...In 1977, when I was reading out football to a few of my friends...., they would not agree with me that such awful fanaticism can build up over a game of football. But in a year all over Calcutta, the small non-descript flags were replaced by larger, flashier ones. Reality took over in a big way. In lact, I was like a prophet in a way... .This was not done consciously. It was almost intuitive..."(৫)

পিটার টার্সন-এর নাটক 'Zigger Zagger'-এর রূপান্তরকারী শ্রী রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত-র এই 'ইনট্যুইশ্যান' কোনো দেবঘটিত কৈশোর ও যৌবনের ক্রিয়াকান্ড নয়। শ্রী সেনগুপ্তর বাড়িতে বন্ধুমহলে ছিল মার্কসবাদী ধ্যান ধারনা-পুষ্ট সমাজ বিশ্লেষণের প্রবাহ। চারপাশে তখন মার্কসবাদীদের প্রাধান্য—মাস্‌লে নয়, মস্তিষ্কে। বিশ্ববিদ্যালয়ে সবচেয়ে পড়ুয়া ধীমান ছাত্রেরা এই বিশ্ববীক্ষায় উদ্ভাসিত হবেন—শুধু দু' একটি ব্যতিক্রম ছাড়া। ঘটনাকে কেবল উপর থেকে দেখা নয়, তার নিচে প্রবহমান কার্যকারণ সূত্রগুলিও তাঁদের'unconscious competence '- এ ধৃত ছিল। ১৯৭৭ সালে প্রযোজিত যে নাটক বারবারই আলোচকদের দ্বারা 'social fascism' এর রূপক হিসাবে উদ্ধৃত হয়েছিল, শ্রী সেনগুপ্ত-র অভিজ্ঞ মনন সেই বীজ প্রত্যক্ষ করেছিল সুদক্ষ কর্ষকের দৃষ্টিতে। ফলত যে ফসল পাওয়া গিয়েছিল নাট্যরূপান্তরে এবং প্রযোজনায—তা দীর্ঘদিন সুরক্ষিত থাকবে বাংলা নাট্যখামারে—এটা খুবই স্বাভাবিক। শ্রদ্ধেয় বিজন ভট্টাচার্য যেমন সহজে নাট্যচর্চার মহত্তম কথাটি উচ্চারণ করেন,'অভিনয় শিখতে হয় পথে'—রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত-র শৈশব কৌশোরও বহুরকম সুরে ব্যঞ্জনায় মথিত - তার নির্মান কখনও দমদম এয়ারপোর্টের কোয়াটারে, কখনও দ্বিপ্রহরে প্রায় জনমনুষ্যহীন শ্যামপুকুর পার্কে কতিপয় কর্মহীন বৃদ্ধের আড্ডায়, কখনও চালচুলোহীন বাউন্ডুলে ছেলেদের সঙ্গে চালচুরির অর্থে দ্যূতক্রীড়ায় সম্পন্ন হয়েছিল। ক্রীড়া সাংবাদিক শ্রদ্ধেয় মতি নন্দী যাঁর মধ্যে সবচেয়ে সম্ভাবনাময় দুই ক্রিকেট খেলোয়াড়ের একজনকে দেখতে পেয়েছিলেন তাঁর যৌবনে, সেই সেনগুপ্ত মাঠকে চিনেছিলেন হাতের তালুর মতো; রাজনীতির পঠন পাঠন মনন ছিল তাঁর ঐতিহ্যে—বিচিত্র বর্ণময় চরিত্র সমূহের। জীবন দেখেছেন, জীবন আর ঠিক সেইজন্য 'ফুটবল' নাটকে মাঠ-মাঠের উন্মাদনা—Social fascism-এর তরঙ্গায়িত উপরিস্থ রূপ এ সবই যেন যোগ্য আধার পেয়েছিল। এবং এরপরেও যা বাকি ছিল, সে তাঁর শিক্ষকতার উত্তরাধিকার। —কোলকাতার বেশ কয়েকটি স্কুলে আমার মতন দাড়িওয়ালা এইরকম একটি লোকের ছবি দেখতে পাবে। উনি আমার বাবা। —গর্বের সঙ্গে আবেগায়িত গলায় এই উচ্চারণ তাঁর কণ্ঠে শোনা গেছে অনেকবার। দাদা দিদি অনেকজন। তাঁরা ঘোরাফেরা করেন ঐ শিক্ষার আঙিনায় আর সেইজন্যই ফুটবলের হরি-অমল-যদু-রা ছিল ঐ বাড়ির আলোচ্য বস্তু, তাদের চিন্তায় এঁরা ব্যাথিত, উৎকণ্ঠিত — সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতেন গোপনে স্বতস্ফূর্তভাবে। সেই পরিবেশে রুদ্রপ্রসাদ নিজেও শিক্ষক। তাঁর হাতেই যখন 'ফুটবল' এসে পড়ে তখন মুহূর্তে তিনি সেটাকে

ছুঁড়ে দেন যে কোনো লক্ষে — পাঠক হিসাবে আমরা সেই অচেনা জগতে শিউরে উঠি অথচ শ্রী সেনগুপ্ত সহজতর সবখানে। কেবল হরি পুরকায়স্থকে কেন্দ্র করেই 'ফুটবল'-এর বৃত্তটি আঁকা -গোড়ায় এমনটাই মনে হয়। কিন্তু ধীরে ধীরে প্রত্যেকটি চরিত্র তাদের নিজস্ব যুক্তি বুদ্ধি ক্ষমতা অক্ষমতা দিয়ে গড়ে তোলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য বৃত্ত —এক অখন্ড সৌরজগতের মতো। তারা প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত অথচ তারা একক। এক ভবিষ্যতহীন বিচ্ছিন্নতায় তারা ক্রমাগত ঘুরপাক খায়। তারা প্রত্যেকে 'হাফ বেক্‌ড্', সম্পূর্ণতা পায় না কখনো— পাওয়া সম্ভব ও নয়। তাদের 'চলা যেন বাঁধা আছে অচল শিকলে'। ব্যোমকালী, হরির মাসি, অণিমা, বিনয়, ফণীমামা, হেডমাষ্টারমশাই — আরো আরো সবাই নিজেদের খন্ডজগতে আবদ্ধ। এই আলোচনা নান্দীকার নিজেই করেছিলেন তাঁদের গোড়ার দিককার প্রযোজনার হ্যান্ডবিলে '—হরির কাছে যে মা— সমাজের কাছে সে বেশ্যা- কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে যে এ দুটোর কোনোটাই পুরো নয়। এ ভবিতব্য সবার। হেডমাষ্টারমশাই যখন হরিকে অমানবিকভাবে পেটান তখন হরির জন্য কান্না পায়, আর ছাত্রসমাজের প্রথম বিদ্রোহের প্রকাশে পর্যুদস্ত হেডমাষ্টারমশাই, যখন বলেন -' কেন এমন হয়ে গেলি, তোরা, হরি?' - তখন সেই পন্ডিত মাষ্টারমশাইকেই কেমন নির্বোধ কেমন অসহায় লাগে। বিনয় প্রচন্ড বাস্তববাদী - কবিতা ছেড়েছে প্রাত্যহিকতার দায় মেটাতে— তৃপ্তও সে তাতে; হরির প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিশীল (!) নিজের জায়গা থেকেই, সেই বিনয় হরির ভবিষ্যত নির্মাণে 'হরস্কোপ' দেখার প্রয়োজনীতা উপলব্ধি করে; অণিমা স্বপ্ন ভাঙ্গার পর আবার স্বপ্ন গড়ার অক্ষম প্রচেষ্টায় রেডিওতে কান পাতে —বন্ধনহীন গ্রন্থির পুরোনো পথ আবার খুঁজে নেবার হাস্যকর পরিণতি! কেউই কোনো উপলব্ধিতে পৌঁছায় না — হরি কেবল একটা বায়ুপূর্ণ গোলাকার চামড়ার থলির মতো ছিটকে যায় এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে। এবং যখন একেবারে বাতিল হিসাবে হরি পুরকায়স্থ মাঠের বাইরে, তখন মাঠের কেন্দ্রে এসে যায় যদু — আরেক হরি! 'এ যৌবন জলতরঙ্গ' অনিবার। অবিশ্রাম।

মুহূর্ত ধরে আলোচনায় এগোলে স্বাভাবিকভাবেই স্থান সংক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে। শুধু শিক্ষা ব্যবস্থা আর সমাজের অব্যবস্থার চিত্রটি কতটা সুস্পষ্ট একবার দেখা যাক হরির স্কুলজীবনের বিদায়কালীন দৃশ্যটিতে। হেডমাষ্টারমশাই পরম পিতার কাছে প্রার্থনার জন্য ছাত্রদলকে চালনা করতে ডাকেন অমল-কে। 'অমল' শব্দটি যে শুভ্রতা যে পরিশুদ্ধির বাতাবরণ তৈরি করেছে 'ডাকঘর' নাটকের পর থেকে —সেই ছবির প্রতিফলন দেখতেই প্রস্তুত হই আমরা। অথচ মুহূর্তেই তা চুরমার হয়ে যায়। সে যখন বিনীত ভাবে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে 'আমাদের কন্টকাকীর্ণ পথ তুমি সুগম করো'— তখন হরিরা, চায়,— ' আমাদের লীগ বিজয়ের পথ তুমি সুগম করো।' ওতেই, তাদের মোক্ষ সে-ই তাদের পরম প্রাপ্তি। 'হে বিশ্বপিতা'-র, বদলে'হে সত্যজিত' 'হে পালকপিতা'-র স্থানে 'হে হরজিন্দার'- সদর্পে সামনে এসে দাঁড়ায়। এক সময় এতো শুভ্রতা(!)সহ্য হয় না হরিদের - হরি অমলকে লাথি মারে। কাপুরুষ(!) অমল, ইশারায় হরির কথাই জানিয়ে দেয় হেডমাষ্টারমশাইকে আর আদেশপ্রাপ্ত হয়ে সঙ্গে সঙ্গেই বেত আনতে ছোটে। জন্তুর মতো প্রহৃত হয় হরি। তারপর এক সময় অনুমোদিত হেডমাষ্টারমশাই-এর স্নেহ-সম্ভাষণের প্রত্যুত্তরে স্কুল বাড়িকে 'এই শালার খোঁয়াড়' বলে হিংস্র হয়ে ওঠে ওরা — হেডমাষ্টারমশাইকে মারে। গান ধরে —'মানব না এ বন্ধনে/মানব না এ শৃঙ্খলে/ ছাত্র

জনতার স্বাধীনতা অধিকার' —। সেই অধিকার খর্বের বিরুদ্ধে তাদের সশব্দ জেহাদ। প্রহৃত অপমানিত হেডমাষ্টারমশাই শেষ উপলব্ধিতে পৌঁছোন—'ওয়েস্টড। থার্টি ইয়ারস অব মাই লাইফ — ওয়েস্টেড'। হরিরা ততক্ষণে পৌঁছে গেছে তাদের মাঠে—মুক্ত কণ্ঠে উঠছে গান, — 'ইষ্টবেঙ্গলকে সাপোর্টের অধিকার'—। কোনটা খোঁয়াড়!

আর একটি সংক্ষিপ্ত দৃশ্য। ব্যাকডোর দিয়ে এ্যাপ্রেন্টিস হয়ে ঢুকছে হরি। আগে যারা ঢুকেছিল — কাজ করতে করতে যাদের কোমর ভেঙ্গে গেছে, স্বপ্নের নীল মদ্য নেশাহীন যাদের কাছে, তারা হরি - রই বন্ধু—সব কর্ম-কুকর্মের। অথচ অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াইয়ে এরা একজনকেও এই টেরিটরিতে ঢুকতে দেবে না। 'যতই বন্ধু হও না কেন — তফাৎ যাও'। অত্যন্ত সহজে ডারউইন -এর মূল তত্ত্বকে কলা দেখিয়ে সমাজনিয়ামকেরা কোথায় যে জাল বোনেন বোঝা যায় না—কেবল যৌবনের ছটফটানি আর অস্থিরতা গোঙানি আর কান্না দৃশ্য-শ্রুত হয়। পাঠক হিসাবে আমরা স্তব্ধবাক।

এই হরিরা 'দলের মধ্যে থাকলে ভারী বীর। রাণা প্রতাপ। শেরশাহ। একা-একেকজন নপুংসক। শিখণ্ডী।' - এই উপলব্ধি কেবল প্রধান শিক্ষকেরই নয়। হরিরাও জানে সে কথা। তাই সবসময় দলবদ্ধ- 'দলচর'। তারপর আশ্রয় খোঁজে কোনো ক্ষমতাবানের ছত্রছায়ায়, কিংবা নিজেরাই হয়ে ওঠে মুষ্টিমেয় আশ্রয়দাতা।

লিয়ার নাটকের মুখবন্ধে এডওয়ার্ড বন্ড যেমন লেখেন- "...every child is born with certain biiologial expectations... that it will be born into a world waiting to receive it and that knows how to receive it. But the weight of aggression in our society is so heavy that the unthinkable happens...One way or the other the child soon learns that it is born into a strange world and not the world it evolved for : we are longer born-free..." এই অস্তিত্বের সংকট উপলব্ধি থেকেই আসে ব্যক্তিত্বহীন গোষ্ঠীবদ্ধতার প্রাথমিক ধারনা—চিন্তাহীন বোধহীন এক জনস্রোত— এক গড্ডল গতিবেগ। হ্যাঁ, ১৯৭৭ সালে এই রাজ্যে বিশ্ববীক্ষার আলোয় রক্তবর্ণ জয়ধ্বনি প্রথমবার উড়তে থাকলেও এই মাদকতা ছিল— এমনকী কলকাতার কোনো কোনো অঞ্চলে 'ইষ্টবেঙ্গল-লাল সেলাম' এমন আবেগময় শ্লোগানও শুনেছেন কবি শ্রী উৎপলকুমার বসু! প্রশ্ন উঠেছিল 'মুক্তির মন্দির সোপানতলে'-র স্বরবিন্যাসে কেন গীত হল 'ইস্টবেঙ্গলের গ্যালারী পরে'-? ঐ যে উত্তর। স্বাধীনতার তিরিশ বছরেই সমস্ত আকাঙ্খা স্বপ্নের মুখ প্রাত্যহিকতার কাঠিন্যে ঘষে রক্তবর্ণ হয়ে গেছে। কোনো আর্দশ নেই আর। "ক্ষুদিরাম 'গ্যাস খেয়ে' ফাঁসির দড়িতে পটল তুলেছে- ওর মতো হতে চাইবো কেন, আমি পাগল, না...।" এই শূণ্যস্থানে যে যার মতো শব্দ বসিয়েছে! একটি কাগজ সমালোচনা প্রসঙ্গে (অবশ্যই প্রয়োজনার) লিখেছিল, নাটককার সম্ভবত জানেন না, হরির মাসির মতো এই রকম সহায় সম্বলহীন সব মহিলাই বেশ্যাবৃত্তি গ্রহন করেন, এমনটা নয়, তারা লোকের বাড়িতে বাসন মাজেন, আরও নানা ভদ্র বৃত্তি নেন! 'হায়রে মানুষ, হায়রে দুর্বলতা—এতো যে আছে ভাল কোনখানে ভুলে গেছে সেই কথা' হরির মাসিকে যে করেই হোক নির্মল রাখতে হবে! নাহলে সমাজের মূল অনিবার্য সত্যগুলি যে নিম্নরেখ চিহ্ন নিয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে! শ্রদ্ধেয় সমালোচক দেবাশিস দাশগুপ্ত লিখেছিলেন, — আমরা হাসছিলাম সামনে একটা আয়না ছিল। নিজেদের চেহারা

যে এত কুৎসিৎ আগে কি জানতাম ? 'নদীর, পাড়ে বসে শোভা' দেখা নয়,'নদীর ঘোলা জলে ঝাঁপ দেওয়া। নদীর নাম 'সমকাল'। — আমরাও সেই হেডমাস্টারমশাই -এর মতো হরিদের সাফল্য কামনা করি, অথচ হরিদের সাফল্য যে ওদের উপরে নেই— এটাই বুঝতে পারা(বা বুঝতে চাওয়া) কঠিন হয়ে ওঠে।

বাসস্টপে সাধারণ(!) কিছু মানুষের উপর ব্যোমকালীর দলের অকথ্য অনার্জনীয় ব্যবহার আমাদের মেরুদন্ড দিয়ে ঠান্ডা স্রোত বইয়ে দেয়। নিজেদের নিরপরাধীর তালিকায় রেখে ভাবি, কবে এই জঘন্য প্রবৃত্তি-প্রকাশের অবসান ঘটবে। অথচ এ পাপ আমাদের।"...if the whole regime, even your non-violent ideas are conditioned by a thousand year old oppression, your passivity serves only to place you in the ranks of the oppresors"। (৭) এ সত্য অনস্বীকার্য।

এক সুগভীর শূণ্যতাকে সামনে রেখেই শুরু হয় 'social fascism'- এর ভিত্তি নির্মাণের কাজ। নান্দীকার প্রচারিত হ্যান্ডবিলে ব্যোমকালীর সংলাপ সামান্য পাল্টে নিয়ে বলা হয় — 'শূণ্যতা খুব বেশিক্ষণ টিকে থাকতে পারে না। একটা কিছু তাকে ভরাট করে দেবেই'। হরির জীবনে যেমন আশৈশব মাসি এবং দিদি -যে ইতিহাস আমাদের অনুমান— এরপরে তার ধ্যানজ্ঞান ফুটবল। রাস্তায় মারামারি করতে গিয়ে মাঠ থেকে নির্বাসিত হরির জীবনে আসে প্রেম (!) — সীতা নাম্নী এক কিশোরী—! স্বাভাবিক ভাবেই সীতা একদিন আরও বড় একজনের প্রেমে পড়ে — ফুটবল জগতের হিরো— রাজার বাচ্চাদের সঙ্গে দৌড়ে পিছিয়ে পড়ে হরি। শূণ্যতা। অসীম শূণ্যতা। ব্যোমকালী টানে হরিকে—স্রোতে ভেসে যাওয়ার আনন্দ উপভোগ করতে, বিনয় নির্দেশ করে নিরাপত্তার দিকে। হ্যাঁ,'নিরাপত্তার চেয়ে নিরাপদ আর কী আছে!' সমান্তের এই দুই মেরুর টান প্রত্যেকটি কিশোর কিশোরী—যারা হরিদের মতো—তাদের দু'ফালা করে দেয়। শেষতক্ হরি তার সমস্ত স্বপ্ন ইচ্ছাকে দু'পায়ে মাড়িয়ে যে জীবনের সামনে এসে দাঁড়ায়—জানে না, সে জীবনটা কী! কেন? শুরু হয় এই অনাকাঙ্খিত জীবনবৃত্তে বসে স্মৃতির রোমন্থন!

মূল ইংরাজি থেকে বাংলা রূপান্তর কতটা অভিসারি কিংবা অপসারি সে আলোচনার ক্ষেত্র বড় সীমিত। মূল নাটকটি পাঠক হিসাবে অনেকের কেন, অনেকের—ই পড়া নেই। পাঠের সময় কোনো ঘটনা বা বিন্যাস সমন্ধীয় কোনো স্বদেশীয় ছবি ভূমি থেকে বিচ্যুত কিনা, সমস্ত খোলস ছুঁড়ে ফেলে আমাদের দেশীয় পটভূমিতে প্রজাপতির কম্পন লাগলো কিনা— খুব সংক্ষিপ্তাকারে দেখা যেতে পারে সেটাই। শুধু চরিত্রের নাম কিংবা ঘটনাস্থানের পরিবর্তনেই যে নাটক দেশিয় হয়ে ওঠে না, সে অভিজ্ঞতা বাংলা নাটক পাঠকারী শ্রোতাদের প্রায়শই হয়ে থাকে। আলোচনার শুরুতে দেখানোর চেষ্টা হয়েছিল, শ্রী রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত কীভাবে এই নাটকের বিভিন্ন চরিত্র, তাদের অন্তর্লীন ক্ষমতা ও সীমাবদ্ধতা, সমাজের ভেতরকার সমস্ত নিগূঢ় হিসেব নিকেশ—এ সব কিছু সম্পর্কেই ব্যক্তিগত জীবন অভিজ্ঞতায় তিনি কতটা সম্পৃক্ত ছিলেন। চরিত্রগুলির ব্যবহৃত শব্দ এবং বাক্যবিন্যাসেই ধরা পড়ে তাদের সামাজিক অবস্থিতি, তাদের মানসিক গঠন, তাদের ভাঙা গড়ার ইতিবৃত্ত। জন গলস্‌ওয়ার্দি নাটক রচনা সম্পর্কে যখন বলেন,'...plot,

action, character and dialogue. But there is yet another subject for a platitude. Flavor. An impalpable quality, less easily captured than that scent of a flower, the peculiar and most essential attribute of any work of art!...(It) is as much its differenntiating essence as is caffeine of coffee. Flavor, infine, is the spirit of the dramatist projected into his work...ঠিক এই ব্যাখ্যাতেই নাটকের রূপান্তরকারীর অনবদ্য অবদান ব্যাখ্যাত হয়ে পড়ে।

আলোচনা প্রসঙ্গে একজন সমালোচক বলেছিলেন, মাসির কাছ থেকে হরির চলে যাওয়ার সময় রূপান্তরে আবেগের কিছুটা প্রাবল্য ঘটেছে। মূল নাটকে বড় নিস্তরঙ্গ ছিল এই বিদায়। হ্যারি ব্যাগ গোছাচ্ছিল। মামা না হরি কাকে রাখবে মাসি। তখন মাসি— মূলনাটকে জিজ্ঞেস করে— তাহলে তুই চললি, হরি'। — এই এক প্রশ্নেই বোঝা যায়, নিজের অবস্থানের জন্য মাসির কাছে কাঙ্খিত কে! রূপান্তরে এইখানে মাসি অনেকটাই ভেঙে পড়ে। হরি মাসি দুজনেই কাঁদে -একসময় হরি কান্নামিশ্রিত কিছু কথা বলতে বলতে নিষ্ক্রান্ত হয়। পাঠক হিসাবে কিন্তু আমাদের কাছে এই আবেগময়তাই সুপ্রযুক্ত। শ্রীমুখোপাধ্যায় ঐ নীরব প্রস্থানের প্রত্যাঘাতে যে মনন দৃশে উঠবে বলে প্রত্যাশা করেছেন, সে অত্যন্ত পরিশীলিত, নাগরিক। আমরা বোধহয় এখনও মা-ছেলের বিচ্ছিন্নতার মতো মুহূর্তে অতো নীরবতার রসাস্বাদনে অভ্যস্ত হই নি। এ সম্ভবত আমাদের ঐতিহ্যেরও বিপরীতে।

'ফুটবল' নাট্যপ্রযোজনার বিজ্ঞাপনে নান্দীকার তখন কয়েকটি চিঠি বার করেছিলেন। প্রথম চিঠির উদ্দিষ্টদের সম্বোধন করা হয়েছিল এইভাবে, '—কলকাতার সমাজসেবীদের কাছে,/মাননীয় মোড়ল,/ মহাশয়/ মহাশয়া—'; দ্বিতীয় চিঠি ছিল,— 'দিশাহারা দর্শকদের কাছে, /নাট্যব্যাকুলেষু,-'; তৃতীয় চিঠি — 'বড়দিনে ছাত্রছাত্রীদের কাছে/ স্নেহভাজন-' (প্রসঙ্গত, ১৯৭৭-এর ২৫ ডিসেম্বর চিঠিটি ছাপা হয়েছিল); চতুর্থ চিঠি, —'মাস্টারমশাই /দিদিমনিদের কাছে / জাতীয় মেরুদন্ডেষু—'। সহজেই ধরা পড়ে, কেবলমাত্র ছাত্রছাত্রীদের চিঠিটি বাদ দিলে, বাকি তিনটির সম্বোধনেই যথোচিত শ্লেষ এবং বিদ্রূপ। কিন্তু সম্পূর্ণ চিঠির বয়ানে তাঁদের প্রতি সহমর্মিতাও ব্যক্ত ছিল। এক তথাকথিত মোড়লেরা ছাড়া অন্য সবাই সমাজের নাট-বল্টু মাত্র। আর আমাদের চোখে দেখা মোড়লেরা তো আরও বড় মোড়লদের দাবা বোড়ের ঘুঁটি। একেবারে শীর্ষস্থানে কিংবা তার নিচের দু' একটি ধাপ বাদ দিলে প্রায় সবাই অচেতনভাবে কিশোর-যুবাদের ঐ ভবিষ্যতশূণ্যতার সামনে ঠেসে ধরেছে — তৈরি হয় এক বোধহীন রোবট শ্রেণী। শ্রদ্ধেয় বৌধায়ন চট্টোপাধ্যায় এই নাটক সম্পর্কে যেমন বলেন,—' Rudraprarad does succeed in making us look at and into ourselves,the germs of social Fascism, and yet we have had an entertaining evening...'। এই বোধহীন দলবদ্ধতা দেখা গেছে/ দেখা যায় কখনও জার্মানীর প্রাগে কখনও ভারতে কখনও কলকাতায় —শুধু ঐ দলচরদের গায়ের জামার রঙ পাল্টে পাল্টে যায়!

যে 'প্রফেসি'-র কথা সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন রুদ্রপ্রসাদ—তার ব্যাপ্তিকাল ফুরোয় না আর। এখনও ঐ বাস্তবতা সমান সতেজ। লন্ডনে এখনও 'ফুটবল' নিয়ে মাতামাতি

চলে, এখনও শুধু ফুটবল সাপোর্টার - যারা শিশু কিশোর, তাদের মনোগাথা ছেপে বার হয়, (৮) কিন্তু এদিকে বাঙালী জীবনে 'ফুটবল' ছিটকে গেছে প্রায় সাইড লাইনে। 'ফ্যাসিজম' এখন অনেকটাই প্রকট। আধারের প্রয়োজন ক্রমেই শেষ হয়ে গেছে। । এখন মাঠের বাইরে অন্যতর নেশাদ্রব্যও অতি সহজলভ্য। এখন এইসব নিয়ে রচিত হবে নতুন নাটক —যার উত্তরাধিকার রয়েছে ঐ 'ফুটবল' নাটকেরই গভীরতর সত্যের কাছে। এই কৃতজ্ঞতা এই প্রাপ্তিস্বীকার চলবে নাট্যচর্চ্চার শেষ দিন পর্যন্ত— যদিও কোনো শেষ নেই —। অনন্ত অক্ষয় এই 'শাশ্বতরূপ'(৯)।

সূত্রনির্দেশ ঃ

১। ষাট দশকের ছাত্র আন্দোলন ঃ পশ্চিমবঙ্গ।। শৈবাল মিত্র। অনুষ্টুপ। শীত সংখ্যা, ১৯৮৭।

২। মেট্রোপলিটান মন . মধ্যবিত্ত . বিদ্রোহ। বিনয় ঘোষ । ওরিয়েন্ট লংম্যান।

৩।ঐ

৪। নিউ ইংলিশ ড্রামাটিস্ট্স/এডউইন মরগান/ পেঙ্গুইন প্লেজ ১৪।

৫। রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত (একটি সাক্ষাৎকার)/ সিগাল থিয়েটার কোয়ার্টারিলি। সংখ্যা ২৯/৩০/২০০১

৬। '— যখন দেখি অধিকার করার মতো লোক আছে তখন আমার মধ্যে জন্মায় স্যাডিজম্, যখন দেখি অধিকৃত হবার মতো শক্তিমান ব্যক্তিত্ব আছে, তখন আসে ম্যাসোচিস্ম্। সব মিলিয়ে এরা ঘটিয়ে তোলে হীনমন্যতা (inferiority complex) তেমনি নেতৃমুখাপেক্ষিতা (idolism), তেমনই ভ্রান্ত চৈতন্য (false consciousness) —'। বিচ্ছিন্নতার মনোদর্শন/ পথিক বসু। প্যাপিরাস/ কলকাতা।

৭। প্রিফেস/ দি রেচেড্ অব দ্য আর্থ। জাঁ পল সার্ত্রে। পেঙ্গুইন বুকস।

৮। কার্যকারণ সূত্রে অদ্ভুত এই বইটি হাতে আসে—'ফুটবল ফিভার'। পোয়েমস্ অ্যাবাউট ফুটবল। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে ২০০০ সালে জন ফস্টার লিখিত এই বইটি ফুটবল দলের সমর্থকদের, অতীত রোমন্থকদের, ফুটবল নিয়ম কানুন ইত্যাদি ইত্যাদি সম্পর্কে মজাদার সব ছড়াতে ভর্তি। আমাদের দেশে তেমন কোন 'ফুটবল চিত্র' আছে কিনা, জানি না। ঐ ছোট্ট বইটির সবচেয়ে দুর্ধর্ষ, ছড়া 'মেগালিগ ৩০০০'। শতাব্দী পরে ফুটবল মাঠ আর সমর্থকদের ছবি কেমন হবে-তারই একটা কাল্পনিক ছবি। একটি ছড়া হুবহু একই প্রায়—হরিপুরকায়স্থ-র মুখ থেকেই যেন নিসৃত—টম্ বিল্ডি-র 'দেন এ্যান্ড নাও'। প্রোফেসি এখানেও।

৯। আমাদের এই সব অসামান্য রূপান্তরিত সব নাটক—যার পটভূমি স্বদেশেই বিদ্যমান —তাকে আমরা দেখি বিদেশের আতস কাঁচে। দু'টি নাটক সম্পর্কে বলাই যায়, এই 'ফুটবল' এবং শ্রী অশোক মুখোপাধ্যায় কৃত 'বেলা অবেলার গল্প'। এ সম্পদ তো আমাদের ছিলই, তাহলে নিজেরাই সেই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইনি কেন? আমরা কি নিজেরাই নিজেদের ঘটনার অনুসন্ধানে যথেষ্ট সময় এবং মনন ব্যবহার করলাম না? একি অপারগতা, না আকাঙ্খা- বর্জনের অভ্যাস! আমাদের মতো নাট্যকর্মীদের এ এক বিস্ময়!

নাটককার

রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত

মুশকিল আসান রুদ্রপ্রসাদ

সীমা মুখোপাধ্যায়

সময়টা ১৯৮১। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক বিভাগের একঝাঁক বকমবাজ, খলবলে ছেলেমেয়ে। শিক্ষক রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত। ক্লাস ইম্প্রোভাইজেশন্। ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে টুক্‌রো টুক্‌রো কথা, আলোচনা। হঠাৎ-ই একটি ছেলে প্রশ্ন করলো— আচ্ছা Sir, আপনি 'আন্তিগোনে' নাটকে ক্রেয়ন চরিত্রটা কেন করলেন? ওটা আপনাকে মানায়? আমরা বাকি যারা ছিলাম সেই ক্লাসে, হঠাৎ এমত প্রশ্নকর্তাকে নিয়ে বেশ একটু অস্বস্তিতে পড়েছিলাম। নির্ঘাৎ ও পক্ষের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটবে এবং ফলটা মোটেই সুখপ্রদ হবে না! কিন্তু মুহূর্তকাল পরেই রুদ্রদা হেসে ফেললেন। খুব স্বাভাবিক গলায় বললেন— তাহলেই বুঝে দেখো আমি কত ভাল অভিনেতা—শুধু অভিনয় ক্ষমতার জোরে প্রমাণ করতে পেরেছি আমি ক্রেয়ন। দর্শকরা কিন্তু আমাকে সাগ্রহে মেনে নিয়েছেন। আসলে চেহারাটি কোন ফ্যাক্টর না। এরপর এই কথার স্বপক্ষে একটির পর একটি উদাহরণ দিয়ে গেলেন—

সেদিন রুদ্রদার এই উত্তরে কার কি প্রাপ্তি হয়েছিল জানিনা, আমার কিন্তু মনের জোর একলাফে দ্বিগুণ হয়েছিল। কারণটা আর কিছুই নয়— সেই সময় আশপাশ থেকে বহুবার আমার শোনা হয়ে গেছে—ইস্‌স্ হাইট-টাই মেরে দেবে মেয়েটাকে। খুবই শর্ট। একটা ভীষণ দ্বন্দ্ব দানা পাকাচ্ছিল আমার মধ্যে। ঠিক এমত সময় রুদ্রদা পরোক্ষে প্রায় মুশকিল আসানের কাজ করেছিলেন।

বাঃ! বিশেষণটি বেশ তো হ'ল—মুশকিল-আসান রুদ্রপ্রসাদ। এই বিশেষণটিকে ধরেই এগোনো যাক। ব্যাপারটা হল, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত এমন এক বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী যাঁকে নিয়ে আমার মত সামান্য একজনের কলম ধরা সত্যিই ধৃষ্টতা। কী নন তিনি? একজন শিক্ষক, একজন নাট্যকার, পরিচালক, অভিনেতা, ভাল ক্রিকেটারও বটে। আবার অসম্ভব ভাল একজন বক্তাও—এমনই আরও কত! এবং সর্বোপরি একজন মুশকিল আসান।

মনে পড়ছে এই কয়েক বছর আগে যেদিন বাবরি মসজিদ ভাঙ্গা হল—আকাদেমীতে তখন নান্দীকার আয়োজিত জাতীয় নাট্যমেলা চলছে। বেশ কিছু নাট্যদল বাইরে থেকে কলকাতায় এসেছেন, আবার কেউবা তখন ট্রেনে। আমরা ভেতরে নাটক দেখছিলাম। যখন প্রথম শুনলাম পরের দিন থেকে কার্ফু জারি করা হচ্ছে, কেমন যেন বাক্-শক্তি রহিত হয়ে গেছিল। নাট্যমেলার কী হবে? যে দলগুলো এসেছে, তারা কী করবে? তখনও বুঝিনি মুশকিল আসান একজন মানুষ নান্দীকারের কর্ণধার। শান্ত মাথায় সামাল

দিলেন সব। না রুদ্রদাকে এক মুহূর্তের জন্যেও নিজের ছন্দ হারাতে দেখিনি।

আজ থিয়েটারের চারপাশে নাট্যকর্মীদের দীর্ঘশ্বাস। সকলের মুখে একটি মূল কথা—এ থিয়েটার নিজের পায়ে দাঁড়াতে শেখেনি দুশো বছরেও, এর অস্তিত্ব আর বেশিদিন নয়। দলের মাথাদের আপশোস,—দলের ছেলেমেয়েরা ঠিকমত মহলায় আসে না। নিষ্ঠা নেই একাগ্রতা নেই। আর ছেলেমেয়েদের একটানা কৈফিয়ৎ দল খেতে দেবে? একটা পয়সা দেয়? উল্টে খালি দাও আর দাও। সময় দাও, পয়সা দাও, একাগ্রতা দাও। আমরা বাধ্য হয়ে পয়সার জন্য অন্য কাজ করি, করতে হয়।

সবটাই সত্যি—তবু প্রশ্ন কিছু থেকেই যায়......................আর তাই কত না সভা, সেমিনার, বিতর্ক, আলোচনা-শুধু সঠিক পথটি মিলছে না কিছুতেই।

এমন দুর্দিনে একটি মাত্র নাট্যদলে বেশ কিছু তাজা ছেলেমেয়ে পূর্ণ সময় দিয়ে শুধু থিয়েটারটাই করছে গোটা দিন, গোটা সন্ধ্যে। তারা বলতে পারছে থিয়েটার করেই আমি আমার রুজির জোগাড় করতে পারি। নাট্যদলটি নান্দীকার, দলটির কর্ণধার রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত। এমত অসাধ্যসাধন যিনি করতে পারেন তিনি মুশকিল আসান নন? রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তর মত শিক্ষক, অভিনেতা, নাট্যকার, পরিচালক গোটা পশ্চিমবঙ্গে নেই—এ কথা বলবো না, কিন্তু তাঁর মত সংগঠক আর নেই একথা একশোবার সত্যি, যাঁকে দেখলেই ভেতরে একটা আশ্বাস জন্মায়। মনে হয়, যে-কোন প্রতিবন্ধকতা সামনে এলে এই মানুষটি অবলীলায় তা ডিঙ্গিয়ে যাবার মত হিম্মতদার।

আরও মনে হয় এমন এক সুস্থ, সুন্দর, স্বনির্ভর নাট্যপরিবারের পিতা বলেই হয়তো তিনি তাঁর এই সত্তরের কোঠায় পৌঁছেও এখনও শিরদাঁড়া টানাটানি করে সতেজ যুবকের মত হাঁটতে, চলতে, ছুটতে পারেন এবং মঞ্চে উঠে এখনও অমন লাফিয়ে, দাপিয়ে, নেচে-গেয়ে কত-না ছবি আঁকতে পারেন।

আমার চোখে রুদ্রদা তাই এই জেটযুগে মুশকিল আসান-কারী এক কল্পনার মতো, স্বপ্নের মতো।

একটি অসমাপ্ত নাটকের অসমাপ্ত চরিত্র

দেবশঙ্কর হালদার

নাটকটা অনেক আগেই শুরু হয়ে গেছিল। মাঝে মাঝেই দূর থেকে ঢোল-কত্তাল-সানাই-বেহালার আওয়াজ চমকে দিচ্ছিল ধারেকাছের লোকেদের। কখনও আর্ত চিৎকার। কখনও হৈ হৈ অট্টহাস্য, কখনও শ্মশানের নিস্তব্ধতা। খানিকটা উঁকিঝুঁকি মারতে মারতেই হাজির হয়ে গেছিলাম মঞ্চটির কাছাকাছি। আগেই বলেছি—নাটকটা শুরু হয়ে গেছিল অনেক আগেই। আমি আনকোরা দর্শক। শুনেছিলাম বটে এদের কথা। এবার দেখলাম। আমি ঢুকতেই যেন দৃশ্যটা শুরু হয়ে গেল। খানিকটা যেন স্বপ্নের মতো। এদের কেউ গানের লোক। কেউ কথার। কেউ বাজনার। কেউ ভাবনার। সকলেই যে যার ভূমিকা পালন করে চলেছে। এদের সর্দারকেও দেখলাম। সর্দারই বটে। মুখভর্তি দাড়ি-গোঁফ। কুচকুচে কালো চুল। তাকালে ভয় ভয় লাগে। যতবার আমার দিকে তাকায়, ততবার চোখ ফিরিয়ে নিই। তারপর আড়াল থেকে বাচ্চা ছেলের মতো আড়চোখে তাকাই। দেখি লোকটা সোজা আমার দিকে তাকিয়ে আছে। তার মানে একে এড়ানো যাবে না। তাকালাম। এক্কেবারে সোজা। মনে হল যেন চোখ দিয়ে বলতে চাইছে—'পারবে'?

মনে মনে ভাবলাম—'কি পারবো'?

—এই আমাদের মতো! নাচতে, গাইতে, হুল্লোড় করতে, হাসতে, কাঁদতে, ভাবতে—পারবে?

—না পারার কি আছে। এ আর এমন কি?

—তাই নাকি! এত সাহস! দেখাও দেখি?

কেমন যেন অপমান বোধ হল। কি ভেবেছটা কি? পারব না। রক্ত গরম হয়ে গেল। ব্যস, লেগে পড়লাম। কিছুক্ষণ যেন ঘোরের মধ্যে ছিলাম। থামতে, দেখলাম মানুষটা তাকিয়ে আছে। চোখে খানিকটা হাসি। খানিকটা কি বিদ্রূপ। আমাকে ঠাট্টা করছে নাকি! আমার চোখে জিজ্ঞাসা—কেমন হল?— দেখলেন তো আমিও পারি। চাইলে আমিও আপনাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারি।

—তাই নাকি! তুমি শুধু নাটক দেখতে নয়, করতেও চাও? ঠিক আছে। ভেবে দেখি। সামনের সপ্তাহে এসো।

এতো ভাবাভাবির কি আছে। ভুল একটু হতেই পারে। শিখে নেব। সেজন্য একসপ্তাহ অপেক্ষা?

মঞ্চের একপাশে আমি। অন্যপাশে সেই সর্দার। সেই একইরকম দৃষ্টি। একদম সোজা। আমার চোখের দিকে। আমি শক্তি সঞ্চয় করে বলতে গেলাম—শুনুন, কি ভাবেন কি আপনি নিজেকে! দুম করে সবকটা আলো কে যেন নিবিয়ে দিল। জোরে বাজনা বেজে

উঠল। আমি বুঝলাম দৃশ্যটা শেষ। অন্ধকারে রাগে অপমানে গজরাতে লাগলাম।— কি ভাবে কি এরা নিজেকে। আমরা কিছুই পারি না। আরে বাবা, একটু আধটু ভুল তো হতেই পারে । আমি কি ওদের মতো রোজ নাচি, নাকি রোজ গাই? বেশ তো ভুল হয়েছে, শিখে নিতাম। তারজন্য বিদ্রূপ! এক সপ্তাহ অপেক্ষা! যাবই না কোনওদিন আর ওঁর কাছে। ভারি তো আমার নাটক করে। ভাবছি আর হাঁটছি বাড়ির পানে। যত এড়াবার চেষ্টা করছি —চিন্তাটা তত পেয়ে বসছে। ঠিক করেই নিয়েছি আর ওদের কাছে যাব না। কোনওদিন। তবু ওদের কথাই ভেবে চলেছি সারাক্ষণ। আর ওদের সর্দারের কথা। কেমন যেন চাঁচাছোলা। ধুর! যাবই না কোনওদিন ওর সামনে। চিন্তাটা যাচ্ছে না কিছুতেই। বুঝলাম লোকটাকে এড়ানো যাবে না। বোধহয় লোকটাকে এড়ানো যায়ও না।

আলো জ্বলে উঠল মঞ্চে। মঞ্চের একধারে সর্দার। সঙ্গে দলবল। অন্যধারে আমি। আর আমার মতো ভিড় করা কিছু ছেলেমেয়ে, যারা কিছুতেই এড়িয়ে যেতে পারিনি। সেই সর্দার সংলাপ বলে চলেছেন। একেবারে নিখুঁতভাবে। একেবারে সোজা সকলের চোখের দিকে চেয়ে। কেমন করে হয়ে উঠতে হয় শিল্পী। কেমন করে নিজের ভেতরের মানুষটাকে উন্নত করে তুলতে হয়। কেমন করে চারপাশটাকে দেখতে হয়। কেমন করে সর্বনাশের শেষ সীমায় দাঁড়িয়েও হাল না ছেড়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হয়। কেমন করে কখনও কখনও নিজেই নিজের পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলতে হয়—'আমিও পারি'। আহা! কি সংলাপ। আহা! কি বলার ভঙ্গি। লাফিয়ে উঠে হাততালি দিতে যাব— একসঙ্গে অনেকগুলো আলো নিভে গেলো। শুধু নীল রঙের একটা আলোর মায়ায় আমরা কজন নতুন ছেলেমেয়ে ওই বড় সর্দারের সঙ্গে নাচছি, ছুটছি, দৌড়চ্ছি, কসরৎ করছি। বুঝলাম শুরু হয়ে গেছে। আমাদের পথচলা। কখন যেন দর্শক আসন ছেড়ে একেবারে মঞ্চের মাঝখানে দৃশ্যটার মধ্যে ঢুকে পড়েছি। বড় সর্দারের চোখে এখন ঔদ্ধত্য ছাড়া আরও অনেক রঙ দেখতে পাচ্ছি। আর ভয় ভয় লাগছে না। সাহস করে ভাবলাম একবার বলি—'তুমি সর্দারই বটে'। তোমাকে যে 'কিছুতেই এড়ানো যায় না।' নীল আলোটা ধীরে ধীরে মুছে যাচ্ছে। অন্ধকার ঘিরে ফেলছে পুরো মঞ্চটাকে। বুঝলাম দৃশ্যটা শেষ হচ্ছে। এবার পরের দৃশ্য। এখন চতুর্দিক অন্ধকার। কিন্তু সেই অন্ধকারেও আমি বড় সর্দারকে দেখতে পাচ্ছি। স্পষ্ট। আমাদের দিকে চেয়ে আছে। মনে মনে বললাম— 'তুমি সর্দারই বটে। তোমাকে কিছুতেই এড়ানো যায় না।'—দৃশ্যান্তর।

।। প্রথমে শেষ সাক্ষাৎকার।।

এই দৃশ্যটার প্রথম দিকটায় বড় সর্দার বেশ গোলমালে পড়েছে। সেই আগের দৃশ্যগুলিতে দেখা মেজ সর্দার, সেজ সর্দার, ছোট সর্দারেরা এখন কেউ নেই। কেন নেই? বড় সর্দারের সঙ্গে বনছে না। এর বেশি খবর তখনও আমরা তেমন কিছু জানি না। শুধু জানি, কিছুতেই সর্দারের সঙ্গে মিলছে না ওদের। তাই ওরা বড় সর্দারকে ছেড়ে চলে গেছে। এখন তবে কি করে সর্দার? কয়েকজন পুরনো সঙ্গী আর আমাদের মতো না ঘরকা না ঘাটকা কিছু নতুন সাঙ্গোপাঙ্গ। সর্দার যখন হয়েছেন তখন তো লড়াই চালিয়ে যেতেই হয়। লড়লেনও। কারণ,

"লড়াইটা চালিয়ে যেতে হয়। দরকার হলে চিৎকার করে দেওয়ালে ঘুষি মেরে সেই লড়াইটা চালিয়ে যেতে হয়।" (সংলাপ/ শেষ সাক্ষাৎকার)

আমরা যারা হাত মুঠো করতে তখনও শিখিনি। যারা গলা ফাটিয়ে চিৎকার দিতে শিখিনি তারাও ওই বড় সর্দারের ডাকে লড়লাম। কারণ লড়াইটা চালিয়ে যেতে হয়। এই দৃশ্যটা দেখতে দেখতে বুঝতে পারছিলাম—এ সর্দার লড়াইতে জিতবে কিনা জানি না, তবে লড়াইটা শেষ পর্যন্ত চালিয়ে যাবে। চিৎকার করে, দেওয়ালে ঘুষি মেরে লড়াইটা চালিয়ে যাবে।—লড়াকু আছে। দৃশ্যটা শেষ হতে দর্শকদের হাততালিতে বুঝতে পারলাম পালা জমে গেছে। লড়াইটা জমে গেছে। দৃশ্যান্তর।।

"বোঝার ভার বোঝা বইবার শক্তি বাড়ায়"

।। শঙ্খপুরের সুকন্যা।।

'ভালোমানুষ' নামে একটা গপ্পো অনেক আগে এই নাটকটার প্রথম দিকের দৃশ্যগুলির মধ্যে ছিল। খুব নাকি জমেও ছিল দৃশ্যটা। এখনকার এই বড় সর্দার এবং আরও অনেক বড় বড় সর্দারেরা ছিল সেই দৃশ্যে। জমিয়ে অভিনয় করেছিল সবাই। দর্শকেরা হাততালিও দিয়েছিল খুব। কিন্তু তখন থেকেই সর্দারের মনে হয়েছে দু'একটা দামী কথা, দরকারি কথা। আরও অনেক কথার ভিড়ে যেন বলা হয়ে ওঠেনি। অথচ এই 'ভালোমানুষের' দৃশ্যে সেই কথাটা বলা খুব জরুরি। সেই কথাটা লেখাও ছিল এই নাটকে। সেই না বলা কথাগুলো বলে ফেলবার তাগিদেই আজ এতগুলো দৃশ্যের পরে সেই একই দৃশ্যকে অন্য চেহারায় হাজির করলেন বড় সর্দার।—'শঙ্খপুরের সুকন্যা'। ঠিক আগের দৃশ্যতে ছিলাম চার-পাঁচজন। এ দৃশ্যে প্রায় চল্লিশজন। চারপাশের চেনাজানা লোকেরা সর্দারকে বল্লে—'এমন আনকোরা চল্লিশজনকে নিয়ে অমন একটা সফল দৃশ্যের ফের মঞ্চায়ন করা কি ঠিক হচ্ছে? একটু বেশি বোঝা নেওয়া হচ্ছে না কি!—বড় সর্দার হাসল। যাকে বলে মরীয়ার হাসি। তারপর ব্রেখটের লেখা সেই লাইনটা বিড়বিড় করলো ঃ

'বোঝার ভার বোঝা বইবার শক্তি বাড়ায়'। (সংলাপ/শঙ্খপুরের সুকন্যা)

সত্যি! এ সর্দার বইতে জানে। মনে মনে বললাম—'তুমি বোঝা বইতে জানো। তুমি সর্দারই বটে। যাকে বলে বড় সর্দার'। ।। দৃশ্যান্তর।।

"সারা জীবন কতো দৌড়লে। কত অ্যাপয়েন্টেমেন্ট। কত কাজ। কোনও দাম নেই। তবে কি মরার পর সব দাম।"

।।ফেরিওয়ালার মৃত্যু।।

এই দৃশ্যে আমরা যারা আনকোরা নতুন ছিলাম তারা অনেকেই ছোট সর্দার, ন সর্দার, সেজ সর্দার হয়ে উঠেছি। তাই আমরাই এই দৃশ্যের সবকিছু ঠিকঠাক করতে উঠেপড়ে লেগেছিলাম। বড় সর্দারের প্রথমটায় আপত্তি ছিল। গল্পটা আমেরিকান। এখানে হয়তো ঠিকমতো খাপ খাবে না। আমরা নাছোড়বান্দা। শেষমেশ সর্দার রাজি। ওই ফেরিওলা লোকটার গল্পটা বড় ভালো! খানিকটা কি ওই বড় সর্দারের মতোই। খানিকটা কি আমাদের সকলের মতোই গল্পটা। একজন মানুষ একদিন কেমন সবার মাঝে থেকেও একলা হয়ে

যায়। নাকি একটা ভুল—একটা ভুলের মাসুল সারাজীবন ধরে বয়ে বেড়ায় মানুষ। কেন ভুল করে মানুষ? কেন মাঝে মাঝে আমাদের সকলেরই একা একা লাগে। কেমন যেন অনাথ অনাথ মনে হয়। কে করে দেয় আমাদের অনাথ—এই চারপাশটা। যেখানে সবাই দৌড়ে চলেছে। কে কত আগে কত বেশি দামে নিজেকে বেচতে পারে সেই আশায়। কারণ এই সমাজে তারই দাম আছে যা বিক্রি করা যায়। এইসব কথা বলতে চেয়েই সর্দার রাজি হয়। এই দৃশ্যে সর্দার কাঁদে। তখন সেই আগে দেখা বড় বড় চোখটাকে কেমন যেন অচেনা লাগে। লোকটাকে একটু বুড়োও দেখায়। তবে কি সর্দারও মনে মনে বিড়বিড় করে—"সারাজীবন কত দৌড়লে। কত অ্যাপয়েন্টমেন্ট। কত কাজ। কোনও দাম নেই। তবে কি.......... ...." কেমন যেন মনখারাপ করা একটা বাজনা বাজে। আর দুম করে দৃশ্যটা শেষ হয়ে যায়। আমার চোখের কোণটা চিকচিক করে ওঠে। দৃশ্যান্তর।।

"জীবনে কাউকে বিশ্বাস করবি না। কারণ সব মানুষ মানুষ হয় না। যত কম বিশ্বাস করবি তত কম দুঃখ পাবি।"

।। গোত্রহীন।।

এই দৃশ্যে সর্দারকে কেমন লাগামছাড়া, অবিশ্বাসী লাগে। সেই মানুষ যে নিজের ভালোবাসার জন্য সব করতে পারে। এমনকি মারাত্মক ঝুঁকি নিতে পারে। জীবন মরণের ঝুঁকি। এমন চেহারায় সর্দারকে দেখে কেমন যেন ভয় করে। ভাবনা হয়। কিন্তু তারিফও করতে ইচ্ছে হয়। কারণ—

'যখন যা চাই
তখনই তা চাই
না হলে, বাঁচাই মিথ্যে'
(কবিতা/শঙ্খ ঘোষ)
আমাদের সর্দারও কি খানিকটা এইরকম। ।। দৃশ্যান্তর।।

"আমি তোমায় ভালোবাসি। কি ভয়ংকর এই কথাটা"

"শানু রায়চৌধুরি"

সবকটা দৃশ্য জুড়ে একটা মেয়ে। শানু। কি বলতে চাইছে সর্দার ওর মুখ দিয়ে। বলছে তোমরা সবাই নিজের জন্য বাঁচো। বড্ড বেশি আমরা অন্যের জন্য বাঁচি। একটু নিজেকে খাতির করো। একটু নিজেকে আদর দাও। দেখবে বাঁচাটা কেমন অন্যরকম হয়ে গেছে। উইংয়ের ধারে দাঁড়িয়ে কেমন বড় বড় চোখ করে লোকটা তাকিয়ে আছে দ্যাখো।—সর্দারই বটে ও। সবাই সালাম জানাবে বলে হাত তুলতে যাচ্ছে—দৃশ্যটা শেষ। সর্দারের সময় নেই। দৌড়চ্ছে পরের দৃশ্যের জন্য। এবার অন্য দৃশ্য শুরু হবে। সর্দার খুঁজছে গল্প। খুঁজছে কথা। খুঁজছে মানুষ। খোঁজো সর্দার, খোঁজো। মাটির নিচে যে কথা তলিয়ে আছে তাকে খুঁড়ে ওপরে নিয়ে এসো। অনেক উঁচুতে মেঘে মেঘে যে কথা যে গপ্পো ভেসে বেড়ায় তাকে পেড়ে আনো। তারপর বাতাসের সঙ্গে, জলের সঙ্গে,

মানুষের সঙ্গে, মাটির সঙ্গে মিলিয়ে মিশিয়ে তাকে পরের দৃশ্যে চালান করে দাও তুমি। পারবে। তুমি পারবেই। তোমার সাদা চুল আরও সাদা হোক। তোমার বয়স আরও বাড়ুক। শুধু প্রত্যেকটা দৃশ্যে তুমি যেমন করে থাকো—সামনে অথবা পেছনে— তেমনই থাকো। কারণ তুমি যে আমাদের বড় সর্দার। কারণ তুমি যে কিছুতেই হাল ছাড়ো না। কারণ তোমাকে যে কিছুতেই এড়িয়ে থাকা যায় না। কিছুতেই না। সালাম সর্দার।।

★একটি অসমাপ্ত নাটকের একটি অসমাপ্ত চরিত্রের কিছু বৈশিষ্ট্য :
(কোনও অভিনেতা যদি ভবিষ্যতে বড় সর্দার চরিত্রে অভিনয় করতে চান)

সর্দার যা পারেন (একডজন গুণাবলী) ঃ

১। ইনি খুব বড়ো করে ডাক দিতে পারেন। অর্থাৎ আহ্বান করতে পারেন।
২। ইনি সকলের সঙ্গে দৌড়তে পারেন। এবং বেশিরভাগ সময়েই সকলের আগে দৌড়ন।
৩। ইনি সততই নিজেকে বদলাতে পারেন।
৪। ইনি জিন্স্ পরেন, টি-শার্ট পরেন। পাজামা-পাঞ্জাবিও পরেন।
৫। ইনি খুব ভালো করে কথা বলতে পারেন। এনার ব্যাখ্যায় বা বিশ্লেষণে চ্যালাদের ভেতর চল্লিশ হাজার ওয়াট আলো জ্বেলে দিতে পারেন।
৬। ইনি সকলের খুব সঙ্গী হতে পারেন।
৭। ইনি খুব বিরক্ত করতে পারেন। যে বিষয় নিয়ে পড়েছেন তা শেষ না হওয়া অবাধ লেগে থাকতে পারেন।
৮। ইনি সম্মান করতে পারেন। অসম্মানও করতে পারেন।
৯। ইনি বিতর্কিত হতে পারেন।
১০। ইনি খুব ভুল করতে পারেন। এবং ভুল শুধরে নিতেও পারেন।
১১। ইনি এনার চ্যালাদের সর্দার হয়ে ওঠার সুযোগ করে দিতে পারেন এবং অনেক সময় নিজেই চ্যালা হয়ে যান।
১২। ইনি সংসারে খুব একটা না থেকেও ঘোরতর সংসারী হতে পারেন।

যা পারেন না (এক ডজন নির্গুণাবলী) ঃ

১। ইনি নির্লিপ্ত হতে পারেন না।
২। ইনি কোনও কিছুই ছেড়ে দিতে পারেন না।
৩। ইনি সমস্ত বিষয়ে মাথা না গলিয়ে শান্তি পান না।
৪। ইনি কাজ না করে থাকতে পারেন না।
৫। ইনি সংসার ছেড়ে থাকতে পারেন না।
৬। ইনি ভয় না পেয়ে থাকতে পারেন না।
৭। ইনি সব্বাইকে খুশি করতে চেয়ে পারেন না।
৮। ইনি একদম একলা শুধুমাত্র নিজের জন্য কিছু করে উঠতে পারেন না।

৯। ইনি মাছ-মাংস খেতে পারেন না।
১০। ইনি খেলা না দেখে থাকতে পারেন না।
১১। ইনি বুড়ো হচ্ছেন কিছুতেই মেনে নিতে পারেন না।
১২। ইনি অনেক সময় সত্যি কথাটা মুখের উপর দুম করে বলে দিতে পারেন না।

পুনঃ : এই অসমাপ্ত নাটকের নাম অথবা বড় সর্দারের নাম কি তা নিয়ে সমস্যা হলে নীচের নামগুলি ব্যবহার করা যেতে পারে—

১। নাটকটির নাম—নান্দীকার (৮৬ সাল থেকে ২০০১)
২। বড় সর্দারের নাম—শ্রী রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত
৩। অন্যান্য চরিত্র—নান্দীকারের বাকি কুশীলব

মুখোমুখি

গৌতম হালদার

[শিল্পের সৃজন পথে স্রষ্টার মনোলোকের পরিচয় রসিকজনের কাছে অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ণ উপাদান। রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত রূপান্তরিত (দু-একটি অনুবাদ) নাটকের সংকলন প্রকাশ করতে গিয়ে মনে হয়েছে তাঁর নাটক যাঁরা ভালোবাসেন, তাঁদের কাছে রূপান্তরকারের মনোভাবনাটি উপস্থাপিত করতে পারলে হয়তো রস গ্রহণের সুবিধা হবে। সেই উদ্দেশ্যেই চেষ্টা করেছি তাঁর সহ নাট্যকর্মীদের সঙ্গে কথা বলে রূপান্তরের সৃজন পথটি নির্ণয় করতে ।

রুদ্রবাবুর ঘনিষ্ঠ সহকর্মী এবং সুযোগ্য শিষ্য গৌতম হালদারের কাছে জানতে চেয়েছিলাম তাঁর নিজস্ব ভাবনা, ধারনার কথা। তিনি বিভিন্ন ব্যস্ততার কারণে নিজে লেখবার সময় পাননি, তাই একটি সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তাঁর ভাবনার কথা প্রকাশ করেছেন, এখানে সেই ভাবনাটি সম্পূর্ণ তুলে ধরা হলো।]

"...আমি তো সম্পূর্ণ মানুষ হিসেবেই তাঁকে দেখেছি। রাতদিন যাঁর সঙ্গে কাজ করা হয় তাঁকে শুধু একভাবে দেখাটাতো মুস্কিল, তো আমাকে বলতে হয় সামগ্রিক ভাবে। তো এই কথা কিন্তু আপনাকে আগেও বলেছি, তবে এক্ষেত্রে নাটকগুলো কিভাবে লেখেন সেটাকে স্পেসিফিক করতে পারলে বোধহয় ভালো।...ফুটবল লেখার সময় আমি ছিলাম না। আমি ছোটবেলায় দেখেছি। তারপরে এখানে এসে আমি অভিনয় করেছি। সেই প্রথম অভিনয়ের সময় থেকে, ফুটবল অভিনয় নান্দীকারে আমার। তো তখন ফুটবল...ফুটবলতো প্রায় সর্বকালীন হিট প্রোডাকসন, সেই নাটকে...রুদ্রবাবু আসলে এই নাটকটা লিখেছিলেন, যদিও তখন আমি, লেখার সময় ছিলামনা। অভিনয় করেছি শুধু, অভিনয় করতে করতে আমার মনে হয়েছে যে এই ফুটবল নাটকের ভেতরে তাঁর প্রায় মানে ওই সময় তাঁর ছাত্রজীবন, খেলার জীবন, তাঁর রাজনৈতিক জীবন এবং তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সমস্তটা মানে একেবারে নিটোল ভাবে, একসঙ্গে একটা নাটকের ভেতরে এবং অভিনেতা কালিদা হিসাবে তার ভেতরে তাঁর প্রবেশ এই সমস্তটা একসঙ্গে এমন করে ঘটেছে বলে আমার ধারণা, আমার বিশ্বাস,প্রায় একটা অম্ভব সুসংবদ্ধ কাজ, ফুটবল নাটক সম্পর্কে এইটাই আমার ধারণা।...মানে বলছি কালিদা যখন অভিনয় করেন আর কালিদা যখন কথা বলেন, যখন যাঁর সঙ্গে ব্যবহার করেন, কালিদা অন্যান্য চরিত্রকে যেভাবে দেখে এই সমস্ত দেখা লেখা এই সবটা একেবারে মিলেমিশে একেবারে মানে খুব সুন্দর ভাবে ব্যালান্সড আরকি। এর জীবনী শক্তিটাও অসাধারণ। এই সবটা নিয়ে। নাটক লেখা থেকে শুরু করে অভিনয় পর্যন্ত। যদিও লেখার সময় ছিলাম না নান্দীকারে।

শেষ সাক্ষাৎকার লেখার সময় আমি ছিলাম। এই ঘরে...রুদ্রবাবু সবসময় নাটক খোঁজেন

তো, মানে কন্টেম্পরারি নাটক, বিদেশী নাটক, নানা দেশের নাটক। এই খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ সেই সময় এই ফুটবলের পরেই কি নাটক তখন রুদ্রবাবু খুঁজছেন তখন হঠাৎ একদিন নান্দীকারে ঘরে দেখলাম "দ্য লাস্ট এপয়েন্টমেন্ট" ভ্লাদরিন দোজারতসিয়েভের একটা নাটক। ইংরেজি নাটক। উনি এলেন। ফুটবল হচ্ছে তখনও। সেই সময় ওই ইংরেজি নাটক বোঝার মতো ক্ষমতা ছিলোনা তখন আমাদের। ইংরেজি নাটক পড়ে যাবেন অভিনয় করে যাবেন সেটা বুঝতে পারবো, সেরকম নয়। সেটা বুঝে উনি বোধহয়, সেই বারে প্রথম বার উনি ঘরে ভেতরে প্রথমবার উনি যেটা পড়লেন, বলে গেলেন। মানে বাংলায় কথা বলে যাচ্ছেন। ইংরাজীটা খোলা আছে সামনে। এই জিনিষটা পরে শিখেছিলাম আমরাও। মানে ইংরেজি নাটক সামনে খুলে রেখে মানে অনেকবার পড়া হয়েছে নাটকটা, এইবার যখন পড়ছি শব্দগুলো ইংরেজি কিন্তু মুখে বাংলা বলছি। সেটা কিন্তু ফেরিওয়ালার মৃত্যু থেকেই শুরু হয়েছে। আমাদের প্র্যাকটিশ মানে বিশেষ করে আমার প্র্যাকটিশ। ওই প্রথম শেখা। এখন আপনাকে বলতে গিয়ে মনে পড়ছে, সব তো সবসময় মনে পড়েনা। ওইটা প্রথম দেখলাম, বাংলায় যখন বলছেন তখন বাংলা নাটকই লাগছে। কিন্তু হাতের যে স্ক্রিপ্টটা সেটা ইংরাজীতে লেখা ট্রান্সলেটেড রাশিয়ান নয় ইংরাজীতে তো তাঁর পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সবাই মিলে হই-হই করলো, দারুণ নাটক। তারপরে কিছুদিনের ভেতরে, মানে দিন পনেরোর ভেতরে, উনি লিখতে শুরু করলেন। লেখার সময়তো দেখেছি যে লিখছেন একটা সিন, সে সিনটা পড়লাম, তারপরে রুদ্রবাবুর বাড়িতে গিয়ে সিনটা পড়তে পড়তে অভিনয়ও শুরু হয়ে গেলো। মানে নাটক কিন্তু পুরো তখনও লেখা হয়নি। অভিনয় মানে কি, বলা, মানে একটা বললে কিরকম লাগছে। মানে reaction নিচ্ছেন, যারা অভিনয় করবেন তাদের। সে অনুযায়ী মানে আমরা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি দিয়ে, মানে সমকালীন শব্দ আমরা যে ভাবে চিনি, সেগুলো হয়তো রুদ্রবাবু নিচ্ছেননা, কিন্তু হঠাৎ করে অন্যকোনো শব্দ ব্যবহার করছেন যেটা আমরাও জানিনা, কিন্তু সেটা ওই reaction এর ভিতর থেকেই গড়ছেন। এই করতে করতে নাটকটা লিখছেন। তো নাটকটা হওয়ার পরে তো সবাই জানেন যে সমকালীন নাটক যেটা রাশিয়াতে গ্লাসনস্তের পরে হয়েছিলো, লেখা হয়েছিলো আগে কিন্তু অভিনয় করার সুযোগ হয়নি রাশিয়াতে। ওখানে খোলা হাওয়া বইতে শুরু করার পরে রাশিয়াতে বোধহয় একসঙ্গে দুটো না তিনটে প্রোডকসন একসঙ্গে চলেছিলো। দুটো প্রোডকসনের কথা মনে আছে, রুদ্রবাবুর অভিনয়টা করেছিলেন ওখানকার একজন অভিনেতা যে অভিনেতা আমাদের দেশের প্রায় শম্ভু মিত্রর মতো, ওই রকম বয়স, আর অন্য একটা প্রোডাকসনে যেটা একই নাটক অন্য আর একটি দল করেছিলো, সে নাটকটাতে এই মানুষের চরিত্রটা রুদ্রবাবুর চরিত্রটা এই অভিনয়টা করেছিলেন কমবয়সী একজন ইয়ং এক্টর। একইভাবে নাটক হয়েছে। এখন আর অভিনেতাদের নাম মনে নেই। তখন শুনেছিলেন। আর তখন নান্দীকার এটা করলো। সেই দিকথেকে দেখতে গেলে সমকালীন চিন্তাচেতনা সমাজকে দেখা তার ভিতরে রাজনৈতিক, সচেতনতা, এইসবগুলো নিয়ে যে রুদ্রবাবু কতোটা ভাবেন, আমরা মাঝেমাঝে দেখে অবাক হয়ে যাই। এতো গভীরে এতো সংবেদনশীল এবং এতো মানবিক ভাবে এবং জোরের সঙ্গে ভাবতে পারেন নাটক লেখার সময় সেটা অসাধারণ ব্যাপার।

এরপরে ফেরিওয়ালার মৃত্যু। ফেরিওয়ালার মৃত্যুও ওইরকম। ফেরিওয়ালার মৃত্যু

যখন শুরু হলো তখন রুদ্রবাবু আর্থার মিলারের নাটকটার কথা বললেন, আমরা ততোদিনে ইংরেজিতে পড়তে শুরু করেছিলাম। আমরা যারা নান্দীকারের ছাত্ররা। কিন্তু লেখা হয়নি, রুদ্রবাবু শুধু বলেছেন। এবার তার মাসখানেক পরে বললেন যে ওটা হবে, আমরা ভেতরে পড়তে শুরু করেছি, ইংরেজিতেই পড়ছি, যেহেতু অনুবাদ হয়নি। তারপরে রুদ্রবাবু নিজেই লিখলেন। কিন্তু দেবাশিস মজুমদারের লেখাটাও আমাদের খুব সাহায্য করেছিলো। কিন্তু রুদ্রবাবু তারপরে সম্পূর্ণ নিজের adoption করে নিলেন। কিন্তু ততোদিনে, সুবিধে হলো যেটা সেটা ইংরেজি নাটক থেকে পড়তে পড়তে, আমরা যেহেতু বাঙালি আমাদের নিজেদের সময়ের সঙ্গে সঙ্গে...মনটাতো আমাদের বাঙালি, আমরা বাঙলা সমাজে বাস করছি। এবারে ওই ইংরেজি শব্দগুলো দিয়ে আমরা আমাদের সমাজটাকে বা অনুভব-গুলোকে বা চারপাশটাকে বলতে শুরু করলাম কাজেই একসঙ্গে দুটো জিনিষ ঘটে যাচ্ছে, তারপরে বাংলাটা শুরু হলো, রুদ্রবাবু লিখলেন তারপরে অভিনয় হলো। কাজে বুঝতে পারছেন একটা লেখার ভেতর একটা প্রসেস চলে সবসময়। সেটা একেকটা নাটকে একেক রকম করে চলে।

এরপরে গোত্রহীনের অনুবাদ নিয়ে যে একটা বিশাল হইচই যে পরে গিয়েছিলো ওইরকম একটা নাটককে আমাদের প্রেক্ষিতে ফেলা, মানে আমেরিকান মাইগ্রেসন প্রবলেম, বন্দর এলাকার মাইগ্রেসন প্রবলেমগুলোকে একসঙ্গে ওই পোত্রুরিকান, স্প্যানিস, হিসম্প্যানিক, বা যাদেরকে ব্ল্যাক বলা হয়, বা আমেরিকান সোসাইটিতে বা ইতালি থেকে যখন লোক আসে তখন কি reation হয় সমাজের, সেটা আমাদের এইখানে হিন্দু মুসলিমের জায়গা থেকে প্রথম একটা চমক তারপরেরটা কথা হচ্ছে পুরোটাকে একটা মুসলিম পরিবারের মধ্যে ফেলা কোলকাতা মানে পশ্চিমবঙ্গের একটা মুসলিম পরিবার এই চিন্তাটা একেবারে অদ্ভুত, এটা আমরা কেউ ভাবতেও পারিনি। কিন্তু করার পরে মনে হয়েছিলো এইটাই একমাত্র উপায়। বাইরের লোকের কাছ থেকে শুনেছি মানে ভালো নামী দর্শকের কাছ থেকে।

নাট্যকারে সন্ধানে ছটি চরিত্র নাটকটা দেখার সময় মনে হয়েছিলো নাটকটা যে ভাষায় যে ভাবে কথা বলছে যে ঘটনা যে ভাবে ঘটাচ্ছে সেটা আমার দেখা নয়। মানে অদ্ভুত একটা। মানে তার গল্প থেকে শুরু করে গল্প বলার ধরন থেকে শুরু করে নাটকের ভিতরে নাটক থেকে শুরু করে এই সবটা মানে চরিত্র...যে যেভাবে কথাগুলো বলে সে কথাগুলোর মানে সেই সম্পর্কগুলোর মানে চরিত্র যে রকম বিপদে পড়ছে সেইগুলো একসঙ্গে আমার কাছে একসঙ্গে অদ্ভুত লেগেছে একসঙ্গে খুব আকর্ষণীয় লেগেছে। স্বাতীদির অভিনয় অসাধারণ লেগেছিলো। আর রুদ্রবাবুর অভিনয়। একদম অন্যরকম, মানে চশমাটা পরে যেভাবে যেরকম ডিরেক্টারের মতো একটা রোল করছেন। মানে তখন আমিতো নাটকে ঢুকিনি বাইরে দেখছি, তাই বলাটা অনেক সোজা। যখন নাট্যকারের সন্ধানে ছটি চরিত্র দেখলাম দেখলাম অদ্ভুত এক ডিরেক্টার, কিরকম একটা চশমা পরে খিটখিট করে মানে অন্যরকম ক্যারেক্টার। যে চরিত্রটার সঙ্গে রুদ্রবাবু একেবারে এক হয়ে গিয়েছিলেন।

নাট্যকার রুদ্রপ্রসাদ এবং নির্দেশক রুদ্রপ্রসাদ এই দুটি সত্তার মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব কাজ করেনা বরং সমন্বয় কাজ করে। করান তিনি। আবার একসঙ্গে প্রোডাকসনের লোক থিয়েটারের লোক আবার অর্গানাইজেসনের লোক। ডিরেক্টার সব একসঙ্গে। রুদ্রবাবুর

কাজের ভেতরে সে ছাপটা পড়ে। যখন নির্দেশনা দ্যান, তখন আমরা যবে থেকে দেখেছি এটা সবচাইতে বড়গুণ লেগেছিলো নান্দীকারের যে নির্দেশনাকে নির্দেশনা মনে হয়না। অদ্ভুত একটা ফ্রিডম আর মানে অভিনেতাদের অদ্ভুত একটা সেন্স দ্যান। অভিনেতারা তাঁর ওপরে ডিপেন্ড করতে পারে অভিনয়ের জায়গা থেকে। এইটা একজন নির্দেশকের সবথেকে বড় গুণ বলে মনে হয়, এবং কখনই বলে দ্যাননা তুমি এখান থেকে চারপা হেঁটে ওইখানে ওইটা বলো ওখান থেকে ঘাড় ঘুরিয়ে ওইটা বলো। তোমার ইচ্ছা মতো তুমি করলে করতে করতে যেটা ভাল হচ্ছে সেটাকে বলা। এবং নাটকের ভাষাও পালটে গেছে একটু আধটু, যা লিখেছেন আমরা, যেমন আমিইতো, অভিনয় করবার সময় আমার মতো করে করে নিয়েছি। তাতে কোনো অসুবিধা হয়নি, বরং ভালোই বলেছেন।

* [বক্তার মূল বাচনভঙ্গি অবিকৃত রাখা হয়েছে।]

খালেদ চৌধুরী : সঞ্চয়ন ঘোষ

[শ্রদ্ধেয় কবি ও নাটককার মোহিত চট্টোপাধ্যায় সম্প্রতি একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন, নাটককে সাহিত্য বলা যায় কিনা, কারণ প্রযোজনাতেই নাটকের পূর্ণতা। তাঁর এই মন্তব্যকে ঘিরে অনেক বিতর্ক হয়েছে। কোনও বিতর্কে প্রবেশ না করেও আমাদের মনে হয়েছে, নাটকের ক্ষেত্রে নাটককারের চিন্তন পদ্ধতি যেমন আমাদের আগ্রহী করে, তেমনই প্রযোজনা কর্মের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত ছিলেন তাঁদের চিন্তন ভাবনাটিও পাঠককে আগ্রহী করবে। বিশেষ করে সেই চিন্তন প্রক্রিয়াটি যদি খালেদ চৌধুরীর মতো নাট্যব্যক্তিত্বের হয়। এই বইটির জন্যই শ্রী চৌধুরী তাঁর মূল্যবান সময়ের থেকে বেশ খানিকটা সময় ব্যয় করেছেন আমাদের জন্য। সাক্ষাৎকারটি আমাদের পক্ষ থেকে নিয়েছেন তাঁরই শিষ্যপ্রতিম তরুণতর প্রজন্মের উল্লেখযোগ্য মঞ্চচিত্রক শ্রী সঞ্চয়ন ঘোষ। সাক্ষাৎকারের অংশটি এখানে মুদ্রিত হল।]

"…..নান্দীকারের সঙ্গে আমি প্রথম যে কাজ করেছি তা শেষ সাক্ষাৎকার। দ্বিতীয় কাজ করেছি ফেরিওয়ালার মৃত্যু, তৃতীয় কাজ করেছি মেঘনাদ বধ কাব্য। এই তিনটি করেছি। ওদের প্রথম নাটক আমি দেখেছি নাট্যকারের সন্ধানে ছটি চরিত্র। এটা প্রথম দেখি আমি মুক্তঅঙ্গনে । এবং দেখে সেটের মধ্যে একটা গোলমাল দেখেছিলাম। অর্থাৎ গোলমালটা হওয়ার কারণটা হচ্ছে সেট যে ভাবে সাজিয়েছে, ন্যাচারালিস্টিক ওয়েতে সাজিয়েছে। যদিও স্ট্রাকচারাল বা কাঠামোগত ঠিক ছিল। কিন্তু সাজানোটা হয়েছিল সমান্তরালভাবে। যার ফলে আমি বুঝতে পারছিলাম যে কথাগুলো হারিয়ে যাচ্ছে। সবাইকে প্রোফাইলে কথাগুলো বলতে হচ্ছে। ফলে ওদিকের উইংস কথাগুলো টেনে নিচ্ছে। সামনের সেকেন্ড রো তে ছিলাম, কিন্তু তাও কথাগুলো শুনতে পাচ্ছিলাম না। শেলি পাল, বিভাস চক্রবর্তী এরা সব ছিল তখন। নাট্যকারের সন্ধানেতে বিভাস চক্রবর্তী ছিলো কিনা ঠিক মনে নেই অবশ্য।...তো এটা দেখার পর অজিতেশ আমাকে বললেন আপনার কি রকম লেগেছে। আমি বললাম আমার খুব ভালো লেগেছে, কিন্তু একটা জায়গায়,.... সেটটা যেভাবে উপস্থাপন করেছেন, ডায়লগগুলো হারিয়ে যাচ্ছে। ডায়ালগগুলো শোনা যাচ্ছে না। তার কারণটা হচ্ছে যে আপনি সমান্তরালভাবে সাজিয়েছেন। অর্থাৎ সোজাসুজি করে। আর্কিটেকচার যেভাবে হয় সেভাবে নয়। থিয়েটারের আর্কিটেকচার কিন্তু একটু আলাদা। আমি দর্শককে দেখাব। প্রোফাইল হলে হবে না। একটা কথা বলতে বলতে যদি সেমি প্রোফাইলে চলে আসবে, এবং সামনে আসবে। যাতে কথা না হারায়। ফেসটা না হারায়। তাহলে সেটাকে এমন ভাবে আমায় সাজাতে হবে যে অভিনেতা বসবে, এমন ভাবে বসবে বা এমনভাবে

দাঁড়াবে যে মুখটা অটোমেটিকালি দর্শকের দিকে থাকবে। তাহলে আর কথা হারাবে না। তখন আমি বললাম একটা কাগজ দিন তো, তখন কাগজে এঁকে দিয়েছিলাম। সেটা আমার মনে আছে। কিন্তু তারপর তাঁরা কি করেছিল কি করেনি সেটা আমি জানি না। কিন্তু আমার কাছে এটা মনে হয়েছিল। এটা অবশ্য দ্য রুটস-এর কথা বলছি, নাট্যকারের সন্ধানে ছটি চরিত্রে সেট প্রায় ছিলই না। অভিনয়টাই প্রধান ছিল। খুব মিনিমাম কিছু ছিল। ....তারপর দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে বা অন্য নাটক দেখেছি, কিন্তু প্রথম এই নাটকটা নিয়ে যখন রুদ্রপ্রসাদ এল আমার কাছে। "শেষ সাক্ষাৎকার"। তখন পার্টির মধ্যে, রাশিয়ান পার্টির মধ্যে গোলমাল শুরু হয়েছে। এবং সেটার ভেতরে একটা ব্যুরোক্রেসি খুব একটা ডেভলাপ করছে, ব্যুরোক্রেসিটা বেশ জাঁকিয়ে বসার চেষ্টা করছে, আর সাধারণ মানুষ তার থেকে উৎপীড়িত হচ্ছে। তখন একজন সাধারণ মানুষ প্ল্যান করল, যে সমস্ত সাক্ষাৎকারগুলো একজনের নামেই করল আর কেউ নেই। বাকিগুলো সবটাই সে নিজেই ম্যানিপুলেট করল। এবং এখানে যে assistant, officer, সে বারবার বলছে পরের লোক আছে আপনি তাড়াতাড়ি শেষ করুন। না, না, আপনি কথা শুনুন, পরে কোনো লোক নেই। বলে যাচ্ছে বারবার, আবার দেখা গেল সে পাজল্ড হয়ে যাচ্ছে। এই যাচ্ছে বারবার, তাতে আমার প্রথমেই মনে হল একটা স্যুইং ডোর থাকা দরকার। যে স্যুইং ডোরে সে হনহন করে যাবে, গিয়ে দেখবে নেই, অবাক হয়ে ফিরে আসবে। স্যুইং ডোরটা এই-এই করছে (অর্থাৎ স্যুইং করছে)। সুইং ডোরটা কিন্তু এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই। দর্শকের কাছে স্যুইং ডোরটা একটু কাজ করবে। হঠাৎ যদি একটা কেউ ধাক্কা দিয়ে যায় তাহলে স্যুইং ডোরটা quietly সরবে না, ঝড়ের বেগে যাচ্ছে, গিয়ে দেখবে কেউ নেই, আবার রেগেমেগে আসছে, আর এ আস্তে আস্তে আর্গুমেন্ট করে যাচ্ছে। ব্যুরোক্রেসির যে চূড়ান্ত জায়গাটা তাকে আমি দাম্ভিকতা দেখানোর জন্য ওই উপরেরটা করলাম। আমি যদি নর্মাল চেহারা দিতাম মনে হত না। তাতে মনে হত বেসিকালি সে ছোটো মানুষ। কিন্তু তার হ্যালোটা বড়। যার জন্য টোটাল জিনিসটাকে ডিস্টর্ট করে ওপরে তুলে দিলাম। এই যে তুলে দেওয়ার ব্যাপারটা, এটা আমি একাধিক জায়গায় ব্যবহার করেছি। (সঞ্চয়ন : এক্সাজারেট করা)। হ্যাঁ এক্সাজারেট করা। এই ভাবনাটা আমি প্রথম পেলাম ওই লিবার্টিটাকে বড় করে দিয়ে অন্যান্যদের ছোট্ট করে দেওয়া। তাতে এক্সাজারেট করে দেওয়া হল। এইটা আমি কালের যাত্রাতেও লাগিয়েছি। তার মধ্যে একটা ঘড়ি আছে বিরাট, ...সেই জন্য এইটাকে বড় করা।....এর মধ্যে দুটো ভাবনা ছিল, এই টাইম ওদের পথ করে দিচ্ছে সেই জন্য ওটা লোক যাতায়াত করতে পারে ওইরকম ভাবে করা। সেই জন্য হাইটটাকে বাড়িয়ে দিলাম। এবং টাইমটাকে বিরাট করে দিয়ে....নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এখানেও (শেষ সাক্ষাৎকার) কিন্তু এই জিনিসটা করলাম। এর কোনও action নেই। আস্তে আস্তে বিকেল হচ্ছে। সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে। যার জন্য এখানে ট্রান্সপারেন্ট, সেমি ট্রান্সপারেন্ট, মানে ওপেক দিয়ে ওটা দেখা যাচ্ছে, আর টকটকে লাল পর্দা। তার পাশে একটু মাঝখানে যেটা অলিন্দ মতো আছে, টব আছে, ওইখানটা গ্রিন আছে। অর্থাৎ মানুষের মধ্যে কোথাও একটা জীবনের প্রতীক এদের মধ্যে রয়েছে। কিন্তু ওই ব্যুরোক্রেসির যে আঁটোসাটো ব্যাপার সেইটি এই লোকটাকে ঘিরে রেখেছে ওই দাম্ভিকতায়। কিন্তু লোকটার মধ্যে ভিতরে কোথায়

একটা জায়গা রয়েছে। স্প্রিং ডোরটা এইখানে । এখান দিয়ে হনহন করে যায়, এইখানে একটা আলমারি আছে , যাতে এরা লেনিনের কথা বারবার বলে। কিন্তু লেনিনকে বন্ধ করে রেখেছে। ওই লোকটা যে সাক্ষাৎকার দিতে এসেছে সে বা নিতে এসেছে, সে একটা সময়তে রেগে গিয়ে ওটা ভাঙে। একটু হাওয়া খেতে দাও, একটু হাওয়া খেতে দাও। লেনিনকে এরকম বন্ধ না রেখে ও কাঁচটা ভাঙে। এবং কাঁচটা ভাঙলে কেলেঙ্কারি, তার টেকনিকাল আসপেক্ট ভাবো। যদি বড় কাঁচ ও ভাঙে তাহলে তো acting করতে পারবে না। কেটেকুটে যাতা কাণ্ড হত। সেইজন্যে একটা ছোট্ট ফ্রেম করে ওটাকে করলাম যাতে ভাঙলে ওটা ওইখানে থাকে। প্র্যাকটিকাল অ্যাসপেক্ট বুঝতে পারছ তো, সিনেমার কাঁচ ভাঙা আর থিয়েটারের কাঁচ ভাঙার মধ্যে অনেক তফাৎ রয়েছে। এই সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে। কাজেই এই হচ্ছে যে মোটের মধ্যে ভাবনাচিন্তা। সামনেটা কার্পেট। সামনেটা বসার যায়গা ছিল।.....এখানে কিছু ক্যারেকটার আছে যাদের সম্বন্ধে সে এ্যালিগেশন নিয়ে এসেছে। মোটের ওপর ভাবনাটা এই রকম ছিল।

সঞ্চয়ন : একটা কথা আমার মনে হয়েছে, এই একটা দরজা দিয়েই বেরোনো, আর কোথাও দিয়ে বেরোনোর জায়গাটা ছিলনা। আর জানলাটা খুললে বাইরে একটা ল্যান্ডস্কেপ দেখা যেত।

খালেদদা : এই জানলাটা যে খোলা হয় তখন এটা দেখা যায়।

সঞ্চয়ন : একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করার ছিল, প্রসেনিয়ামের নিজস্ব যে পথটা যেটা পিছনে দিকে যায়, সেটার রিয়ালিজমের থেকেও, আপনার কাছে মোটিফ অনেক বেশি, মানে যে অবজেক্টগুলো প্লেস করছেন, তার নিজস্ব চেহারাটা অনেক বেশি,.....

খালেদদা : অনেক বেশি, যার জন্য ওই কালো ব্যাকগ্রাউন্ড রাখা, যাতে অবজেক্টটা প্রজেকটেড হয়। কালো দিলে যেটা হয়, তুমি নিজে খুব ভালো করে জানো, যে অন্য রঙ থাকলে কিম্বা সাদা থাকলে সবটা গিলে ফেলে। ডিস্টার্ব করে ছায়া পড়ে। আমাদের যখন আকাশ দেখাবার দরকার হয় তখন সাদা দেখাই । কিন্তু যেখানে আকাশ দেখাবার দরকার নেই, যেখানে অন্য দিকটা কাজ করছে, নাটকের তো অন্যান্য সমস্ত দিকও আছে, যেখানে আমার অবজেক্ট বা কালার প্রজেকশন দরকার, সেখানে কিন্তু ব্ল্যাক দিতে পারি। আমি ফ্লোট করি সমস্ত জিনিসটাকে। এবং তার থেকেই ওই নাটককে সাহায্য করার জন্য একটা রাস্তা আমার সামনে চলে আসে। তখন তার ব্যাকগ্রাউন্ড থাকে না।

সঞ্চয়ন : তার মানে আপনার কাছে....যখন প্রসেনিয়ামে কাজ করেন তখন প্রসেনিয়াম স্পেসটা একটা মিউচুয়্যাল স্পেসের মতো.....

খালেদদা : exactly,mutual space-এর মতো। একেবারে। ওই জানলা খুললেই দূরের একটা পার্সপেকটিভ দেখা যায়, শহরটা দেখা যায়, দূরে, দূরে চলে যাচ্ছে, ওটা আঁকা। দুদিক দিয়ে আঁকা ছিল। কিন্তু যারা এঁকেছে আঁকাটা ভালো না। আমি আগে হাতে আঁকতাম, কিন্তু তারপর ওইসব আর করিনি, ভেবেছিলাম ওইটা নিশ্চই পারবে। পরে দেখি যে আঁকাটা ঠিক পার্সপেকটিভ হয়নি। কিন্তু যেহেতু আলো-টালো খুব কম থাকে, আঁকাটা খুলে যায়, চলে যায়।

মানে আমি ন্যাচারালিজম করি না, রিয়ালিজম করি। এই পার্থক্যটা লোককে বোঝানো খুব মুশকিল। ন্যাচারালিজম মানে যা দেখছি তাই, আর রিয়ালিজম হচ্ছে যা আমি করছি, যা দেখছি তার নির্যাসটা আমি নিচ্ছি। অর্থাৎ দেখলে কিন্তু লোকের মনে হবে, এইটাই তো হতে পারে, কিন্তু exactly তা নয়। সিলেকশন করা। আর কি। এই পার্থক্য। লোকে রিয়াল আর ন্যাচারালের মধ্যে তফাৎ করতে পারে না। যে কোনটা রিয়াল আর কোনটা ন্যাচারাল। ধরো এটা রিয়াল, কিন্তু এটা ন্যাচারাল নয়, কারণ আর্কিটেকচারালি ওটা ডিস্টর্ট করা। তাই ওটা ন্যাচারাল নয়। ন্যাচারাল হলে কিন্তু আমাকে আর্কিটেকচারল সাত ফুট বা ছ ফুট রাখতে হত। দিয়ে লিন্টেল দিতে হত। কিন্তু ওটা ছাড়িয়ে আট ফুটে চলে গিয়েছি, আট ফুট না দশ ফুট ছিল। এ তো হয় না কখনও। পুতুল খেলার মধ্যেও ঠিক সিমিলার জিনিস ছিল।.....এখানে দ্যাখো এই দরজাটা বড়। (উৎসাহী পাঠক বহুরূপী প্রযোজিত পুতুল খেলা নাটকটির সেটের ছবি দেখে নিলে বুঝতে সুবিধা হবে।) এখানে একটা দরজা আছে খুব ছোট্ট, এখানে একটা জানলা আছে ছোট। এটার থেকে এটার হাইট বেশি।

সঞ্চয়ন : আমার একটা জিনিস জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয়, আপনার ম্যাক্সিমাম ডিজাইনগুলো দেখতে গিয়ে মনে হয়েছে একটা লিনিয়ার কন্সট্রাকশন খুব ইম্পর্টান্ট।

খালেদদা : হ্যাঁ, লিনিয়ার কন্সট্রাকশন খুব ইম্পর্টান্ট । পুতুল খেলা নিয়ে analyse করেছিলাম, ওটা এখানে আছে তো, (পুতুল খেলার ছবি), এই যে রাউন্ড, রাউণ্ড, রাউন্ডটাকে আমি নিয়েছিলাম এই ভাবে, মানুষ আঘাত যখন পায় একটু বেঁকে যায়, আর যখন, আর আমরা যখন আনন্দ পাই, একটু বুক ফুলিয়ে,...ঠিক তার রিভার্স। এই যে কার্ভের ডিফারেন্স এটা তো পেইন্টিং-এর লাইনটাকে স্টেজে নিয়ে এলাম। দর্শক এমনি বোঝে-না, দর্শকের সাবকন্সাস-এ কাজ করে। সে যদি বলে ও বুঝে ফেলেছি, তাহলে কিন্তু ব্যাপারটাই নষ্ট। আমার কাজ হচ্ছে সবটাই সাবকন্সাসে তার মধ্যে কাজ করা। তার কাছে মনে হবে এটাই তো রিয়াল, এই তো ঠিক। কিন্তু ঠিক নয়। আমি ঠিকটা তার ওপরে ইম্পোস করছি, কায়দা করে তাকে শিখিয়ে দিচ্ছি। ব্যাপারটা এইভাবে হয়। এই যে আমি analyse করে লাইনটা দেখাচ্ছি, প্রথম হচ্ছে তিনটি ভাগ। তিনটি কম্পোজিশন। পরে বোধহয় একটা কম্পোজিশন হয়, প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা, তারপরটা টোটালিটিতে রাউন্ড । ওই দরজাটাই হচ্ছে মেন দুটোই। ঠিক এখানেও তাই, (শেষ সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে) এখানে সবচেয়ে ভোকাল হচ্ছে এই দরজাটা। যাওয়া আসা।

সঞ্চয়ন : একটাই animated.......

খালেদদা : একটাই animated......, আর এইটা এলিমিনেট করে কোন সময় যখন ও রিয়ালাইজ করতে থাকে, তখন ওই ব্যাকটা দম্ভটা কমে গিয়ে আলোটা কমে গিয়ে বিকেলের পড়ন্ত আলো, ওই সময় দরজাটা খুলে দেয়, খুলতেই এক্সপ্যান্স হয়, হঠাৎ মনে হয় আমার চেয়েও আরও জগৎ আছে। সামনে অনেক বড় জগৎ আছে। আর এ হচ্ছে ওই, assistant আমাদের দেবশংকর করল যেটা, এ তো উঠতি ব্যুরোক্র্যাট, সেইজন্য ওর তেজটা খুব বেশি। আর ও হচ্ছে পোক্ত ব্যুরোক্র্যাট, ও কিন্তু বুঝেসুঝে পরে ঠিক করল যে কাজটা ঠিক করিনি বোধহয়। এই ভাবনার থেকে কিন্তু, মোটের ওপর আমি করেছি।

সঞ্চয়ন : ফেরিওয়ালার মৃত্যু...

খালেদদা : ফেরিওয়ালার মৃত্যু সম্পর্কে আমি যেটা বলি সেটা হল, ডেথ অফ সেল্‌সম্যান নামে আমি একটা ফিল্ম দেখেছিলাম। তখন আমি খুব ফিল্ম দেখতাম। এটা বোধহয় লেট ফিফটিস-এ হবে কিম্বা আরলি সিক্সটিস-এ হবে, ফেরিওয়ালার মৃত্যু যখন দেখি। এলিটে দেখেছিলাম। মেন চরিত্র ছিল ফেডরিক মার্চ। একটা অসুবিধা ছিল যে, ছবিটা বুঝতে পারছি অথচ বুঝতে পারছিনা। দুটো কারণ। আমেরিকার accent সবটা পারতাম না নিতে, যদিও দেখে দেখে অনেকটা কাছাকাছি গিয়েছিলাম। কিন্তু খুব পাজলিং . আর এটা তো নাটক, তো ফিল্মে যখন করছে তখন একটু বদলাচ্ছে, কাজেই মাঝে মাঝে ওটা ধরতে পারছিলাম। ফেরিওয়ালার মৃত্যু যখন বাংলায় পড়ি, তখন ব্যাপারটা আমার কাছে একটু অন্যরকম পরিষ্কার লাগল। সেইটা করতে গিয়ে প্রথম আমাকে যেটা সাজেস্ট করেছিল, ওরিজিনাল সেটের ডিজাইনও আমার কাছে বোধহয় খুঁজলে পাব। সেখানে একটা দোতলা ছিল। ছেলেদের ঘরটা দোতলায়। এবং দোতলার থেকে ওপর থেকে বাবা মা র কাণ্ড কারখানা দ্যাখে। দুই ছেলেই দ্যাখে। তারপর যা reaction হওয়ার তা হয়। আমি দোতলাটা দিইনি। প্র্যাকটিকাল কারণে। আমার মাথায় একটা কাজ করে আমি যেটা ইমপোস করি দলের কাছে। এক তো কোনও হল নেই তোমার হাতে। তোমাকে আজকে দিল্লি, কালকে বর্ধমান, তারপর দিন কল্যাণী শো করে বেড়াতে হবে। শো করতে গেলে ছ ফুটের বেশি যদি কিছু করি ট্রেনে allow করবে না। আমাকে ম্যাক্সিমাম ছ ফুটের একটা দরজার ফ্রেম নিতে হবে। চার ফুটের নিতে পারলে সব থেকে ভালো। আমি যদি এরকম একটা দোতলা করি তাহলে প্রচুর জিনিসপত্র হয়ে যায়, তাহলে ক্যারি করতে অসুবিধা হবে। ক্যারিং কস্টটাও অনেক বেশি হয়। রাখার সমস্যা হয়। আমার কাছে তাই মনে হল দোতলা দেওয়া খুব জরুরি নয়। তাছাড়া কদিন পরেই ক্যাঁচকোঁচ সব শব্দ হবে। actor নড়াচড়া করলেই ক্যাঁচকোঁচ শব্দ হবে। শব্দ আটকানোর জন্য কত জল দেবে, কাজেই প্র্যাকটিকাল আসপেক্ট চিন্তা করে আমি ইন্সসিস্ট করলাম যে ওটা দেব না। দোতলা করবনা, আমি পাশের ঘরে করব। মাঝখানে যেন বসার ঘর, ওদিকে ছেলেরা, থাকে। এদিকে এরা থাকে। এবং তার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে ইনভিসিবল একটা বর্ডার আছে যেটা এই বাড়ির অংশ। যার পেছনে কিন্তু বিরাট বিরাট বিল্ডিং। একটা সময় যেন হামলে পড়ে। একটা সময় মনে হয় যেন এই এই করে ঘাড়ের ওপর পড়বে। যখনই পেছন দিকটা বেশি প্রমিনেন্ট হয়ে যায় তখনই মনে যেন পুরো সংসারটা যেন গ্রাস করবে। ওটাকে একেবারে পরিষ্কার পর্দা বানিয়ে তাতে কেটে কেটে গর্ত বানিয়ে, তলায় সাদা কাপড় দিয়ে ওখানে লাইট করা হত। তাতেই কিন্তু ব্যাপারটা এসে গেল। ওই যে সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়া ব্যাপারটা। সবটাই সব জায়গায় হয়-না। বহু কষ্ট করে academy-তে লাগাতে হয়। সাধারণত academy-তে শো বেশি হয়। আমি যখন সেট করি তখন আমার মাথায় academy থাকে, দলের ক্ষমতা থাকে, রাখার প্রবলেম থাকে। রাখার প্রবলেম হল পিছনে ত জায়গা নেই। আমি ডেপ্‌থ দিতে পারছি না। একেবারে ডেপ্‌থ পাচ্ছি না। ফলে একই জায়গা থেকে সাদা একটা কাপড় ঝোলাচ্ছি, আবার সামনের দিকে টেনে নিয়ে আসছি। লেভেলটা সেম হয়ে যাচ্ছে। তলা থেকে ফাঁক

দিয়ে লাইট বসিয়ে ওপর দিকে মারা হচ্ছে। এই করে জিনসটা দেখানো হচ্ছে। সমস্ত প্র্যাকটিকাল ডিফিকালটি কম্প্রোমাইসে আসতে হয়। আমি এখন যদি বিদেশে সেট করতাম তাহলে পুরো একটা ফ্রিডম পেতাম। কারণ ওরা স্টেজে রেগুলার করে। ওরা ঠিক করে নেয় আমি ছ'মাস বা একবছর বা দু'বছর করব। ...আমাদের তা তো নয়, আমাদের রোজই, তারপরে আরেক জনের শো আছে। হুড়মুড় করে গোটাও। এই ভাবনাটা মাথায় রাখলে না আমি কাজ করতে পারি না। এই ট্রেনিংটা আমার হয়েছে নিউ এম্পায়ারে। ওই নিউ এম্পায়ারের আদলেই কিন্তু আমাদের একাডেমি। অর্থাৎ সাইড লাইট খুব গোলমেলে। হঠাৎ করে চলে যায়, ফলে অর্দ্ধেক লোক যদি একটু পাশে থাকে সে দেখতে পায় না। একমাত্র সেন্টারের লোক সব দেখতে পায়। তো নিউ এম্পায়ারে আমরা কতটা সামনে আনতে পারি? পনেরো ফিটের ওপারে যেতেই পারি না। এই যে অসুবিধা, একাডেমিতেও ঠিক সে অসুবিধা। পনেরো ফিটের পিছনেও যদি আমরা যাই তাহলে কিন্তু একটা সাইড মারা পড়ে যাবে। তখনই কম্প্রোমাইস করতে হয় পিছন দিকে গুটিয়ে আনা। সেন্ট্রালাইজ করে নিয়ে আসা। এই সমস্যাটা আমাদের মাথায় সবসময় রাখতে হয়। এটা মাথায় রেখে কাজ করে আমি কিন্তু ...আমার ইচ্ছে মতো কোনও কাজ করতে পারি না। আমি করার সময় কিন্তু প্র্যাকটিকাল অ্যাসপেক্টটা ভাবি। এবং তার ফাঁক দিয়ে কতোটা ভাঙচুর করতে পারলাম, এবং আর একটা জিনিস হচ্ছে যে আমি শুধু abstract কাজ যে করি তা নয়। abstract কাজ করি, প্রতীকী কাজ করি। কিন্তু তোমরা যে কাজটা করছ, এই কাজটা আমি করি না। এই কারণে যে তোমাদের ভাবনাচিন্তা আমাদের থেকে এগিয়ে গেছে। দর্শকেরও কিন্তু ভাবনা চিন্তা এগিয়েছে। এর মধ্যে একটা রিয়ালাইজেশন আমার হয়েছে, যে দর্শকেরা কিন্তু এটা নিয়ে মাথা ঘামায় না। কালকেই আমি গৌতম হালদারকে বলছিলাম তিনটি জিনিস দর্শক চায়, একটা হচ্ছে ভালো নাটক, বা খারাপ নাটক যাই হোক, তারপর পরিচালক, তারপর অভিনেতা। তিনটি ছাড়া আর কিছু চায় না। আর কিছু দরকার নেই। ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক হল কি সেট হল কি পোশাক হল কি মেকআপ হল, বদারই করে না। আজকাল একটা ফ্যাশান হয়ে গেছে, বইয়ের প্রচ্ছদ এবং বাঁধাই ভালো। এটা বলতে হয়। প্র্যাকটিকালি দর্শক বদার করে না। সেজন্য আমার কাজের প্রতি একটা নিষ্ঠা নিয়ে কাজ করি। কোনও ফিডব্যাক আমি এক্সপেক্ট করি না। ফিডব্যাক আমি পাবনা কখনও। এবং আমি কোন দিনই পাইনি। যেটা পেয়েছি সেটা কিন্তু গটআপ। একেবারে বানানো কথা। তবে আমি বিশ্বাস করিনি তা। আমি করেছি, কারণ আমি মনে করেছি এটা পার্ট এন্ড পার্সল। আমার ভাবনা থেকে মনে হয়েছে সেইজন্য আমি কাজটা করি। যেমন, তারপরে এই নাটকের সেট যখন আমি করলাম, যে ফ্রেমগুলো আমি করলাম সেগুলো আমি দেখাচ্ছি অথচ দেখাচ্ছি না। অর্থাৎ ফ্রেমগুলোই প্রমাণ করে দেবে যে কে কোন ঘরে থাকছে।

সঞ্চয়ন : একটা জিনিস আমার দেখতে খুব অদ্ভুত লেগেছিল সেটা হচ্ছে যে দেওয়ালগুলো কালো হয়ে যাওয়া। এবং যেটা এই নাটকে...

খালেদদা : ইনফ্যাক্ট আমরা দরজা দিয়ে বেরচ্ছি, দেওয়াল দিয়ে বেরচ্ছি না। দেওয়ালটা ইমমেটিরিয়াল নাটকে। দেওয়ালে অসুবিধা হয়। আমার আনওয়ান্টেড

গিয়ে পড়ে, দেওয়াল দিলেই। ব্ল্যাক হলে কিন্তু সেটা পড়বে না। থ্রিলার যদি থাকে তাহলে একটা স্যাডোর দরকার হয়। ছায়াটা এই এই করে আসছে। আমি যদি দেওয়ালটা একটু ভাঙচুর করে দিই তাহলে তাতে আঙুলগুলো বেঁকেটেকে আসবে, তাতে লোকের মধ্যে একটা শিরশিরানি ভাব আসবে। কিন্তু এছাড়া আমার তো দরকার নেই। আমি দেওয়াল দিলেই একটা স্যাডো পড়ে যাবে। ওটা আনওয়ান্টেড। actor-কে আমি হঠাৎ ঢোকাব তার স্যাডো যদি আগে চলে আসে? লাইটের লোক হয়ত সেটাকে কভার করার চেষ্টা করবে। কিন্তু তার মাথায় এটা নেই, তার মাথায় একে আলোকিত করতে হবে। কিন্তু আলোকিত করতে গেলে তো স্যাডো পড়ে যাচ্ছে, সে খেয়াল নেই। এলেই আগে জানান দিল যে লোক ঢুকছে। যেখানে আমরা এই যে পাশে সিগারেট খেতে বারণ করি, আনওয়ান্টেড ধোঁয়াটা এসে পড়বে গায়। এই জন্যেই স্টেজের পাশে সিগারেট খাওয়া টর্চ জ্বালানো এগুলো বন্ধ করা হয়, এগুলো ডিস্টার্ব করে। দর্শকের দৃষ্টিটাকে ডিস্টার্ব করে এবং অন্য দিকে চালিয়ে দেয়। ভিন্ন পথে চালিয়ে দেয়। এই জন্য...আমি যে সাদা ব্যবহার করিনি তা নয়, কোথাও কোথাও আছে। যেমন ডাকঘরে আছে। ডাকঘরে তুমি দেখবে সাদা একেবারে সাদাই দেওয়া।...মোটের ওপর এই ভাবনা থেকে আমি কাজগুলো করি।

তৃতীয় যেটা আমি করেছিলাম ওদের মেঘনাদ বধ কাব্য। সেখানে একটা বহু আগে আমি ব্যবহার করেছিলাম সেটা আবার রিপিট করলাম। সেটা হল ফ্লোরটা কালো করে দেওয়া। এটা আমি স্বর্গীয় প্রহসনে করেছিলাম।.....

সঞ্চয়ন: এখানে একটা আপনি যেটা বলছিলেন যে যে এক্সাজারেসন অফ হাইট দিয়ে...কিন্তু এখানে আমি দেখছি যে দরজার হাইট এবং দেওয়ালের হাইট সবই সমান।

খালেদ দা: হ্যাঁ সমান। এখানে তফাৎ হলো যে এখানে আলাদা আলাদা ঘটনাটা ঘটছে। ফেরিওয়ালার মৃত্যুর মধ্যে কখনো হোটেল, কখনো বার, কখনো এদের প্রাইভেট চেম্বার। ছেলেদের থাকার ঘর। ওদিকে নিজেদের থাকার ঘর। বদলে বদলে যাচ্ছে। তার ফলে কি করছি দরজাটা বোধহয় একই হাইটে রেখেছি, সবটাই বোধহয় ছফুটের না সাড়ে ছ ফুটের আছে। ওইটা মাথায় রেখে যে, নিয়ে ঘুরতে হবে এবং সেইটি উইং এর গায় লাগিয়ে দেওয়ার জন্য। যেখানে উইং পাচ্ছেন সেখানে কালো একটা add করে দিয়ে, তার সঙ্গে ওইটাকে এগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কতোটা এগিয়ে কতোটা পিছিয়ে পার্থক্যটা এই সামনে পিছনের।

সঞ্চয়ন: এটা দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিলো উইংগুলোই যেন, স্টেজে ঢুকে ঢুকে কালো...

খালেদদা: হ্যাঁ কালো হয়ে যাচ্ছে। তখন আমার দরকার পড়ছেনা এই কারণে যে আমরা দেওয়াল দিয়ে তো চলিনা। সেটা আগেই বলেছিলাম একবার, একমাত্র হোঁচট খেলে আলাদা কথা, কিন্তু আমরা বেরোই দরজা দিয়ে। উঁকি মারি জানলা দিয়ে। জানলার সিগনিফিকেন্সটা একটা, আমরা কোথাও একটা জায়গায় একটু মুখটা দেখাতে চাইছি। একটু বাতাস চাইছি, কেউ উঁকি মারছে এটা আমার জানলা, আমার ভিতর থেকে বাইরেটা দেখতে পাচ্ছি, লোকে বলেনা এই ছেলেটাই আমার জানলা। সে অনেক খবর নিয়ে আসে। আমি যাচ্ছিনা, তার মানে আমাকে আমি লুকিয়ে

রেখেছি। সে খবরটা নিয়ে আসে। আমি জানলা দিয়ে দেখলে যেমন হয়, আমি সেইটা করি। দরজা হলে কিন্তু সবার কাছে উন্মুক্ত আমি। আমি বেরোলাম কি ঢুকলাম সবার কাছে উন্মুক্ত। কিন্তু দরকার নেই, এইটা ঢুকলো এইটা বেরোলো দর্শক মেনে নেবে। দর্শকের কোনো অসুবিধা হবে না, তুমি উল্টো পাল্টা না ঢুকলেই হলো। কোনটা বেরোবার আর কোনটা ঢোকার এটা ওর বাড়ি, এটা আমার বাড়ি, এইটা প্রথম তোমাকে এস্টাব্লিস করে দিতে হবে। একবার যদি এস্টাব্লিস করে ফেলো, আর কোনো অসুবিধা নেই দর্শক সঙ্গে সঙ্গে মেনে নেবে। এবং দর্শক জিজ্ঞাসা করবেনা দেওয়ালটা কোথায় গেলো, জানলা নেই কেন? কক্ষনো প্রশ্ন করবে না।

সঞ্চয়ন: আচ্ছা এই প্রসঙ্গে আমার খুব একটা অদ্ভুত জিনিষ জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করছে সেটা হচ্ছে যে ভারতীয় চিত্র শৈলীর মধ্যে এই ধরনের একটা রিয়ালিজম ইন টার্মস অফ ন্যাচারিলিজম না দেখিয়ে মোটিফ হিসেবে সিলেক্ট করা, মানে ওই দরজা যেটা আপনি বললেন: একটা ফ্রেম যাতে বেরোনোও আবার ঢোকাও যায়, প্রসেনিয়ামটা বিশেষত ভাবে একটা ওয়েস্টার্ন স্পেস...

খালেদদা: প্রসেনিয়ামের তো বিবর্তন ঘটেছে। প্রসেনিয়াম যখন এলো সেভেনটিন্থ সেনচুরিতে তখন প্রসেনিয়াম তো বাইরে থেকে ঘরে এলো। আমার বইটার মধ্যে এসব পাবে (বইটির নাম অভিনয়: শিল্পকলা) তাতে খুব ডিটেলে বর্ণনা করা আছে।

সঞ্চয়ন: আমার প্রশ্নটা হলো যে আপনি কেন প্রচুর উপাদান...

খালেদদা: আমি উত্তরটা দেওয়ার চেষ্টা করি, কেননা আমার মধ্যে তো ভারতীয় প্রভাব আছে ডেফিনিটলি। অনেক জিনিষ আমি পাশ্চাত্য থেকে নিই, কিন্তু আমার পরিপ্রেক্ষিত আমাকে...আমাকে প্রকাশ হবে ভারতীয় মতে। ভারতীয় ভাবধারায় আমাকে প্রকাশ করতে হবে, কেননা আমি ভারতীয় লোকের কাছে কথা বলছি। তার বোধগম্য করে কথাটা বলছি। তারই কথা বলছি। এখন যদি আমি প্যালেস এনে বসিয়ে দিই, তাহলে লোকের কাছে মনে হবে এ আমি কোথায় এলাম। এটা কি তাহলে ইংল্যাণ্ডে ঘটনাটা ঘটেছে। কিন্তু দেখা গেলো না, ওই ঘটনাটা ইংল্যাণ্ডে নয়। তখন দর্শক মুস্কিলে পড়ে যাবে। নাটকের ডায়লগ চলে যাচ্ছে অনেকখানি। এ কোথাকার জায়গা, কার বাড়িতে এরকম গেট আছে? এটা কি রাজভবনে আছে না রাজভবনের গেট তো এরকম নয়। লোকে এই ভাবনাটা ভাবতে শুরু করে।

রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত : সুমন মুখোপাধ্যায়

[আগ্রহী পাঠক হয়তো লক্ষ্য করেছেন, আমরা মূল যে জায়গাটা ধরতে চেয়েছি সেটা হলো, তরুণ প্রজন্মের দৃষ্টিকোণ থেকে রুদ্রপ্রসাদের নাটক এবং নাট্যকে বিশ্লেষণ করবার একটা প্রয়াস। সে ভাবনা থেকেই মনে হয়েছিলো তরুণতর প্রজন্মের উল্লেখযোগ্য নির্দেশক সুমন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তর একটি অন্তরঙ্গ আলাপচারিতা। প্রথামাফিক গৃহীত সাক্ষাৎকারে অনেক সময়তেই সুনির্দিষ্ট প্রশ্নের মধ্যে তা শেষ হয়। কিন্তু রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তর মতো পূর্ণাঙ্গ নাট্যব্যক্তিত্ব যিনি নাটকের রূপান্তর থেকে শুরু করে তার মঞ্চায়ন পর্যন্ত নিজেকে জড়িয়ে রাখেন, তাঁর কর্মকে অনুধাবন করতে গেলে একটু অন্য রকম কিছু করবার দরকার অনুভব করেছিলাম, ব্যক্তিগত একটি গবেষণা প্রকল্পের প্রয়োজনে দীর্ঘকাল তাঁর সান্নিধ্যে আসবার সুযোগে। এই বইটির বিন্যাসের দায়িত্ব পালন করতে এসে তাই প্রথমেই মনে হয়েছিলো রুদ্রপ্রসাদকে বিশ্লেষণ করতে তরুণতর প্রজন্মের ভাবনা চিন্তাকেই প্রাধান্য দেওয়া দরকার।
সেই ভাবনা অনুসারে স্থির করি সুমনের সঙ্গেই কথা বলা দরকার রুদ্রবাবুর। তাঁদের আলাপচারিতার অংশবিশেষ অনুলিখিত হলো।]

সুমন : আপনি একজন সংগঠক, নাট্যকার বা রূপান্তরকার, এবং অভিনেতা পরিচালক, কিন্তু অভিনেতা সত্তাটি খুব বেশি আনবো না আলোচনার মধ্যে। আমি কতোগুলি বেসিক যেগুলো হয় সাধারণত, বাদ দিয়ে যাচ্ছি। একটা ইনটারভিউ এর ক্ষেত্রে কতটা ইনোভেটিভ হওয়া যাচ্ছে সেটা একটা চিন্তা থাকে। সেখান থেকে ভাবছি, আপনার একটা যে কোনো প্রজেক্ট যখন তৈরি হয়, কোন ইম্পালসটা আপনি প্রথম পান? ওটা কি ডিফারেন্সিয়েট করে বিভিন্ন প্রজেক্টের ক্ষেত্রে নাকি ইটজ রিপিটস উইথ আ নিউ? কি ধরনের ক্রিয়েটিভ ইম্পালস পান? এটা কি কোনো ভাবে ডিফাইন করা সম্ভব?

রুদ্রপ্রসাদ : আসলে মানুষ হিসেবে কতোগুলো প্যাটার্ন আমার মধ্যে আছে। একনম্বর আমি নিজেকে থিয়েটারের ক্রিয়েটিভ লোক মনে করিনা। তার ফলে আমি সব সময় চেষ্টা করি কিভাবে যা আছে আমাদের ভান্ডারে, নান্দীকারে, বা একটু রিমোটলি বাংলা থিয়েটারের ভাণ্ডারে, সেটাকে আমি কিভাবে ভালো করে অর্গানাইস করতে পারি। এটা সব সময় আমার মাথার মধ্যে কাজ করতে থাকে। যেমন আগামীকাল ডিপার্টমেন্ট অফ কালচারে একটা মিটিং হবে ওই গ্রান্ট রিনিউয়ল বা নতুন গ্রান্ট ইত্যাদি নিয়ে। তো আমার যাদের সঙ্গে দেখা হয়েছে তাদের জিজ্ঞাসা করেছি তোদের কোনো application আছে নাকি? তার মধ্যে জেনে নিচ্ছি স্যালারি গ্রান্টে কার কন্টিনুইটির ব্যাপার আছে। তো

ইম্পালসতো নেই এর মধ্যে। এটা আমার রুটিন। as an organiser. আমি অফকোর্স নান্দীকারের কথাটা বললাম তার সঙ্গে বললাম যে এই এই গুলো যদি একটু দেখেন। তো এর মধ্যে আমার একটা প্যাটার্ন আছে, এটা একটা ছোট্ট উদাহরণ। এইটা দিয়ে বলতে চাইছি এইটা আমার সবসময় মাথায় থাকে। তেমনি কোনো প্রজেক্ট be it a project for a new production or project for women's theatre festival or a project for collaboration for institute for Indian languages যে কোনো কিছুতেই আমি কাজ করি তার মধ্যে, কি কি জিনিষ কাজ করে আমার মধ্যে সেইগুলো কনস্ট্যান্ট। আর সেইগুলো একটি স্টেডি ইম্পালস। সেইগুলো কনট্যিনুআসলি ফ্লো করে আমার মধ্যে। যেমন আমাদের দলের ছেলেরা, ... শো না থাকলে রোজ কিছু ছেলেমেয়ে they work as professional তো এই যে কতগুলো ছেলেমেয়ের মধ্যে আমি বয়ঃজ্যেষ্ঠ, তো ব্রেখটের কথা অনুযায়ী যে নিজের রুটি জোগাড় করতে পারেনা he must be an idiot. সেটা আমার খুব অহংকারে লাগে। ... এই যে আমাদের দলে এতোগুলো ছেলেমেয়ে আছে যে, তাদের মধ্যে বেশ কিছু আছে যে তারা যদি ইন্ডিভিজুয়লি বাজারে খেলতে নামে তাহলে they will be able to earn quite a lot, at least handsomely. কিন্তু তারা একটা গ্রুপের কাজ করে, থিয়েটার নামক বস্তু যেটার রেপলিকেসনস নেই। যেটার wider reach নেই। যেটার কখনই টার্নওভার বড় নয়। সেজন্য তারা চিরকাল কষ্টে থাকবে। আর সে চ্যালেঞ্জটা কনটিনিউআসলি আমার কাছে ইমপালস এর মতো কাজ করে। তার ফলে কি করে থিয়েটারে এই ছেলেমেয়েগুলো প্রফেশনাল হবে, যে ইয়াং ছেলেমেয়েগুলো ১২০০ বা ১৪০০ টাকা পায় তাদের কি করে ২০০০ টাকা দেবো। যে ৩০০০ পায় তাকে কি করে ৫০০০ দেবো। এরই সঙ্গে সঙ্গে আমি আমাদের এই পশ্চিমবাংলায় থিয়েটারে যে কতগুলো বিচ্ছিন্ন ব্যতিক্রম ছাড়া ভালো থিয়েটার হচ্ছেনা, এই কথাগুলো যতোবার বলি তখনই গোলমাল লাগে চারপাশে। তো সেই জায়গায় .. অবশ্য একটু পরে হয়তো আমি বলবো যে, নান্দীকারে আমার ধারণা 60s থেকে এখন ভালো থিয়েটার করি আমরা। আমার নিজের ধারণা। এবং গৌতমরা দেবশংকররা আমার থেকে বেটার নির্দেশক বলে আমি বিশ্বাস করি। সেটা কিন্তু স্নেহবশতঃ নয়। আমি বিশ্বাস করি তাই। I can prove that. তৎসত্ত্বেও সাধারণ ভাবে বাংলা থিয়েটারে বিক্রিবাটা খারাপ, অনেক সামাজিক কারণে। অনেককিছু গোলমালে সর্বক্ষণ সেইখানে মনে হয় যে কি করলে থিয়েটারটা আরো পাওয়ারফুল হবে। এই রকম অনেক গুলো কনসার্ন আমার মাথার মধ্যে আছে, আর তারই সঙ্গে কনসার্ন আছে কতোগুলো সোসাল জাসটিস। both at national level and at global level. যেগুলো কনটিনিউআসলি ইনফ্লুয়েন্স হচ্ছে। সেগুলো আমার কাজ করে। সবগুলো আমাকে কনট্যিনিউআসলি চালাতে থাকে যার জন্য আমি যেকোনো কাজ করি তারমধ্যে এই কাজগুলো আমাকে ভিতরে ড্রাইভ দিতে থাকে। যেকোনো কাজ। এটা আমাকে idle থাকতে দেয়না কখনো।

সুমন : তাহলে কি বলবেন সোসাল ইনজাসটিস বা গ্লোবাল সিচ্যুয়েসনই আপনাকে ইম্পালস দিচ্ছে। আরো স্পেসিফিক ভাবে যদি জিজ্ঞাসা করি তাহলে ... যদি আমি আর্থার মিলারের একটা প্রজেক্ট, আপনি পর পর আর্থার মিলার করলেন, কেন হঠাৎ আর্থার মিলার করলেন? যিনি আমেরিকান নাট্যকার, লিখছেন আমেরিকান ডিপ্রেসনের সময়। হঠাৎ আপনাকে কোথায় ট্রিগার করলেন তিনি যে আপনার মনে হলো যে কোন ক্রিয়েটিভ ইমপাল্‌স থেকে ডেথ অফ সেলস ম্যান বা ভিউ ফ্রম দ্য ব্রিজ করতে শুরু করছেন। এটাকে সে জেনারালাইজেশনের মধ্যে ফেলবো না, ডিপার কোনো ক্রিয়েটিভ ইমপাল্‌স আপনার মধ্যে কাজ করছে?

রুদ্রপ্রসাদ : বললাম না অনেকগুলো সোসিওকালচারাল কম্পোনেন্টস আমাকে হ্যারাস করতে থাকে। এগনাইট করতে থাকে, ড্রাইভ দিতে থাকে, সেই জায়গা থেকে আমি সব সময় দেখছি ... আমি প্রথম মেজর কাজ করেছি ১৯৭৫ এ। আন্টিগোনে। আন্টিগোনে যখন করছি তার একটু পরে ইমার্জেনসি ইম্পোজড হচ্ছে। আমি তো জানতাম না যে হবে। তারপরে হচ্ছে বাংলাদেশে শেখ মুজিব ডিকটেটরশিপ আসা ইত্যাদি। এটা ঘটছে। এই রকম যে কতোগুলো ঘটনা এর পরবর্তী কালে যখন ফুটবল করি তখন আমি দেখতে পেলাম আমাকে অনেক লোক বললো, যে, এই ফুটবল ফ্যানাটিসমটা অতো কিছু না। আপনি প্যারাবল অফ সোসাল ফ্যাসসম বলছেন কিন্তু অতো কিছু নয়। স্টেজে পতাকা গুলো উড়ছে ইত্যাদি এটা রিয়ালিটি নয়। তারপরে দুবছরের মধ্যে দেখা গেলো যে রিয়ালিটির তুলনায় আমারটা পেল্‌। কারণ বাস্তবে অনেক বড়বড় ফ্ল্যাগ দেখা যেতে লাগলো। একেবারে রাস্তা জোড়া। এবং তার কদিন আগেপরে দেখা গেলো যে ব্রিজেস প্যাটেলকে চুমু খেলো একটা মেয়ে। তারপরে ইংলন্ডে একটা মেয়ে উলঙ্গ হয়ে ফুটবলের খেলার মাঠে ঢুকে পড়লো। তখন আমার মনে হলো Terson যখন/ইফ্ করছেন তখন কিন্তু ইফ্‌টা করার সময় সর্বোর্ন ইউনিভারসিটির রিভোল্টটা, বার্কলে ইউনিভারসিটির রিভোল্টটা হয়নি। কিন্তু আমার কিরকম সিসমোগ্রাফিক পারসেপসনে তার কদিন পরে এই ঘটনা ঘটলো। এবং আমার মনে হলো I am all most profetic. though I didnot being liked proved true. কারণ যে পেইনফুল ঘটনাগুলো ঘটতে শুরু করলো সেগুলো আমাকে ভীষণ কষ্ট দিয়েছে। আমি যখন খড়ির গন্ডি কবলাম যখন করছি এবং লোকটাকে মেলাতে পারছিনা, বাদলবাবু পুরো লোকটাকে বাদ দিয়েছিলেন, আমি কিছুতেই সেটাকে জাস্টিফাই করতে পারিনা। তোমার যদি ইচ্ছে থাকে তাহলে ওটাকে বাদ দিয়ে তুমি নিজে একটা গল্প লেখ। ওরকম দরের একটা নাটক লিখেছে তার আর্ধেকটা কেটে নিয়ে আর্ধেকটা রিলেশনশিপ করে I didn't like it at all. কিন্তু আমরা তখন ওটাকে মেলাতে পারছিনা, ঠিক সেই সময় মরিচঝাপি ঘটলো, ওই সেই কতোগুলো লোক বাস্তুর সন্ধানে জল পেরিয়ে যাচ্ছে ইত্যাদি। বোধহয় আমার নানান ধরনের antenna গুলো কনস্ট্যাটলি সজাগ থাকে বলেই সব সময় দেখছি যে টাইমের সাথে একটা রিলেশনশিপ হয়। ফেরিওয়ালার মৃত্যুর ফেড মেমারি আমার আছে অসীমের

পারফর্মেন্স সম্পর্কে। জনৈকের মৃত্যু। আর আনফর্চুনেটলি মনে আছে শুধু মাত্র যে সিনটা ... মহিলার সঙ্গে যখন সে এফেয়ার করছে আরকি। সেটা আমার দোষ না অসীমের প্রোডাকসনের দোষ তা আমি জানিনা। ওটা খুব রগরগে করে একটা নীলসার্ট পরেছিলো মনে আছে। তা it did'nt touch me at all. মানে অসীমের প্রোডাকসনটা। তখন আমার বয়স কম কিন্তু। তারপরে যখন আমি নাটক খুঁজি নাটক খুঁজি তখন এইটা পড়তে পড়তে হঠাৎ একটা পয়েন্টে আমার মনে হলো অন্য ধরনের ফেরিওয়ালা তো রোজ আমি দশটা করে তাড়াই বাড়ি থেকে এবং তাড়ানোর পরে আমার চোখে জল এসে যায়, এই ছেলেটা কার ছেলে। আমি বললুম না আমার লাগবে না। আর সে ডেসপারেটলি প্রমাণ করার চেষ্টা করলো যে he is a good salesman. at once আমাকে ট্রিগার করলো, এবং ওইটা যখন ট্রিগার করলো। তারপরে আমি কতোগুলো জিনিষ দেখতে পাইনি। তা হলো, ফেরিওয়ালার মৃত্যু করার পরে মেঘনাদ বললো আমার শ্বশুর শাশুড়ি বললো যে, তাদের কথা বলা হচ্ছে। সুরজিৎ, মানে প্রতিদিনে লেখে যে ... আর কোনো একজন পুলিশ অফিসার, আমার নামটা মনে নেই, তারা বললো যে তারা সারারাত ঘুমোয়নি। নিজেরা আলোচনা করছে আমরা যেন আমাদের ছেলেমেয়েদের কখনো না বলি তোকে একটা কিছু হতেই হবে। এবং আমি নিজে দেখছি যে সামনের রো-তে বসে বসে যারা কাঁদছে, তারা সকলে নিজেদের অপূর্ণতা অর্থাৎ পেরেন্টস হিসেবে সেই জায়গাটা নিয়ে ভাবছে। অর্থাৎ ডেথ অফ সেলসম্যান হ্যাড আ নিউ বেয়ারিং ইন আওয়ার নাইণ্টিস অফ আ ডিফারেন্ট কান্ট্রি। তো, এইটা কি আমি কনসাসলি করেছি? আমি জানিনা। কতোগুলো আমার মধ্যে কনসাসলি কাজ করেছে। সব মিলে ওই ডেথ অফ সেলসম্যানের মধ্যে যে আমেরিকান ক্রাইসিসটা সেন্টারে আছে ফোকাল পয়েন্টে আছে সেটা এখানে আছে কিনা আমি জানিনা, ওখানকার লেসার ইস্যুস অনেক বিগার ইস্যুস হয়ে আমাদের এখানকার লোককে আনন্দ দিয়েছে। রিলেট করেছে। দেয়ার মাস্ট হ্যাভ বিন সাম থিং ইন দ্য প্লে দ্যাট হুইচ উইথাউট মাই নলেজ ট্রিগার্ড মি টু ট্রাই ইট আউট এবং যেটার মধ্যে একটা বড় কথা সেটা হচ্ছে এই সময়ের সঙ্গে কোথাও রিলেট করানো। আমার মনের মধ্যে অজান্তে কাজ করে যায়।

গোত্রহীন নাটকটা, ... গৌতমরা, স্বাতী ওরা সব রেগুলার নিজেরা ইংরাজি নাটক পড়ে, অধিকাংশ ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করেনা বেশি তাই ডেলিবারেটলি আরো বেশি শেক্সপিয়ার, মডার্ন ক্লাসিক্স এই সব পড়া হয়। মানে প্লে acting করে পড়ানো হয়। ইংরাজিও শেখা হয়। কারণ গ্রামার করে পড়লে ওরা পড়বে না। তো করতে করতে দে স্টাম্বল্ড আপ অন ভিউ ফ্রম আ ব্রিজ। ওরা জোর করতে লাগলো এটা করতেই হবে। আর আমি বললাম এটা অসম্ভব। ইটস আ ভেরি পাওয়ার ফুল প্লে। হ্যাঁ, স্বীকার করছি, এটা লার্জীল একটা প্রেমের গল্প। কিন্তু গ্রিন কার্ডের যে ক্রাইসসটা সেটা এখানে রিয়ালিটি না। এবেলা ওবেলা ওপার থেকে চলে আসছে, ওটা সেকেন্ডারি হতে পারে কিন্তু ওই চালচিত্র না থাকলে প্রতিমাটা বেরবে না। ... সো আই রিজেক্টেড। এখানে সেই ক্রাইসিস

নয় একেবারে। এটা রিয়াল হবেনা। আমি বুঝতে পারছি আমি না করাতে ওরা দুঃখ পাচ্ছে। তো হঠাৎ একদিন আমার মনে পড়ে গেলো আমার বাড়িতে জামিল ছিলো। তখন এখানকার আলট্রালেফট একটা গ্রুপ গিয়েছিলো জামিলকে ইন্টার্ভিউ করতে। একসময় ওরা বলে না, আমরা বাঙালিরা যা ভাবি আপনারা সেটা বুঝবেননা। তো জামিলের চোখটা হঠাৎই ফ্ল্যাশ করলো। আমি বাঙালি বুঝবোনা। আসলে যে জায়গা থেকে আমাদের এখানকার বাঙালিরা বলে না যে ওরা তো বাঙালি না ওরা মুসলমান। আর সেটা কি গভীর একটা কষ্ট দেয় যারা বাংলাকে ভালোবাসে, তাদেরকে। সেটা আরো পার্স্যু করলে দেখা যায় এখানে যখন শিখদের পেটানো হচ্ছিলো তখন শান্ত হয়ে যাওয়ার পরে আমরা চোখের দিকে তাকিয়ে দেখেছি তার মধ্যে একটা ভাব থাকে এই লোকটা কি আমাকে অবর্জাব করছে। আমরা যেমন নানা জাতের লোকের সম্পর্কে গল্প করি, এখন গোটা ইন্ডিয়ার লোকেরা আমাদের সম্পর্কে যেমন করে বঙ্ বঙ্ বলে থাকে। তো সেই জায়গা থেকে আমার মনে হলো বাঙালি মুসলমানরা এখানে এসে থাকে তারা কি একজ্যাক্টলি হিন্দু রিফিউজিদের মতো ফিল করে। and I thought no. ভেতরে একটা কিছু কাজ করে, এনি মোমেন্ট একটা কেউ কিছু advantage নিয়ে নেবে। যে তুমি কিন্তু মুসলমান এবং সেইজন্য কিন্তু নট ওয়েলকাম। তো সেই সাইকোলজি তে একটু বিজেপি, একটু অমুক করে নাটকটা দাঁড়িয়ে গেলো আর কি। অর্থাৎ ওই এন্টেনাগুলো কিন্তু আমাকে বারবার হেল্প করছে। বোঝাতে পারছি কথাটা।

সুমন : কিন্তু একটা জায়গা ডিফাইন করলেন যে আনকন্সাসলি আসছে, কিন্তু এটাকি কোনও কনসাস ইন্টার্প্রিটেসনের মধ্যে নেই বলছেন আপনি।

রুদ্রপ্রসাদ : আমি বলতে চাইছি যে কনসাসলি কতোটুকু ডিসিশন আমরা নিই। যদি বিজ্ঞানের কথা বলি দ্য প্রিন্সিপাল অফ আনসার্টেনিটির কথা যদি বলি অধিকাংশ মুহূর্তে ... আমি এই মুহূর্তে কনসাস ডিসিশনের কথা বলছিনাতো। কিন্তু আমার অনেক জায়গা থেকে হয়তো পর মুহূর্তে মনে হবে আচ্ছা এই কথাটা কেন আমার মনে আসেনি, টি.এস. এলিয়েট যাকে বলে কবিতার ক্ষেত্রে যে কিছুই সৃষ্টি হয়না আসলে একটা কেমিক্যাল ক্যাটালিসিস হয় আরকি যা তোমার মধ্যে আছে তা নতুন ভাবে ক্যাটালাইজড হয়। তা আমি বলতে চাইছি যে সাধারণভাবে অনেক ফ্যাকটার্স আছে since I am not academically discipline that gives me a great advantage. going beyond the usual project patarns. রিসেন্টলি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ান ল্যানগুয়েজেস এর সঙ্গে একটা কাজ করার কথা হচ্ছে, ওর মধ্যেও আমার ইম্পালসগুলো ... কিছু টাকা চাই আমার কিছু লোককে কাজ করাতে হবে আমায়, শুরু হয়েছিলো কি দিয়ে? না ভ্যালুজ স্টোরিজ দিয়ে। আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের ভ্যালু স্টোরিজ দিলে কিছু উপকার হবে কিনা। সারা পৃথিবীতে কতো ভ্যালুজ স্টোরিজ আছে, জড়ো করে এবং তারই সঙ্গে ভাষা শেখানোর ব্যাপার এই করে একটা ফুল প্রোজেক্ট বেরিয়ে এলো আমার। ওই

একটার পর একটা হতে হতে।

সুমন : এবার আমি একটা প্রশ্ন করছি, সাধারণত এটা একটা কনভেনশনাল কোশ্চেন তবু জিজ্ঞাসা করছি, একটা প্রশ্ন থেকেই যায় যে আপনি বিদেশী নাটকের রূপান্তর করেছেন, কিন্তু দেশজ নাটক নিয়ে বেশি কাজ করেননি। বিদেশের নাটক আপনাকে বেশি আকৃষ্ট করেছে, দেশের নাটক আপনাকে, মানে আপনি যে ইম্পালস গুলোর কথা বলছেন দেশের নাটক সেই ইম্পালসগুলোকে মেলাতে পারছেনা কোথাও। আর্থার মিলারের ১৯৩০ বা ৪০ এর বা আমাদের আগের শতাব্দীর প্রথম দিককার বা প্রথম ৫০ বছরের নাটক তুলে আনতে হচ্ছে আমাদের সোসাইটির সঙ্গে রিলেট করানোর জন্য। এই প্রশ্নটা আমি রাখতে চাইছি নতুন নাট্যকাররা কি এই পারপাসটা কি সার্ভ করতে পারেনি নাকি ট্রিগার করতে পারেনি কোথাও।

রুদ্রপ্রসাদ : আসলে অনেকগুলো মিলে। তার মধ্যে অনেকগুলো লুপহোলস হয়তো থাকবে। মাইট বি আমি পার্স্যু করিনি বলেই হয়তো লুপহোলসগুলো allow করেছি। একনম্বর হচ্ছে, যখন আমি থিয়েটার করতে শুরু করি অজিতেশের সঙ্গে, অজিতেশের নাটক একটা দুটো আমাদের হয়েছে। হে সময় উত্তাল সময়, তারপরে সেতুবন্ধন, এই রকম কয়েকটা নাটক নিজেরা করেছি। আর ফ্রানক্লি স্পিকিং those are no grade plays. সেটাতো আমরা as performers, as producers, as theatre workers, those were not sufficiently challenging, we tried it. ট্রাই করেও দেখেছি সাফিসিয়েন্টলি চ্যালেনজ্ করছেনা আমাদের। যেমন হে সময় উত্তাল সময়, কন্টেম্পরারি কথা হয়তো, এই নকশাল মুভমেন্ট, সিপিএম-এ কেন এতো বিভেদ, ইত্যাদি। তার সঙ্গে কৃষ্ণর যদু বংশ, মেলাতে পারছি হয়তো, কিন্তু মহৎ এক্সপেরিয়েন্স আমাদের কাছেও আসছেনা অতএব লোকের কাছেও যাচ্ছেনা। so this was very clear যে ঘরের নাটক দ্বারা চলবে না। আর চলবে না কেন? এই কারণে, বরাবরই আমরা খুব বেশি করে নাটক পারফর্ম করবো বলে আমাদের কথা ছিলো। এটা ... আমাদের ৬০ এ আমাদের শুরু ৬৫টিতে ... তখন আমাদের মতো অতো বেশি সংখ্যায় নাটক কেউ করেনা। ৬৫তে ইন্ডো পাক ওয়ারের জন্য ৩ মাস থিয়েটার পারফর্ম বন্ধ ছিলো, ৯ মাসে আমরা ১৩১টা পারফর্মেন্স করেছিলাম। ফ্যাবুলাস! ১৩১টা ৯ মাসে মাইন্ড ইট। দলটার বয়স ৫ বছর। তো এইটা আমাদের একটা টার্গেট ছিলো। হয়তো তার পিছনে আমরা প্রফেশনাল হবো এইসব মাথায় ছিলো। তারপর আমরা গাড়ি ভাড়া দেওয়া আরম্ভ করলাম। ইত্যাদি, ইত্যাদি। তো এইসব কনসিডারেশন গুলোর পিছনে আছে, যে আমাদের এমন একটা নাটক চাই যা ১) আর্টিসটিকালি আমাদের চ্যালেঞ্জ করবে। ২) আমাদের করলে তবেই লোককে করবে আর ৩) সেটা অনেকবার হতে পারবে।

আর সেক্ষেত্রে আর দেখতে পাচ্ছি যাদেরকে তার মধ্যে বাদল বাবু ... অজিতেশ বেঁচে

নেই এগুলো কোট করাও বড় মুস্কিল। ... তবে ফ্রাঙ্ক হওয়াই বোধহয় ভালো।

সুমন : হ্যাঁ অবশ্যই।

রুদ্রপ্রসাদ : and Badal babu was Ajitesh's cup of tea, atleast this I can say. কাপ অফ টি না হলে সেটা করার মানে হয়না। ওদিকে মোহিত মনোজ তারা তখন কতোগুলো দলের পকেট। তাদের সঙ্গে আমাদের, মানে অশোকদের সঙ্গে বিভাসদের সঙ্গে, শ্যামল ঘোষদের সঙ্গে এদের মধ্যে একটা ... আর আমরা ... খানিকটা শাইনেসের জন্য মিশিনা, আর খানিকটা লাইনের লোক নই বলে মিশিনা। আর তার জন্য আমাদের খুব হাইব্রাও বলে পরিচিতি ছিলো। তবে ব্যাপারটা নট এন্টায়ারলি সো এ্যটলিস্ট। কারণ অজিত তো ভীষণ ওপেন গোছের লোক ছিলো। ও হাইব্রাওয়ের লোকই নয়। আমি নাহয় একটু টেটিয়াপনা করি। কিন্তু অজিতেশ was very open. তো যাইহোক ওইজায়গা থেকে মনোজ বিভাসের পকেটে, তো we didnot have any playwrite. যাকে ধরে আমরা লেখাবো অন্তত। যে একে দিয়ে লেখালে আমাদের কাজ হয়। সেদিক থেকে আমাদের গতি হচ্ছে যে নাটক পড়লে আমাদের ধাক্কা লাগে। যে নাটকের জন্য আমাদের কারোর কাছে যেতে হবেনা, তো that was one mejor reason বিদেশী নাটকে যাওয়ার জন্য। এর পরবর্তীকালে আমি নাটক লিখিনি কেন, ADOPT করেছি। লিখিনি কেন? এই প্রশ্ন যদি ওঠে সেক্ষেত্রে আমি বলবো অজিতেশ বেঁচে থাকতে এবং এখনো নান্দীকার এমন একটা থিয়েটার গ্রুপ যেটা প্রফেশনাল হতে চায়। যে প্রত্যেককে পে করে মানে মান্থলি বেসিস। খুবই কম হলেও মান্থলি বেসিসে পে করি আমরা। সেরকম একটা দল চালাতে গেলে যে কি করতে হয়, একি ভাবছে ওকি করছে ও কেন থাকছে না, ও কেন কম আসছে, আর সেগুলো আনফর্চুনেটলি অধিকাংশই আমার ওপরে এসে পড়ে। এইসবের ফলে আমি কখনোই সময় পাইনি, নাটক লেখবার। অবসর পাইনি। থিয়েটার প্রোডাকসন করতে গেলে আমি ফেল করে যেতেই পারি কিন্তু ওটা আমার কম্পালসন। নাটক লেখাটা আমার কাছে কম্পালসন হয়ে ওঠেনি আর পরবর্তী কালে সেটা সাইকোলজিকালি ... দূর একটা স্ট্রাকচার থাকলে পেরে যাবো বাবা। কিন্তু এখন এটা ... so I didnot gave myself a chance. এমনকি এই যে এই শহর এই সময় ... এটা একেবারে কালেকটিভ লেখা। কিন্তু তার মধ্যে কতোগুলো কথা আমি না থাকলে হতোনা। আমি সাক্ষী মানে, ৪৩ এর মন্বন্তরে আমি যখন শিশু প্র্যাকটিকালি। মানে বটুকদার গানের অভিজ্ঞতাগুলো চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। আমি তো সুভাষদাকে মিছিলে দেখেছি। সেই কবিকে আমি তো মিছিলে কবি হয়ে উঠতে দেখেছি দিনের পর দিন। so the whole of agony much of West Bengal much calcutta I have lived it, I have shared it, actively. ফলে ওই নাটকটা কিন্তু আমি না হলে লেখা হতো না অনেক কিছু। কিন্তু তবুও আমার মনে আছে, "কত্তা মশায় কত্তা মায়েরা অনেক কথা ছিলো যে ডানার শেকড় হবে শেকড়ের ডানা। কথা ছিলো সবাই সবার প্রতিবেশী হবে।

সমাজতন্ত্র হবে।" ... এই কথা ছিলো বলতে বলতে কনক্লুড করতে যাচ্ছি, আমি বলে যাচ্ছি, ওরা বলছে আরে লিখে ফেলুননা। আমি লিখতে পারছিনা, কারণ আমার লেখার হ্যাবিট নেই। একটা নাট্যকার হিসেবে লেখার হ্যাবিট নেই। আমি বলতে পারছি কিন্তু লিখতে গেলে ... তখন আমার মনে আছে একদিন স্বাতী, গৌতম, দেবশঙ্কর এরা বললো কি করছেন আপনি যাননা একা গিয়ে বসে লিখুন। মনে আছে তখন আমি এই অন্ধকার রুমে বসে বসে লিখছি। লিখতে লিখতে ব্যাপারটা পালিশ হলো। এই যে আমি যেটুকু লিখতে পেরেছি এই সময় বা অন্যের নাটককে সাহায্য করার সময় যতটা পেরেছি এগুলো সবটাই কিন্তু ওই থিয়েটার মেকিং এর যে কম্পালসন সে কম্পালসনের দ্বারা I have accepted the chalange, tried to do things in my own way. এবং ভালোমানুষের যে শঙ্খপুরের সুকন্যাটা লেখা its also challenge from the point of view of theatre, mind you not out of যে আমি একটা নাটক লিখবো কি করে সেক্ষেত্রে কি ভালো নাটক খুঁজবো। তখন আমার মনে হলো এই নাটকটা জাস্টিস করে আমরা অন্যায় করে ছিলাম। সেই সময় রঙ্গনাতে যখন ল্যাজেগোবরে হয়ে যাচ্ছি আমরা আর গনেশ বাবুরা আমাদের বলছেন চলে যাও। এবং ওদের সেটের লোকেরা সেট ভেঙ্গে দিচ্ছে রোজ দুবেলা। দুপুরে এইসব করছে আর বিকেলে আধ ঘন্টার মধ্যে আমরা শো করবো। এইসব চলছে তখন। একবার আমরা থানায় যাচ্ছি, একবার ওরা থানায় যাচ্ছে। আজকে যদি ভালোমানুষের টেক্সটা পড়ে বলবো লুম্পেনাইজেসন অফ ব্রেখট। honestly, this is the word that I cant avoid. শঙ্খপুরের সুকন্যাতে দেখা হচ্ছে ইয়াংসুন আর সুইটা। দেখা হচ্ছে শেষের দিকটায়। তখন বলছে যে কি ভাবছেন আপনি, "বৃষ্টির আওয়াজ বড় বেশি। প্লেনের শব্দ গেলো না। ... আপনার কি মনে পড়ে পাইলট হওয়ার ইচ্ছা আর নেই। "আর আমাদের ফার্স্ট ভারসনে কি হয়েছিলো "না আপনি ওকে বিয়ে করতে পারেন না। আপনার কি সেই বৃষ্টির রাতের কথা মনে পড়েনি।" ... তুমি জানোনা, লেটমি বি ভেরি ফ্রাঙ্ক। আমার তো ওইসব গুলো করার ব্যাপারে প্রতিবাদ ছিলো কিন্তু I was a good volentier. তো আমার মনে আছে একদিন ওই কমারশিয়াল রেডিওতে যে প্রোগ্রাম করতাম আমরা। বিবিধভারতী। তো সেই প্রোগ্রামটা ... অজিতেশ কেয়া আমি বসে আছি সেই প্রোগ্রামটা শুনবো বলে, আমি পাশের ঘরে চলে গেলাম। আমাকে বললো তুমি শুনবে না, আমি বললাম না। this is not necessary Nandikars survival. তো সেই জায়গায় থেকে আমার মনে হয়েছিলো থিয়েটারের ক্ষতি করেছি আসলে এটা করে। ... আমার মনে আছে এঘরে বসে বিরাট তর্কাতর্কি হচ্ছিলো। ওটা দারুণ হিট প্রোডাকসন। তো আমি বললাম give me two days time. বলে আমি খাতা পত্তর নিয়ে দেখালাম বাংলা থিয়েটারে এতো ইভেস্টমন্ট এর আগে কখনো হয়নি। টেস্ট ক্রিকেটে পনেরো হাজার কাউন্টি। ভালোমানুষ বলে। অথচ হাউস ভ্যালু হচ্ছে ৬০০০/৭০০০। তো এটা কি? এটাকে হিট বলবে কেন তুমি? এই এতো বড় বড় বিজ্ঞাপন। আমি বললাম বিজ্ঞাপনে কি মে দিবসে শ্রমিকদের ডাকছো, আর জামাই ষষ্ঠীর দিনে জামাইদের ডাকছো। মানে একেবারে রিয়্যাল কমারশিয়াল গ্যানজাম আরকি।

তো সেটা আমার মনে হয়েছিলো থিয়েটারের দিক থেকে নান্দীকারের দিক থেকে অন্যায়। লোকে মনে কি রেখেছে না রেখেছে, আমি তো জানি। so I started এবং তখন অত্যন্ত যত্ন করে adopt করে এবং ... সময়টা ততোদিনে খারাপ হয়ে গেছে বাংলা থিয়েটারে। কিন্তু কতোগুলো হয়েছিলো, ওই জামিল টামিল সব মিলে। আমাদের মতো করে ব্রেখট করা, ইত্যাদি। আর অপর দিকে, একজন জার্মান এখানে পড়াতেন সে আমায় চিনতোনা। সে একবার বম্বেতে বলেছিলো এতোভালো ব্রেখটের প্রোডাকসন আমি দেখিনি। ইস্টজার্মানিতেও দেখিনি। তো that way it was a short of a correction of ourselves, কম্পালসন কিন্তু থিয়েটারের। নট মাই ডিসায়ার টু বি ড্রামাটিস্ট, সেই জায়গা থেকে নয়। অর্থাৎ টু কাট ইট সর্ট, যে যে প্রয়োজনে যে যে কারণে বিদেশী নাটকগুলো আমরা করেছি, তার ও পর থেকে পরবর্তী কালে নগর কীর্তন আমাদের নিজেদের লেখা নাটক। এই শহর এই সময় আমাদের নিজেদের লেখা নাটক। স্বজনবাদীয়ার ঘাট হবে যেটা সেটা আমাদের নিজেদের লেখা নাটক। এখন আমরা আসতে আসতে ইক্যুইপ্ট হচ্ছি, আমাদের নাটক না দিলেও একভাবে করার। তুই যে তিস্তা পারের বৃত্তান্ত করলি, তোর মধ্যে যে ওপেননেস ছিলো, আমি গোড়া থেকে কন্ভিসন্ড as an individual and as a groupman যে আমাকে এমন নাটক চুজ করতে হবে যে নাটক আমাকে ভীষণ ভাবে চ্যালেঞ্জ করবেই।

সুমন : একটা ফ্রেম ওয়ার্ক মোটামুটি পাওয়া গেছে, এবারে আমি একটু ডিরেকটার রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত কে প্রশ্ন করবো। যে আপনি কি ভাবে রিহারসল শুরু করেন এটা কি প্রতি নাটকের ক্ষেত্রে একই রকম একটা পদ্ধতির অনুশীলন ঘটে নাকি কিম্বা যদি বলি যে ফেরিওয়ালার মৃত্যু আর এই শহর এই সময় এই দুটি নাটকের শুরু কি একভাবে হয়েছিলো। নাকি দুরকম পদ্ধতিতে হয়েছিলো। নাকি প্রতিটা নাটকে একটা বিশেষ পদ্ধতি আপনি এডপ্ট করেন নাকি it changes from play to play.

রুদ্রপ্রসাদ : একেবারে গোড়া থেকে আমরা দেখেছি শুনেছি যে ভাবে সেই ভাবে চলতো। একটা টেক্সট সেটা পড়া। তার থেকে আস্তে আস্তে মুভমেন্টে যাওয়া, ইত্যাদি ইত্যাদি, সেই জায়গা থেকে . . .থিয়েটারে তো সবসময় কতোগুলো অদ্ভুত জিনিষ ঘটে, মানে of hear and now এর যে খেলাটা থাকে। আমার প্রথম মেজর কাজ আন্তিগোনে। এই নাটকের ব্লকিংটা আমার করা। আমার মাথায় ছিলো। মানে ওটা আমি ওয়ার্কআউট করিনি অন স্টেজ। দিনের পর দিন আঁকতে আঁকতে যেটা আমার কাছে ক্রিস্টালাইজড করলো সেই মুভমেন্টগুলো আমি দুটো তিনটে কালার্ড পেন্সিলে করে নিলাম। তার ফলে পুরো মুভমেন্ট কিন্তু অজিতেশের নয় ওটা আমার মুভমেন্ট। এবং সেটা ওই লোকগুলো দিয়ে করিয়ে নেওয়া। কিন্তু সেটা অন প্রিন্সিপল আমার খারাপ বলে মনে হয়। খুব খারাপ পদ্ধতি বলে আমার মনে হয়। মানে একটা জ্যান্ত হিউম্যান বিং সে কিভাবে মুভ করবে সেটা আমি আগের থেকে বলবো কি করে। কিন্তু সাম হাও ওটার ক্লাসিকাল বন্ডেজ সবটা

মিলে হয়তো আমার ভাবনার সঙ্গে বা একসঙ্গে বহুদিন কাজ করেছি বলে কেয়া অজিতেশের ভাবনাতে অনেক এম্প্যাথি ছিলো বলে হয়তো ওদেরকে কোথাও খটকা দেয়নি। they could easily accept those movements. কিন্তু সেই দিনগুলো পুরোনো দিন আমার কাছে। since 2nd half of 80s তারপর থেকে টোটালি ইম্প্রোভাইজ করে নাটক করা। সেটা ফুটবল থেকেই খানিকটা। কিন্তু সেখানেও আমি অনেকটা ইনিসিয়েটিভ নিয়েছি। কিন্তু তারপর থেকে যখন আমি নান্দীকারে ট্রেনিংটাকে বেশি করে ইম্পরটান্ট বলে মনে করলাম, এবং কিছু ইয়াং লোকেদের পেয়ে গেলাম যারা এই ট্রেনিংটাতে আনন্দ পাচ্ছে, এবং বিশ্বাস করছে। কারণ আমাদের এল্ডার জেনারেশন যারা তারা এটা বিশ্বাস করলেও বিকজ অফ ল্যাক অফ প্র্যাকটিশ এন্ড হ্যাবিট একদম পুরোনো হ্যাবিটস বাই হার্ট, আর একদিকে নতুন হ্যাবিটের জন্য শরীর তৈরী নেই আবার করবো . . . যাই হোক সেইটা থেকে আরম্ভ হয়ে গেলো। শেষ সাক্ষাতকারে একটা জিনিষ যেটাকে লোকেরা ভালো বলে, সেটা হচ্ছে চেয়ার নিয়ে খেলা। অর্থাৎ একটা অর্ডারের মধ্যে ঘরটা আছে, গোটা সাত আট চেয়ার। একটা সোফা একটা ডিভান ইত্যাদি। এবং পরে সেটা হেল্টারস্কেলটার হতে আরম্ভ করলো, এধার ওধার তারপর তার থেকে একটা করিডোর তৈরি হয়ে যায়। যেটার মাঝখানে ওই ডাক্তারটা থাকে আবার পরবর্তীকালে ওইটা পুরো ওইভাবে সাজিয়ে দিয়ে চলে যায় একটা লোক। এইযে জায়গাটা এইটা পুরোটা ওইখানে করতে করতে হলো। মাথার মধ্যে আছে যে এইগুলো আছে, ওই করিডরের আইডিয়াটা টেক্সটে আছে। কিন্তু ওইটা পাবো কি করে। সেটা আগে থেকে ওয়ার্ক আউট না করে, দুমদাম। যেমন একটা জিনিষ একটা দুটো টুকরো বললে বোঝা যাবে, একটা ক্রুসিয়াল জায়গা এলো যখন গৌতমকে দেবশঙ্কর বললো, কার কথা বলছেন ওই মহসিনের কথা বলছেন, যে লোকটাকে নিয়ে প্যাঁচ খেলা হলো, ও তো মরে গেছে ছমাস হলো। মানে এতক্ষণ সেটা নিয়ে ব্ল্যাকমেল করছিলো। তখন ও জাস্ট কোলাপ্স করে। পরে গিয়ে আবার লজ্জা পেয়ে উঠে পড়ে। এটা করতে হলো। এবং শেষকালটায় ওটা আস্তে আস্তে ছেঁড়ে এর মাঝখানে ওইটা একটা পিক পয়েন্ট। যখন ও পরে গেলো, ওটা একটা খুব ইম্পর্টান্ট মোমেন্ট। এইটা অনেক বলেছে পড়ে যায় কেন। আমাকে শম্ভুদা একবার বলেছিলেন, ওই যে একটা কবিতা, চিরায়মানা কবিতাটায় হঠাৎ একটা জায়গায় বলছেন, যেমন আছ তেমনি এস আর কোরোনা সাজ, তারপর হঠাৎ একেবারে ক্লাসিকাল গাইয়ের মতো, চূড়ান্ত বিলম্বিত করে লয় তালটা রেখে আবার ফিরে আসেন। এটা ছাড়বার ক্ষমতা থাকলে তবে একটা লোক করতে পারে। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম শম্ভুদা এটা কেন করলেন, উনি বললেন তোমার ভালো লেগেছে কি? আমি চুপ করে আছি, তোমার ভাল লাগলে ঠিক আছে না হলে না। এটা আমার হঠাৎ মনে হলো কি করবো বলো। এর ব্যাখ্যা দিতে পারবোনা। আমি যে ব্যাখ্যা দেব, সেটা টেকনিকাল ব্যাখ্যা হবে, তেমনি ওখানে যে ঘটনাটা ঘটলো ওই গৌতমের পড়ে যাওয়াটা, তার আগে অনেক রকম ছিলো, চেয়ারটা ধরে ফেলা, মাথায় হাত দেওয়া, যেগুলো সবই ক্লিশে কিন্তু। সেগুলো চিনি আমরা। আর এটা ছিলো একটা অচেনা, লোক, হঠাৎ নাম্ব হয়ে গেলো। এটা ভালো লাগলে এক্সট্রিমলি

ভালো লাগবে, নাহলে না। কারণ যার লাগবে তার কিন্তু এই জায়গা থেকে লাগবে, চেনা পরিধির বাইরে সে হাঁটতে চায়না। ইমাজিনেশনের ওই জায়গাতে মানুষে মানুষে ডিফার করে। যখন মানুষ ইমাজিনাশনকে বেঁধে রাখতে রাখতে এমন অভ্যস্ত হয়ে গেছে আর তার বাইরে সে বেরোতে পারেনা। তুই নাটক করতে গিয়ে দেখেছিস নিশ্চই যে অনেক লোককে তুই কম্যুইনিকেট করতে পারছিসনা। সে বেঁটে করে ফেলেছে নিজেকে। সে আর কিছুতে বেরবেনা। কম্যুইনিকেট করছেনা। সেরকম জায়গা থেকে এইযে নোবলওয়ার্ডস জায়গাটা সেটার রসটা আমরা পেয়ে গেছি কিছু লোক। ফলে আমরা কিছুতে নিজেদের বাঁধতে পারিনা। আর আমাদের প্র্যাকটিকাল ট্রেনিং এর জায়গাটা হচ্ছে ওই প্রোডাকসন করতে। একটা ক্যারেকটারকে চারজন পাঁচজন করে করে যাচ্ছে। ওরকম না যে অনেকে ট্রাই করায়, কিন্তুই মনে ঠিক আছে কাকে দেবো। কিন্তু এটা না। দেখা যাক না এই লোকটার ভেতর থেকে কিছু বেরোয় কিনা। তারজন্য একদিন শুভাশিস যে নানান কারণে আমার ওপর রেগে ছিলো তার একটা কারণ হলো এই রকম, ও এই ফেরিওয়ালার মৃত্যুতে সুমন্ত যে পার্টটা করে ওই যে ছেলেটা খুব সাকসিড করলো, চরিত্রটার নাম ভুলে গেছি, তা সেই রোলটা,. . . শুভাশিসকে নিয়ে আমার দুঃখ ছিলো ওর মধ্যে কিন্তু একটা পাগলা এক্টর ছিলো। কিন্তু শুধুই পাগলা ছিলো। যার মধ্যে মহাদেবের ধ্বংস আছে আর তারই সঙ্গে পা টি ঠিক তুলে, রেখে দিয়েছে, কি ব্যালান্স। সেটা না থাকলে তো আর মহাদেব হওয়া যায়না। তার ফলে একদিন আমি বলেছিলাম আচ্ছা তোমাদের এইরকম হয় কেন আমি যা বলবো তাই খারাপ। কোনোটাই কি আমি একটা ঠিক কথা বলব না। আমার মধ্যে দুঃখ ছিলো, ওর মধ্যে একটা ক্ষমতা ছিলো কিন্তু ওই বাঁধনটা অন্যেরটাও এক্সেপ্ট করলো না নিজেও বাঁধন নিলো না। তার ফলে ও কখনো ভালো এক্টর বলে পরিচিত হলো না। অথচ হতে পারতো। পোটেন্সিয়াল ছিলো। আমার খুব কষ্ট ছিলো ওর কেন নাম হচ্ছেনা। গৌতমের খালি নাম হবে কেন? তা সেসময় একদিন ও যখন করছে ট্রাই, সামান্য একটু করেছে আমার ভীষণ ভালো লেগে গেলো। ওর নাম হবেই এটা করে। সো আই ডিসাইডেড যে তুমি এইটাই করো। ও বলল, যে পার্টটা আমি করছি, লোমানটা, ওইটা আমি ট্রাই করবো। ওর হয়তো পরবর্তীকালে মনে হতে পারে ওই ভালো রোলটা আমি নেব, কিন্তু আমার হিস্ট্রি দেখলে দেখবে যে আমি সবসময় ছেড়েছি। আমি কক্ষনো আগ্রহ দেখাইনি পার্ট করার জন্য। অজিত থাকা কালে, পরেও। তারপর থেকে আর অভিনয় আসতোনা জোর করলেও। মানে অভিনয় করবে না এরকম জায়গায় আসতে আসতে চলে গেলো। তো এইরকম অনেক গুলো জায়গা থেকে ইম্প্রোভাইজ করতে গিয়ে আমাদের অনেক সময় অনেক জায়গায় এই রিস্ক গুলো থেকে যায়। কিছু লোক আশা করে যে তার রোলটা হবে, কিন্তু সে আর অনুসন্ধানের চ্যালেঞ্জটা শেষ অবধি নিতে পারেনা।

সুমন : কিন্তু আপনাকে স্ট্র্যাটেজি একটা সময় নিতেই হয়, তখন কি কোনো ইমেজ বা কোনো . . .

রুদ্রপ্রসাদ : ওগুলো ক্রিস্টালাইজ করে বোধহয়। যেমন শঙ্খপুরের সুকন্যায় ওটাতে

ভীষণ ভাবে ইম্প্রোভাইজ করে করা হয়েছে, সেন্ট্রাল ইমেজটা ছিলো পাওয়ারের ইমেজ। ওই ঘরানঘিঞ্চিটা। এটা শুরু থেকেই হঠাৎ মাথার মধ্যে ঢুকে যায়। শুরুতে আমি বলেছি এটা থাকবে এটা সেন্ট্রাল ইমেজ। মেটাফরটাকে আমার চাই। ওটাকে নিয়ে নানান খেলা ওটা কনস্ট্যান্ট রয়ে গেলো। কখনো কখনো কোনোকোনো নাটকে এরকম হয়।

সুমন : সব নাটকেই কি এরকম ইমেজ বা মেটাফর কাজ করে,

রুদ্রপ্রসাদ : করে বোধ হয়। যেমন ফুটবল আবার করলাম। ফুটবলের ভ্যালিডিটি কি? এই জায়গা থেকে ধরতে গিয়ে অনেক তর্কাতর্কি হলো নিজেদের মধ্যে। কিন্তু এই প্রোডাকসনের সেন্ট্রাল পয়েন্টটা হচ্ছে নান্দীকারের ব্যান্ড অফ বয়েজ এন্ড গার্লস আছে। যাদের শরীরটা বেশ ভালো। অর্থাৎ যারা নাচতে পারে, গাইতে পারে, তার সঙ্গে আমাদের সাজানোর ক্ষমতা খানিকটা বেড়েছে। এবং সঞ্চয়ন আছে যে খানিকটা কালার এবং অন্য সমস্ত ডেকরের কাজ গুলো করতে পারে। তো আমার স্টার্টিং পয়েন্ট হচ্ছে আমার স্ট্রেংথ। ফুটবল ইজ ভেহিকিল ফর দ্যাট। বোঝাতে পারছি কথাটা? নাটকটাতো আছে, এবার ওটাকে আপগ্রেড করে কিছু জায়গায় রিলেট করবো আজকের সময়ের সঙ্গে। সেটা টেক্সটের কাজ। করেওছি কিছুটা। বাকিটা হচ্ছে এ নাটকটা সাতাত্তর সালে যাদের নিয়ে করেছিলাম, এখনকার ব্যান্ডটা অনেক বেশি . . . তারা ভীষণ ভাবে নিজেদের স্টেজে প্রকাশ করবে, আর সেই প্রকাশটা হলেই মজা লেগে যাবে।

সুমন : এটা না হয় একটা স্ট্রেংথ থেকে আপনার আসছে। কিন্তু প্রথমে যে আলোচনায় আমরা ছিলাম এই সামাজিক যে এন্টেনা গুলো আপনার কাজ করে কন্টিনিউয়াসলি, কন্টিনিউয়াস সাসটেঙ্গ অফ ইম্পালস। সেক্ষেত্রে ফুটবল যখন আবার নতুন ভাবে করছেন, তখন সেটাও আবার কাজ করছে না অনলি সেক অফ স্ট্রেংথ।

রুদ্রপ্রসাদ : সমস্তটা মিলে মিশে। ওগুলো হচ্ছে আমার সাজানো কথা। আর মিলেমিশে যে কথাটা সেটা হচ্ছে আজকের টিভি সিরিজের সঙ্গে আমরা কি ভাবে কম্পিট করবো। যেমন আমাদের এখনকার নাটকগুলো অধিকাংশই রিয়ালিজম থেকে দূরে সরতে চেষ্টা করছি। একটা নাচিয়ে যে কান্ডটা ঘটাতে পারে স্টেজে, একটা গাইয়ে যেটা ঘটাতে পারে। সেই জায়গাটাকে আমি কি করে থিয়েটারে কি করে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট করি। কিম্বা রিঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট করি। যার ফলে ফুটবলের মধ্যে সেই সম্ভাবনা আছে। অর্থাৎ আজকের এইযে চমকদার কালচারাল রিয়ালিটি যেটা সেটা বার করার জন্য ফুটবলের মতো প্রোডাকসন খুব হেল্প করতে পারে।

সুমন : এস্থেটিকালি যদি আমাকে কোথাও লড়তে হয়, ...

রুদ্রপ্রসাদ : তাহলে আমাকে ওর পাওয়ার কালার, ওর ভিজুয়াল, ওর মিউজিকালিটি এসব নিয়েই . . .

সুমন : আবার আর একটা দিকে দেখছি যখন মিলার করছেন, ঠিক ৯০ শতকের গোড়ার দিকে তখন ভীষণ ভারবস। সেখানে ইমেজ, আপনি যে ক্যাটাগরির কথাগুলো বলছেন, ফুটবলে যেগুলো আছে, বা অন্যান্য নাটকে যেমন এই শহর এই সময়, ভিজুয়ালটার যে ফিজিকালিটি, সেখানে ফিজিকালিটি নিশ্চয়ই আছে কিন্তু সেগুলো মাচ ভারবস। তো

আপনি কি এখন মনে করছেন এই ভারবসিটি টা দিয়ে আর দর্শককে . . .

রুদ্রপ্রসাদ : না আমি সে ভাবে ভাবেনি। আর সত্যি কথা বলতে কি একভাবে তো এই শহর এই সময়তো কথা। কিন্তু কথার সঙ্গে নাচ মিলে যায়, এখন আমার এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে যে ৭৭ এর পরে অজিতেশ চলে যায়, আন্তিগোনে আমি করেছি। লোকে ভালো বলেছে। ফুটবল আমি করেছি লোকে ভালো বলেছে। ৭৭ থেকে, মিড ৮০ পর্যন্ত আমি যা কিছু করেছি ভালো কাজ স্ট্যান্ড আউট করেনি। এক ব্যতিক্রম আর মাননীয় বিচারক মন্ডলী। যদিও আমার ধারণা ব্যতিক্রম যদি ১০ বছর আগে করতাম অনেক বেশি চলতো। ওটার মধ্যে যে ট্রিমেন্ডাস ইনোভেটিভনেস এবং পাওয়ার ছিলো আনফর্চুনেটলি সময়টা খারাপ হয়ে গেলো। যখন লোকে মজা কম পায়, গপ্পোর আঁঠি চোষে বসে বসে। মানে যেটা চলে সেটা কেন চলে তার কোনো অংক নেই। এছাড়া অধিকাংশ কাজে কোনো এক্সপ্লোশন ছিলোনা। সেকেন্ড থটে আমার মনে হয়েছে যে দলটাকে লিডার হিসাবে আমি ইনহেরিট করি। যে দলটা অজিতেশ চলে যাওয়ার পরে, আনে ফুটবল এবং আন্তিগোনে। অজিতেশ থাকাকালীন আমি করেছি। এবং যদ্যপি অজিতেশ ফুটবলে পার্ট করতো, একটা শো ছাড়া কোনো শোতে ভালো পার্ট করেনি কিন্তু। ওই যে পার্টটা ও করতো। হি হেরিটেড দ্যাট রোল। I provoked him so much যে ও ফ্যাবিউলাস কান্ড করেছিলো। থিয়েটার বলেই আর রইলো না। কিন্তু আদার ওয়াইজ ও খুব খারাপ করেছিলো কারণ খুব খারাপ মনে করতো রোলটাকে। আর তদ্দিন ওর ভিতরে ওই দলে থাকবে কি থাকবে না ইত্যাদি কাজ করতে শুরু করেছিলো। অলরেডি হি ওয়াজ ফিলিং লোনলি। অলরেডি যাত্রায় যেতে আরম্ভ করেছে। তার ফলে হি ওয়াজ নো লংগার দ্যাট অজিতেশ হু ইউজড টু লিড। স্ক্যাটার্ড হয়ে যাচ্ছে লোকটা। কিন্তু ও আছে। একটা স্ট্রাকচার আছে। সেই স্ট্রাকচারে আই এম স্টিল দ্য সেকেন্ড ফিডিল। এমনকি পাপপুণ্যর যখন প্লে রিডিং হচ্ছে দলে আর তারপরে ও তো পারফর্মার। তো. সে যতই গোলমাল চলুক। ওতো আর্টিস্ট। আমার থেকে অনেক বড় আর্টিস্ট। আমায় বলছে খোকন তুমি কোন পার্টটা করবে, আমি বললাম আমার ঘরানা অন্য। আমি আজ পর্যন্ত কোনোদিন বলিনি, এটা ডিরেকটারের ব্যাপার, ও বললো আমি বন্ধু হিসেবে তোমাকে বলছি, আমি বললাম না। ভেতরে অভিমান ছিলো। কারণ সওদাগরের নৌকাতে আমার যে পার্টটা করার ছিলো যেটা নিয়ে আমি রিহারসল করেছি। রাধারমণকে দিয়েছিলো ও করতে। রাধারমণ ডিরেকট করছিলো ও নিজে করলো পার্টটা। এবং অজিত কিছু বললো না। যে তুমি ভুল করছো, এটা খোকনকে দেওয়া উচিৎ। রেডিওয়োতে আমি করেছি। রিহারসলে আমি করেছি, যখন আবার ডিরেক্ট করা হলো তখন গোলমাল লেগে গেছে দলে। কিন্তু আমি একটা কথাও বলিনি। স্বেচ্ছায় আমি অনেক কিছু ছেড়েছি। কিন্তু if I am convinced as a team man.এটা আমার কাজ করে। শুধু নারদের লয়ালটির জায়গা থেকে পারিনা। সেই জায়গা থেকে আমি টিম ম্যান বলেই আমার দলের প্রয়োজনে ফুটবল এবং আন্তিগোনে করেছিলাম। আমার সঙ্গে কন্ডিশন ছিলো আমাকে তিনটে নাটক ডিরেক্ট করতে হবে, অজিতেশ পারছিলো না। এমনকি অজিতেশ চাইছিলোনা ফুটবল হোক। ও বলছিলো

এটা ভালো নয়। এতে ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগান লেগে যাবে। কিন্তু inspite of aparant apathy to the production, till we were together, and togetherness brought the best out of me. এরপর আমি ৭৭ সাল থেকে দলটা চালাতে আরম্ভ করলাম একা তখন কিন্তু আমি এই গ্রুপটার মধ্যে। আমি চালাচ্ছি, সব ঠিক, কিন্তু এই গ্রুপটা তো আমি চিনি না। তারফলে, একবছরের মধ্যে আবার ভাঙলো, কারণ যে লোকেরা অজিতেশের বিরোধিতা করেছিলো তারা আমার বিরোধিতা করলো। কারণ তারা বোঝেনি কেন বিরোধিতা হয়েছিলো। তারপরে আস্তে আস্তে একটা হোমোজিনাইটি এলো, তখনই কিন্তু আবার আই ফেল্ট ফিসন ওয়াটার, এন্ড দ্যাট ওয়াজ মিড অফ 80s. আবার কিন্তু আমি গ্রুপ ম্যান। এখন যখন আমার নাম ডিরেক্টর থাকে, আসলে আই এম দ্য সিনিওর মোস্ট। I am the eldest. কিন্তু আমি একা ডিরেক্টর না এটার। সেই জায়গাটাতে আবার ফিরেছি তাই নান্দীকারের কাজটা আবার করতে পারি।

সুমন : তার মানে আপনি বলছেন ডিরেক্টর হিসাবে আপনি . . .

রুদ্রপ্রসাদ : ডিরেক্টার হিসাবে আমি ভালো কালেকটিভের লোক।

সুমন : কিন্তু কালেকটিভিটিরও তো একটা ক্রিয়েটিভ অ্যাসপেক্ট আছে।

রুদ্রপ্রসাদ : usualy সেটা হয়না তো। এখানে অনেক সময় কালেক্টিভিটিকে আমাকে বাদ দিতে হয়। যেমন একটা পয়েন্টের পরে কিছু কিছু লোককে নিয়ে ইম্প্রোভাইজেসন বাদ দিতে হয়। কিন্তু যতটা সম্ভব হেটারোজেনাস কোয়ালিটি, ম্যাকসিমাম কালেকটিভিটিটা যাতে হয় . . .,।

সুমন : কিন্তু এই বহুস্বর কে তো একটা স্বরে বাঁধতে হবে।

রুদ্রপ্রসাদ : আমি একটা কথা বলেছিলাম আমি ওটা বিশ্বাস করি। যে when I am most insignificant, অথচ কাজটা হচ্ছে then I am the best.আসলে সেই বাড়ির কর্ত্তাই ভালো যাকে হাঁকডাক করতে হয়না।

সুমন : যেমন ধরুণ স্তপতনওকভ বলেছিলেন ডিরেক্টার ইস আ প্রিজম। actor থেকে আলোটা এসে আবার ...

রুদ্রপ্রসাদ : absolutely. তবে ওদের ক্ষেত্রে ওটা সুবিধা আছে ওইটা বলা এবং করা। আফটার অল ওদের প্রফেসনাল স্ট্যাটাসটাতো দিয়েছে সোসাইটি।

সুমন : আমাদের ডিরেকটাররা কি এটা দাবী করতে পারেনা? আমি, মানে আমি ক্রিয়েটভলি একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি, যেমন পিটারব্রুক রিসেনটলি একটা বইতে বলেছেন যে ডিরেক্টার আসলে কি, যেমন ফ্রান্সে বলা হয় কোরিওগ্রাফার বা একেকটা দেশে ডিরেক্টারকে একেকরকম ভাবে বলা হয়। উনি একটা মদের কারখানায় বসে বলেছেন যে ডিসটিলার, মানে ডিসটিল করে যে, এটা কি মনে হয়? আমাদের পরিবেশে যারা থিয়েটার করছি বা এমেচার বা প্রফেশনাল সবাই, এরকম কোনো উক্তি করাটা কি বিলাসিতা?

রুদ্রপ্রসাদ : নিশ্চয়ই একভাবে হয়। শম্ভু মিত্রর কাজের মধ্যে কোথাও একটা আনমিস্টেকেবলিটি ছিলো। সেটা কি শুধু সাজানো কথা। শুধু গলার একটা ধরণ, I don't think so, আসলে আমাদের যেটা মিসিং ফ্রম দ্য সিন এবং ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং ইট

উড ইনক্লুড পিটার ব্রুক ইন দ্যাট ক্যাটাগরি, দিস পিপল আর নট থিয়েটার ফিলসফার। একটা ডিরেক্টারের মধ্যে একটা ভিসন অফ লাইফ সেটা ছোট বড় যাই হোক। পিটার ব্রুকএর কাজ আমার সিন্থেটিক লাগে। তার কারণ হচ্ছে এটা হচ্ছে not infong by a human philosophical over view or a child with a mind who is questing things বক্তব্য থাকতে পারে প্রশ্নও থাকতে পারে, কিন্তু কোনো বিশিষ্টতা কোথাও থাকবে যেটা জীবনের সব কিছুর সঙ্গে প্রশ্ন করে, রিলেট করে। শম্ভু মিত্র যখন রাজা, রাজা ইডিপাস একসঙ্গে নেন, কোনো চমকের জায়গা নয়, কোনো জায়গা থেকে সত্যি করে অন্ধকারকে এক্সপ্লোর করা। অর্থাৎ লোকটা সময়, স্থান, এই সবের দ্বারা আলোড়িত হয়ে একভাবে একটা কথা সে যদি ফিলসফার হতো একভাবে লিখতো। একটা বই লিখতো, একটা মোনোগ্রাফ লিখতো।

সুমন : আমি যেটা জানতে চাইছি আপনার কোন ভিশনটা, যেটা আপনি বলছেন শম্ভু মিত্রর একটা ফিলসফিকাল ভিশন ছিলো;

রুদ্রপ্রসাদ : ওগুলো এতো ইনসিগনিফিকেন্ট মানুষের কাছে...

সুমন : আমার কাছে সিগনিফেকেন্ট, কারণ doing theatre is part of my job.

রুদ্রপ্রসাদ : আমার দিক থেকে ... যেমন আমি, ধরো একটি ছেলে কিছুদিন হলো কম আসছে, সকলেই নিশ্চয়ই একইভাবে কষ্ট পাচ্ছে, কিন্তু আমি এর পেছনে লেগেই আছি, সে বহুদূরে থাকে, আমি ফোন করছি তার পাশের বাড়িতে। তুই একটু আসবি আমার বাড়িতে, what thats mean, আসলে একটাই পয়েন্ট, আমি কখনো ছাড়ি না। এই না ছাড়ার ফলে দুটো ঘটনা ঘটে, অর্থাৎ, you are able to see more pain allarround, I can persive lot of pain in me. তার ফলে এই জিনিসটা আমাকে সর্বক্ষণ তাড়িত করে। সকাল থেকে রাত্তির পর্যন্ত রাস্তাতেও তাড়িত করে এখানেও করে। আমরা কি করলাম আমাদের জীবনটাকে নিয়ে। সকালে খবরের কাগজে পড়লাম বুশ একটা বক্তৃতা দিচ্ছে যে নর্থ কোরিয়া আর ইরাক যদি কোনো ধরনের অস্ত্র ধরে আমরা ওদের টেররিস্ট বলে ঘোষণা করবো। তারপরে বলছি ইউ এন ও তে বসে আমরা কথা বলবো। সো এইগুলো আমার কাছে আর হায়েস্ট কনসারন। the pain that continuously inflicting on others and ours. এই যে হিউম্যান ওয়েস্ট, এইগুলো প্রতিমুহূর্তে আমাকে, এর ফলে আমি হয়তো এতো কথা বলি, যার জন্য আমি হয়তো নাট্য একাডেমিতে কখনো যাই কখনো যাই না। গেলেই খালি ঝগড়া করি। কারণ আমি কিছুতেই বলতে পারি না, আচ্ছা ঠিক আছে যা আছে। দিস রিয়ালিটি আই ক্যান নেভার accept. সেইটা আমাকে ভীষণ তাড়িত করে। ফলে আমি সেই কাজ করতে চাই যে কাজ সবসময় ওইসব কথা কোন না কোন ভাবে সবসময় বলে।

সুমন : গোত্রহীন নাটকটা যখন আমি দেখলাম শেষ দৃশ্যে গিয়ে use of slow motion. আমার মনে হলো এইটা underlined একটা কমেন্ট অন দ্য হোল পারফেমেন্স। এইটা একটা জাম্প অফ দ্য রিয়ালিস্টিক প্লেন অন দ্য প্লে টু সাম ... একটা অন্য জায়গায়।

রুদ্রপ্রসাদ : ওটা ব্যাখ্যাটা আমি পাইনি, করার পরে পেয়েছি। যেমন aparently

GOTRAHIN is a realistic play, আবার at the same time is a non realistic play. যেমন আমি যে ভাবে হাঁটি, কোন লোক্‌টা ওভাবে হাঁটে। তার কারণ হাঁটার সময় আমি ইম্প্রোভাজেসন করতে করতে আমি ভেবেছিলাম এই লোকটার ক্যারেকটারিস্টিক কি? সেটা হচ্ছে একটা শুয়োরের মতো আর একটা সিংহের মতো। তো ধর স্বাতী যে করে ও একটা ইঁদুরের প্রোটোটাইপ নেয়। তো actualy এগুলো কিন্তু একেবারে নন রিয়ালিস্টিক জায়গা। গৌতমের মুভমেন্ট একেবারে একটা হাতির মতো। এরকম জায়গা থেকে আমাদের কিন্তু অন্য জায়গায় যেতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু তাহলেও নিশ্চয়ই বাঁধনের তফাৎ আছে। তাহলে শেষের ওখানটায় ওরকম ভাবে কেন করলাম। ওই যে রিয়ালিজমকে ভাঙবার যে ... ওই যে বলছিলাম যে আজকের থিয়েটারকে সারভাইভ করতে গেলে কিছুতেই রিয়ালিজমে থাকতে পারছি না। আমাকে অনেক বেশি মিউজিকাল ভিজুয়াল, থিয়েট্রিকাল, ফিজিক্যাল, মোর পাওয়ার ফুল কিছু করতে হবে। আর যদি একটা বড় এক্টার পারে পাশের এক্টার কি করে পারে। তার জন্য আমার বেশি করে মুভমেন্ট রিয়ালিজ্ম এর মধ্যে ঢোকাতে চাই, সেটা আমি কি কি ভাবে পারি। সেটা হয়তো মাথার মধ্যে কাজ করেছে। এরকম অনেকগুলো জিনিস মিলে কিন্তু আসলে ওই টি.এস.এলিয়েটের মতো একটা জিনিস ঘটে। এবার ওইখানটায় কি হলো শেষটায়। শেষটায় ওই যে করতে করতে আমরা ওই ভাবে নিয়ে যাচ্ছি, ওর বডিটাকে ঘরের মধ্যে নিয়ে গেলো এইরকম একটার পর একটা কোনো রিদম ফাঁদলাম, সেই রিদম বাজতে বাজতে যাচ্ছে। শেষকালে হঠাৎ করে ওইটা যখন দাঁড়িয়ে গেলো, বাজনা থামিয়ে দিলাম তারপরে আবার বাজনা দিলাম, তখন মনে হলো এইটাতে বেশ একটা ভালো লাগছে। একটা কমেন্টারি তৈরি হয় without going out of text. সেটা হলো কিন্তু ওইভাবে। কিন্তু হওয়ার পেছনে পেছনে প্রক্রিয়া গুলো বোধহয় ওই অতো গুলো চাওয়া বা না চাওয়া মিলে।

যেমন ফুটবলে, শেষটায় কি করবো কিছু পাচ্ছিলাম না। সব সাজিয়ে ছিলাম শেষটা কিছু নেই। আর ওরিজিনাল টেক্সটে কি আছে আমার মনেও নেই। শেষ কালে করতে করতে মনে হলো তেহাইতে নিয়ে গিয়ে ফেলি। ঘুরিয়ে বৃত্তাকারে ইন্ডিয়ান ক্লাসিক্যাল মিউজিকের মতো। যেমন ওই গানটা বাবাকে তোর বাবাকে তোর রেফারি বারবার এসেছে। প্রথমে একসুরে, তারপরে আর একসুরে, তৃতীয় বারে আর এক সুরে। ওই চ্যাংড়া গানটা একসময় গম্ভীর হয়ে যায়। তেমনি ওইখানে হরিকে নিয়ে খেলা শুরু হলো, এবার যদুকে নিয়ে খেলা শুরু হলো। it gose on and on. আজকের যুগের লোকেদের অশ্বত্থামা হয়ে যাওয়া। খেলেনা কেউ খেলা দেখে। এই জায়গাটা নিয়ে করছি। তো কি করা। তো করতে গিয়ে যেটা দাঁড়ালো, anger আছে, ট্রানসেডেসন আছে, দেখা যেটা কি কি অপসন আছে, আর্টে কি কি অপসন দেয়। যেখানে ভীষণ স্যোসালি এলার্ট কিছু ঘটনা ঘটছে, আমি সোস্যাল ইস্যুটাকে কিছুতে এড়াতে পারবো না। যদি না এড়াতে পারি তখন আমার কি কি অপসন আছে অ্যাঙ্গার, ট্রানসেন্ডেসন, আর না হলে কনটিন্যুইটি। কেন না আমি মনে করলাম ঋত্বিক ঘটক যখন ওই শেষ কালে ওই 'মেঘে ঢাকা তারা' তে আবার ওই

ছেঁড়া জুতোটা পরে তখন সাইকেলটা ট্রানসেন্ড করে যাচ্ছে।

সুমন : এবার যে থিয়েটার পার্সপেক্টিভে আসব, আপনাকে যদি সোস্যাল সায়েন্টিস্ট বলি কারণ ডিরেক্টার সোস্যাল সায়েন্টিস্টের মতোই কাজ করে, তার একটা ভিশন আছে, এখানে আমি বলছি বর্তমান পার্স্পেকটিভ যদি ধরা যায় তবে পোলিটিক্যাল অ্যাটমোস্ফিয়ারের কথা আপনি বলেছেন, আর আপনি নান্দীকারের একটা ইভোলিউসনের কথা বলেছেন, যেখানে আপনি সেকেন্ড ফিল্ড থেকে আসতে আসতে আর একটা অর্গানাইসেসনের মধ্যে এলেন যেটা আপনার কাছে মনে হয়েছে অনেক বেশি ভায়াবেল এবং এক্সপ্লরটরি একটা ... সেখানে মনে হয় যে পোলিটিক্যাল অ্যাটমোস্ফিয়ার ... কারণ আপনি প্রথমে বলে দিয়েছেন যে আপনি সবসময় স্টেট, সরকারী মনোভাব সরকারী নীতি এবং থিয়েটার এবং পোলিটিক্যাল ইম্পালস সেইটা কিভাবে আপনি ডিফাইন করবেন, ধরুন যে, দু'দশকের আমি যদি এটা একটা মুভমেন্ট বলি একটা মেজর মুভমেন্ট হয়েছে পোলিটিক্যাল সিচুয়েসনে, মানুষের মনন, ... যেখানে একটা চ্যানেল ছিলো সেখান থেকে ৪৭টা চ্যানেল বুম আপ করলো, এবং সো কল্ড গ্লোবালাইজেসন ঘটলো। এইটার মধ্যেখানে আপনি থিয়েটারকে কি ভাবে প্লেস করবেন, how you define theatre in this perspective? গ্লোবালিইজেসন সরকারী মনোভাব এবং সরকারী নীতি এবং রিসেন্টলি পেরিয়ে যাওয়া নাট্যমেলা ... আপনি যেহেতু awar of the global changes and political situation. ...

রুদ্রপ্রসাদ : এই প্রশ্নের উত্তর সত্যি আমার জানা নেই। আমি যদি খুব প্রিসাইসলি বলতে পারতাম, যে এগুলো হচ্ছে গ্রে এরিয়া, ইত্যাদি গুলো যদি বলতে পারতুম তাহলে আমি হাউস ফুল হতে পারতুম আমার ঘরে এবং বাইরে। আলটিমেটলি আমি যে দেখাবো আমার asset আমার anger এবং pain, not my analisys or my insight, or my dream. মানে এমন ভাবে আজকের রিয়ালিটিটা আমাকে বাঁধছে, সাম্প্রতিক দুটো ঘটনা, একটা হচ্ছে ট্রেড সেন্টার ডেমলিসন, আফগানিস্থানে যেটা চলছে এখনো, এবং আর একটা হচ্ছে, ICC. এক্ষেত্রে ১০০ % কনভিন্সড যে আফগানিস্থান নিয়ে এতো কেচ্ছা কেলেংকারি, তার ভেতরে যে পারসেপসন এবং অন্যান্য ... পাকিস্তান এক ভাবে ভলান্টিয়ার হতে চাইছে, ইন্ডিয়া হতে চাইছে। তার মধ্যে কে কার ইকোনমিক পোলিটিক্যাল মাইলেজ, রাশিয়া যে রোলটা নিচ্ছে, এইসবকে বলে মাইন্ড বগলিং মানে কোন দিশা পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ আমি কনভিন্সড যে আফগানিস্থানের আসলে ওসামা বিন লাদেন বনাম জর্জবুশের লড়াই না। লড়াইটা পরিষ্কার যে, যেখানে কোনো এঙ্গুলারিটি থাকবে কেন জর্জ বুশ বলবে যে ইরাকে বা নর্থ কোরিয়াতে নিউক্লিয়ার ওয়েপন হলে আমরা তাদেরকে ঠেঙিয়ে বিষ ঝেড়ে দেব, ইন্ডিয়া বা চায়না বা পাকিস্তান সম্পর্কে বলতে পারবে না কেন? তো এই যে এক্সট্রিম হিপোক্রেসি গোটা সোসাইটিতে আমার তো মানে মাইন্ড বগলিং লাগে যখন দেখি টনি ব্লেয়ার এখন ইংলন্ডে সবথেকে পপুলার। ভাবতে অবাক লাগে একটা লোক দাসের মতো কথা বলে যাচ্ছে, পুরো আমেরিকার দালালের মতো কথা বলে যাচ্ছে। এই রকম জায়গায় আজকে পুরো একটা ওয়ার্ল্ড স্ট্রাকচারে কোনো

এঙ্গুলারিটিস থাকবে না কোন সাইন্টিফিক একিউরিওসিটি থাকবে না। কোনো ধরণের ডিসারবসন হবে না ডেভিয়েসন হবে না, আমি যেমন ভাবে চালাবো সেইভাবে চলবে, সেক্ষেত্রে আফগানিস্থান ইস থর্ন ইন দ্য ফ্লেস। তার সঙ্গে আছে তেল, একেবারে ইকনমিক কনসিডারেসন। এই মুহূর্তে আমেরিকায় ওয়ান পয়েন্ট কতো পারসেন্ট একটা ডিপ্রেসন আরম্ভ হয়ে গেছে। কাজেই ওদের এসব করতেই হবে, কারণ যে স্ট্যান্ডার্ড ওরা নিজেদের জন্য সেট করেছে সারা পৃথিবীর পপুলেশনের ৬ % আমেরিকান। আর ৪৮ % হলো ওয়েলথ। সেই অংশে অভ্যস্থ যারা, সে জাত এছাড়া যাবে কোথায়। প্লেন লিভিং হাই থিংকিং কোনো দিন বুঝতে পারবে না। এসব আমরা জানি। কিন্তু জানি কই আসলে? তার জন্য রাগ দুঃখের প্রকাশ হয় কোথায়? আজকে আমাদের থিয়েটারে হয় না।
আইসিসি ইন্ডিয়ান বোর্ড, ইংলন্ডের বোর্ড, এরা সবাই মিলে খেলাটা পরিস্কার, আমরা সকলে জানি এত লোভী এরা প্রত্যেকে কেউ এটা থেকে বেরবে না। কাজেই কোন ঝগড়া নেই আসলে। এই প্রত্যেকটা ক্রিকেটিং কান্ট্রি, তাদের বোর্ড এপাশে ওপাশে আছে, কিন্তু এই তালে ঠিক আছে ওখানে মাল আছে। আমরা সকলে জানি কিন্তু, আসলে কার হাতে বেশি ভোট থাকবে। সেটা নিয়ে একটা খেলা আছে। একেবারে নগ্ন গ্রিডি লোক, সেখানে ক্রিকেট নেই। সেখানে শচিন তেন্ডুলকার কত বড় শিল্পী সে সব কোন কনসিডারেসন নেই। ক্রিকেট মাস্ট গো অন মাই ফুট। গোটা পৃথিবী তা নিয়ে কথা বলে যাচ্ছে? অথচ কথাটা কতো সহজ কথা। সেই জায়গায় হোয়াট ইস দ্য কনক্লুসন? কনক্লুসন এস হিউম্যান সিভিলাইসেন যা করছে করুকগে, মরুকগে, কিন্তু আমাদের থিয়েটার ইস ফেলিং টু রাউস কিউরিওসিটি উইদিন আস অ্যান্ড অ্যাক্রস দ্য ফুট লাইট। আওয়ার থিয়েটার ইস ফেলিং টু জেনারেট দা সাইন্টিফিক টেম্পার। কোয়েশ্চেন করো। আমরা প্রশ্ন করি না। একটু পরে সব কথাটা কত সহজ হয়ে যায়। উই উইল বি দা ওয়ার্স্ট কাইন্ড অফ কনফর্মিস্ট, যারা নিজেরা কনফ্রন্ট করছে না, কনফ্রন্ট করে যাচ্ছে অন্য লোক। থিয়েটার যদি এই কাজ না করতে পারে ইন ইটস মাইক্রো ওয়ে, ম্যাক্রো ওয়ে, স্মল ওয়ে, হোয়েদার থ্রু আ স্টোরি অফ ইন্ডিভিজুয়াল হোয়দার কম্বিনেশন অফ স্টোরি অফ ইন্ডিভিজুয়াল অর আ সোসাইটি, এই সমস্ত স্তরে যতক্ষণ না পর্যন্ত স্পিরিট অফ ডাউট, স্পিরিট অফ কোশ্চেন, স্পিরিট অফ সাইন্স এই জিনিসগুলো ক্রমেই মিশিং হয়ে যাচ্ছে, আর থিয়েটারের মতো আর্ট এবং হিউম্যান ফেনোমেনান এছাড়া ভালো হতে পারে না।
... আসলে WE are playing ball, যতটা রেবেল ছিলাম অতোটা রেবেল নই বোধহয় আর। আমরা ওই ব্যাক্তিগত আলোচনায় কি করবো বল এরকম কখনো কখনো বলে ফেলি। সব থেকে স্যাড হচ্ছে যখন আর বলার মতো সেই বন্ধুত্ব পরস্পরের মধ্যে থাকে না, ...
ওই রঙ্গনা প্রোজেক্ট দেখলাম। ... হিস্টোরিকালি আর ওখানে বাঁচানো যাবে না থিয়েটার। সেই জায়গায় ওরা ওখানে লেগে পড়েছে, এই লেগে পড়ার ফলে, ... এটা নিয়ে মনোজের সঙ্গে আলোচনা হয়নি এখনও। ও কি করতে চায় ওই ক্যারেকটারটা। ও কি একটা লেচ। ও কি একটা কামুক লোক। না কি ও যাতা করে, কি ব্যাপারটা কি, আমি ধরতে পারছি না

লোকটাকে, ওদিকে বিভাস নাকছাবিটা , ওই নাটকটা মনোজ আমাকে পড়িয়েছিলো। আমাদের একসঙ্গে করার কথা ছিলো। এখন ওখানে যে কনভেনসনাল অ্যাক্টিং এর জায়গা থেকে কতগুলো দামী মোমেন্টের জায়গা করছে তাতে হয় না কথা। ওর ভেতরে যে ক্রাইসিস গুলো আছে ওর ভেতরে আমরা দেখতে পাচ্ছি ওরা যে কথাগুলো বলছে তারা কেউ বিশ্বাস করে না কথাগুলো।

সুমন : আপনি কি এইজন্যই বললেন যে হিস্টোরিকালি ওটা সারভাইভ করবে না?

রুদ্রপ্রসাদ : না, এটা হচ্ছে যে ওই এন্টারমেন্ট ম্যাপটা, যেটা কোলকাতার, তার থেকে বললাম।

সুমন: আপনার কি মনে হয় না যে প্রোডাকসান গুলো এতোই কনভেনসনাল এবং এতোই কনটেম্পরারি টাইম কে ডিফাই করে করা যে, ...

রুদ্রপ্রসাদ : না, কিন্তু নাকছবিটাতে অনেকগুলো হিউম্যান মোমেন্টস ছিলো। কতগুলো কষ্ট। কতগুলো কষ্টের জায়গা ছিলো যেটাকে এক্সপ্লোর করলে নাটকে যদি কোন গোলমাল থাকে তাহলে ঠিক হয়ে যেত আপনা থেকে। কিন্তু কতগুলো কাঁচামাল খুব ভালো ছিলো ওখানে।

সুমন: আমার মনে হয় পুরোটা জিনিসটার মধ্যে এমন একটা প্রোটোটাইপ ওয়ার্ক করছে, সেইটা কোন ইন্টিগ্রিটি পাচ্ছে না। যেমন বাইরে যে ছবিগুলো আঁকা হচ্ছে তার বাইরের যে ডেকর পুরোটার এমন একটা সেটা মেলে না কোথাও। তাহলে কি বলবো যে হেজিমনিটা তৈরি হয়েছিলো ৬০এ সেটা এখনও ওয়ার্ক করছে এবং আমরা বেরুতে পারছি না তার থেকে।

রুদ্রপ্রসাদ : যেটায় মানুষকে নিয়ে কারবার এপারে ওপারে, সেখানে মানুষগুলো যদি আমরা মানুষ না হই, কি থিয়েটার তৈরী করবো আমরা? এটা ক্লিশের মতো শোনাচ্ছে, কিন্তু এই সোজা উত্তর। সেক্ষেত্রে আমার তোমাকে বয়স্ক হিসেবে উত্তর, আমার কথা দেখেছো, আমাদের যা দেখেছো , রাগ রেখোনা। কিছু হয়তো আমাদের থেকেও পেয়েছো। খারাপও পেয়েছো, ভালো ও নিশ্চয়ই কিছু পেয়েছো। হতে পারে না, ইট ডাস্ নট বেয়ার লজিক, যে সবই আমরা খারাপ করেছি। সেইটার শ্রদ্ধার সঙ্গে মাথায় রেখে যদি কিছু ট্র্যাডিসন থেকে মাথায় রেখে, যদি কিছু এখনও ট্র্যাডিসন থেকে সাক করতে হয়, ইন্টিগ্রেড করতে হয়, অ্যাসিমিলেট করতে হয়, সেটা খোলা মনে রাগ না করে, রাগ করলে তোমার ক্ষতি হবে, আমাদের আর হবে না। সেইটা মনে রেখে, এইবার ইউ হ্যাভ টু নেগোসিয়েট উইথ দ্য ওয়ার্ল্ড। সেক্ষেত্রে আশার একটাই কথা যে থিয়েটার বাজারে যদি বড় করে ডাক দিতে পার, বিবেকানন্দ বলেছিলেন, লেনিন বলেছিলেন, যে সোস্যাল গ্রাভিটেসনে দশটা

লোক চাই, পঞ্চাশটা লোক চাই যারা রিয়লি ফ্রি। আর আমার প্রশ্ন, যে হাউ ফ্রি ইউ পিপল আর? মানে ইকনমিকালি না, ইন স্পিরিট। এই ফ্রিডমটা, মানে পাগল হয়ে যাওয়া। সেইটা যদি তোমাদের থাকে তাহলে, শেষকালে তোমাদের মতো ছোট ছেলে যখন ইন্টার ভিউ করবে তখন তাকে বলবো বিলিভ মি আই রিয়েলি ট্রায়েড মাই বেস্ট। আই ডিড নট নো, বাট আই ট্রায়েড। দেয়ার ওয়ার মিলিয়নস অফ লেনিন বিফোর লেনিন সাকসিডেড। তাই তো হয়, ইতিহাসে অনেকগুলো মুহূর্তের ফলে ... হিস্ট্রি ইস হোস্টাইল। হিস্ট্রি ইস বিয়িং এরেসড। হিস্ট্রি নেই। পার্পেচুয়াল প্রেজেন্টের মধ্যে বাস করছি আমরা। আমার অতীতকে ভোলানো হচ্ছে, আমার ভবিষ্যৎ তৈরী হচ্ছে না। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে, ভেরি স্লিপারি, খুব একটা স্যাড মোমেন্ট ফর অল অফ ইউ।

সুমন : at the same time challenging.

রুদ্রপ্রসাদ : সেটা, হোয়েদার ইউ রিয়েলি লাভ থিয়েটার।